আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্তের ধর্মচিন্তার দার্শনিক বিশ্লেষণ

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

তন্ময় কুমার সরকার

তত্ত্বাবধায়ক

ইভা সাদিয়া সা'দ

সহযোগী অধ্যাপক, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. কাজী নূরুল ইসলাম

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর, ২০২০

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, তন্ময় কুমার সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের একজন পিএইচ. ডি. গবেষক। তার রেজিঃ নং ৬৫/২০১৫-১৬। সে আমাদের তত্ত্বাবধানে 'আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্তের ধর্মচিন্তার দার্শনিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে।আমাদের নির্দেশনা অনুসারে কাজটি সে সুন্দরভাবে করেছে। এ কাজটি একটি অনন্য ও মৌলিক কাজ বলে আমাদের ধারণা। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কোন গবেষণাকর্ম হয়নি। আমরা তার সাফল্য কামনা করি।

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. কাজী নূরুল ইসলাম
বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ইভা সাদিয়া সা'দ
সহযোগী অধ্যাপক
বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় যেসব ধর্মের মূল গ্রন্থের সহায়তা লাভ করেছি সে সকল ধর্মের প্রবক্তা, প্রচারক, মূনী, ঋষি, নবী, রাসুলগণের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। এ গবেষণা কর্মকে যাঁরা তথ্য, তত্ত্ব ও পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নাম উল্লেখ করে কারো অবদানকে ছোট করবনা।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ,যাঁদের শিক্ষা আমার অনুপ্রেরণা,তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ আমাকে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।আমার এম. ফিল. গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও বর্তমান গবেষণা কর্মের যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক, আমার স্যর প্রফেসর ড. কাজী নূরুল ইসলাম এবং আমার ম্যাডাম প্রফেসর ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম, এঁরা দুজন আমার বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে আসীন।তাঁদেরকে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক মিসেস ইভা সাদিয়া সা'দ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে এ কর্মকে সফল করেছেন; তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।আমার সহকর্মীবৃন্দ নিরন্তর আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার পরিবারের সকল সদস্য এ কাজের নিরন্তর সহায়ক। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। শ্রী পরিমল চন্দ্র বর্ম্মণ শ্রম দিয়ে অভিসন্দর্ভটি নির্ভুলভাবে তৈরীর চেষ্টা করেছেন।তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি আমার বাবা মায়ের আশীর্বাদে এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

তন্ময় কুমার সরকার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	বিষয়	**পৃষ্ঠা**
	সার সংক্ষেপ	i-xiv
প্রথম অধ্যায়:	আচার্য গুরুনাথ ও আচার্য গুরুনাথ প্রচারিত ধর্ম ১.আচার্য গুরুনাথ ২.আচার্য গুরুনাথ প্রচারিত ধর্ম	০১-২০
দ্বিতীয় অধ্যায়:	ধর্মের নাম , ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মের ভাষা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত	২১-৩০
তৃতীয় অধ্যায়:	আচার্য গুরুনাথের ঈশ্বরতত্ত্ব ১. ঈশ্বরের অস্তিত্ব ২. ঈশ্বর এক না বহু ৩. ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ৪. ঈশ্বরের স্বরূপ ৫. ঈশ্বর সগুণ না নির্গূণ	৩১-১৪০
চতুর্থ অধ্যায়:	জীবাত্মা সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথের মত	১৪১-১৬০
পঞ্চম অধ্যায়:	আচার্য গুরুনাথের সৃষ্টিতত্ত্ব	১৬১-১৭৭
ষষ্ঠ অধ্যায়:	উপাসনা সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথের মত	১৭৮-১৯০
সপ্তম অধ্যায়:	সাধনা সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথের মত ১. সাধনা ২. গুণ সাধনা	১৯১-২১৬
অষ্টম অধ্যায়:	অবতার, দেবতা ও সোঽহং জ্ঞান প্রসংগে আচার্য গুরুনাথের মত	২১৭-২৩৪
	উপসংহার	২৩৫-২৩৮
	গ্রন্থাবলী	২৩৯-২৪৬
	পরিশিষ্ট	a---h

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় লিখিত "গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রবন্ধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১] প্রবন্ধকার সেখানে গুরুনাথ সেনগুপ্তের সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন এবং শেষে আক্ষেপ করে বলেছেন যে, আমরা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ঈশ্বরতত্ত্ব ও তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করি বটে, কিন্তু এই একই পথের পথিক গুরুনাথের কথা ভুলে থাকি। এটি একটি গুরুতর অপরাধ। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।... বৃহত্তর সমাজে ধর্মোপদেষ্টা, গুরু ও সাধকরূপে তাঁর গূঢ় পরিচয়ের অনেকটা অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে। কবি, প্রাবন্ধিক ও মনস্বী লেখক গুরুনাথের সারস্বত প্রতিভারও সবটা কি উদ্ভাসিত হয়েছে?[২] ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের এ বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, আচার্য গুরুনাথের লেখনীর মধ্যে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় রয়েছে এবং তা উদ্ঘাটিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তিনি আরও বলেন, "... তাঁকে শুধু ক্রান্তদর্শী ঋষিকল্প ব্যক্তি বলেই মনে হয় না, আধুনিক ধর্মান্দোলনে তাঁরও যে একদা একটা গুরুতর ভূমিকা ছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। প্রচারের অভাবে, তাঁর যথার্থ পরিচয় আজ নিস্প্রভ প্রায়। গুরুনাথের উদার অসাম্প্রদায়িক মানবজীবনকেন্দ্রিক ব্রহ্মবাদ ঊনিশ শতকের বাঙালীর বিচিত্র জীবন জিজ্ঞাসাকে অভিনব দিক থেকে ফুটিয়ে তুলেছে।[৩]

আমরাও তাঁর লেখনী পড়ে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হয়েছে, তাঁর ধর্মতত্ত্ব সর্বমহলের জন্য অনুপ্রেরণামূলক একটি মতবাদ। এটি উদ্ঘাটিত ও প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এটি ধর্মজগতে একটি নতুনমাত্রা যোগ করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে গুরুনাথ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। গুরুনাথ সেনগুপ্ত সাহিত্য, দর্শন, নীতিশিক্ষা ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। আমরা এ অভিসন্দর্ভে তাঁর ধর্মতত্ত্ব থেকে কিছু কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর (১২৫৪ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ) তৎকালীন বঙ্গাদেশের যশোর জেলার কালিয়ার পার্শ্ববর্তী বেন্দাগ্রামে গুরুনাথ সেনগুপ্তের জন্ম হয়। তাঁর মা বাবা দুজনেই

---

[১] ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি গুরুনাথ সেনগুপ্তের কর্মস্থল কলিকাতার আহিরীটোলা বঙ্গাবিদ্যালয়ের ১২৫ বর্ষ পূর্তি স্মারক পত্রিকায় পুনরায় প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে

[২] কলিকাতার আহিরীটোলা বঙ্গাবিদ্যালয়ের ১২৫বছর পূর্তি স্মারক পত্রিকা, ১৯৮৫ পৃ. ৫৯;কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্য পত্রিকা ১৯৬৯,পৃ,১৯০-১৯১

[৩] ঐ ঐ, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম করতেন। তাঁর বাবা 'সাধু রামনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। মা-বাবার ধর্ম করা দেখে ছোটবেলা থেকেই গুরুনাথের মধ্যে ধর্মসাধনের আগ্রহ জন্মে। তিনিও ধর্মচর্চা করতেন এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়তেন। বড় হয়ে তিনি দেখলেন, ধর্মানুসারীদের মধ্যে ধর্মের প্রকৃত বিষয় উপেক্ষিত হয়ে বাহ্য আচারের আড়ম্বর বেশী। ধর্মানুসারীগণ একে অন্যের বিরোধিতা করছেন, এমনকি নিজেরাও নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছেন। ধর্মের এই প্রচলিতরূপ দেখে তিনি সন্দেহাকুল হন কেননা তা ধর্মশাস্ত্রের অনুকূল নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রের প্রতিকূল। এজন্য তিনি ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানার জন্য ব্যাকুল হন। এ সময়ে তিনি তাঁরই মত একই মানসিকতার সত্যসন্ধানী কয়েকজনকে পান।[৪] তাঁরা মিলিতভাবে সদ্‌গুণাবলীর চর্চ্চা ও এক উপাস্যের উপাসনা করতে শুরু করেন। নিষ্ঠার সাথে একাজ করতে করতে তাঁরা পারলৌকিক মহাত্মাদের[৫] কাছ থেকে আত্মাকর্ষণের[৬] মাধ্যমে ধর্মের প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে পারেন এবং সেভাবে নিজেরা ধর্মাচরণ করতে থাকেন। উপাসনা ও গুণের উন্নতির ধাপে ধাপে ধর্মের অন্যান্য বিষয়গুলিও তাঁরা জানতে পারেন। ধর্মাচরণ করে, উপযুক্ততা লাভ করে, আচার্য গুরুনাথ এ ধর্ম প্রচার করেন।

এ ধর্ম অনুসারে, এ জগতের স্রষ্টা, পালক, রক্ষক, নিয়ন্তা একজন, তিনিই একমাত্র উপাস্য; তিনি অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়। তাঁর গুণ দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে; সৃষ্টির সবকিছুই গুণসমষ্টি। তাঁর অনন্ত গুণের কণা কণা দিয়ে তিনি জীবাত্মা সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার উপাসনা[৭] ও গুণের চর্চ্চা দ্বারা জীবাত্মা যখন কোন একটি গুণের পরম উন্নতি, পরাকাষ্ঠা বা অনন্তত্ব লাভ করে, তখন সে ঐ বিশেষ গুণে স্রষ্টার বা পূর্ণ পরমাত্মার সাথে এক হয়। বলা হয় যে, ঐ গুণে সে একত্ব প্রাপ্ত হয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে বহুগুণে একত্ব লাভ করে জীবাত্মা পরমাত্মত্ব লাভ করে এবং পূর্ণ পরমাত্মার অধিক সান্নিধ্য লাভ করে কিন্তু কখনও স্রষ্টার সমান হয় না বা স্রষ্টাতে লীন হয় না। জীবাত্মার চারপাশে যেসব বিষয় আছে সেগুলি পাপ পুণ্যে মিশ্রিত। জীবাত্মার কর্তব্য এই যে, নিজে নিষ্পাপ হয়ে, ঐসব বিষয়ের পাপ অংশ বাদ দিয়ে কেবল পুণ্য অংশ অর্জন করা। গুণ সাধনার দ্বারাই একাজ সম্ভব। গুণসাধনার দ্বারাই মানুষের জন্মগ্রহণের সার্থকতা লাভ হয়। এ ধর্মমতে, গুণ সাধনাই সর্বপ্রধান কাজ সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা এবং গুণের অভ্যাস একমাত্র কাজ। এ ধর্মমতে জাতিভেদ নাই। সকল মানুষ সমানভাবে ধর্মকাজ করার অধিকারী। এ ধর্ম অনুসারে সব মানুষকে সহোদর-সহোদরার মত জ্ঞান করতে হয়; এ অভেদভাব অবশেষে সমস্ত চেতন পদার্থে পরিণত হয়। পারলৌকিক মহাত্মারা এ ধর্মের নাম দেন 'সত্যধর্ম'।আচার্য গুরুনাথ 'সত্যধর্ম' নামে একটি বইয়ের

---

[৪] দ্রষ্টব্য, দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস, মহাত্মা গুরুনাথ, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ৭৪

[৫] যেসব পারলৌকিক আত্মারা পরমেশ্বরের অধিক সান্নিধ্যে আছেন, তাঁদেরকে পারলৌকিক মহাত্মা বলা হয়। তাঁদের হৃদয়ে কোন ভ্রান্তি আসতে পারেনা, তাঁদের মাধ্যমে যা জানা যায় তা অভ্রান্ত (দ্রষ্টব্য, শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম, বাংলাদেশ, ১৩৮৬, পৃ; ঙ ও ৯)

[৬] যাঁরা গুণে অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করেছেন, যাঁরা দোষমুক্ত, তাঁদেরকে আশ্রয় করে পারলৌকিক মহাত্মারা তাঁদের মত জানাতে পারেন, এ পদ্ধতিকে আত্মাকর্ষণ বলে (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ৮)

[৭] উপাসনা বলতে আচার্য গুরুনাথ উপাস্য অনন্ত গুণময়ের গুণকীর্তন, তাঁর কাছে নিজের পাপের কথা বলা, পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা, গুণের জন্য প্রার্থনা প্রভৃতি বুঝিয়েছেন (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ১৪-১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে এ ধর্মের তত্ত্বসমূহ সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। এ ধর্মের বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে প্রকাশের জন্য তিনি তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, তত্ত্বজ্ঞান সাধনা, সত্যামৃত প্রভৃতি বই লিখেছেন।

তত্ত্ব আলোচনায় চিন্তাবিদগণ যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে দুটি পদ্ধতি প্রধান। একটি অনুসারে পূর্বমত সম্পূর্ণ খন্ডন করে নিজমত প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর অন্যটি অনুসারে পূর্বমত যা-ই থাকুক না কেন, সে বিষয়ে কোন আলোচনা না করে স্বাধীনভাবে নিজমত প্রকাশ করা হয়। আচার্য গুরুনাথ একটু ভিন্নতর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর নিজ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় পূর্ববর্তী যথার্থ তত্ত্বসমূহকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করেছেন। যথার্থ কোন তত্ত্বকে তিনি হেয় করেননি বা এড়িয়ে যাননি। পূর্ববর্তী যথাযথ তত্ত্বগুলোকে যথার্থভাবে বিন্যস্ত করেছেন এবং তার সাথে আর কোথায় কতটুকু যোগ করলে তাঁর নিজের তত্ত্বটি পূর্ণাঙ্গ হয়, তিনি সেটুকু সংযোজন করেছেন। এছাড়া তাঁর নিজস্ব তত্ত্বগুলোকে তিনি নিরপেক্ষভাবে(objectively) তুলে ধরেছেন। আর তাঁর দৃষ্টিতে ভ্রান্ত মতবাদগুলোকে তিনি পূর্ববর্তী শাস্ত্র থেকে প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে খন্ডন করেছেন। এজন্য তাঁর দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্বের সমাবেশ বেশী দেখা যায়। তাঁর লেখা পড়ে অনেকেই বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন যে, এসব তত্ত্ব সবই পূর্ব পূর্ব শাস্ত্রসমূহে রয়েছে। কিন্তু অভিনিবেশসহ পুরোটা পড়লে বোঝা যায় যে, এর সবটুকু পূর্বে ছিলনা এবং পূর্বে এভাবে বিন্যস্তও ছিলনা।

ধর্মের মূল বা প্রধান বিষয় ঈশ্বর। বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে ঈশ্বরকে নানা নামে ভূষিত করা হয়েছে, যেমন-পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরমসত্তা, আল্লাহ, খোদা, ভগবান, পরমপুরুষ, পরমপিতা, পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, God, Absolute, Supreme আহুরা মাজদা ইত্যাদি। বাংলায় প্রচলিত বিধায় সাধারণভাবে আমরা 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করব। এছাড়া কখনও কখনও পরমপিতা, পরমেশ্বর, স্রষ্টা, উপাস্য প্রভৃতি শব্দও ঐ একই সত্তাকে বুঝাতে ব্যবহার করব। এগুলি সবই ঐ এক সত্তার বিভিন্ন গুণ প্রকাশক শব্দ। ঈশ্বর বলতে আধিপত্য, প্রভুত্ব গুণ যাঁর, Ruler, সবকিছুর অবলম্বন, প্রভৃতি বুঝায়। পিতৃত্ব একটি গুণ, এ গুণের চরম উৎকর্ষ যিনি, তিনি পরমপিতা। এমনিভাবে অন্য শব্দগুলোও তাঁর গুণ প্রকাশ করে। আচার্য গুরুনাথ দেখিয়েছেন যে, এ সব নাম একই সত্তার বিভিন্ন গুণ প্রকাশক শব্দ। এসব নামের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বর এক না বহু, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, ঈশ্বর সগুণ না নির্গুণ, ঈশ্বরের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণসহ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

মানুষ ধর্ম করে। সুতরাং ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। আগস্ত্ কোঁতের মতে, মানুষের সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৮] ম্যাক্সমুলারের মতে, মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হ'ল ধর্মের ইতিহাস।[৯] আচার্য গুরুনাথ জীবাত্মা/মানবাত্মার অস্তিত্ব, স্বরূপ, মানবাত্মার পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁর করণীয় কি কি, এ সব বিষয়ে আলোচনা

---

[৮] দ্রষ্টব্য, Positive Philosophy Vol. II, P.119 Quoted in Pringle Pattison, S.A. in The idea of God in the Light of Recent Philosophy, Clarendon Press, 1917, p. 137

[৯] দ্রষ্টব্য, D. Mial Edwards, The Philosophy of Religion, অনুবাদ- সুশীল কুমার চক্রবর্তী, ধর্মদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা ১৯৮৯, পৃ : ১

করেছেন। জগতে মানুষের কর্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হ'ল, গুণ-সাধনা মানুষের সর্বপ্রধান কাজ অর্থাৎ ঈশ্বর-উপাসনা ও গুণের অভ্যাস একমাত্র কাজ।[১০] আর এজন্য উপাসনা কি, উপাসনা কিভাবে করতে হয়, উপাসনার অবস্থা, উপাসনার ফল প্রভৃতি এবং সাধনা কি, কিসের সাধনা, কিভাবে কোন সাধনা করতে হয়, সাধনার ফল প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁর ধর্মতত্ত্বে সন্নিবেশ করেছেন। তাঁর মতে, এ জগতে যা কিছু আছে সবই গুণ ও গুণময়।[১১] এই গুণ-ই সাধনার বিষয়।

আচার্য গুরুনাথ আত্মার গুণগুলিকে সরল, মিশ্র ও জাত- এ তিনভাবে ভাগ করেছেন। যে গুণ বা যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে স্বভাবতঃ আছে, সেগুলি সরলগুণ। যথা- প্রেম, সরলতা ইত্যাদি। যে গুণের অঙ্কুর আত্মায় থাকুক বা না থাকুক অন্য কোন গুণ বা গুণসমূহের যোগে স্বীয় নামে পরিচিত হয় সেগুলো মিশ্র গুণ। যেমন- ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদি। যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে নাই , ভৌতিক জগতের সাথে আত্মার সম্বন্ধকালে ক্ষণে ক্ষণে উদিত ও ক্ষণে ক্ষণে তিরোহিত হয় ; সেগুলো জাত গুণ। যেমন- কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণগুলি উৎকৃষ্ট; তৃতীয় শ্রেণীর গুণগুলি অপকৃষ্ট, এদের অন্য নাম দোষ। উৎকৃষ্ট গুণগুলির উন্নতি ও অপকৃষ্ট গুণগুলির লয় সাধনাকেই গুণ-সাধনা বলে। উৎকৃষ্ট গুণগুলির উন্নতি হলে অপকৃষ্ট আপনা হতেই লীন হয়ে যায়।[১২] তবে তিনি এও বলেছেন যে, জাতগুণ বা দোষের লয়, মিশ্রগুণের উন্নতি ও লয় এবং সরল গুণের উন্নতি--এর প্রত্যেকটির জন্যই বিশেষ বিশেষ সাধনা আবশ্যক। আর সে সাধনাগুলি তিনি তাঁর ধর্মতত্ত্বে সন্নিবেশ করেছেন।

জগতের মানুষ শান্তি চায়। বিশ্বশান্তির জন্য চিন্তাবিদগণ নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন কিন্তু তবুও পৃথিবীতে অশান্তি রয়েছে। আচার্য গুরুনাথের মতে, গুণ সাধনা যদি আচরিত হয়, তবে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সীমাবদ্ধ গুণ ও দোষ পরিচালিত কর্মই জগতে অশান্তি বা অমঙ্গল উৎপন্ন করে। সকলে যদি দোষ থেকে মুক্তিলাভ করে এবং উৎকৃষ্ট গুণগুলির উন্নতি সাধন ক'রে গুণগুলিকে অসীম করতে পারে, তাহলে জগতে শান্তি আসতে পারে।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় দর্শন অপরিহার্য। আচার্য গুরুনাথের ধর্মতত্ত্বে বেশ কিছু নতুন দার্শনিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। পূর্ব পূর্ব অনেক ধর্মতত্ত্বের ও দার্শনিকতত্ত্বের দ্বন্দ্বের মীমাংসার চেষ্টা তাঁর ধর্মতত্ত্বে আছে। যেমন, ঈশ্বর এক না বহু, সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুণ এ সকল দ্বন্দ্ব মীমাংসার চেষ্টা তিনি করেছেন। ধর্ম ও দর্শনে অমঙ্গলের সমস্যা নামে একটি সমস্যা আছে, এ সমস্যা নিরসনের ইঙ্গিতও তাঁর ধর্মতত্ত্বে রয়েছে।

আচার্য গুরুনাথের ধর্মচিন্তা অনেক বিস্তৃত এবং এর আনুষংগিক অনেক দার্শনিক তত্ত্ব, নীতিশিক্ষা, ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে। এর সবকিছু এ ক্ষুদ্র পরিসরে বিবৃত করা সম্ভব নয় বিধায় আমরা বিশেষ বিশেষ অংশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। সেগুলো নিম্নরূপ :

---

[১০] দ্রষ্টব্য, শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম, বাংলাদেশ, ১৩৮৬, পৃ. /.

[১১] দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ. ১৩৬।

[১২] দ্রষ্টব্য, শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

১। ভূমিকা, ২। প্রথম অধ্যায় : আচার্য গুরুনাথ ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম, ৩। দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্ম, ধর্মের নাম, ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মের ভাষা সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথের মত, ৪। তৃতীয় অধ্যায় : আচার্য গুরুনাথের ঈশ্বরতত্ত্ব, ৫। চতুর্থ অধ্যায় : জীবাত্মা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত, ৬। পঞ্চম অধ্যায় : আচার্য গুরুনাথের সৃষ্টিতত্ত্ব ৭। ষষ্ঠ অধ্যায় : উপাসনা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত, ৮। সপ্তম অধ্যায় : সাধনা সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথের মত, ৯। অষ্টম অধ্যায় : অবতার, দেবতা ও সোঽহং জ্ঞান সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত, ১০। উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়ে আচার্য গুরুনাথের পরিচয় ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় আচার্য গুরুনাথের শিক্ষা আরম্ভ হয়। এরপর তিনি একে একে বেন্দার টোলে ও বরিশালের খালিশাকোটার টোলে ব্যাকরণ পড়েন। পরে বেন্দা সার্কেল স্কুল থেকে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতার নর্মাল স্কুলে পড়তে যান এবং ১৮৬৭ সালে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাঁর কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে সুপ্রসিদ্ধ পন্ডিত মধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতি তাঁকে ‘কবিরত্ন’ উপাধি দেন। নর্মাল স্কুলের অধ্যয়ন শেষে তিনি আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং ক্রমে এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হয়ে পঁচিশ বছর কাজ করেন। একাজে থাকা অবস্থায় তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বই লেখেন।

পারলৌকিক মহাত্মাদের কাছ থেকে আত্মাকর্ষণের মাধ্যমে পাওয়া ধর্মের বিষয়গুলির আলোকে আচার্য গুরুনাথ আটটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে ‘সত্যধর্ম’ নামে একটি বই প্রকাশ করেন।বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদে সত্যধর্ম কি, সত্যধর্মের স্বাতন্ত্র্য, তাৎপর্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। যে ধর্ম নিত্যকাল বিদ্যমান, যথার্থ বিষয়ে পরিপূর্ণ, পরমেশ্বরের (পরমপিতার) অভিপ্রেত ও অসৎকে সৎ করে তা-ই সত্যধর্ম।

এ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,সত্যধর্মে সাকার উপাসনা, যোগসাধন, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, নির্বাণ বা ঈশ্বরে লীন হওয়া, সোঽহং, তত্ত্বমসি, ত্রিত্ববাদ, একবার মাত্র মানুষ জন্মগ্রহণ করে, বিধর্মীদের প্রাণনাশ, পাপীদের বিনাশ, প্রভৃতি মত নাই। সত্যধর্মের বিষয়গুলি কেবল পৃথিবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা অসীমভাবে বিস্তৃত। এ ধর্মের বিষয়গুলি সব শাস্ত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং এ মতের মধ্যে সমস্ত শাস্ত্রের ও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের মীমাংসা আছে বলে দাবী করা হয় । জগতে ঘটে যাওয়া বা ঘটমান অত্যাশ্চর্য বিষয়গুলোর মীমাংসাও সত্যধর্মে আছে বলে দাবী করা হয়। আত্মাকর্ষণ, পাপগ্রহণ আয়ুপ্রদান ও বিবিধ সিদ্ধির কথা সত্যধর্মে আছে। এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারাও সত্যধর্মের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সত্যধর্মের সার, সত্যধর্ম লাভের উপায় ও সত্যধর্মে থাকার উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সত্যধর্মের সার- মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন, পরমাত্মার জীবত্ব বিনাশ সাধন ও ভগ্নাংশের অখন্ড আকারে পরিবর্তন সাধন। সহজ জ্ঞান, নির্ভরতা ও বিশ্বাস অন্ততঃ এ তিনটি গুণবিশিষ্ট হয়ে দীক্ষা নিলে অর্থাৎ ঈশ্বর পথাবলম্বী হলে এ ধর্ম লাভ করা যায়, আর রীতিমত উপাসনা করলেই এ ধর্মে থাকা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ‘উপাসনা’ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। উপাস্যকে আত্মার আভরণ করাকে উপাসনা বলে। উপাসনার দুটি অংশ- উপাস্যের গুণ কীর্তন ও তাঁর কাছে নিজের পাপের কথা বলা। উপাস্যের (পরমেশ্বরের বা স্রষ্টার) অনন্ত গুণ। বিভিন্ন স্তব, গান বা সাধারণ কথায় তাঁর গুণ-কীর্তন ও নিজের পাপের উল্লেখ করতে করতে যখন আত্মগ্লানি হয় তখন পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। এর পরে যে যে গুণের অভাব বোধ হয়, সেসব গুণের জন্য প্রার্থনা করতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে ‘সাধনা’ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সাধনা অর্থ গুণ অভ্যাস। গুণ অনন্ত যথা- প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সরলতা, পবিত্রতা, বিশ্বাস, নির্ভরতা প্রভৃতি। যদিও উপাসনা দ্বারা গুণের বৃদ্ধি হয় কিন্তু সাধনা অর্থাৎ যথোচিত অভ্যাস না করলে প্রকৃতরূপে গুণের উন্নতি হয়না। গুণ সাধনার মাধ্যমে গুণ লাভ ক’রে ক্রমশঃ অনন্ত গুণময় পরমপিতার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। দোষের অননুশীলন যেমন দোষ নিবারণের প্রধান উপায় তেমনি গুণের অনুশীলন গুণ বৃদ্ধির প্রধান উপায়। পুরুষ সাধুশীলা স্ত্রীকে ও সাধুশীলা স্ত্রী সৎপুরুষকে অবলম্বন করে প্রেম গুণ অভ্যাস করতে পারেন। মা-বাবাকে অবলম্বন করে ভক্তি লাভ করা সহজ। একাগ্র হতে চেষ্টা করলে ক্রমশঃ একাগ্রতা গুণ লাভ হয়। এভাবে অন্যান্য গুণও অভ্যাস দ্বারা লাভ করা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে গুণ সাধনার দ্বারা যেসব সিদ্ধি বা ক্ষমতা হয়, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আত্মাকর্ষণ, পাপগ্রহণ, বাক্‌সিদ্ধি, আয়ুপ্রদান, দেহ থেকে বের হওয়া, দেহ নিয়ে যথাইচ্ছা যাওয়া প্রভৃতি ক্ষমতা যে যে গুণে হয়, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেহ, পরলোক, পুনর্জন্ম প্রভৃতি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। মানুষ মাত্রেরই অসীম দেহ- স্থূলতম, স্থূলতর, স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ইত্যাদি। স্থূলতম বা আদিম দেহ ত্যাগ করে মানুষ পরলোকে যায়। আদিম দেহ ত্যাগের পরে মানুষ যে যে স্থানে যায়, সেগুলোও পৃথিবীর মত এক একটি স্থান তবে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। যাঁরা উন্নত তাঁরা সুখময় স্থানে আর যাঁরা অবনত তাঁরা দুঃখময় স্থানে বাস করেন। পাপক্ষয় ও গুণের উন্নতি অনুসারে আত্মার উন্নতি হয়। পরলোকগত আত্মাদের মধ্যে কেউ কেউ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। পুনর্জন্ম সব আত্মারই যে হবে এমন না। যাঁরা পরলোকে পাপক্ষয় ও গুণের উন্নতি করে উঠতে পারেন না, তাঁরাই পুনর্জন্ম নিয়ে থাকেন। পুনর্জন্ম আত্মাদের ইচ্ছাধীন।

সপ্তম পরিচ্ছেদে পাপ-পুণ্য বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। যাতে অন্যের মনে কষ্ট হয় সুতরাং সহানুভূতি হলে কৃতকারীরও কষ্ট হয়, তাকে পাপ বলে। যার যতদূর ক্ষমতা আছে, সেরূপ কাজ না করলে বা তার বেশী করলে জীবাত্মার কষ্ট হয়, সুতরাং ঐসবও পাপ। পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত আত্মগ্লানি। উপাসনা দ্বারা উপযুক্ত আত্মগ্লানি হয় ও পাপ মুক্তি হয়। যাতে অপরের মনে সুখ হয় এবং সহানুভূতি হলে কৃতকারীরও সুখ হয়, তা-ই পুণ্য। যার যতদূর ক্ষমতা, সে অনুসারে কাজ করলে পুণ্য লাভ হয়।

আত্মাকর্ষনের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সাধকগণ কি কি কাজ করেছেন , অষ্টম পরিচ্ছেদে তার কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ধর্ম, ধর্মের নাম, ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মের ভাষা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত আলোচনা করেছি।

ধর্ম অর্থাৎ পথ। মোক্ষলাভের উপায়কে ধর্ম বলে। ধর্ম ধর্মই, এর কোন বিশেষ নাম নাই তবে সিদ্ধ প্রচারকগণ ধর্মের নাম 'সত্যধর্ম' বা এরূপ অর্থবিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন। জগতে প্রচারিত বিভিন্ন ধর্ম একই ধর্মের দেশ কাল পাত্রোপযোগী সংস্করণ এবং বিভিন্ন কারণে নানা নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

মুনী ঋষিদের শাসন বাক্য শাস্ত্র নামে পরিচিত। ধর্মশাস্ত্র উন্নত মানুষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে অনেক কিছু পরবর্তীকালের সংযোজন। সেজন্য প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র বের করা অসম্ভব প্রায়। কাজেই যাঁরা নিস্পৃহ ও শাস্ত্রজ্ঞ সেরকম মহাত্মাদের কাছ থেকে যা জানা যাবে তা-ই পরমশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্র যে ভাষায় রচিত, ধর্মানুসারীগণ সে ভাষাকে ধর্মীয় ভাষার মর্যাদা দেন। ধর্মীয় বিষয়গুলি ঐশীবাণীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। প্রচারক যে ভাষাভাষী, সে ভাষায়ই ঐশীবাণী এসেছে। এজন্য বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ভাষা বিভিন্ন। আচার্য গুরুনাথের মতে সব ভাষার উৎপত্তি একটি মূল ভাষা থেকে হয়েছে, যার নাম তিনি দিয়েছেন বৈজিক ভাষা। এ ভাষায় জ্ঞান হলে সবার ভাষা বোঝা যায়। এ ভাষায় জ্ঞান লাভ করতে হলে আত্মাকে বহু গুণে উন্নত করতে হয়। আচার্য গুরুনাথ প্রচলিত ভাষাসমূহের সীমাবদ্ধতার কথা তাঁর লেখনীতে উল্লেখ করেছেন; কারণ এসব ভাষায় উচ্চার্যমান বর্ণাবলীরই অভাব আছে; কাজেই এর কোন একটি দ্বারা সম্পূর্ণরুপে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয় অধ্যায়ে আচার্য গুরুনাথের ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। গুরুনাথ ঈশ্বরবাদী। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রচলিত প্রমাণগুলো যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি নিজে কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমস্ত সৃষ্টির উপাস্য একমাত্র; তিনি বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এ তত্ত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, ঈশ্বর সগুণ না নির্গুণ, এ সব নিয়ে প্রচলিত যে ধারণা ও দ্বন্দ্ব, তাঁর আলোচনায় এর মীমাংসার চেষ্টা দেখা যায়। তাঁর মতে, নিরাকার বললে সাকার তার অন্তর্গত হয়। সাধারণভাবে 'নিরাকার' শব্দের অর্থ 'আকার নাই যার' এরকম করা হয়। কিন্তু তিনি দেখান, পাণিনী ব্যাকরণ অনুসারে, 'নিরাকার' শব্দের অর্থ 'নিরবধারিত বা নির্ণয় করা যায় না অর্থাৎ অনির্ণেয় আকার যার'। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, তিনি সাকার আবার তিনি আকার বিহীন, তিনি সাকার-নিরাকারের অতীত, তিনি নিরাকার অথচ সর্বাকার ইত্যাদি। সাধারণ লোকে যাকে সাকার বা নিরাকার বিবেচনা করে, ঈশ্বর তার মধ্যে কোনটি নন, অথবা অনন্ত সাকারত্ব ও অনন্ত নিরাকারত্ব এই উভয়ের অনন্তভাবে মিশ্রন বা অনন্ত একত্ব তাঁর অনন্ত স্বরূপের একটি স্বরূপ।

ব্যাকরণের ঐ সূত্র অনুসারে তিনি দেখান যে, 'নির্গুণ' বললেও 'গুণ নাই যার' তা বুঝায় না বরং 'নিরবধার্য বা নিরবধারিত গুণ বিশিষ্ট' বুঝায়। সুতরাং সগুণ ও নির্গুণ বলার মধ্যে কোন বিরোধিতা দেখা যায় না। একটি গুণের ধারণীয় ভাব অন্যটি গুণের অধারণীয় ভাব। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেন, ঈশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়। গুণের সংখ্যা অনন্ত তাই তিনি অনন্ত গুণময়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি গুণের ই আবার অনন্ত ভাব, তাই তিনি অনন্ত অনন্ত গুণময়। এভাবে অনন্ত গুণের অনন্ত ভাবের অনন্তত্ব বা পরাকাষ্ঠা যিনি, তিনি ই ঈশ্বর বা পরমেশ্বর। সুতরাং তিনি অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়।

দৃশ্যমান জগতে পরস্পর বিরুদ্ধ দু'রকম সত্ত্বা দেখা যায়, যেমন, সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম, চেতন-অচেতন, নারী-পুরুষ ইত্যাদি। পরমাত্মা এককভাবে এর কোন একটির মত নন। তিনি সুখস্বরূপও নন দুঃখস্বরূপও নন বরং সুখ-দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্ত একত্ব। তিনি চেতন-অচেতনের অনন্ত একত্ব, নারী-পুরুষের অনন্ত একত্ব ইত্যাদি। এভাবে অনন্তভাবে সুখ ও দুঃখের একত্ব, ধর্ম ও অধর্মের একত্ব, চেতন ও অচেতনের একত্ব, দয়া ও ন্যায়পরতার একত্ব, জ্ঞান ও প্রেমের একত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষের একত্ব প্রভৃতি অনন্ত একত্বের একত্বই ঈশ্বরের স্বরূপ। এ অধ্যায়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বর এক না বহু, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, ঈশ্বর সগুণ না নির্গুণ, ও ঈশ্বরের স্বরূপ- এ পাঁচটি উপ অধ্যায়ে আচার্য গুরুনাথের ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে জীবাত্মা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত আলোচিত হয়েছে। অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময় পরমেশ্বরের যে অংশ কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল - এ তিন প্রকারের তিনটি দেহসম্পন্ন এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে দেহে বদ্ধ, তা-ই জীবাত্মা। জীবাত্মা নানা পাশে[১৩] বদ্ধ, সে জন্য সে যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তা বিস্মৃত; তাছাড়া দেহকেই সে আত্মা বলে মনে করে। পাশমুক্ত ও গুণাতীত (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অতীত অর্থাৎ এ তিনগুণ দ্বারা বিচলিত নয়-এমন অবস্থা) হয়ে আত্মস্বরূপ লাভ করাই জীবাত্মার চরম কাজ। জীবাত্মা যেরূপ কাজ করে ক্রমশঃ আত্মস্বরূপ লাভ করতে পারে তা হচ্ছে ঈশ্বরের উপাসনা এবং সাধনা অর্থাৎ দোষ-পাশ থেকে মুক্তির জন্য সাধনা, জীবাত্মার গুণের অংকুরগুলি গুণরূপে পরিণত করার জন্য ও গুণ লাভের জন্য সাধনা। এ বিষয়গুলি তিনি উপাসনা ও সাধনা অংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ঐ দুটি বিষয় এ অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে। এ অধ্যায়ে জীবাত্মার অস্তিত্ব, স্বরূপ, কাজ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে উপাস্য সম্বন্ধে আলোচনা করার পর স্বাভাবিকভাবে উপাসক সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। উপাসক কে, তার অস্তিত্ব, তার স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা সঙ্গত বিধায় এ অধ্যায়ে সে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবাত্মা উপাসক, তাঁর অস্তিত্ব প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শনের যুক্তিগুলি গ্রহণ করেছেন। জীবাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, মস্তিস্ক প্রভৃতি থেকে ভিন্ন। জীবাত্মা কর্তা, অন্যগুলি করণ। জীবাত্মার বা আত্মার ধর্ম চৈতন্য যা অন্যদের ধর্ম থেকে ভিন্ন। চৈতন্য যার ধর্ম সে-ই জীবাত্মা। জীবাত্মা সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণে দেহে বদ্ধ। কিন্তু এ তিনগুণ সব দেহে সমান নয়। আত্মার অবস্থা অনুসারে এর তারতম্য ঘটে। বৃক্ষলতা, গুল্ম, নদী, পর্বত প্রভৃতির দেহ তমঃ প্রধান, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী প্রভৃতির দেহ রজস্তমঃ প্রধান এবং মানুষের দেহ রজ

---

[১৩] যা আত্মাকে পরমাত্মা থেকে ও অন্য আত্মা থেকে পৃথক করে, যা অনন্ত গুণময়ের অংশকে পৃথকভাবে অবস্থান করায় সেগুলো পাশ। পাশ বলতে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল, জাতি এ আটটি মাত্র বোঝায় না বরং কাম-ক্রোধাদিও পাশের মধ্যে গণ্য (দ্রষ্টব্য, শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম, গুণ প্রকরণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান। রজোগুণ চঞ্চল ও চালক ব'লে সে অনুসারে কাজ করতে করতে যখন সত্ত্বগুণের সবিশেষ উদ্রেক হয় তখনই মুক্তি লাভের ইচ্ছা জাগে।

আচার্য গুরুনাথের ধর্মতত্ত্ব অনুসারে জীবের দেহের সংখ্যা অনন্ত। জীব একই সাথে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ - এ তিন প্রকারের তিনটি দেহ ধারণ করে আছে। স্থূল দেহের সংখ্যা ৩৯৯, সূক্ষ্মদেহের সংখ্যা পরার্ধ থেকে ৩৯৯ কম এবং কারণ দেহের সংখ্যা অনন্ত। এক দেহের কাজ শেষ হলে অন্য দেহ লাভ হয়। এভাবে সব দেহের কাজ ক্রমশঃ শেষ হলে পূর্ণভাবে মুক্তি হয়। এ তিন প্রকার দেহই পঞ্চভূতের সমন্বয়ে তৈরি, তবে আত্মার অবস্থা অনুসারে উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেসব আত্মা অবনত অর্থাৎ স্থূল ভাবাপন্ন তাঁদের দেহও সেরকম স্থূল উপাদানে তৈরি;আর যাঁরা উন্নত তাঁদের দেহও সেরূপ উন্নত হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম উপাদানে তৈরি হয়। দেহমাত্রই ত্রিগুণাত্মক হলেও কারণ শরীর সত্ত্বগুণ প্রধান, সূক্ষ্মশরীর রজঃ গুণ প্রধান এবং স্থূলশরীর তমোগুণ প্রধান।

পঞ্চম অধ্যায়ে আচার্য গুরুনাথের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে । তাঁর মতে আত্মা চৈতন্যাত্মক আর শরীরাদি জড়াত্মক। এ উভয়ের যোগ কিভাবে হয় সে ব্যাখ্যার জন্য তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন।আর এ কারণেই জীবাত্মা সম্বন্ধে তাঁর মত আলোচনার পরেই তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সন্নিবেশ করা হয়েছে।

তাঁর মতে, এ জগৎ সৃষ্ট। সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও প্রলয়কর্তা একজন। আদিতে একমাত্র তিনি (পরমেশ্বর) ছিলেন। তাঁর থেকেই এ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরতত্ত্বে আচার্য গুরুনাথ প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর একমাত্র এবং তাঁর স্বরূপ অংশে তিনি বলেছেন, পরমেশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়। এ সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সৃষ্টি প্রকরণ নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু পরমেশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময় সেহেতু তিনি অনন্ত প্রেমময়। প্রেমের ধর্ম যেমন বহুকে এক করা তেমনি এককে বহু করাও প্রেমের ধর্ম। প্রেমের ধর্মবশতঃ তিনি নিজেকে বহু করলেন। তাঁর নিজেকে বহু করার ইচ্ছা হল। তাঁর এই ইচ্ছা-ই সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকৃতি হল। পরমেশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা তাঁর অপূর্ণতা প্রতিপাদিত হয়না কারণ এটা অভাববশতঃ পাওয়ার ইচ্ছা বা আপ্তুমিচ্ছা নয়, এ ইচ্ছা পূর্ণশক্তি পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষ। নিজেকে বহু করার ইচ্ছার অন্য নাম নিজের অনন্ত গুণের পরীক্ষা করার ইচ্ছা। এ ইচ্ছাশক্তি নিত্যা এবং তিনরকম শক্তিবিশিষ্টা- সৃষ্টি করার ইচ্ছা, পালন করার ইচ্ছা ও ধ্বংস বা লয় করার ইচ্ছা। প্রতি শক্তির কাজই বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারা হয়। যেমন, দাহ করার কাজ দাহকত্ব গুণযোগে হয়, উপচিকীর্ষা শক্তির কাজ দয়াগুণ দ্বারা হয়। এ কারণে বলা যায়, ঐ তিনশক্তির কাজও তিনটি গুণ দ্বারা হয়। সে তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্ব গুণ দ্বারা পালন ও তমোগুণ দ্বারা ধ্বংস বা লয়ের কাজ হয়। পরমপুরুষের ইচ্ছাশক্তি-ই নিত্যা প্রকৃতি। এই মহাশক্তি থেকে পরমপুরুষ সহযোগে অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ও অনন্ত অনন্ত জীবের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হচ্ছে এবং এশক্তি পরমপুরুষে তন্ময়ভাবে নিত্য মিলিতা হয়ে নিয়ত তাঁর সহযোগে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও লয় করে যাচ্ছে।

পরমপুরুষের অংশ (অনন্ত গুণময়ের অনন্ত গুণের কণা কণা) যখন জীবভাবে বদ্ধ হতে লাগল তখন ঐ অংশের সহযোগে প্রকৃতি থেকে অন্তকরণের উৎপত্তি হল। অন্তকরণ চারভাগে

Dhaka University Institutional Repository

বিভক্ত- মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। এ সময়ই পরমপুরুষের অনন্ত সাকারত্ব ও অনন্ত নিরাকারত্বের একত্ব নামক একটি গুণ (যা অব্যক্ত নামে পরিচিত) পরমপুরুষ সহযোগে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হল এবং তা থেকে পরমপুরুষ সহযোগে ব্যোমের উৎপত্তি হল। এই ব্যোমই জড়জগতের প্রকৃতি। ব্যোম থেকে পরমপুরুষ সহযোগে বায়ু, ঐভাবে বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে তরল পদার্থ ও তরল পদার্থ থেকে ভূমি বা কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হল। পরে এ পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হল। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে জড়জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এই যে জগৎ দেখা যায়, এর জড় অংশ পরমেশ্বরের অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক গুণ থেকে উৎপন্ন এবং চৈতন্যাংশ তাঁর সাক্ষাৎ অংশ। অতএব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই পরম কারণ পরমেশ্বরের কার্য।

পঞ্চভূতের পঞ্চসত্ত্বাংশ দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং সমষ্টিগতভাবে অন্তকরণ উৎপন্ন হয়েছে। পঞ্চভূতের পঞ্চরজোঅংশ দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের এবং সমষ্টিগতভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল - এ তিন প্রকার শরীরই পঞ্চভূত থেকে উৎপন্ন। পঞ্চভূতের উপর জ্ঞান শক্তির সঞ্চালনে কারণ শরীর।, ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি হয়েছে আর ভোগের জন্য স্থূল শরীরের উৎপত্তি হয়েছে। পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হয়ে সমস্ত চেতন অংশের শরীর উৎপাদন করে। প্রতি শরীরে পরমাত্মার চৈতন্যাংশের সংযোগে বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষ্যাদি এবং সর্বশেষে নরজাতি উৎপন্ন হয়। এরূপেই দৃশ্যমান সৃষ্টি হয়েছে।

পরমেশ্বরের যে অনন্তগুণ, তার মধ্যে কোনটির কিরূপ শক্তি, তা পরীক্ষা করাই সৃষ্টি। এ কারণ সমস্ত চেতন অংশেই অনন্তগুণ অত্যল্প পরিমাণে এবং কেবল কোন একটি গুণ বেশী পরিমাণে দেয়া হয়েছে। ঐরূপ গুণসম্পন্ন ঐ সকল অংশের মধ্যে কে তাঁতে (পরমেশ্বরে) তন্ময় হতে পারে, এ-ই পরীক্ষা, এ জন্যই সৃষ্টি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপাসনা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চিন্ময়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, অশরীরি, বিভুর উপাসনা কর্তব্য বলে তিনি নির্দেশ করেছেন। উপাসনা সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করেছেন। শাব্দিকগণের মতে, উপাসনা অর্থ উপাস্যের নিকটে অবস্থান করা। সাধকভেদে এ অবস্থা এক এক জনের কাছে এক এক রকম। বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সে সব মতে উপাসনার একটি প্রধান অংশ উপাস্যের গুণকীর্তন। আচার্য গুরুনাথের মতে, যার দ্বারা উপাসক উপাস্যকে ভূষণস্বরূপ করতে পারেন, তা-ই উপাসনা। উপাসনার প্রধান দুটি ভাগ, (১)উপাস্যের গুণকীর্তন ও (২) তাঁর নিকটে নিজের পাপের কথা বলা। এ ছাড়া পাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা, গুণের জন্য প্রার্থনা প্রভৃতিও উপাসনার অঙ্গ। উপাসনার ফলে পশুত্বের নাশ, মনুষ্যত্বের বিকাশ, গুণলাভ ও তার ফলে অত্যুচ্চ অবস্থাসমূহ লাভ এবং সর্বোপরি মানবজন্মের সার্থকতা প্রভৃতি লাভ হয়।

আচার্য গুরুনাথ পার্থিব কাজ ত্যাগ করে উপাসনা করার কথা বলেননি। পার্থিব জীবন যাপনের প্রয়োজনে সৎকর্মান্বিত হতে বলেছেন। সংসারে উন্নতি ও পার্থিব জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে বলেছেন।বাসস্থান, খাদ্য, পরিধেয়াদি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পার্থিব কাজের মধ্যে এবং অবসর সময়ে জগদীশ্বরের উপাসনা করার কথা বলেছেন। যেভাবে উপাসনা করলে উপাসনার যথাযথ ফল লাভ হয় তার উপায় হিসাবে তিনি উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ও প্রণালী নির্দিষ্ট করেছেন। উপাস্য পরমেশ্বর অনন্ত গুণময়; গুণ দ্বারাই তাঁর উপাসনা করতে হয়, কোন পার্থিব বস্তু দিয়ে তাঁর উপাসনা হয়না। উপাসনার সময়ে জগদীশ্বরের গুণকীর্তন বললে তাঁর যে অনন্ত গুণ আছে, তার কীর্তন করা বুঝালেও সসীম গুণ সম্পন্ন ও সসীম শক্তি বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে অসীম গুণকীর্তন অসম্ভব। এছাড়া সকলের পক্ষে সকল গুণকীর্তন প্রয়োজনীয় নয়। যে ব্যক্তি পাপে নিমগ্ন, তার পক্ষে সত্য ও আনন্দ গুণের কীর্তনে বিশেষ লাভ হয়না। পাপ থেকে মুক্তির জন্য, জগদীশ্বর যে গুণে পাপীদিগকে পাপ থেকে মুক্ত করেন, তার সেই জাতীয় গুণের কীর্তন করা বিধেয়। অর্থাৎ যথাশক্তি সমস্ত গুণ কীর্তনের সাথে ঐ বিশেষ গুণটির পুনঃ পুনঃ কীর্তন করা প্রয়োজন। এ কারণ আচার্য গুরুনাথ বলেছেন যে, পরমেশ্বরের গুণকীর্তন করবার আগে গুণবাচক শব্দের কোনটির কি অর্থ অর্থাৎ কি শক্তি তা জানা দরকার। তিনি এরকম কতগুলি গুণের কথা লিখেছেন। যেমন, করুণা গুণে জগদীশ্বর পাপীদিগকে পাপ থেকে মুক্ত করেন। কৃপা গুণে শান্তি দেন, দয়া গুণে যাবতীয় দুঃখ হরণ করেন। মঙ্গল গুণে পাপীদের শুভ বিধান করেন, শিব গুণে নিষ্পাপদিগের শুভ বিধান করেন, বিভু অর্থ সর্বব্যাপী, সত্য অর্থ নিত্য ইত্যাদি। এভাবে অর্থবোধ করে, আত্মার অবস্থা অনুসারে গুণকীর্তন করলে অভীষ্ট ফল লাভ করা যায়। ভক্তি,প্রেম, একাগ্রতা, বিশ্বাস প্রভৃতি গুণে জগদীশ্বরের গুণকীর্তন করতে করতে যখন আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তখন পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনার পর যখন পরমপিতার করুণায় পাপমুক্তি ঘটে তখন নির্মল আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। এরপরে উপাসনার জন্য হৃদয়ে যে যে গুণের অভাববোধ হয়, সে সকল গুণের জন্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। তবে প্রেম কামনাতীত, এজন্য অন্য গুণের সাথে বা কোন কাম্য বিষয়ের সাথে প্রেমের জন্য প্রার্থনা বিধেয় নয়।

সপ্তম অধ্যায়ে ‘সাধনা’ সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথের মত আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর মতে, সাধনা অর্থ অভ্যাস বা চর্চা করা। গুরুদেব যে বিষয়ের শিক্ষার জন্য, যে রূপে, যে বিষয় অভ্যাস করতে বলেন, সেরূপে সে বিষয় অভ্যাস করাকেই সাধনা বলে। অর্থাৎ যেভাবে কাজ করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সে রকম কাজের অভ্যাসকেই সাধনা বলে। সাধনার ফলেই মানুষ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ উন্নতি লাভ করে। মানুষের প্রধান কর্তব্য পাপক্ষয় ও গুণের উন্নতি করা।আচার্য গুরুনাথের মতে, পাপের মূলকারণ দোষ ও পাশ;এদের থেকে মুক্ত হওয়া ও গুণের উন্নতি করা- এর প্রত্যেকটির জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সাধনা করা প্রয়োজন । আচার্য গুরুনাথ দোষসমূহ থেকে মুক্তির উপায় ‘ইন্দ্রিয় নিগ্রহ’ প্রবন্ধে এবং পাশসমূহ থেকে মুক্তির উপায় ‘পাশাষ্টকম্’ প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সরলতা, বিশ্বাস ও পবিত্রতা- এ ছয়টি পরম গুণের সাধনার বিবরণ দিয়েছেন এবং এই সূত্র ধরে অন্যান্য সকল গুণের উন্নতির বিধান দিয়েছেন। গুণ কি, বিভিন্ন গুণের সংজ্ঞা, কিভাবে কোন্ গুণ অভ্যাস করতে হয়, কোন্ গুণের ভাজন কে, কোন্ গুণের ব্যাঘাত কি কি, কোন্ গুণ বৃদ্ধির উপায় কি, কোন্ গুণের শক্তি কি, কাজ কি, কোন্ গুণ সাধনার ফল কি, প্রভৃতি বিষয় তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে লিখেছেন। এ ছাড়া সাধকদের অবলম্বনীয় বিষয় এবং সাধকদের অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞাতব্য বিষয়ও তিনি লিখেছেন। এ অধ্যায়ে 'সাধনা' ও 'গুণ সাধনা' এ দুটি পর্যায়ে এ বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ে অবতার, দেবতা ও সোঽহংজ্ঞান সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত আলোচনা করা হয়েছে। জগদীশ্বর জন্মগ্রহণ করেন- কিছু ধর্মে এরকম একটি মত প্রচলিত আছে, যাকে অবতারবাদ বলে। এ প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথের মত নিম্নরূপঃ

জগতে অনেক ঈশ্বর আছেন কিন্তু পরমেশ্বর একমাত্র। একত্বপ্রাপ্ত সাধকগণ ঈশ্বর শব্দে অভিহিত হন। অন্ততঃ একটি গুণেও যিনি একত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ ঐ গুণে চরম উৎকর্ষ লাভ করে জগদীশ্বরের সাথে ঐ গুণে এক হয়েছেন, তিনি ঈশ্বর। পরমেশ্বর এরূপ অনন্ত একত্বের একত্বস্বরূপ। জগদীশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে কোন একটিতে যিনি অনন্তভাব প্রাপ্ত , তাকেই একত্ব প্রাপ্ত বলে। সুতরাং জগতে যাঁরা অবতার বলে সিদ্ধ, তাঁরা কোন কোন গুণের অবতার, অনন্ত গুণের নয়। যেমন শিব জ্ঞানীত্বের, শ্রীকৃষ্ণ বীরত্বের, যীশুখৃষ্ট ক্ষমাশীলত্বের অবতার ইত্যাদি। অবতারগণ জগদীশ্বর নন, তবে তাঁরা গুণ বিশেষে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়ে সাধারণ লোকের চেয়ে অত্যুন্নত অবস্থা লাভ করেছেন। যাঁরা অবতার বলে পরিচিত তাঁরাও প্রথমে সামান্য মানুষ ছিলেন; বহু শতবর্ষ কঠোর তপস্যা ও কর্ম প্রভাবে তাঁরা বিবিধ গুণ ও শক্তি লাভ করেছেন। সুতরাং অবতার বলতে এরূপ গুণ-শক্তি সম্পন্ন মানুষ বোঝায়, পরমেশ্বর যে অবতীর্ণ হন, তা বোঝায় না। কঠোপনিষদের ১/২/১৮, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের ৬/৯ শ্লোকে এবং কোরান শরীফের ১১২ নং সুরায় 'জগদীশ্বর যে জন্মগ্রহণ করেন না' এরূপ কথা বলা আছে। কাজেই অবতারবাদীদের ঐ কথা, এসব ধর্মগ্রন্থের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। অবতারবাদীগণ যে সব প্রয়োজন দেখিয়ে জগদীশ্বরের জন্মগ্রহণের কথা বলেন, ঐ সব প্রয়োজন একজন সবিশেষ শক্তি সম্পন্ন মানুষ দ্বারাই সম্পন্ন হতে পারে, জগদীশ্বরের জন্মগ্রহণরূপ শ্রুতিবিরোধী মতের প্রয়োজন হয়না বলে গুরুনাথ মনে করেন। সুতরাং সৃষ্টির বিভিন্ন স্থানে পরমেশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য, যাঁরা পরমেশ্বরের আদেশে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরাই অবতার।

আচার্য গুরুনাথ 'দেবগণ' শব্দে ইহলোকস্থ মুক্ত পুরুষ ও পরলোকগত উন্নত মহাত্মাগণ বুঝিয়েছেন। হিন্দু শাস্ত্রে যে সব দেবদেবীর কথা পাওয়া যায় এবং খৃষ্টানাদি শাস্ত্রে যে পবিত্র আত্মাদের কথা জানা যায়, তাঁর মতে, এঁরা সকলেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও আত্মোন্নতি সাধন করেছেন। তাঁর মতে, গুণ দ্বারাই পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্বে প্রভেদ। তিনি বলেছেন যে, প্রয়োজন অনুসারে দেবদেবীগণের পূজা করা অকর্তব্য নয়, তবে কখনই তাঁদেরকে জগদীশ্বরের তুল্য জ্ঞান করা ঠিক হবেনা। তাঁরা সান্তশক্তিবিশিষ্ট আর জগদীশ্বর অনন্তশক্তিবিশিষ্ট। দেবতাদের বা মহাত্মাদের যে শক্তি তাও জগীশ্বরেরই শক্তি। দেবদেবীগণ অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণসম্পন্ন জগদীশ্বরের অংশ ও উপাসক; এঁদেরকে ধারণা করাও সাধারণতঃ কারও সাধ্য নয়। দেবদেবীগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাঁদের প্রতি যথোচিত ভক্তি করা কর্তব্য কিন্তু তাঁরা যাঁর অংশ, তাঁকে তাঁদের স্থানীয়রূপে ভাবা ঠিক নয়। আধুনিককালে যজ্ঞেশ্বর মিত্র, পূরবী পাল প্রমুখ বেদের গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে, দেবতারা বিশেষ একটি নরগোষ্ঠী, হিমালয়ের উত্তরে উচ্চ ভূমিতে তাঁদের বাস ছিল। তাঁরা শিক্ষা-

Dhaka University Institutional Repository

দীক্ষায় উন্নত ছিলেন। আবার, প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এরিখ ফন দানিকেনের মতে, দেবতারা ছিলেন মহাকাশের অজানা গ্রহবাসী সুসভ্য মানুষ। তাঁরা সর্ববিষয়ে পৃথিবীবাসী মানুষের চেয়ে বহুগুণে উন্নত।

জগতে সোঽহং বলে একটি মত আছে। সোঽহং শব্দের অর্থ 'সে-ই আমি'। এখানে 'আমি' কোন সৃষ্ট আত্মা আর 'সে' বলতে পরব্রহ্ম-কে বুঝায়। অর্থাৎ সৃষ্ট আত্মা 'সে-ই আমি' অর্থাৎ 'পরব্রহ্ম-ই আমি' এরকম জ্ঞান করতে পারে, এমতে এরূপ কথা বলে। উপনিষদে এ জাতীয় চারটি বাক্য পাওয়া যায়-সোঽহং, সোঽহমস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ও তত্ত্বমসি। এ বিষয়ে আচার্য গুরুনাথ মত দেন যে, স্রষ্টার প্রতি সৃষ্ট আত্মার কখনও সোঽহং জ্ঞান জন্মে না। সৃষ্ট আত্মা কোটি কোটি গুণে একত্ব লাভ করলেও কখনও পরমেশ্বরের তুল্য হতে পারেনা। কারণ অনন্ত একত্বের যে একীভবন তা-ই পরমেশ্বরের স্বরূপ। জীব নিজের চেষ্টায় অনন্ত একত্বই লাভ করতে পারেনা। কাজেই অনন্ত একত্বের একত্ব লাভের কথা, সে চিন্তাও জীব করতে পারেনা। তবে সৃষ্ট আত্মার সাথে সৃষ্ট আত্মার সোঽহং জ্ঞান হতে পারে। এটা গুণ সাধনার ফলে হয়। আচার্য গুরুনাথ 'প্রেম' ও 'অভেদ জ্ঞান' এ দুটি গুণ সাধনার বর্ণনায় সোঽহং জ্ঞানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দুটি আত্মা পরস্পর প্রেম সাধনা করলে, উভয়ের উন্নত প্রেমবশতঃ তাদের মধ্যে পার্থিব অভেদ জ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ প্রেমের দ্বারা সমভাবাপন্ন সাধকগণ পরস্পর পরস্পরের গুণাবলীর অধিকাংশ লাভ করে পরস্পর তন্ময় হয়ে যায় অর্থাৎ 'আমিই তুমি' বা 'তুমিই আমি' এরূপ অবস্থাপন্ন হয়। এই অভেদ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হলে সোঽহং জ্ঞান জন্মে। পার্থিবঅভেদজ্ঞান ছাড়া সোঽহং জ্ঞান জন্মেনা। কাজেই স্রষ্টার সাথে সৃষ্ট আত্মার কখনও সোঽহং জ্ঞান জন্মেনা, কারণ তাঁর প্রেমের সদৃশ প্রেম জগতে বিদ্যমান নাই।

প্রেমের উন্নত অবস্থায় অভেদজ্ঞান জন্মে। সুতরাং জগতের প্রতি প্রেমের প্রসার হলে সকল মানুষকে 'আমার' বলে বোধ হয়। এরূপে অভেদ জ্ঞানকারী সাধক আরও উন্নত অবস্থায় সকল মানুষকে সোঽহং জ্ঞান করেন অর্থাৎ 'সকলেই যে আমি' এরূপবোধ করেন। অভেদ জ্ঞানের আরও বৃদ্ধি হলে সৃষ্টির সবকিছুই তাঁর সোঽহং জ্ঞানের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। সে সময়ে তিনি বোধ করেন যে, একমাত্র অনাদি অনন্ত পরমপিতা পরমেশ্বর ও আমি এই উভয়ই কেবল বিদ্যমান। কেননা সমস্ত জগৎ তখন তাঁর অন্তর্গতভাবে থাকে। এই পরমোন্নত সময়ে সাধক নিজের উন্নতির জন্য যেমন চেষ্টা করেন, সমস্ত সৃষ্টির উন্নতির জন্যও তেমন চেষ্টা করেন। এ অবস্থাপন্ন সাধকই ধর্মপ্রচার, জ্ঞান প্রচার এবং জগতের সুখ বর্ধন ও দুঃখ নিবারণে প্রকৃত সমর্থ; সকলের উন্নতি সম্পাদনই তখন তাঁর মহাব্রত হয়।

এ আটটি অধ্যায়ে আমরা আচার্য গুরুনাথের ধর্মতত্ত্বের কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অভিসন্দর্ভের জন্য আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছি। তথ্যগুলোর মূল্যায়ন করে তুলনামূলক ও বিচারমূলক আলোচনা করেছি। সুতরাং একাধারে এসব পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি। ধর্মজগতের নানা তত্ত্ব আছে এবং প্রকৃত ব্যাখার অভাবে সেগুলো পরস্পর বিরুদ্ধবৎ মনে হয়। আচার্য গুরুনাথ যেভাবে গুণের দ্বারা সবকিছু ব্যাখা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, তার দ্বারা প্রকৃত ধর্মতত্ত্বের এই আপাতঃ বিরোধিতার অবসান হয় বলে আমাদের মনে হয়েছে। আমরা

Dhaka University Institutional Repository

এলক্ষ্য সামনে রেখে তাঁর গুণ সাধনা তত্ত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরার এ ক্ষুদ্র চেষ্টা করেছি। আমাদের মেধা, স্মৃতি ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। সকলের ক্ষমা ও কৃপা ভিক্ষা করি।

প্রথম অধ্যায়

আচার্য গুরুনাথ ও আচার্য গুরুনাথ প্রচারিত ধর্ম

(১)
আচার্য গুরুনাথের পরিচয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল। ভারতে তখনও কোম্পানীর শাসন, লর্ড হার্ডিঞ্জ গভর্নর জেনারেল। দেশে-বিদেশে চিন্তাজগতে একটা মহা আলোড়ন-- ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি সব কিছু সম্বন্ধে মানুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে যুগ প্রবর্তক রাজর্ষি রামমোহন নিরাকার উপাসনার অবশ্য কর্তব্যতা প্রচার করে নতুন যুগের প্রবর্তন করে লোকান্তরিত হয়েছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণের ধর্মাদর্শের সাথে বেদ-উপনিষদের সঙ্গতি স্থাপন করতে না পেরে চিন্তিত আছেন।[১] বাংলার বাইরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পৌরাণিক ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মকে বিমুক্ত করে তার আর্যত্ব বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি-না, তাই ভাবছেন। ভারতের বাইরে আমেরিকায় অধ্যাত্মতত্ত্ব অনুশীলনরত সাধকগণ ইহলোকের সাথে পরলোকের যোগসূত্র স্থাপন করা যায় কি-না,তার উপায় উদ্ভাবন করছেন। চারিদিকে নতুন ও পুরাতনে সংঘর্ষ। ধর্মে ধর্মে বিরোধ ও বিচ্ছেদ। সকলেই আপন আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রচার করছে। একদল যুক্তিকে মুক্তির উপায় বলছে, অন্যদল ভক্তিকে মুমুক্ষুর একমাত্র অবলম্বন বলে প্রচার করছে। গোড়ামী ও ধর্মান্ধতা কোন কোন দলের উপাস্য, আবার কোন দল ধর্মহীন উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া জীবন যাপনের পক্ষপাতী। একদল যা কিছু প্রাচ্য তাকেই অশ্রদ্ধা করছে, অন্যেরা পাশ্চাত্যকে অবজ্ঞা করছে। একদল বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করছে, অন্যদল তাকে উপেক্ষা করছে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে চির কলহের সুর, বিরোধ ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠছে। ধর্ম জগতেও এক মহা সন্ধিক্ষণ। ঈশ্বর আছেন কি নাই, থাকলে তিনি এক না বহু, সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুণ, দেব-দেবী আছেন কি-না, অবতারবাদ সত্য কি-না, সৃষ্টি কি,কিরূপে হ'ল, গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না, ধর্মশাস্ত্র সত্য কি-না, সেগুলো পরমেশ্বর কথিত না মানব রচিত, জীবাত্মা কি, পরমাত্মা কি, জীবাত্মার

---

[১] দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর আত্মজীবন চরিতে লিখেছেন, "... কিন্তু যখন উপনিষদে দেখিলাম 'সোঽহমস্মি' তিনিই আমি 'তত্ত্বমসি' তিনিই তুমি, তখন সেই উপনিষেদের উপরও নিরাশ হইয়া পড়িলাম, ... ব্রাহ্মধর্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তন ভূমি হইল না- উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়ই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান (দ্রষ্টব্য, যতীন্দ্র মোহন সিংহ, সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার, কলিকাতা, ১৩৩০, পৃ: ৯২-৯৩)।

সাথে পরমাত্মার সম্বন্ধ কি, বিজ্ঞান সত্য না প্রজ্ঞান সত্য, জড়জগৎ বড় না সূক্ষ্মজগৎ বড় ইত্যাদি ইত্যাদি চিন্তা মানুষের মনকে আলোড়িত করছে। প্রকৃত সত্যের সন্ধানে মানুষ ঘুরে মরছে। অসত্য ও অর্ধসত্য চারিদিকে আস্ফালন করে চলেছে। সত্যকার ধর্মবোধ নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত হচ্ছে। বাহ্য পূজা-উপাসনা স্বকীয় বাহ্য আচার মাত্র বজায় রেখে প্রাণহীন স্তব-স্তুতিতে পরিণত হচ্ছে। একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্মকে নির্বিশেষ নিরূপাধি দেশকালাতীত ধর্মরূপে গণ্য ও প্রচার করা হচ্ছে। সংস্কারের বাঁধা ভূমার অন্বেষণকে সমাচ্ছন্ন করে রাখছে। মহাত্মা নামে খ্যাত ঈশ্বর ঈশ্বরীগণের পূজা পরমশরণ পরমেশ্বরের উপাসনাকে আচ্ছন্ন ও আবৃত করে রাখছে।[২]

এমনিতর একটি সময়ে তৎকালীন ভারতের অবিভক্ত বাংলায় যশোর জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের নড়াইল জেলার) কালিয়ার পার্শ্ববর্তী বেন্দা গ্রামে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর, ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার আচার্য গুরুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মহাত্মা গুরুনাথ নামেও পরিচিত হন। তাঁর পিতা রামনাথ সেন (যিনি সাধু রামনাথ নামে অভিহিত ছিলেন) এবং মা গৌরীদেবী।

পাঁচ বছর বয়স থেকে গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে বেন্দার সর্ববিদ্যাকুলজ গোলকচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ পড়েন। এরপরে বরিশালে খালিশাকোটায় জগচ্চন্দ্র কবিভূষণের টোলে কলাপ ব্যাকরণ শেষ করেন। এগারো বছর বয়সে কবিরাজী শাস্ত্র আয়ত্ব করেন। এরপর বেন্দা সার্কেল স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতায় নর্ম্যাল স্কুলে পড়তে যান। এ সময়ে তিনি বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য এবং দর্শন পড়েন। কয়েক বছরের মধ্যে মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম, পাণিনি প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাকরণ, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, তন্ত্র, উপনিষদ, স্মৃতি ও ন্যায়ের জ্ঞান লাভ করেন। সে সময়কার সুপ্রসিদ্ধ পন্ডিত মধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতি ও রাজকুমার ন্যায়রত্ন তাঁর অসাধারণ কবিত্ব শক্তির জন্য তাঁকে কবিরত্ন উপাধি দেন।[৩]

১৮৬৭ সালে গুরুনাথ নর্ম্যাল পাশ করেন। ১৮৬৮ সালের মার্চ মাসে কলিকাতার আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় পন্ডিতের পদে গণিত শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। বাস্তবে তাঁকে গণিত বাংলা ও

---

[২] (দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম প্রচারক দেব-মানব মহাত্মা গুরুনাথ, সত্যধর্ম মহামন্ডল, বাংলাদেশ, পৃ. (১৪) (১৫))।

[৩] এই অভিজ্ঞান পত্র দুখানি সংস্কৃতে রচিত। তাঁর বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

(১) "হে সৎকুল প্রসূত আমার শিষ্য শ্রীমান গুরুনাথ সেনগুপ্ত! যেহেতু তোমা কর্তৃক কাতন্ত্র মুগ্ধবোধ, সিদ্ধান্ত কৌমুদী প্রভৃতি ব্যাকরণ, কালিদাস- ভবভূতি-মাঘ-ভারবি-বাণভট্ট-শ্রীহর্ষাদি প্রণীত কাব্য এবং ছন্দ, অলংকার, গণিত, কোষ, পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষৎ, তন্ত্র প্রভৃতি বহুশাস্ত্র অধীত হইয়াছে। সেই কারণে আমি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে কবিরত্নোপাধি দিলাম।

হে গুরুরত, অম্বষ্ঠবংশ গ্রহার্ক গুরুনাথ! গুণীগণাগ্রগণ্য, বিবধশাস্ত্রজলধিতে আপ্তবোধামৃত তোমাকে অদ্য আমি সুবিমল কবিরত্নোপাধি প্রদান করিলাম।

এই প্রশংসা পত্রিকা গ্রহ বসুঅব্ধি চন্দ্র দ্বারা বিজ্ঞেয় শাকে অর্থাৎ ১৭৮৯ শকাব্দে (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) সূর্য মেষ রাশিতে গমন করিলে যে মাস বুঝায় অর্থাৎ বৈশাখ মাসে চতুর্থ দিবসে লিখিত হইল। ইতি- শ্রী মধুসূদন বাচস্পতি।"

(২) "হে সেনবংশাবতংস (সেন বংশের অলংকার স্বরূপ) শ্রীমদ্ গুরুনাথ নামধেয় বৈদ্যপ্রবর আমার ছাত্র! ন্যায়াদিদর্শন শাস্ত্রে তোমার পান্ডিত্য বিশেষরূপে অবগত হইয়া পরমসন্তুষ্টচিত্তে আমি শ্রী রাজকুমার ন্যায়রত্ন সকলের অবগতির নিমিত্ত তোমাকে কবিরত্নোপাধি দিতেছি। আমার মনে হয় তুমিই এই উপাধির প্রকৃত পাত্র। হে স্নেহাস্পদ! পরমাত্মার নিকট আমি এই প্রার্থনা করি, এই উপাধি বিভূষিত হইয়া দর্শন শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে তুমি সর্বদা যত্নবান হও। ইতি-

তাঁর উপাধি প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর অন্যতম শিক্ষক শ্রী আশুতোষ দেবশর্মা তাকে যে character certificate দিয়েছিলেন তাও অনবদ্য।

(দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম প্রচারক দেব-মানব মহাত্মা গুরুনাথ, পৃ. ৩৯-৪২)।

ইতিহাস, এ তিনটি বিষয় পড়াতে হ'ত। পরে তিনি রসায়ন শাস্ত্রও পড়াতেন। ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯০০ সালে ৩৩ বছরের শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর নেন। তিনি কিছুদিন ডাফ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন।এছাড়া সিটি কলেজ, রিপন কলেজ প্রভৃতিতে স্থায়ীভাবে অধ্যাপকতা করার জন্য গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের ক্ষতির আশংকায় আত্মস্বার্থবিমুখ গুরুনাথ সে কাজে সম্মত হন নাই।

১৮৯১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত প্রাতঃস্মরণীয় মণীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পরে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি.আই.ই. ঐ বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন রায়বাহাদুর কানাইলাল দে, সি.আই.ই.। তাঁরা ১৮৯৭-৯৮ সালের বার্ষিক বিবরণীতে পন্ডিত প্রবর গুরুনাথ সেনগুপ্তের যে প্রশস্তি করেছিলেন তা অনন্য।[৪]আচার্য গুরুনাথের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনন্য ও সকলের অনুসরণীয়। শিক্ষকতা জীবনে তিনি ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিজ্ঞান করে শিক্ষা দিতেন। ছাত্র কিরূপ পরিশ্রম করতে পারে এবং তার বুদ্ধি, মেধা ও একাগ্রতাই বা কিরূপ তা না জানলে তার উন্নতি করা দুস্কর বলে তিনি মনে করতেন। যাতে ছাত্রের চিন্তাশক্তি বিকাশের অনুকূলতা হয়, তিনি ছাত্রকে সেভাবে শিক্ষা দিতেন। ছাত্রকে সাধুশীল ও সদ্বৃত্ত করা এবং বিদ্যাশিক্ষার সাথে সাথে যাতে ছাত্রের ধর্মভাব উদ্দীপ্ত হয়, সেদিকে তিনি দৃষ্টি দিতেন। ছাত্রবর্গ বাড়ীতে কিরূপ ব্যবহার করে তার অনুসন্ধান করাও শিক্ষকের কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন এবং নিজে তা করতেন। কোন ছাত্রের মধ্যে গুণের পরিচায়ক কিছু দেখলে তাকে উৎসাহিত করতেন, পুরস্কার দিতেন, আবার কারো মধ্যে দোষের কিছু দেখলে সংশোধনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। তাঁর মতে শাস্তিদানের একমাত্র উদ্দেশ্য শিক্ষাদান ও চরিত্র সংশোধন, সেজন্য ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। যদিও তিনি কায়িক দন্ডের বড় একটা পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁর অসাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের জন্য তার প্রয়োজনও হতোনা।

আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকালে ও সেখান থেকে অবসর নিয়ে আচার্য গুরুনাথ সংস্কৃতে ও বাংলায় বহুবিধ ও বহুসংখ্যক মহাকাব্য, কাব্য, খন্ডকাব্য, গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গদ্য, পদ্য বিভিন্ন ছন্দে রচনা করেছেন।উক্ত বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষকোচিত শ্রমসাধ্য, দায়িত্বপূর্ণ ,দেশহিতকর কাজে নিয়োজিত থেকেই তিনি এ কাজ করেছেন। বিশেষতঃ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থাবলী জগতের অমূল্য সম্পদ। সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি রচনা বীরোত্তর কাব্য, মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্যের উত্তর। তাছাড়া সে সময়কার পাঠ্য বইয়ের এমন কোন বিষয় নাই যে বিষয়ে তিনি লেখেননি। সে সময়কার প্রকাশক অবলাকান্ত সেন মহাশয়কে প্রত্যেক শ্রেণীর ও প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নোত্তর অন্য নামে লিখে দিয়েছেন।

তাঁর রচনার প্রধান কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো:

---

[৪] "পন্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সংস্কৃত, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, দর্শনাদি শাস্ত্রে এবং গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে ইহার যেরূপ অসাধারণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে আমরা বিবেচনা করি, এতাদৃশ শিক্ষক সমস্তভাবে অতি দুর্লভ সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর পরিশ্রম ও যত্নের সীমা নাই, এবং ইহার প্রতি তাঁর বিশেষ মমতাও আছে। তিনি আপনার বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই বিদ্যালয়ের উন্নতি ও গৌরবের জন্য সর্বদাই তৎপর থাকেন। ...." (দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ৭২-৭৩)।

সংস্কৃত রচনাঃ

গ্রন্থ : (১) সত্যধর্ম্ম (২) গুণরত্নম্ (৩) গুণসূত্রম্ (৪) পাশাষ্টকম্ (৫) মুক্তি জিজ্ঞাসা।

প্রবন্ধ : (১) ধ্যানম্ (২) অবতারবাদঃ (৩) অদৃষ্টবাদঃ (৪) গুণত্রয়ম্ (৫) অভেদজ্ঞানম্।

উপরিউক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঁচটি এক্ষণে "সত্যামৃত" নামক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে।

গ্রন্থ : (৬) ধর্ম্মঃ (৭) ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (৮) ষট্চক্রভেদ সাধনা (৯) স্তোত্ররত্নম্।

প্রবন্ধ : (৬) প্রণব প্রশংসা।

মহাকাব্য : (১) শ্রীরামচরিতম্ (২) শ্রীগৌরবৃত্তম্ (পদ্যে বঙ্গানুবাদসহ)।

কাব্য ও খন্ড কাব্য : (১) বারিদূতম্ (২) বাতদূতম্ (৩) মনোদূতম্ (৪) পত্নীশতকম্ (৫) শিক্ষাশতকম্ (৬) ভ্রমভ্রমণম্।

ব্যাকরণ : (১) সুখবোধ ব্যাকরণম্ (২) কৌমার ব্যাকরণম্ (৩) ছন্দোরত্নম্ (৪) গণরত্নম্ (৫) পাণিনিসারঃ (৬) চতুষ্টয়বৃত্তিঃ (৭) আখ্যাতবৃত্তিঃ (৮) কৌমার সঞ্জীবনী (সর্ব্ব বর্ম্মার গুরুবৃত্তির বিংশ সূত্র পর্য্যন্ত ভাষ্য) (৯) বৈদিক ব্যাকরণম্ (সন্ধি পর্য্যন্ত) (১০) ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর।

ইতিহাস : (১) ভারতেতিহাসঃ।

টীকাগ্রন্থ : (১) সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী টীকা (২) ঋগ্বেদ টীকা (৩) কাদম্বরী টীকা (৪) মুগ্ধবোধ টীকা।

ভাষ্যগ্রন্থ : (১) সামবেদ ভাষ্যম্ (২) কালী-উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রভাষ্যম্।

নীতিগ্রন্থ : (১) সুনীতিসারঃ।

বিদ্যালয় পাঠ্য-পুস্তিকা : সাহিত্য সোপানম্

গুরুমাহাত্ম্য বিষয়ক : (১) গুরুগীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদসহ)।

বিবিধ বিষয়ক খন্ড রচনা : (১) মহেশপঞ্চকম্ (২) চন্দ্রকান্তপঞ্চকম্ (৩) জাতিভেদঃ (৪) আত্মবংশ পরিচয়ঃ (৫) শ্বশুরবংশ পরিচয় (৬) একাগ্রতা (৭) প্রচার্য্য বিষয়াঃ (৮) অভিনন্দন পত্রম্ (৯) কালী স্তোত্রম্ (১০) অষ্টোত্তরশত স্তোত্রম্ (১১) ঈশাষ্টকম্ (১২) প্রণামঃ (১৩) ব্রহ্ম স্তোত্রম্ (১৪) ব্রহ্মাষ্টকম্ ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুরুগীতা এবং খন্ড রচনা গুলির দশম হইতে চতুর্দ্দশ সংখ্যক বিষয়গুলি "নিত্যকর্ম্ম" নামক বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে।

বাংলা রচনা

ধর্ম্ম ও দর্শন : (১) তত্ত্বজ্ঞান (২) তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত (৩) দম্পতির ধর্ম্মালাপ (৪) অদ্ভূত উপাখ্যান (৫) মহাপুরুষদিগের সিদ্ধি বিবরণ (তত্ত্ববোধ পত্রিকায় প্রকাশিত) (৬) সাধুজীবনী (৭) ন্যায়দর্শন (ন্যায়দর্শনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা)।

মহাকাব্য : (৮) কমলিনী মহাকাব্য (৯) সুভদ্রাহরণ মহাকাব্য।

কাব্য : (১০) বীরোত্তর কাব্য।

শিশুপাঠ্য কবিতা পুস্তিকা : (১১) সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত (১২) হিতদীপ।

ব্যাকরণ : (১৩) লঘু সুখবোধ ব্যাকরণ (১৪) ব্যাকরণ সোপান।

ভূগোল : (১৫) সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক ভূগোল (১৮৭৭ ডিসেম্বর)।

ইতিহাস : (১৬) ইতিহাস শিক্ষা।

গণিত : (১৭) পাটীগণিত।

জ্যামিতি : (১৮) জ্যামিতি সহায়।

বর্ণপরিচয় শিক্ষামূলক : (১৯) প্রথম পাঠ।

স্ত্রী শিক্ষা : (২০) স্ত্রী শিক্ষা।

রচনা : (২১) রচনামালা।

উপন্যাস : (২২) নলিনী।

বিবিধ নিবন্ধ : (১) নিত্যকর্ম্ম (২) প্রণব (৩) শ্রাদ্ধ ও তর্পণবিধি।

এই তিনটি প্রবন্ধ "নিত্যকর্ম্ম" বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে।

(৪) সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের ইতিহাস (৫) অক্ষদেবন (৬) টীকাকার মল্লিনাথ (৭) স্বভাবজাত চরিত্র ও পৌরুষজাত চরিত্র (৮) ধর্ম্ম সমন্বয় (৯) সত্যমাহাত্ম্য (১০) বিজ্ঞান (১১) বাঙ্গালীর অভাব কি? (১২) মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি (১৩) নবাবতার (১৪) দুর্গোৎসব (১৫) নরাধমের জীবন চরিত (১৬) বাল্মীকি (১৭) অপূর্ব্বস্বপ্ন (১৮) ব্রাহ্মণ রক্ষা।

(নবম থেকে অষ্টাদশ সংখ্যক প্রবন্ধ তত্ত্ববোধ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

(১৯) দর্শন (২০) পুরাণ। (এই দুটি নিবন্ধ রত্নাকর পত্রিকায় প্রকাশিত)

(২১) দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অসীমত্ব (সত্যামৃত বইয়ে মুদ্রিত) (২২) রামানন্দ সংবাদ (২৩) মুক্তি।

খন্ড রচনা : (১) বঙ্গভাষা (কবিতা) (২) ভারতভূমি (কবিতা) (৩) যুধিষ্ঠির চরিত (৪) 'জ্ঞানদায়িনী' মাসিক পত্রিকার (প্রস্তাবিত) বিজ্ঞান (৫) স্বজাতীয়দের প্রতি (কবিতা) (৬) অভেদজ্ঞান (কবিতা) (৭) কৌশল্যার বিলাপ (কবিতা) (৮) কতিপয় ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত রসাত্মক কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত তালিকা প্রমাণ করে যে, লেখক গুরুনাথের শ্রমশীলতা কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাঁর প্রতিভা কিরূপ সর্ব্বতোমুখিনী ছিল। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উপরিউক্ত রচনাবলী ছাড়া তিনি নিজের নাম গোপন রেখে বিদ্যালয়-পাঠ্য কত শত পুস্তকের ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তর তৎকাল-প্রসিদ্ধ অবলাকান্ত সেন নামক পুস্তক প্রকাশককে লিখে দিয়েছিলেন, তা নিশ্চিতরূপে বোধ হয় কোন কালেও জানা যাবে না। আমরা এ জাতীয় কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করলাম :

(১) সাহিত্য প্রশ্নোত্তর, (২) রামচরিতের সুচারু ব্যাখ্যা, (৩) সাহিত্য শিক্ষার অর্থ পুস্তক, (৪) সাহিত্য কুসুমের সুচারু ব্যাখ্যা, (৫) প্রবন্ধমালার সুচারু ব্যাখ্যা, (৬) নৃসিংহবাবুর প্রাকৃত ভূগোলের প্রশ্নোত্তর, (৭) সরল পদার্থ বিজ্ঞান ১ম ভাগ, (৮) ধারাপাত, (৯) পদার্থবিদ্যার প্রশ্নোত্তর, (১০) ব্যাকরণ, (১১) পদ্যপাঠ ৩য় ভাগের সার্থক অন্বয় সংস্করণ ও রচনা, (১২) চারুবোধ সুচারু ব্যাখ্যা, (১৩) চারু প্রবন্ধের সুচারু ব্যাখ্যা, (১৪) চারুপাঠ ৩য় ভাগের সুচারু ব্যাখ্যা, (১৫) রামের রাজ্যপ্রাপ্তি পুস্তকের সুচারু ব্যাখ্যা, (১৬) কবিতা কুসুমাঞ্জলীর সুচারু ব্যাখ্যা, (১৭) ভূবিদ্যার প্রশ্নোত্তর, (১৮) আখ্যান-মঞ্জরী ২য় ভাগের ব্যাখ্যা, (১৯) আখ্যান-মঞ্জরী ৩য় ভাগের সুচারু ব্যাখ্যা, (২০) নীতি পাঠের সুচারু ব্যাখ্যা, (২১) সরল পদার্থ বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর, (২২) ১৮৯১ সালের সংস্কৃত এন্ট্র্যান্স কোর্সের ব্যাখ্যা, (২৩) স্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর, (২৬) স্বাস্থ্যোপায়, (২৭) সীতার বনবাসের ব্যাখ্যা, (২৮) বিজ্ঞান রহস্যের প্রশ্নোত্তর, (২৯) প্রবন্ধ কুসুমের সুচারু ব্যাখ্যা, (৩০) বিজ্ঞান-সূত্রের প্রশ্নোত্তর, (৩১) বৃহৎ ব্যাকরণ, (৩২) প্রকৃতি জিজ্ঞাসার

প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি ইত্যাদি।[৫]

সুতরাং দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধারাপাত, ইতিহাস, ভূগোল, শরীর পালন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই পন্ডিত গুরুনাথকে লিখতে হয়েছিল।

আচার্য গুরুনাথের কর্মস্থল কলিকাতার আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে গিয়ে জানা যায় তিনি সেখানকার সপ্তম হেডমাস্টার ছিলেন। বোর্ডে সাত নম্বরে তাঁর নাম লেখা আছে। সর্বাপেক্ষা গুণী হেডমাস্টার হিসাবে তিনি আজও সেখানকার সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। বঙ্গ বিদ্যালয়ের ১২৫তম বছর পূর্তি উৎসবে যে স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, সেখানে স্বামী অভেদানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ভোলানাথ চন্দ্র -এ তিনজনের সাথে আচার্য গুরুনাথের ছবি ছাপা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় আচার্য গুরুনাথের উপর একটি গবেষণা প্রবন্ধ লেখেন এবং সেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি বিদ্যালয়ের স্মারক পত্রিকায় পুনঃ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। এ প্রবন্ধে লেখক আচার্য গুরুনাথের রচিত সাহিত্য বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আচার্য গুরুনাথ প্রায় একশত সংস্কৃত কাব্য, মহাকাব্য, কোষ কাব্য প্রভৃতি রচনা করেন। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন, "আমরা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ঈশ্বরতত্ত্ব ও তত্ত্ব দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করি বটে। কিন্তু এই একই পথের পথিক গুরুনাথের কথা ভুলে থাকি। এটি একটি গুরুতর অপরাধ। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি"(ঐ পুস্তিকার এই বিশেষ বিশেষ অংশগুলো পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো)। আচার্য গুরুনাথের সাহিত্য-কর্ম সংস্কৃতে ও বাংলায় বিশাল পরিধির। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনাও একই রকমের। এর মধ্য থেকে শুধু তাঁর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক কিছু বিষয় এ অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হলো।

শিক্ষকতা কাজে যোগদান করার পরের বৎসর ১২৭৪ বঙ্গাব্দের ১৯শে আশ্বিন বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের রামচন্দ্র দাসের বড় মেয়ে আদরমণি দেবীর সাথে আচার্য গুরুনাথের বিবাহ হয়। ব্রহ্মচর্য শেষে গুরুর আদেশে গুরুনাথ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। বিবাহিত জীবনই আদর্শ জীবন মনে করে এ জীবন তিনি গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, "কেউ আজীবন ব্রহ্মচারী থাকবেন না তবে ব্যক্তি বিশেষের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম হতে পারে এবং গুরুর আদেশ লাভ করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হবেন। অনন্তর পুত্র উৎপন্ন হলে ও সৎপথাবলম্বী হলে এবং সে সংসার নির্বাহে সমর্থ হলে আবশ্যকমত সংসার ত্যাগ করতে পারেন, তবে তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, সংসারাশ্রমীর অনুকূলভাবে কাজ করবেন।"[৬] আচার্য গুরুনাথের মতে, পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিবাহ প্রাণিগণের সাধারণ ধর্ম। বিবাহের উদ্দেশ্য একটি পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রেম সঞ্চার। বিবাহের লক্ষ্য সেই প্রেমের বৃদ্ধি ও পূর্ণতা সাধনা করা- যে প্রেমে পরম প্রেমময় পরমেশ্বরের এই জগৎ সৃষ্ট ও পুষ্ট, যে প্রেমে তাঁর আনন্দময়ী সৃজনধারা নিত্য প্রবহমানা। প্রেমবৃত্তের প্রকৃত কেন্দ্র নিজ গৃহ এবং গৃহকে ভিত্তি করে সংসারজীবন ও আদর্শ মানব জীবন গড়ে ওঠে। মানবীয় যাবতীয় বৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্য সাধন

---

[৫] দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ১১৩-১১৭

[৬] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম, ধর্মার্থীর কর্তব্য, বাংলাদেশ, ১৩৮৬, পৃ: ১৭৩ (১৩ নং পাদটিকাসহ)

শুদ্ধ সাংসারিক জীবনের মধ্য দিয়েই সম্ভব। দাম্পত্য প্রেম বিশ্বপ্রেমের মূল, দাম্পত্য প্রেম প্রভাবে সৃষ্টির স্রোত অব্যাহত ও চির ক্রীড়াশীল থাকে। বস্তুতঃ বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনে এবং বিধাতৃ পুরুষের ইচ্ছার অনুগত হয়ে যাঁরা সংসারে বাস করেন তাঁরাই প্রকৃত সংসারী, সুতরাং যথার্থ ধর্মপথ অনুসারী। গুরুনাথ তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন, "সকলেই সংসারের উন্নতি কর, পার্থিব জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর এবং বাসস্থান, খাদ্য, পরিধেয়াদি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন কর। তবে পার্থিব যে কার্যই কর না কেন, তাহাতে একান্ত ব্যাসক্ত হইওনা...কোন কার্যেই সেই সর্বভূতসুহৃদ পরমপুরুষকে বিস্মৃত হইওনা... সর্বদাই তাহাকে স্ব স্ব হৃদয়াসনে আসীন রাখ..."[৭]

সাধকদের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস অতি গোপন। একনিষ্ঠ সাধনবলে যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন তাঁদের সাধন ইতিহাস বড় একটা লিপিবদ্ধ নাই। কারণ সাধকগণ নিজেরা তাঁদের সাধনার কথা না বললে অন্যের জানার সম্ভাবনা নাই। আর অতি অল্প সাধকই তাঁদের প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে করা নিগূঢ় সাধনার ইতিহাস অন্যের কাছে বলেছেন বা বলতে ইচ্ছা করেন।

ফলে সিদ্ধ জীবনের কিছু ঘটনা দেখে আমরা তাঁদের অন্তর্জগতের সামান্য একটু আভাস পেতে পারি কিন্তু যে সব গুণাবলী অবলম্বন করে তাঁরা সাধনার পথে চলেছেন এবং সিদ্ধ হয়েছেন সে সম্বন্ধে আমরা কোন কিছুই জানতে পারিনা। গুণহীন হয়ে গুণবানের গুণের কথা জানা যায়না, দেবতা না হয়ে দেবতার তত্ত্ব জানা যায়না, স্বল্পোন্নত হয়ে মহোন্নত সাধকের ধারণা করা অসম্ভব। কাজেই আচার্য গুরুনাথের সুদীর্ঘ সাধনজীবনের কিছু কিছু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দ্বারা তাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অপূর্ণ থেকেও অপূর্ণতর।

'সাধনা' এ শব্দটিকে তিনি মধুময় অমৃতময় বলে উল্লেখ করেছেন, সাধনার মহিমাকে তিনি 'চিন্তার অতীত' 'বাক্যের অতীত' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। নিজের সাধনার প্রভাবে ও অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তিনি এ জীবনে মানবজন্মের সফলতা, জীবত্ব বিনাশ ও ভগ্নাংশের অখন্ড আকারে পরিবর্তন সাধন করেছেন, রিপু বা দোষসমূহের লয় সম্পাদন করেছেন, পাশসমূহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, পঞ্চভূতকে বশীভূত করেছেন, প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সরলতা, বিশ্বাস, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণে একত্ব লাভ করেছেন, আত্মাকর্ষকতা, অন্যের পাপ গ্রহণ শক্তি, বাক্‌সিদ্ধি, দেহ নিয়ে যথা ইচ্ছা নিমেষ মাত্রে গমন করার শক্তি, দেহ থেকে বের হয়ে অন্যের দেহে আশ্রয় করার ক্ষমতা, দেহ থেকে বের হয়ে চেতন পদার্থের যেটির ইচ্ছা সেটির মত দেহ ধারণ করার ক্ষমতা, আয়ু প্রদান শক্তি, রুগ্নকে নিরাময় করার ক্ষমতা, স্থূল শরীরে ও সূক্ষ্ম শরীরে দূরস্থ জনকে দেখা দেবার ক্ষমতা, মৃতকে জীবিত করার শক্তি, অন্ধকে চক্ষু, পঙ্গুকে সুস্থপদ, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান ও বিকলাঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ করার ক্ষমতা, মানুষ ছাড়াও অন্য জীবের ভাষা বোঝার ক্ষমতা, চক্রভেদ সামর্থ্য, অভেদজ্ঞান প্রভাবে নিখিল মন্ডলকে অন্তরস্থ করার ক্ষমতা, আত্মার অসীমত্ব সাধন প্রভৃতি শক্তি লাভ করেছেন। সাধনার প্রভাবে পরলোকের যাবতীয় বৃত্তান্ত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে জেনেছেন। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে ব্যবধান তা অতিক্রম করেছেন। সাধনার বলে সৃষ্টিকর্তার একমাত্র দৃষ্ট ও সৃষ্টজীবের একান্ত দুর্বোধ্য ও অনুমিতির অতীত সৃষ্টি বৃত্তান্ত তাঁর

---

[৭] দ্রষ্টব্য,১। সত্যধর্ম প্রচারক দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ(জীবনী গ্রন্থ),পৃ,২৭৮।২। শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, বাংলাদেশ, ১৩৯৫, পৃ: ২৫৪

হৃদয়ালেখ্যে চিত্রিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র, পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ ও বিপরীত ভাবাপন্ন ধর্ম সমুদয়ের একীভবন করেছেন। সাধনার প্রভাবে তিনি অজাতশত্রু হয়ে জগদ্বাসীর প্রত্যেককে সানন্দে ও প্রেমবন্ধে গ্রহণ করেছেন। বিপরীতবাদীর প্রতিও প্রেম বৃদ্ধি করেছেন। মানবজাতির প্রতি ভেদজ্ঞান দূর করেছেন এবং পশুত্ব, পক্ষিত্বাদি জাতিভেদ পর্যন্ত নিজহৃদয় থেকে দূর করেছেন। সর্বত্র ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করে একমেবাদ্বিতীয়ম্ এই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করেছেন। নিজে যেমন প্রেমময়ের প্রেমসুধা লাভ করেছেন তেমনি সৃষ্টির সকলকে সেই সুধা পান করাবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করেছেন। [৮]

মাতা-পিতার ধর্মচর্চ্চা দেখে গুরুনাথের মধ্যে কৈশোরেই ধর্মসাধনের বীজ উপ্ত হয় যা ক্রমেই তাঁকে মুক্তিপথে ধাবিত করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধর্মানুশীলন ও ধর্মজিজ্ঞাসা তাঁর ক্রমেই বেড়ে চলে। ধর্ম পিপাসার জন্য তিনি কিছুদিন ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রতী হন। কিন্তু এ ধর্ম তাঁর আত্মার তৃপ্তি সাধন করতে পারলোনা। তিনি ব্রাহ্মসমাজে না গেলেও উপাসনা চালিয়ে যেতে লাগলেন।এসময় তিনি তাঁরই মত অধ্যাত্ম সাধনায় উৎসুক কয়েকজনকে পেলেন যাঁরা তাঁরই মত ধর্মপ্রাণ ও সত্যকাম। এই সব বন্ধুদের সাথে প্রতিদিন কোন একস্থানে মিলিত হয়ে রাত্রিতে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সহকারে পরমেশ্বরের উপাসনা করতে লাগলেন ও সত্য নির্ণয়েচ্ছু মন নিয়ে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। [৯] তদবধি কয়েক বছর বন্ধুদের সাথে উপাসনা করে ঈশ্বরাদিষ্ট আত্মাদের সাহায্যে 'সত্যধর্ম' সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো জানতে লাগলেন এবং নিজেরা সেভাবে প্রস্তুত হয়ে ঐ ধর্মের যথাযথভাব গ্রহণ ও তা সম্যক অনুশীলনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁরা জানতে পারলেন, সত্যধর্ম অনুসারে গুণসাধনা সর্বপ্রধান কাজ আর গুণের মধ্যে প্রেমগুণ সেরা। সুতরাং সকলে মনে প্রাণে উপাসনা করতে লাগলেন এবং প্রথমে প্রেম পরে অন্য গুণগুলোর অভ্যাস করতে লাগলেন। ক্রমে তাদের উপাসনায় পারলৌকিক অত্যুন্নত মহাত্মারাও আসতে লাগলেন এবং সত্যধর্ম সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় তাঁদের জানাতে লাগলেন।

ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে গুরুনাথ পারলৌকিক মহাত্মাদের কাছ থেকে সত্যধর্মের তত্ত্বসমূহ লাভ করেন এবং তা বই আকারে প্রকাশ করেন। সত্যধর্মের তত্ত্বগুলোকে পরিস্ফুট করার জন্য তিনি বেশ কিছু বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন। সত্যধর্ম থেকে তিনি জেনেছেন, ধর্ম অর্থাৎ পথ।মোক্ষ লাভের উপায়কে ধর্ম বলে। সৎপথ দেখে ঈশ্বরের রাজ্যে গমন করাকে ধর্মসাধন বলে। আর এজন্য আচার্য গুরুনাথ তাঁর ধর্মচিন্তা বিষয়ক অন্যতম প্রধান গ্রন্থ 'তত্ত্বজ্ঞান'-কে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন- উপাসনা, সাধনা ও সিদ্ধি বা মুক্তি; যেখানে তিনি ধর্মজীবনের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিক নির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি কিভাবে মানুষ তার জীবন সার্থক ও জনম সফল করতে পারে –এগুলিই তাঁর ধর্মচিন্তার প্রতিপাদ্য বিষয়।

---

[৮] দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম প্রচারক দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ, পৃ: ৩৪৯-৩৫১

[৯] দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ: ৩৫৯-৩৬০

(২)
আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত প্রচারিত ধর্ম

আচার্য গুরুনাথের ধর্মচিন্তায় এমন কিছু বিষয় আছে, যা আমাদের কাছে অনন্য ও সকলের জন্য অনুপ্রেরণাযোগ্য বলে মনে হয়েছে এবং একই সাথে প্রচলিত বিভিন্ন আপাতঃ বিপরীত ধর্মতত্ত্বমূহের মীমাংসার ইঙ্গিতও সেখানে আছে বলে মনে হয়েছে। এ ধর্মতত্ত্বকে তিনি 'সত্যধর্ম' নামে প্রকাশ করেছেন। এটি বাংলা ভাষায় প্রত্যাদিষ্ট একটি ধর্ম। আচার্য গুরুনাথ এ ধর্মের বিষয়গুলিকে বই আকারে প্রকাশ করেছেন। এ বইয়ে আটটি পরিচ্ছেদ আছে। মুখবন্ধ ও প্রথম পরিচ্ছেদে সত্যধর্ম কি, প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের সাথে এর পার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য, এর ব্যাপকতা, বিশুদ্ধতা এবং এ ধর্ম কি উপায়ে লাভ হয়েছে, তার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সত্যধর্মের সার, কি কি গুণ থাকলে এ ধর্ম লাভ করা যায়, কি করলে এ ধর্মে থাকা যায়, প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সত্যধর্মে থাকার উপায় যে উপাসনা তার বর্ণনা,প্রার্থনা,প্রার্থনার ফল,উপাসনার ফল,দৈনিক উপাসনার নিয়ম দৈনিক উপাসনার প্রণালী এবং ধর্মে দীক্ষাসংক্রান্ত বিষয় বলা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ধর্মসাধন, সাধনা, সাধনার প্রয়োজন, কিসের সাধনা করতে হবে, গুণ সাধনার ফল, প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা প্রভৃতি গুণের সাধনা কিভাবে করতে হয়, এসব বিষয়ের বিবরণ সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে সাধনার ফলে যেসব সিদ্ধি বা ক্ষমতা হয়, তার বিবরণ এবং কোন কোন গুণের সমন্বয়ে কি কি সিদ্ধি হয় তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।ষষ্ঠ অধ্যায়ে মানুষের দেহ, পরলোক, পুনর্জন্ম প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ রয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে পাপ পুন্য বিষয়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।অষ্টম অধ্যায়ে সত্যধর্ম যে উপায়ে লাভ হয়েছে, সেই উপায় অবলম্বনে প্রাচীন থেকে বর্তমানকালে আত্মারা কি কি করেছেন, সেরূপ কতগুলি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়গুলো সত্যধর্ম বইয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। এর বিস্তৃত বিবরণ আচার্য গুরুনাথ তাঁর লিখিত তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, তত্ত্বজ্ঞান সাধনা, তত্ত্বজ্ঞান সংগীত, দম্পতির ধর্মালাপ ও অন্যান্য বইয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনি যেভাবে সত্যধর্মের তত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত করেছেন এ অধ্যায়ে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো:

"যে ধর্ম সত্য অর্থাৎ নিত্যকাল- অনন্তকাল বিদ্যমান, যা যথার্থ বিষয়সমূহে পরিপূর্ণ, যা সত্যস্বরূপ পরমপিতার[১০] একমাত্র অভিপ্রেত এবং যে ধর্ম অসৎকে সৎ করে, সে ধর্মকেই সত্যধর্ম বলা হয়েছে।"[১১] সত্যধর্ম মতে, "পরমপিতা নিজের অংশসমূহকে জড় জগতের সাথে সংযুক্ত করেছেন। তাঁর এই সংযুক্ত

---

[১০] এখানে পিতা শব্দে স্থূলভাবে সন্তান জন্মদানকারী বুঝায় না। যেহেতু ঈশ্বর স্থূলদেহধারী নন কাজেই এ অর্থ তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। তিনি সর্ব গুণময়। পিতৃত্ব একটি গুণ, এ গুণের পরাকাষ্ঠা তাঁতে রয়েছে। এজন্য তাঁকে পরম পিতা বলা হয়েছে। তাঁর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রক্ষাকর্তা। অভিধান অনুসারে পিতা শব্দের অনেক অর্থ। তার মধ্যে একটি অর্থ স্থূলভাবে সন্তানের জন্মদাতা। কিন্তু তিনি যেহেতু স্থূল-সূক্ষ্মের অতীত, কাজেই এ অর্থ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 'পিতা' আরও আরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন জাতির পিতা। এখানেও 'পিতা' সন্তান জন্মদানকারী নয়। তাঁর থেকে সবকিছুর উৎপত্তি- এ অর্থে তিনি পিতা : তিনি রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, উন্নতিকারক... এসব অর্থে তাকে পিতা বলা হয়েছে। পিতা বা জনক শব্দের আরও ব্যবহার আছে। যেমন দর্শনের জনক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক, বিজ্ঞানের জনক ইত্যাদি।

[১১] গুরুনাথ সেনগুপ্ত (প্রকাশক), সত্যধর্ম, পৃ: ১।

সত্যধর্মের সমস্ত বিষয় সত্যধর্ম বই থেকে ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

অংশই জীবাত্মা। জীবাত্মার চারদিকে যে সব বিষয় আছে সেগুলি পাপ ও পুণ্যে মিশ্রিত; জীবাত্মার কর্তব্য এই যে, নিজে নিস্পাপ হয়ে ঐ সব বিষয়ের পাপাংশ যাতে তাকে স্পর্শ না করে, কেবল পুণ্য অংশ যাতে ঈশ্বরের উপাসনা ও গুণ সাধন।"[১২]

সত্যধর্মের মুখবন্ধে নিরাকার, অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, অনাদি-অনন্ত, অসীম, অনন্ত-গুণ নিধান পরমপিতার উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে। 'নিরাকার'-এর পাদটীকায় গুরুনাথ বলেছেন যে, নিরাকার বললেও ঐশ্বরিক ভাব কিছুই বোঝা যায় না। তিনি 'ঈশ্বরের স্বরূপ' অংশে বিষয়টি পরিস্কার করার চেষ্টা করেছেন।[১৩]

এ ধর্মমতে, মানুষ নিজ কর্ম অনুসারে আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্লানি ভোগ করে, দেহ ত্যাগ করার পরে পরলোকে অবস্থান করে, পরলোকগতদের মধ্যে কতগুলি আত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, কেউ কেউ আর জন্মগ্রহণ করে না।

এ ধর্মের মতে, সাকার উপাসনা নাই, (সাকারের উপাসনা নাই তবে অর্চনা আছে; গুরুনাথের "তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা" বইয়ে এ বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে) যোগ সাধন নাই, ঈশ্বরে লীন হওয়া নাই (অর্থাৎ নিজ চেষ্টা বা কর্ম দ্বারা কেউ ঈশ্বরে লীন হতে পারে না, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে সকলেই তাতে লীন হতে পারে)।

এ ধর্ম অনুসারে জগতের সমস্ত মানুষকে (নর-নারীকে) সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করতে হয়। এ অভেদভাব অবশেষে সমস্ত চেতন পদার্থে পরিণত হয়।

এ ধর্ম অবলম্বন করতে হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত বিশেষ কোন আশ্রম প্রয়োজনীয় নয়, সকল আশ্রমীই এ ধর্ম অবলম্বন করতে পারেন। সত্যধর্মের আশ্রম হৃদয়, যাতে পরমাত্মা আসীন থাকেন, 'আশ্রম গ্রহণ করার অর্থ হৃদয়ে জগদীশ্বরকে স্থান দেওয়া। [যে নিরাশ্রমী, তার হৃদয় নাই, তাতে পরমাত্মা বসতে পারেন না, কেবল উপরি উপরি রক্ষা করেন। কিন্তু পরিত্যাগ করেন না]।

সত্যধর্ম মতে, গুণ-সাধন সর্বপ্রধান কাজ। সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা ও গুণের অভ্যাস একমাত্র কাজ। যেহেতু গুরুনাথ হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেজন্য তাঁর প্রচারিত ধর্মকে অনেকে হিন্দু ধর্মের একটি শাখা, হিন্দুদের একটি সাধন পদ্ধতি বা উদারনৈতিক হিন্দুধর্ম থেকে উদ্ভুত কোন ধর্ম বলে মনে করেছেন এবং কেউ কেউ গুরুনাথের লেখনী থেকে কোন কোন বিষয়কে হিন্দুধর্মের বিষয় বলে উল্লেখও করেছেন। কিন্তু সত্যধর্ম প্রচারের যে ইতিহাস তাতে দেখা যায়- এটি পারলৌকিক মহাত্মাদের কাছ থেকে আত্মাকর্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত।[১৪]

---

[১২] গুরুনাথ সেনগুপ্ত(প্রকাশক), সত্যধর্ম, পৃ: ১ (উপাসনা ও গুণ সাধনা বিষয়ে পরবর্তীতে সত্যধর্মের ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।)

[১৩] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ১৪৩।

[১৪] পারলৌকিক মহাত্মাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত :

জগতে অনেক ধর্মীয় লিপি আছে- যেগুলি ঐশীবাণী এবং সেগুলি ধ্যানযোগে পারলৌকিক মহাত্মাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত। যেমন- বেদ, বাইবেল, কোরান। সত্যধর্মের বিষয়গুলিও ধ্যানের মাধ্যমে পরলৌকিক মহাত্মাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১. **পারলৌকিক মহাত্মা** সম্বন্ধে গুরুনাথের লেখনীতে নিম্নরূপ ধারণা পাওয়া যায়।

"যে সকল পারলৌকিক আত্মারা অনন্ত গুণধাম পরমপিতার সান্নিধ্য নিবন্ধন অতুল আত্মপ্রসাদ সাগরে ভাসমান, তাহাদিগকে পারলৌকিক মহাত্মা কহে।" (দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম : মুখবন্ধ, পৃ. ।/.)

৫.২ **আত্মাকর্ষণ সম্বন্ধে** নিম্নরূপ তথ্য আছে-

এটি যে অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম অপেক্ষা বিভিন্ন তা যুক্তিসহ সত্যধর্ম বইয়ের মুখবন্ধে ও প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যধর্মের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যে বিষয়গুলি বলা হয়েছে, তাও সত্যধর্মের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে।

প্রথম পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ :

১.সত্যধর্মে সাকার উপাসনা নাই, সুতরাং সমস্ত সাকারবাদপূর্ণ ধর্ম থেকে তা বিভিন্ন অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে ভিন্ন।

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে যে, পরমপিতা জড় জগতের সাথে তাঁর অংশ সংযুক্ত করেছেন, কিন্তু তিনি ঐ সৃষ্টি থেকে নির্লিপ্তভাবে বিভিন্ন আছেন; সুতরাং আকার-বিশিষ্ট যা-ই ধরা যাক্‌না কেন, তা জড়-জগতের সাথে সংযুক্ত। এজন্য তা কখনও সেই অনন্ত শক্তি অনাদি-অনন্ত নয়। অতএব আকার-বিশিষ্ট বা সাকারের উপাসনা করলে পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করা হয়না। হিন্দুধর্মের শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভৃতি মতে সাকার উপাসনার বিধি আছে। কিন্তু ঐ সব মতাবলম্বীরা এও স্বীকার করেন যে, পরমাত্মা সাকার নন।

সাধকদের হিতের জন্য নিরাকার পরমাত্মার রূপ কল্পনা করা হয়। হিতার্থায় শব্দের অর্থ অনেকে ‘হিত নিবৃত্তি’ অর্থ করেন, কারণ অর্থ শব্দের একটি অর্থ হ’ল নিবৃত্তি। অর্থাৎ সাধকদের অহিত করার জন্য অরূপের রূপ কল্পনা করা হয়।[১৫] নিরাকারভাব সকলে ধারণা করতে পারেনা, সেজন্য নিকৃষ্ট চেতা উপাসকদের হিতের জন্য নিরাকার পর-ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হ’ল। কিন্তু যা কল্পনা তা সত্যের দাবী করতে পারেনা। অরূপের রূপ কল্পনা করলে সাধকদের হিত হয় কিনা, এবিষয়ে মতভেদ আছে। আবার সেমতে বলা হয়, সাকার দেব-দেবীর উপাসনা করলে জ্ঞান যোগ হয়, সেই জ্ঞান যোগ ছাড়া মানুষ কখনও নিরাকার ব্রহ্মকে ধারণা করতে পারে না। সত্যধর্ম এমত গ্রহণ করে না। কেননা তৃণকে হিমালয় মনে

“যে ব্যক্তির (১) প্রেম (২) সরলতা (৩) পবিত্রতা (৪) একাগ্রতা (৫) ভক্তি ও (৬) ঈশ্বর জ্ঞান আছে এবং (৭) যাহার মন কুপথে গমন করে না, পারলৌকিক আত্মারা তাহাকে আশ্রয় করিতে ও স্ব স্ব মন্তব্য জানাইতে পারেন। কিন্তু কেবল উক্ত গুণগুলি থাকিলেই পারলৌকিক মহাত্মারা কোন ব্যক্তির দেহ আশ্রয় করেন না। যে ব্যক্তির উল্লিখিত গুণসমূহ অত্যন্ত অধিক পরিমানে হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত গুণগুলিও আছে, পারলৌকিক মহাত্মারা তাহাকেই আশ্রয় করিতে পারেন। গুণ যথা- (৮) সম্পত্তি বিষয়ে নিস্পৃহতা (৯) নিস্পাপ অবস্থা বা মূর্তিমতী পবিত্রতা (১০) অন্যদীয় পাপগ্রহণ ক্ষমতা (১১) লোকের উপকার ভিন্ন অপকার করিবনা- এই বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়তা (১২) সিদ্ধিসমূহ লাভের উপযুক্ত গুণ (১৩) কামক্রোধ হীনতা (১৪) অন্তত: সমস্ত মনুষ্যকে সহোদরবৎ দর্শন ও তদনুরূপ আচরণ করা। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম, পৃ. ৮।

আত্মাকর্ষণের মাধ্যমে সত্যধর্ম আবিস্কারের নিম্নরূপ ইতিহাস জানা যায়-

আত্মাকর্ষণের মাধ্যমে পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়- এ তথ্য জানার পর থেকে গুরুনাথ তাঁর বন্ধুদের সাথে পারলৌকিক আত্মাদের সাথে যোগাযোগের অনুকূল সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। কালে তাঁরা বুঝতে পারলেন পারলৌকিক আত্মাদের আকর্ষণ করতে হলে প্রেম, ভক্তি, সরলতা, পবিত্রতা, ঈশ্বর-জ্ঞান, মনের কুপথ গমন বিমুখতা- এসব দুর্লভ গুণ থাকা আবশ্যক। শুরু করলেন সকলে এসব গুণের সাধনা এবং আরও ব্যাকুলভাবে উপাসনা করতে লাগলেন। তদবধি কয়েক বছর বন্ধুদের সাথে উপাসনা করে ঈশ্বরাদিষ্ট পারলৌকিক মহাত্মাদের কাছ থেকে সত্যধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো জানতে লাগলেন এবং নিজেরা সেভাবে প্রস্তুত হয়ে ঐ ধর্মের যথাযথভাব গ্রহণ ও তা সম্যক অনুশীলনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা জানতে পারলেন, সত্যধর্ম অনুসারে গুণসাধনা সর্বপ্রধান কাজ। আর গুণের মধ্যে প্রেমগুণ সেরা। সুতরাং সকলে মনে প্রাণে উপাসনা করতে লাগলেন এবং প্রথমে প্রেম পরে অন্য অন্য গুণগুলোর অভ্যাস করতে লাগলেন। ক্রমে তাদের উপাসনায় পারলৌকিক অত্যুন্নত মহাত্মারাও কখনও আহূত হয়ে কখনও স্বেচ্ছায় আসতে লাগলেন এবং সত্যধর্ম সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় তাদের জানাতে লাগলেন। (দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম প্রচারক দেব-মানব মহাত্মা গুরুনাথ, পৃ: ৩৫৯-৩৬০,)।

[১৫] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ১৩১।

করে কখনও হিমালয়ের জ্ঞান হয় না। ঘাসের অবলম্বনে আকাশ লাভ হয় না।[১৬] এ প্রসঙ্গে গুরুনাথ আরও বলেছেন, ব্রহ্ম ধ্যানে অসমর্থ মানুষ যে পৃথিবীতে আছেন, এরকম মনে হয় না।[১৭]

২.সত্যধর্মে হঠযোগাদির মত কোন যোগ সাধনা নাই এবং পদ্মাসনাদির মতো কোন আসন-সিদ্ধিও নাই। এ প্রসঙ্গে সত্যধর্মে বলা হয়েছে, হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি যোগের উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা-সাধন। পরমপিতার প্রতি প্রেম করতে পারলেই একাগ্রতা জন্মে, কাজেই ঐ সব বিষয়ের তেমন কোন প্রয়োজন নাই। শতবর্ষ যোগসাধনা করে যে একাগ্রতা জন্মে এক মুহূর্তের প্রেমে তার চেয়ে হাজারগুণে একাগ্রতা জন্মে। আর এভাবে কাজ করলে একাগ্রতার সাথে পাপমুক্তি প্রভৃতি লাভও হয়। আসন সিদ্ধিও যোগেরই অন্তর্গত, কাজেই এ বিষয়ে একই কথা প্রযোজ্য। তবে শরীরের সুস্থতা ও একাগ্রতা লাভের সাহায্যের জন্য আসন ও প্রাণায়াম করা যায়।[১৮]

৩. নিরাকারবাদী বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের কিছু বিশেষ তত্ত্বের সাথে সত্যধর্মের অমিল দেখা যায়। বেদান্তের তত্ত্বমসি, সোঽহং প্রভৃতি মত সত্যধর্মে নাই। আর ব্রাহ্মদের মতে, একবার মাত্র মানুষ জন্মগ্রহণ করে, এমতও সত্যধর্মে নাই। সত্যধর্ম মতে গুরু স্বীকার করা হয় কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে গুরু স্বীকার করা হয় না। এ ছাড়া ব্রাহ্মধর্মে উপাসনার পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট নাই অথচ উপাসনার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সত্যধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।[১৯]

---

[১৬] ঐ ঐ, পৃ: ১৩০

[১৭] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, সত্যধর্ম মহামণ্ডল,বাংলাদেশ,১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৩৪

[১৮] শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৩৬ ও ১৯

[১৯] উপাসনা পদ্ধতি : সত্যধর্ম গ্রন্থের ৩য় পরিচ্ছেদে সত্যধর্মের দৈনিক উপাসনার নিয়ম ও সত্যধর্মের দৈনিক উপাসনার প্রণালী লিখিত আছে। প্রণালীতে বলা হয়েছে প্রথমেই পরমপিতার গুণকীর্তন করবে। দ্বিতীয়তঃ গুণকীর্তনের পরে আপন আপন পাপ উল্লেখ করতে হবে; তৃতীয়তঃ গুণকীর্তন ও পাপ উল্লেখ করতে করতে যখন আত্মগ্লানি হবে তখন পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হবে, চতুর্থতঃ পাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনার পরে গুণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। প্রথমে সাধারণভাবে সমস্ত গুণের জন্য, এবং পরে প্রেম, ভক্তি, নির্ভরতা, একাগ্রতা প্রভৃতির মধ্যে যেটি বা যেগুলির অভাব বোধ হবে তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। এর পূর্বে নিয়মের শেষ ধাপে বলা আছে যে ,নিয়মানুসারে কাজ করার পূর্বে মনের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ ২/১টি গান করা কর্তব্য। গুরুনাথ সত্যধর্ম বইয়ের এ প্রণালী অবলম্বন করে তাঁর লিখিত তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা বইয়ের ২৯০ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ উপাসনা পদ্ধতি লিখেছেন।তবে গুণের জন্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে বলছেন যে ,যে গুণটির অভাব বোধ হবে, তার জন্য প্রথমে প্রার্থনা করা কর্তব্য। একবারে সব গুণের জন্য প্রার্থনা করতেও বাধা নাই।(পৃ,২৮৮)

১ম ধর্মের শ্রেষ্ঠতাসূচক সঙ্গীত
২য় নির্বেদজনক সঙ্গীত
৩য় মনের প্রতি বা জনের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ সঙ্গীত
৪র্থ গুণকীর্তন (সাধারণ কথায়, স্তবে বা গান দ্বারা অথবা ঐ তিন প্রকারে)
৫ম স্বীয় পাপের উল্লেখ ও তজ্জন্য আত্মগ্লানি ভোগ
৬ষ্ঠ পাপ হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা
৭ম গুণের জন্য প্রার্থনা
৮ম ধ্যান
৯ম দীক্ষাবীজ জপ (এ স্থলে বক্তব্য এই যে, গুণকীর্তনের পূর্বেও দীক্ষাবীজের অন্তত: তিনবার উচ্চারণ আবশ্যক এবং ধ্যানের পরে অন্তত: ২০ বার জপ করা কর্তব্য। কেহ কেহ সহস্র, দশ সহস্র ও লক্ষবারও জপ করে থাকেন)।
১০ম জগদীশ্বরের কৃপাময়ত্ব সম্বন্ধে স্তব বা গান
১১শ জগদীশ্বরের আনন্দময়ত্ব সম্বন্ধে স্তব বা গান
১২শ স্তব বা গান দ্বারা জগদীশ্বরের প্রেমানন্দময়ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখপূর্বক ধন্যবাদ দান।

১ম-১২শ পর্যন্ত আচার্য গুরুনাথ লিখিত উপাসনা পদ্ধতি। উপাসনা অধিবেশনে তাঁর অনুসারীগণ প্রথমে তাঁর আহ্বান (গুরু আহ্বান) করেন এবং উপাসনা শেষে তাঁকে ধন্যবাদ দেন। উপাসনা অধিবেশনে পরমপিতার ধন্যবাদ শেষে পরমপিতার প্রণাম

৪. পরমপিতার সাথে পুত্র ও পবিত্র আত্মার অভেদজ্ঞান (ত্রিত্ববাদ) খৃষ্টধর্মে স্বীকার করে কিন্তু সত্যধর্মে এ জাতীয় মত নাই। খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম পুনর্জন্ম অস্বীকার করে- এর সাথেও সত্যধর্মের ভিন্নতা আছে।

৫.বৌদ্ধধর্ম অহিংসা বিষয়ে সত্যধর্মের কিছুটা কাছাকাছি। কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞান, পরলোক ও মুক্তি প্রভৃতির ধারণা এবং উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে সত্যধর্ম ঐ ধর্ম থেকে অনেক আলাদা। সুতরাং সত্যধর্ম এ ধর্ম থেকেও ভিন্ন।

৬.আধুনিক থিয়জফিষ্ট ধর্ম থেকেও সত্যধর্ম বিভিন্ন। পরলোক, পুনর্জন্ম বিষয়ে এ ধর্মের সাথে সত্যধর্মের মিল নাই। এ ধর্মে কোন কোন গুণের উন্নতির বিধি থাকলেও এ ধর্ম 'সোঽহং' মতাবলম্বী এবং এ ধর্মেও উপাসনার প্রকৃষ্ট উপায় নাই।

সত্যধর্ম তত্ত্বমসি, সোঽহং প্রভৃতি বাক্যকে অন্যায্য বলে মনে করে। এ মত খন্ডনের উদ্দেশ্যে সত্যধর্মে বলা হয়েছে যে, যে মানুষ অন্য এক বা একাধিক মানুষকে আত্মতুল্যবোধ করতে পারেনা, সে

এবং গুরুদেবের ধন্যবাদের পরে গুরুদেবের প্রণাম সংযোজিত হয়েছে। প্রণাম আচার্য গুরুনাথের লেখা। এ বিষয়গুলো উপাসনা অধিবেশনের অংশ। মূল উপাসনার বিষয় ১ম-১২শ; যেটি গুরুনাথ লিখেছেন। আবার বর্তমানে উপাসনা অধিবেশনের শুরুতে ধ্বনি দেয়া হয়।

এসব মিলিয়ে বর্তমানে গুরুনাথের অনুসারীদের মধ্যে নিম্নরূপ উপাসনা অধিবেশনের বিবরণ পাওয়া যায় :-

১। ধ্বনি : বন্দে পিতরমেকম্ (৩ বার) গুরুকৃপাহি কেবলম্ (৩বার)
২। দীক্ষাবীজ জপ
৩। গুরু আহ্বান : সঙ্গীতে বা সাধারণ কথায়
৪। দীক্ষাবীজ জপ
৫। ধর্মের শ্রেষ্ঠতাসূচক সঙ্গীত
৬। নির্বেদ জনক সঙ্গীত
৭। মনের প্রতি ও জনের প্রতি সঙ্গীত
৮। দীক্ষাবীজ জপ (অন্তত: ৩ বার)
৯। গুণকীর্তন : সঙ্গীত, স্তব বা সাধারণ কথায়
১০। স্বীয় পাপের উল্লেখ ও তজ্জন্য আত্মগ্লানি ভোগ
১১। পাপ হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা
১২। গুণের জন্য প্রার্থনা
১৩। ধ্যান
১৪। দীক্ষাবীজ জপ
১৫। জগদীশ্বরের কৃপাময়ত্ব সম্বন্ধে স্তব বা গান
১৬। জগদীশ্বরের আনন্দময়ত্ব সম্বন্ধে স্তব বা গান
১৭। স্তব বা গান দ্বারা জগদীশ্বরের প্রেমানন্দময়ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখপূর্বক ধন্যবাদ দান
১৮। দীক্ষাবীজ জপ
১৯। শাস্ত্র পাঠ (প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সত্যধর্মের উৎসবে উপাসনা অধিবেশনে শাস্ত্র (গুরুনাথ লিখিত) পাঠ করা হয়, তবে সবক্ষেত্রে এটি আবশ্যিক নয়)
২০। জগদীশ্বরের প্রণাম
২১। দীক্ষাবীজ জপ
২২। গুরুদেবের ধন্যবাদ
২৩। দীক্ষাবীজ জপ
২৪। গুরু প্রণাম।

* [৪-১৮ অংশটি উপাসনার বিষয়, বাকীগুলো উপাসনা অধিবেশনের বিষয়]

কিরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকে আত্মতুল্যবোধ করবে? ক্ষুদ্রতম প্রস্তরকণা অনন্ত হিমাচলকে আত্মসদৃশ (নিজের মত) ভাবতে পারেনা। মানুষ ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র। সে নিজ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত কোন আত্মাকেই কখনও আত্মতুল্য ভাবতে পারেনা, সে কিভাবে অনন্ত গুণে অনন্ত উন্নত পরমপিতাকে আত্মতুল্য বলে নির্দেশ করবে!

আচার্য গুরুনাথের মতে, মানুষ যতই উন্নত হোক কখনও পরমপিতায় লীন হয়না। যেমন বৃত্তক্ষেত্রের মধ্যে যত প্রকার সরল রৈখিক ক্ষেত্র থাকতে পারে, তার মধ্যে ত্রিভূজ ক্ষেত্র অল্পবাহু বিশিষ্ট এবং অল্পস্থানব্যাপী; সেরকম পরমপিতার সৃষ্টিতে যত প্রকার পদার্থ আছে, তার মধ্যে এই দৃশ্যমান স্থূলজগৎ পরলোক অপেক্ষা অল্পতর গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এই তিন গুণ বিশিষ্ট। যেমন বৃত্তের মধ্যের সমচতুর্ভূজ, সমপঞ্চভূজ, সমষড়ভূজ, সমশতভূজ প্রভৃতি ক্ষেত্র ক্রমশঃ ঐ ত্রিভূজের চেয়ে বেশী বাহুবিশিষ্ট এবং বেশী স্থানব্যাপী, সুতরাং বৃত্তের অধিকতর কাছাকাছি, সেরকম পারলৌকিক উন্নত আত্মাদের দেহও চার, পাঁচ, ছয়, সাত, শত ইত্যাদি সংখ্যক গুণবিশিষ্ট এবং তাঁরা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও পরমপিতার অধিক নিকটবর্তী। বৃত্তের মধ্যেকার নিয়মিত সরলরৈখিক ক্ষেত্রের বাহুসংখ্যা যতই বাড়ুক, তা কখনও বৃত্তের সমান হয়না। সেরকম জীবাত্মা যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, কখনও পরমপিতার তুল্য হতে পারে না। সে অনন্তকাল অনন্ত ক্ষুদ্রভাবে তাঁর নিকটে থাকে; সে কখনও পরমাত্মাতে লীন হতে পারবে না।

৭.আমেরিকাদি মহাদেশে প্রচলিত স্পিরিচ্যুয়ালিস্ট (সাধারণ আত্মাকর্ষণ) ধর্ম থেকেও সত্যধর্ম বিভিন্ন। স্পিরিচ্যুয়ালিস্ট ধর্মও সোঽহং মতাবলম্বী।

৮.আচার্য গুরুনাথ দাবী করেছেন যে, সত্যধর্ম ঐকদেশিক নয়, এ ধর্ম সর্বাঙ্গ বিশুদ্ধ ও ব্যাপক। এ প্রসঙ্গে তার কিছু মত উল্লেখ করা হ'ল।

সত্যধর্ম পৃথিবীকে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়গুলিকে অতি তুচ্ছ বোধ করে এবং এ ধর্মে পরলোক ও পারলৌকিক আত্মা ইত্যাদির আলোচনা প্রধান। হিন্দুধর্মাদিতে যে অষ্ট সিদ্ধির[২০] উল্লেখ আছে তা পৃথিবী মধ্যস্থ। কিন্তু সত্যধর্মে ইহলোকস্থ হয়েও পরলোকে গমন ও সেখানকার বিষয়ে জ্ঞান লাভের কথা আছে।

---

[২০] অষ্টসিদ্ধি : বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার অষ্টসিদ্ধির বিবরণ আছে। শিব সংহিতায় বর্ণিত অষ্টসিদ্ধি :

(১) অনিমা – নিজের দেহকে ইচ্ছামত সূক্ষ্ম করবার ক্ষমতা, এর দ্বারা দেবগণ ও সিদ্ধগণ ইচ্ছামত আপনাদের দেহ সূক্ষ্ম করে অলক্ষিতভাবে যথাইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন।
(২) লঘিমা – নিজ শরীরকে লঘু করার শক্তি
(৩) প্রাপ্তি – লাভ করা
(৪) প্রাকাম্য – আপনার ইচ্ছানুসারে চলার ক্ষমতা
(৫) ঈশিত্ব – স্থাবরাদি সর্বভূত আজ্ঞাকারী
(৬) বশিত্ব – বশ করার শক্তি
(৭) মহিমা – উৎকর্ষ/মহত্ব
(৮) কামাবশায়িত্ব – রিপুকুল বশীভূত, ইন্দ্রিয় নিগ্রহশক্তি

তত্ত্বসমাস (প্রাচীন সাংখ্য) অনুসারে অষ্টসিদ্ধি :
(১) পারা (২) সুপারা (৩) প্রমোদ (৪) রম্যা (৫) প্রমোদমানা (৬) রম্যমানা (৭) মুদিতা (৮) উত্তমা।
সাংখ্যকারিকা মতে অষ্টসিদ্ধি :
(১) উহ্ (২) শব্দ (৩) অধ্যয়ন (৪) প্রাপ্তি (৫) বাহ্যাভ্যন্তরশুচি (৬) অধ্যাত্মদুঃখ বিঘাত (৭) আধিভৌতিক দুঃখ বিঘাত (৮) আধিদৈবিক দুঃখ বিঘাত।
অনিরুদ্ধ ভট্টের মতে অষ্টসিদ্ধি :

সত্যধর্ম পরমপিতার ক্রমময় সৃষ্টির মত ক্রমে ক্রমে অসীম জ্ঞানমার্গ প্রদর্শক ও ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অসীমরূপে প্রসারিত।

সত্যধর্ম সমস্ত শাস্ত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং এ ধর্মে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সুচারু মীমাংসা আছে বলে দাবী করা হয়।

অন্যান্য ধর্মে সে সব আশ্চর্য ঘটনার বিষয় আছে, সত্যধর্মে সে সবই আছে, তদুপরি কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনার বিষয় আছে। কপিলের শাপে সগর পুত্রদের বিনাশ, ভগীরথের অদ্ভুত উৎপত্তি ও অস্থিপ্রাপ্তি এবং গঙ্গার আনয়ন দ্বারা সগর পুত্রদের উদ্ধার প্রভৃতি সেসব কথা হিন্দুধর্মে আছে এবং পাঁচখানি রুটি দ্বারা বহুলোকের ভোজন এবং ভুক্তাবশিষ্ট রুটির সংখ্যা শতাধিক গণনা ইত্যাদি যে সব কথা খৃষ্টধর্মে আছে, সত্যধর্মে এ সবের মীমাংসা আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (বিষয়টি সত্যধর্ম বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে)

আত্মাকর্ষণ, পাপগ্রহণ, বিবিধ সিদ্ধিলাভ ও আয়ুপ্রদান শক্তি এ সকল প্রধান বিষয়ের বিবরণ সত্যধর্মে আছে। এ বিষয়গুলি সত্যধর্মের স্বাতন্ত্র ও ব্যাপকতা প্রকাশ করে।

আচার্য গুরুনাথ দাবী করেন যে, যারা কলুষ অনলে দগ্ধ, তাদের শান্তি দিতে এবং যারা মুক্তিকামী তাদের মুক্তি দিতে সত্যধর্ম প্রকাশিত হয়েছে।[২১]

৯।আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পারলৌকিক মহাত্মাদের কাছ থেকে আত্মাকর্ষণের মাধ্যমে এ ধর্ম প্রাপ্ত। তাঁরাই এ ধর্মের প্রচারক।

যে ব্যক্তির (১) প্রেম, (২) সরলতা, (৩) পবিত্রতা, (৪) একাগ্রতা, (৫) ভক্তি ও (৬) ঈশ্বর জ্ঞান আছে এবং (৭) যার মন কুপথে গমন করে না, **পারলৌকিক আত্মারা** তাঁকে আশ্রয় করতে ও স্ব স্ব মন্তব্য জানাতে পারেন। কিন্তু কেবল ঐ গুণগুলি থাকলেই **পারলৌকিক মহাত্মারা** কোনও ব্যক্তির দেহ আশ্রয় করেন না। যে ব্যক্তির উক্ত গুণসমূহ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হয়েছে এবং নিম্নবর্ণিত গুণগুলিও আছে, পারলৌকিক মহাত্মারা তাঁকেই আশ্রয় করতে পারেন।

(৮)সম্পত্তি বিষয়ে নিস্পৃহতা।

(৯)নিস্পাপ অবস্থা বা মূর্তিমতী পবিত্রতা।

(১০)অন্যের পাপ গ্রহণ ক্ষমতা।

(১১)লোকের উপকার ভিন্ন অপকার করব না, এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়তা।

(১২)সিদ্ধিসমূহ লাভের উপযুক্ত গুণ (কোন্ কোন্ গুণে কোন্ সিদ্ধি সে বিষয়ে সত্যধর্মের ৫ম পরিচ্ছেদে বলা আছে)।

(১৩)কাম-ক্রোধ-হীনতা।

(১৪)অন্ততঃ সমস্ত মানুষকে সহোদরবৎ দর্শন এবং সেরূপ আচরণ করা, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

(১) তার (২) সুতার (৩) তারতর (৪) রম্যক (৫) সদামুদিত (৬) প্রমোদ (৭) মুদিত (৮) মোদমান। (দ্রষ্টব্য, দ্বিজেন্দ্র লাল বিশ্বাস, মহাত্মা গুরুনাথ, কলিকাতা, ২০০১, পৃ: ৯৬) আরও দ্রষ্টব্য, সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা, ১৯৯৫।
সত্যধর্ম মতে সিদ্ধিসমূহ সত্যধর্ম বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

[২১] দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম, ১ম পাতা।

সত্যধর্মে বলা হয়েছে যে, ধর্মের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পারলৌকিক মহাত্মারা যা জ্ঞাত আছেন তা অভ্রান্ত কেননা তাঁরা ঈশ্বরের এত সান্নিধ্য লাভ করেছেন যে, এ বিষয়ে তাঁদের হৃদয়ে ভ্রান্তি আসতে পারে না। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, অন্ধ জগৎ আপনার আত্মার উৎকর্ষে যা জেনেছে তার চেয়ে পারলৌকিক মহাত্মাদের দ্বারা যা জানা যাচ্ছে তা সত্য। আচার্য গুরুনাথ এ কারণে সত্যধর্মকে সর্বাঙ্গবিশুদ্ধ ও সত্য বলে দাবী করছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ :

সত্যধর্মের সার :

(১)মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন, মানুষ যখন প্রেমানন্দময় পরমপিতার প্রেমসুধাপানে আনন্দসাগরে মগ্ন হয়, তখনই মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

(২)জীবাত্মার বিনাশ সাধন বা পরমাত্মার জীবত্ব বিনাশ সাধন, পাশমুক্ত হলে জীবত্ব বিনাশ সাধন হয়।

(৩)ভগ্নাংশের অখণ্ড আকারে পরিবর্তন সাধন, উক্ত দুটি অবস্থার পরে যখন দেহাবচ্ছিন্ন পরমাত্মার জীবত্ব ধ্বংস হয় অথচ পূর্ণতা হয়না, তখন সে ক্রমশঃই পূর্ণস্বরূপ অনাদি-অনন্তের নিকটবর্তিতা লাভ করতে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ পূর্ণত্ব পেতে থাকে। একেই ভগ্নাংশের অখন্ড আকারে পরিবর্তন সাধন বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

এখানে আরো বলা হয়েছে যে, ঐভাবে আত্মা উন্নতি লাভ করে অনন্তকালেও নিজ চেষ্টায় পূর্ণপূর্ণত্ব পেতে পারেনা। উল্লিখিত গুণসম্পন্ন আত্মা ধরা যাক্ অনন্তকাল উন্নতি দ্বারা ·৯ থেকে ক্রমশঃ .৯৯, .৯৯৯ ইত্যাদি রূপে .৯ হ'ল। কিন্তু তাও যে ১ থেকে ক্ষুদ্রতর। তার প্রমাণ এই-

১.০০০০০০০০০.....

.৯৯৯৯৯৯৯৯৯ (ইত্যাদি অনন্ত সংখ্যক)

(বিয়োগ করলে).০০০০০০০০০ [ইত্যাদি (অনন্ত-১) সংখ্যক শূন্য] ১

কি উপায়ে এ ধর্ম লাভ করা যায় : সত্যধর্ম লাভের উপযুক্ত গুণাবলী অর্জন করতে পারলে পারলৌকিক মহাত্মাদের কাছ থেকে এ ধর্ম লাভ করা যায়। কিন্তু এ উপায়ে ধর্ম সাধারণের সুপ্রাপ্য হয়না। সর্বসাধারণের ধর্ম লাভের জন্য উপযুক্ত গুণসম্পন্ন সাধককে প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ সাধকের কাছ থেকে এ ধর্ম লাভ করতে হলে সহজ জ্ঞান, নির্ভরতা (পরমপিতা যা করছেন তা আমার মঙ্গলের জন্য, এরূপ নির্ভরতা) ও বিশ্বাস (তিনিই আমার সব) এ তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক।

কি উপায়ে এ ধর্মে থাকা যায় : যে তিনটি গুণ থাকলে সত্যধর্ম লাভ করা যায়, তা বিনষ্ট না হলে এবং নিয়মমত উপাসনা করলে এ ধর্মে থাকা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ :

উপাস্যকে আত্মার আভরণ করাকে উপাসনা বলে। উপাসনার প্রধানতঃ দুটি অংশ- (১) উপাস্যের গুণকীর্তন (২) তাঁর কাছে নিজের পাপের কথা বলা। প্রার্থনাও উপাসনার অংগ। প্রার্থনা তিন প্রকার- (১) পাপ মুক্তির জন্য (২) গুণ লাভের জন্য (৩) ভিক্ষা। আমার কিছুই নাই, তুমি যা দাও, তা-ই আত্মার প্রতিপালক- এরকম কথা বলাকে ভিক্ষা বলে। উপাসনার দ্বারা প্রেম, সরলতা, ভক্তি, একাগ্রতা প্রভৃতি

গুণের বৃদ্ধি হয়, জড় ও সূক্ষ্ম জগতের সম্বন্ধ জ্ঞান হয়, আত্মা সতেজ অবস্থা লাভ করে ও এরূপ আরও উন্নতি হয়।

প্রার্থনার ফলে পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়; প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে পাপ কাজ না করা ও পাপকর কাজের চিন্তা না করা, প্রভৃতি অবস্থা হয়।

দৈনিক উপাসনার নিয়ম ও প্রণালী :

প্রতিদিন অন্ততঃ তিন ঘন্টা উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে। উপাসনা গান দ্বারা ভাল হয়, না পারলে সাধারণ কথায় বা স্তব দ্বারা করা যায়। উপাসনার আগে মনকে উপাসনামুখী করার জন্য মনের প্রতি দু'একটা গান করা যায়। উপাসনার প্রথমে উপাস্যের গুণকীর্তন করতে হবে। তাঁর অনন্ত গুণ যেমন- দয়াময়, করুণাময়, কৃপাময়, সত্য, সনাতন, পতিতপাবন, অগতির গতি, দীননাথ, দীনবন্ধু, দীনের শরণ, মঙ্গালময়, শান্তিময়, শিব (নিষ্পাপদিগের শুভবিধানকারী) বিভু (সর্বব্যাপী), তারণ, অনাদি, অনন্ত, অসীম, জ্ঞান-নিধান, প্রেমময়, নিরাকার, নির্বিকার, রক্ষক, পালক, সৃজনকারী, চির-অবলম্বন, অনাথের নাথ, বিপদভঞ্জন, ন্যায়ের ধাম, ক্ষমাময়, গুণময়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবে উপাস্য অনন্ত গুণময়। সাধারণ কথায়, স্তবে বা গান দ্বারা উপাস্যের গুণকীর্তন করা যায়। গুণকীর্তনের পরে নিজ নিজ পাপের উল্লেখ করতে হবে। যেগুলি মনে পড়বে প্রথমে সেগুলি পরে সাধারণভাবে জ্ঞানে-অজ্ঞানে যত পাপ করা হয়েছে তার উল্লেখ করতে হবে। কাম-ক্রোধাদি ও পাপের মধ্যে গণ্য, এদেরও উল্লেখ করতে হবে।

গুণকীর্তন ও পাপ উল্লেখ করতে করতে যখন আত্মগ্লানি হয় তখন পাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। এরপর গুণের জন্য প্রার্থনা। প্রথমে সাধারণভাবে সমস্ত গুণের জন্য, পরে প্রেম, ভক্তি, নির্ভরতা, একাগ্রতা, সরলতা প্রভৃতি গুণের মধ্যে যে গুলির অভাববোধ হবে সেগুলির জন্য প্রার্থনা করতে হবে। তবে প্রেম কামনাতীত এজন্য একাসনে কোন কাম্য বিষয়ের সাথে প্রেমের জন্য প্রার্থনা করা ঠিক নয়।

এধর্ম অবলম্বন করতে হলে দীক্ষিত হওয়া দরকার। দীক্ষিত হওয়া অর্থ ঈশ্বর পথাবলম্বী হওয়া। দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন এই যে, নিজের শক্তিতে কেউ কোন বিষয় জানতে পারেনা। সব বিষয় পরিচালনার জন্য বা শিক্ষাদানের জন্য একজন গুরুর প্রয়োজন। যিনি এ ধর্ম প্রচারের জন্য আদেশ পেয়েছেন তিনিই দীক্ষাদাতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ :

ধর্ম মানে পথ। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রকৃতপথ অবলম্বন করাকে ধর্মসাধন বলে। সাধনা শব্দের অর্থ অভ্যাস করা।[২২] যাঁরা ধর্মকে জীবনে প্রয়োজন মনে করেন, তাঁদের কর্তব্য গুণ সাধনা করা। উপাসনা করলে গুণের বৃদ্ধি হয় কিন্তু যথোচিত অভ্যাস বা চর্চা না করলে প্রকৃতরূপে গুণের উন্নতি হয়না। দোষ নিবারণের উপায় দোষের চর্চা না করা, আর গুণ-বৃদ্ধির উপায় গুণের চর্চা করা। পাপের মধ্যে বেশী যাতনাদায়ক যেটি প্রথমে তার থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা কর্তব্য। আর গুণগুলির মধ্যে যে যে গুণ ক্রমে

---

[২২] 'সাধনা' প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ বলছেন, "গুরুদেব যে বিষয়ের শিক্ষার্থে, যেরূপে, বিষয় অভ্যাস করতে বলেন, সে বিষয়ে সেরকম অভ্যাসকেই সাধনা বলে। অর্থাৎ যেরূপ কাজ করলে উদ্দেশ্য কাজের সিদ্ধি হয়, সেরূপ ক্রিয়ার অভ্যাসকেই সাধনা বলে | (দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ৭)

শ্রেষ্ঠ বিপরীতক্রমে তাদের অভ্যাস করা কর্তব্য। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যেটি তার অভ্যাস প্রথমে করতে হয়। গুণের মধ্যে যেটির ব্যাপকতা বেশী সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এদিক থেকে প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ।

গুণ সাধনার ফল গুণ লাভ বা গুণবৃদ্ধি করা। গুণ সাধনা হলে জগতের উপকার করার শক্তি জন্মে, সমস্ত সৃষ্ট চেতন পদার্থের প্রতি প্রেম বিস্তার করা যায় এবং ক্রমশঃ অনন্ত গুণ নিধান পরমপিতার নিকটবর্তী হওয়া যায়।

পুরুষ সাধুশীলা স্ত্রীকে ও সাধুশীলা স্ত্রী সৎপুরুষ অবলম্বন করে প্রেমগুণ অভ্যাস করতে পারেন। দাম্পত্য প্রেমই সবপ্রেমের মূল। মা বাবার প্রতি ভক্তি করে ভক্তিগুণ লাভ করা সহজ। এ ছাড়া অন্যান্য ভক্তিভাজনদের ভক্তি করেও ঈশ্বরভক্তি লাভ করা যায়। পরমপিতার উপাসনায় একাগ্র হতে চেষ্টা করলে একাগ্রতা লাভ হয়। প্রেম ও ভক্তি দ্বারাও একাগ্রতা লাভ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ :

সাধনা করলে তার ফল হিসাবে কিছু ক্ষমতা বা বিভূতি লাভ হয়, এগুলিকে সিদ্ধি বলে। যেমন- আত্মাকর্ষণ, অন্যের পাপ গ্রহণ, বাক্‌সিদ্ধি, গুটিকাসিদ্ধি, কীর্ত্তিসিদ্ধি, অমৃতসিদ্ধি, অমূলসিদ্ধি, আয়ুপ্রদান শক্তি ইত্যাদি। কোন্ কোন্ গুণে কোন্ কোন্ সিদ্ধি লাভ হয় এ অধ্যায়ে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এ অধ্যায়ে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে,মানুষ মাত্রেই পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট আয়ু নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পাপ দ্বারা ঐ আয়ু ক্ষয় হয় অর্থাৎ উহার কিয়দংশ বা সমস্ত ভোগের অনুপযুক্ত হয়, কিন্তু পুন্য দ্বারা বৃদ্ধি হয় না। পাপ ক্ষয় হওয়ার পরে নিস্পাপ হতে পারলে পুনরায় ঐ আয়ু ভোগ করার ক্ষমতা জন্মে। উল্লেখ্য যে, পুন্য দ্বারা আয়ুর বৃদ্ধি হয় না বটে কিন্তু আয়ুর প্রভাব বাড়ে। বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন এক মহাত্মার এক দিনের আয়ু অন্যের শতাধিক বছরের আয়ুর সমান হতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ :

প্রতিটি মানুষের অসীম দেহ- স্থূলতম, স্থূল, স্থূলতর, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ইত্যাদি। মানুষ স্থূলতম দেহ ত্যাগ করে পরলোকে যায়। সেখানে কর্তব্যকাজ অর্থাৎ পাপক্ষয় ও গুণের উন্নতি দ্বারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মদেহ লাভ করে। আত্মার উন্নতি নির্ভর করে পাপক্ষয় ও গুণের উন্নতির উপর এবং সে অনুসারে পরলোকে উন্নত বা অবনত স্থানে আত্মা অবস্থান করে।

যাঁরা স্থূলতম দেহে থেকেই বহুদেহের কাজ সম্পন্ন করেন তাঁরা একবারেই অত্যুন্নত স্থানে চলে যান। পরলোকে সব আত্মা সমান স্থানে থাকেনা, যারা উন্নত তারা সুখময় স্থানে আর যারা অনুন্নত তারা দুঃখময় স্থানে থাকে। একরকম উন্নত আত্মারা এক এক জায়গায় থাকে। দুঃখময় স্থানগুলিকে নরক ও সুখময় স্থানগুলিকে স্বর্গ বলা হয়। সূর্যমন্ডলের ও পৃথিবীর কেন্দ্র-সংযোজক রেখার মধ্যবিন্দু হইতে দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশরূপে রেখাপাত করে উচ্চতা ও নিম্নতা স্থির করতে হবে। স্বর্গ নরকের ধারণাটা আপেক্ষিক অর্থাৎ কোন মন্ডল একের পক্ষে নরক হলেও অন্যের পক্ষে স্বর্গ হতে পারে।

পরলোকগত আত্মাদের মধ্যে কেউ কেউ পুনরায় এ লোকে জন্মগ্রহণ করেন। একেই পুনর্জন্ম বলে। পুনর্জন্ম যে সব আত্মারই হবে এমন নয়। যারা পরলোকে আয়ু প্রাপ্ত হন,তাঁহাদেরই পুনর্জন্ম হইতে পারে। এটা আত্মাদের নিজ নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যেসব আত্মা পরলোকে নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম অর্থাৎ পাপক্ষয় ও গুণের উন্নতি করে উঠতে পারেনা, সাধারণতঃ ঐ কাজ সম্পাদনের জন্য তারা পুনর্জন্ম নিয়ে থাকে। এ ছাড়া উন্নত আত্মারা সবিশেষ কারণবশতঃ পুনর্জন্ম নিয়ে থাকেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ :

যাতে অন্যের মনে কষ্ট হয় এবং সহানুভূতি হলে কৃতকারীর মনেও কষ্ট হয় তাকে পাপ বলে।[২৩] যে আত্মা যত পাপাক্রান্ত তার পাপকর কাজে তত কম কষ্ট হয়। সুতরাং একবার নিষ্পাপ হতে না পারলে

---

[২৩] আচার্য গুরুনাথ উপাসনা বর্ণনাকালে উপাসনার দ্বিতীয় অংশ "নিজ পাপের উল্লেখ" বলে নির্দেশ করেছেন। পাপ বলতে তিনি (ক) দুস্কৃতি (দোষ পরিচালিত কাজ) (খ) পাশ (ঘৃণা/লজ্জাদি অষ্টপাশ) (গ) জাতগুণের অলয় (যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে নাই, ভৌতিক জগতের সাথে সম্বন্ধকালে ক্ষণে ক্ষণে উদিত ও তিরোহিত হয় যথা- কাম,ক্রোধ, ঘৃণা,লজ্জা ইত্যাদি) এবং (ঘ) কয়েকটি মিশ্রগুণের অলয় - বলে উল্লেখ করেন। এখানেই আবার লিখেছেন,আত্মাকে যা থেকে রক্ষা করা কর্তব্য, যাতে লিপ্ত আত্মার পতন অনিবার্য, তাকে পাপ বলে (দ্রষ্টব্য, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০)। এ গ্রন্থে অন্যত্র লিখেছেন, পাপ শব্দে জীবহিংসা, ব্যাভিচার প্রভৃতি দুস্কৃতিমাত্র নয়, ঐ সকল ছাড়াও অষ্টপাশ, জাতগুণের (কাম-ক্রোধাদির) অলয় এবং কয়েকটি মিশ্রগুণের অলয়ও পাপ। (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ: ৫৪)

গুরুনাথ বিভিন্নস্থানে পাপ তিন প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত, সত্যধর্ম মহামন্ডল, বাংলাদেশ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সং-৭৮, ৮০, পৃ: ৫৬, ৫৭)। গুরুনাথের 'পবিত্রতা' প্রবন্ধের অনুবাদকারী কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এ তিনরকম পাপের উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য, অনুবাদমালা, ১ম খন্ড, অনুবাদক, গৌরপ্রিয় সরকার, ঠাকুরনগর, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৫০)। গুরুনাথ সাধনা গ্রন্থে সাধনার সাধারণ বিবরণ অংশে ধর্মের কথা উল্লেখ করে এদের বিপরীত কাজগুলি ধর্মের ব্যাঘাতজনক ও মোক্ষমার্গের বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন-

ধর্ম	**বিঘ্ন**
১। সত্য	১। অসত্য (মিথ্যাচারণ)
২। অহিংসা	২। হিংসা
৩। অস্তেয়	৩। স্তেয় (চৌর্য)
৪। ব্রহ্মচর্য	৪। অনিয়মিত ও অতিরিক্ত নারী সংসর্গ
৫। অপরিগ্রহ	৫। পরধনাদির পরিগ্রহ
৬। শৌচ	৬। অশুচিত্ব
৭। সন্তোষ	৭। নিরন্তর অসন্তোষ
৮। তপস্যা	৮। তপস্যা না করা
৯। স্বাধ্যায়	৯। ধর্মগ্রন্থ পাঠ না করা
১০। ঈশ্বরোপাসনা	১০। জগদীশ্বরের উপাসনা না করা
১১। প্রত্যাহার	১১। না করা
১২। ধারণা	১২। "
১৩। ধ্যান	১৩। "
১৪। সমাধি	১৪। "

এ বিঘ্নসমূহ অল্প পরিমানে বা মধ্যম পরিমানে বা অধিক পরিমানে কৃত, কারিত বা অনুমোদিত হয়ে অনন্ত প্রায় দু:খ ও অজ্ঞানতা উৎপাদন করে। কারণ এগুলি ক্রোধ লোভ ও মোহপূর্বকই উৎপন্ন হয় (দ্রষ্টব্য, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ১৮-৩৭)। সত্যধর্মে আছে, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি পাপের মধ্যে গণ্য (দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম, পৃ: ১৫)। সত্যধর্মের গুণ প্রকরণে গুরুনাথ লিখেছেন, কাম, ক্রোধ, ঘৃণা ও লজ্জা ইত্যাদি জাতগুণ- এগুলি অপকৃষ্ট গুণ এর অন্য নাম দোষ (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ: ৩৮)। আবার লিখেছেন, দোষ পরিচালিত কাজের অধিকাংশই পাপ। দোষ পরিচালিত সব কাজই পাপ নয় (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ৯৩)। উপাসনা গ্রন্থে দোষ রাশিকে পাপের মূল বলে উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য, তত্তজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২৬৮)। হিংসাদিকেও দোষ বলা হয়েছে (সত্যধর্ম, পৃ; ২১)।

প্রচলিত মতে ষড়রিপু হ'ল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য(সাধনা, পৃ: ১৪৮) এদেরকে দোষ বলা হয়। আর অষ্টপাশ হ'ল-ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আশংকা, জুগুপ্সা, কুল, শীল, জাতি। কিন্তু সত্যধর্ম গুণ প্রকরণে বলা হয়েছে- আধ্যাত্মিক গুণ- সরল মিশ্র ও জাত- এ তিন প্রকার।... যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে নাই ভৌতিক জগতের সাথে আত্মার সম্বন্ধকালে ক্ষণে ক্ষণে উদিত ও তিরোহিত হয় তাকে জাতগুণ বলে। যথা: কাম, ক্রোধ, ঘৃণা ও লজ্জা ইত্যাদি। এখানে ষড়রিপু ও অষ্টপাশ উভয়কেই দোষ বলা হয়েছে। এছাড়া তিনি আরো দোষের কথা বলেছেন, যেমন স্বার্থপরতা, কপটতা ইত্যাদি।

সুতরাং কাম, ক্রোধাদির দ্বারা যা উৎপন্ন তার অধিকাংশই যখন পাপ আর ধর্মের বিঘ্নসমূহও এদের দ্বারা উৎপন্ন। সুতরাং কাম, ক্রোধাদি পাপের মধ্যে গণ্য। এ ক্ষেত্রে তিনরকম পাপের উল্লেখ পাওয়া যায়- কৃত, কারিত ও অনুমোদিত। সত্যধর্ম গ্রন্থে তিনরকম পাপের উল্লেখ আছে। প্রথমত: পিতৃপুরুষদের স্বীকৃত পাপ। দ্বিতীয়ত: স্বকৃত পাপ অর্থাৎ পাপকর কাজ করলে যে পাপ হয় তা। এছাড়া, কতিপয় সূক্ষ্ম কারণে পাপস্পর্শ হয়।

সব পাপ অনুভব করার শক্তি জন্মে না। জগতে সবাই সব কাজে সমান অধিকারী নয়। যার যতদূর ক্ষমতা আছে সে সেরূপ কাজ না করলে বা তার চেয়ে বেশী কাজ করলে জীবাত্মার কষ্ট হয়- এ ভাবেই জীবাত্মার পাপ হয়। জন্মগ্রহণের সময় উর্ধতন পুরুষদের পাপ স্বীকার করতে হয়। পাপকর কাজের দ্বারা পাপ হয়। এছাড়া কয়েকটি সূক্ষ্ম কারণেও পাপ হয়।

যে কাজ দ্বারা পাপক্ষয় হয় তা হ'ল আত্মগ্লানি। যেরকম পাপ সেরকম আত্মগ্লানি হওয়া দরকার। উপাসনা দ্বারাই উপযুক্ত আত্মগ্লানি হয়। তাই উপাসনা দ্বারাই পাপমুক্তি হয়।

যাতে অন্যের মনে সুখ হয় এবং সহানুভূতি হলে কৃতকারীর মনেও সুখ হয়, তাকে পুণ্য বলে। সাধারণতঃ কর্তব্য কাজ করাকে পুণ্য বলে। যার যেরূপ ক্ষমতা সে অনুসারে কাজ করলে পুণ্য হয়।

পাপের ফল আত্মগ্লানি আর পুণ্যের ফল আত্মপ্রসাদ।

গুরুনাথ 'পবিত্রতা' প্রবন্ধে 'মুক্তিতে পবিত্রতা অধিগত হয়' এরকম মত দিয়েছেন। মুক্তি বহু প্রকার এমনকি অনন্ত প্রকার। এর মধ্যে ২২ প্রকার মুক্তি শ্রেষ্ঠ। যথা: ভববন্ধ হতে, ত্রিবিধ কলুষ হতে, ষড়বিধ বিষয় হতে, অষ্টপাশ হতে, দেবতেজোদর্শনে, দেবতা দর্শনে, ব্রহ্মজ্যোতিদর্শনে ও ব্রহ্ম দর্শনে (দ্রষ্টব্য, অনুবাদমালা, ১ম খণ্ড, পৃ; ৫০)। এই ত্রিবিধ কলুষ (পাপ) বলতে ঐ প্রবন্ধের অনুবাদক শ্রী গৌরপ্রিয় সরকার কায়িক মানসিক ও বাচনিক এ তিন প্রকারের উল্লেখ করেছেন। এখানে ত্রিবিধ পাপের মধ্যে অষ্টপাশ নেই কারণ পরবর্তীতে অষ্টপাশ থেকে মুক্তির উল্লেখ আছে। আবার গুরুনাথ সংগীতে লিখেছেন, "না বুঝে করেছি নাথ ত্রিবিধ কলুষ কত"এখানে পাপ বলতে কৃত পাপ বুঝাচ্ছে অর্থাৎ কৃত পাপ তিন রকম। সুতরাং গৌরপ্রিয় সরকারের ঐ ব্যাখ্যা এখানেও প্রযোজ্য হতে পারে। আবার অন্য সংগীতে বলছেন, "ত্রিবিধ পাপ মোচনে ....."এই ত্রিবিধ বলতে ঐ সংগীতে নির্দিষ্ট করা হয়নি, এটি কৃত কারিত অনুমোদিত এ তিনরকম হতে পারে আবার সত্যধর্মে যেমন বলা আছে দ্বাদশ পুরুষের স্বীকৃত, স্বকৃত এবং কতিপয় সূক্ষ কারণে- এ তিনরকম হতে পারে।

উপাসনার দ্বিতীয় অংশ স্বীয় পাপ কথন প্রসঙ্গে গুরুনাথ বলেন, "জগদীশ্বরের নিকট স্বীয় পাপরাশির উল্লেখ করলে, উহার মূল তখনই শিথিল হয় এবং তৎপরে "দোষলেশ-শূন্য অনন্ত গুণনিধির পুত্র হইয়া এইরূপ পাপাচরণ করিয়াছি" চিন্তা করিবা মাত্র ভীষণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং সেই আত্মগ্লানি প্রভাবেই পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায় (দ্রষ্টব্য, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ৪৯)। এখানে কৃত পাপের উল্লেখের কথাই বলা হয়েছে। এই কৃত পাপ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক তিন প্রকার হতে পারে। অনুতাপই পাপ মুক্তির প্রধান সাধন (ঐ, পৃ: ৫২)। এখানে কৃত পাপের উল্লেখের কথাই বলা হয়েছে। এই কৃত পাপ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক তিন প্রকার হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মের নাম, ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মের ভাষা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত

আচার্য গুরুনাথের মতে, ধর্ম অর্থাৎ পথ;মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে পথ তাকে ধর্ম বলে। প্রকৃত পথ দেখে ঈশ্বরের রাজ্যে গমন করাকে ধর্মসাধন বলে।[১] জগতে কোন ধর্মের প্রকৃত পক্ষে কোন নাম নেই। যেমন- জগদীশ্বরের কোন নাম নেই। যে যা বলে ডাকতে চায়, তার কাছে সে নামই প্রধান। সেরকম ধর্মেরও কোন বিশেষ নাম কোন সিদ্ধ প্রচারক উল্লেখ করেননি।[২] তবে ,যেমন- প্রণব[৩] জগদীশ্বরবাচক বলে ভারতীয় সব মহাত্মারা স্বীকার করেছেন, সেরকম 'সত্যধর্ম' এ শব্দ বা এরূপ অর্থবিশিষ্ট শব্দ সব প্রচারকগণ নির্দেশ করেছেন। সুতরাং প্রকৃত ধর্মমাত্রেই সত্যধর্ম নামে খ্যাত, প্রচারকদের উক্তি থেকে তা বোঝা যায়।

এ কথার সমর্থনে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রের উক্তি উল্লেখ করেছেন।যেমন, হিন্দুধর্মের ঈশ-উপনিষদে আছে-

হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্

তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।১৫

---

[১]দ্রষ্টব্য,১। সত্যধর্ম, পৃ: ১৭,২।শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত,সত্যামৃত ,গুণসুত্র,৪/১২, অনুবাদঃ অনুবাদমালা ১ম খন্ড,পৃ,৭৪।

২।বিভিন্ন ভাষায় ধর্মের সমার্থক শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে জীবনে চলার পথ (Way of life)। ইংরেজি religion বাংলা 'ধর্ম' শব্দের সমার্থক। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে পুনরেকত্রীকরণ বা binding together a new; Re+legere=Relegion; Re=পুনরায় Legere= একত্রীকরণ বা বাঁধা-to bind together (Pritibhushan Chatterjee, Studies in Comparative Religion, Dasgupta & Co. Calcutta, ১৯৭১, পৃ: ৪০৯)। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা-ই হোক না কেন ধর্ম, রিলিজিয়ন, দ্বীন, মাযহাব, তরীকা এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবনের চলার পথ। এমনকি, কোন কোন ধর্মের নামের অর্থই হচ্ছে পথ। যেমন শিনতোইজম (Shintoism)। শিনতো শব্দের অর্থ হচ্ছে দেবতার পথ (the way of gods) (ঐ, পৃ: ২৭৪)। Taoism-এর মূল শব্দ Tao-এর অর্থ হলো মহৎপথ বা স্বর্গীয় পথ (ঐ, পৃ: ২৮৯)।

[দ্রষ্টব্য : ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম, ড. কাজী নূরুল ইসলাম, তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০২, পৃ: ১৪]

[২] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ১৩৯-১৪০।

[৩] প্রণব ৫টি : ও, ওঁ, ওং, বম্, ওঁং। ঐ সমস্তের মূল বর্ণ অ আ উ ম্-এই চারটি। অ-কার শব্দে পালনকর্তা, আ-কার শব্দে সৃষ্টিকর্তা, উ-কার শব্দে লয়কর্তা, অনুস্বার শব্দে পরব্রহ্ম অর্থাৎ গুণাতীত ব্রহ্ম।

প্রণব সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেখানে বিস্তৃত বিবরণ আছে। দ্রষ্টব্য : মহাত্মা গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন, তত্ত্বজ্ঞান নিত্যকর্ম, ৭ম সং, বাংলাদেশ, ১৩৮৯, পৃ: ৪৭-৬৩।

অর্থাৎ সুবর্ণময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। হে জগৎপোষক! সত্যধর্মার দৃষ্টির নিমিত্ত তা অপসারিত কর।

মহানির্বানতন্ত্রে মহাত্মা শিব বলেছেন-

সত্যধর্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম কুরুতে নরঃ

তদেব সফলং কর্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে।।

প্রকটেহত্র কলৌ দেবী সর্বে ধর্মাশ্চ দুর্বলাঃ

স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ।

সত্যব্রতা সত্যনিষ্ঠা সত্যধর্মপরায়ণা

কুল সাধন সত্যা যে ন হি তান বাধতে কলিঃ।।

অর্থাৎ সত্যধর্ম আশ্রয় করে মানুষ যে কাজ করে তা সফল হয়। কলি প্রকট হলে সব ধর্ম দুর্বল হবে একমাত্র সত্যধর্মই থাকবে। সত্যব্রত, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্মপরায়ণকে কলি বাঁধতে পারেনা।

মনুসংহিতায় আছে-

সত্যধর্মার্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।

খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থ বাইবেলে দেখা যায় যীশুখৃষ্ট আত্মপ্রচারিত ধর্মকে সত্যধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন। কোরান শরিফেও হযরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্মকে সত্যধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

এ মতের অনুকূলে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মূল প্রচারক মারা যাবার পর তার ছেলে এ দলের নাম দেন সত্যধর্ম।[৫] গুরু নানক বিশুদ্ধ গুরুবাদী ছিলেন। এঁর মতে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই। সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে তাঁর আদেশমত চললেই সত্যধর্ম লাভ হবে। এই-ই তার উপদেশের সারমর্ম।[৬] স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "সময় আসিতেছে- যখন মহামানবগণ জাগিয়া উঠিবেন, এবং

---

[৪] দ্রষ্টব্য,গুরুনাথ সেনগুপ্ত,তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা,পৃ.১৪০।
কোরানে আছে- ...নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি (আল-বাকারাহ-১১৯)।
"...বল আল্লাহ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইব্রাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্টভাবে সত্যধর্মের অনুসারী (আল ইমরান-৯৫)"।
"... আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম পৌঁছিয়েছি। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্মে নিস্পৃহ।" (আল যুখরুক-৭৮)।
"তিনিই তাঁর রাসুলকে হেদায়েত ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন। যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন (আল-ফাত্‌তহ-২৮)"
"তিনিই তাঁর রাসুলকে পথ-নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"(সুরা-৫-৭, আছছফ-০৯)।

[৫] দ্রষ্টব্য, জেমস্ তেজস শংকর দাস, "বাংলাদেশে খৃষ্ট ধর্মের দুশো বছর এবং অতঃপর," প্রকাশক জনেশ লোটন রায়, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬, ২০১৬, পৃ: ৪৭। কর্তাভজা সম্প্রদায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ বা তার শাখা স্বরূপ। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউলে চাঁদ প্রাদুর্ভূত হয়ে এমত প্রথম প্রাদুর্ভূত করেন। আউলে চাঁদের শিষ্যরা তাঁকে জয়কর্তা বলে সম্বোধন করত। তা থেকেই এ সম্প্রদায়ের নাম কর্তাভজা। [দ্রষ্টব্য, শ্রী সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ: ৩৪৮]

[৬] দ্রষ্টব্য, শ্রী সুবল চন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৫৭

ধর্মের এই শিশু শিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মার দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।"[৭] মোঃ তোফায়েল হোসেন, 'সাভারের ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখেছেন, "এতদঞ্চলে বৌদ্ধযুগে যে তাম্রলিপি উদ্ধার করা হয়েছে তাতে লেখা আছে, 'সম্ভাগ পরগণায় ৩০টি বৌদ্ধস্তুপ নির্মিত হয় এবং হিন্দুযুগের কিছু কিছু মন্দিরও বর্তমান ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাগণ নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসে পূজা অর্চনা করতো। সত্যধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) ও অপধর্ম (হিন্দুধর্ম) পাশাপাশি বিরাজমান ছিল।"[৮] এখানেও দেখা যায়, বৌদ্ধরা তাদের ধর্মকে সত্যধর্ম বলছেন।সুতরাং প্রকৃত ধর্মমাত্রই সত্যধর্ম নামে খ্যাত। জগতে যেসব ধর্মপ্রণালী প্রচারিত আছে, বাইরে থেকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সকলে একই ধর্ম অবলম্বনে কাজ করে। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন নাম হলেও বিভিন্ন নামধারী ধর্মসমূহ একই ধর্মের দেশকাল পাত্রোপযোগী সংস্করণ। যেমন, ইহুদী ধর্ম জাতির নামানুসারে, খ্রীষ্টান ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারকের নাম অনুসারে এবং মুসলমান ধর্ম ধর্ম-অবলম্বীদের সংজ্ঞানুসারে নামপ্রাপ্ত হয়েছে।[৯]

বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে গুরুনাথের মত হ'ল-

সব নদ যেমন একই সাগরে মেশে তেমনি সব ধর্মকে সমান ভাবতে হবে।[১০] আচার্য গুরুনাথ আরো বলেছেন, পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম প্রণালী প্রচলিত আছে, সেগুলো আপাতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বলে মনে হলেও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ নয়- এ সত্য সাধারণ জনগণকে জানানো সত্যধর্ম প্রচারের প্রথম উদ্দেশ্য।[১১]সত্যধর্মে ধর্মকাজ বলতে ঈশ্বরের উপাসনা ও গুণের অভ্যাস অর্থাৎ নিজের মধ্যে যে গুণগুলি আছে, সেগুলোর বৃদ্ধি, বিকাশ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা বুঝানো হয়েছে।[১২] আর সব ধর্মেই এটি করা হয়। কাজেই সব ধর্মের মধ্যেই সত্যধর্মের কাজ দেখা যায়। [১৩] যে যে ধর্মেই থাকুক না কেন, এ দুটি কাজ যে করে সে সত্যধর্ম অনুসারী।

---

[৭] স্বামী বিবেকানন্দ, বেদান্তের আলোকে, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ৯৬

[৮] দ্রষ্টব্য, মোঃ তোফায়েল হোসেন, 'সাভারের ইতিহাস', স্বাবলম্বী, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ: ২০

[৯] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ১৪০।

আমিনুল ইসলাম লিখেছেন, একেশ্বরবাদীরা যেহেতু এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করে, সেজন্য তাদের সকলকে ব্যাপক অর্থে মুসলমান বলা যায় (দ্রষ্টব্য, আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা) মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ; ২৭)। সুতরাং ব্যাপক অর্থে মুসলমান বলতে কোন ধর্মের গন্ডী থাকেনা। যারা একেশ্বরে বিশ্বাস করে এমতে তারা সবাই মুসলমান। কোরান পাঠ করার পর গ্যেটে বিস্ময়ের সাথে বলেছিলেন, এই যদি ইসলাম হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষই একজন মুসলমান (দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ১৭)। আবার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেও অনুরূপ মত পাওয়া যায়। সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ উল্লেখ করেছেন যে, হিব্রু ও জেন্দ ভাষায় সিন্ধু তীরবর্তী আর্যস্থানকে 'হন্‌দ্' রাজ্য বলা হত। হন্‌দের অধিবাসীদিগকে 'হন্‌দু' বলা হত। ক্রমে তা হিন্দু আকারে পরিণত হয়েছে (সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ, হিন্দুধর্ম, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ ; ২)। সুতরাং হিন্দু ধর্ম বলতে ঐ স্থানের অধিবাসীদের ধর্ম বুঝায়। আবার হিন্দ্ অর্থে ভারত একটি দেশ বুঝায়। যেমন সেতার-এ-হিন্দ অর্থ ভারত নক্ষত্র, তাজিরাৎ-এ-হিন্দ্ অর্থ ভারতীয় ফৌজদারী আইন, আহেল-এ-হিন্দ অর্থ ভারতবাসী। এ শব্দ থেকেও যদি হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ধরা হয় তাহলে হিন্দু অর্থ ভারতবাসী অর্থাৎ ভারতের সব মানুষকে এর অন্তর্গত করা যায়। আর হিন্দুধর্ম বলতে ভারতবাসীর ধর্ম বোঝায় অর্থাৎ ভারতে সব ধর্মই হিন্দুধর্ম। এখানেও ধর্মের কোন গন্ডী থাকছেনা।

[১০] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যামৃত : মুক্তি জিজ্ঞাসা, পদ্যানুবাদ, সত্যধর্ম মহামন্ডল, বাংলাদেশ, ১৩৯৫, পৃ: ০৭

[১১] সত্যধর্ম প্রচারক দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ (দম্পতীর ধর্মালাপ), পৃ: ২০৩

[১২] সত্যধর্ম, পৃ: ✓

[১৩] ঐ, পৃ: ৩১

প্রচলিত ধর্মের নাম, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মশাস্ত্র প্রসঙ্গে গুরুনাথ একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা তুলে ধরেছেন।[১৪] যেহেতু তিনি হিন্দুকুলে জন্মেছিলেন, সেজন্য হিন্দুধর্ম ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ভিত্তি করে এ আলোচনা করেছেন। ভারতের ধর্ম হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত।[১৫] কিন্তু নামটা সংস্কৃত নয়, পারস্য ভাষার শব্দ।[১৬] হিন্দু শব্দ যদি সংস্কৃত হ'ত তাহলে বেদ, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারতের কোন না কোন স্থানে এর উল্লেখ থাকত। তাছাড়া যেসকল স্থানে 'আর্য' নাম লেখা হয়েছে তার কোন কোন স্থানে 'হিন্দু' নাম দেখা যেত। 'হিন্দু' নাম প্রামাণিক হলে তা থেকে অন্যত্র বচন উদ্ধৃত হ'ত। অনেক পরবর্তীকালে ভবিষ্য পুরাণ বা ঐ জাতীয় গ্রন্থে 'হিন্দু' নামের উল্লেখ আছে। যেমন-

ইংরেজা নব ষট্‌পঞ্চ লন্ড্রদেশ সমুদ্ভবাঃ

হিন্দুধর্ম প্রলুপ্তয়ে ভবন্তি চক্রবর্তিনঃ।

বা

হিমবদ্‌বিন্দুসরসোর্মধ্যো হিন্দু প্রকীর্তিত।

এ সকল শ্লোক 'হিন্দু' নাম প্রচারের পরে লেখা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে সিন্ধুনদের পূর্ব প্রদেশ সিন্ধুস্থান বা সিন্ধু প্রদেশ বলে বিদেশীরা নির্দেশ করতেন। সিন্ধু শব্দ পারস্য ভাষায় হিন্দু, গ্রীক ভাষায় ইন্দুস এবং এভাবে ল্যাটিন ভাষায় বিকৃত হয়ে ইন্ডিয়া হয়েছে। ইংরেজরা শেষোক্ত নাম ব্যবহার করেছেন। এভাবে ভারতবাসীরা বিদেশীদের দ্বারা সিন্ধুস্থানী, হিন্দুস্থানী এবং সংক্ষেপে হিন্দু নামে পরিচিত হয়েছেন। ঐতিহাসিকদের এমতে হিন্দু নামের মধ্যে কোন গ্লানি নেই।

কিন্তু ভাষাজ্ঞদের মতে এ নাম মহাগ্লানিজনক। পারস্য ভাষায় হিন্দু শব্দে কৃষ্ণবর্ণ বোঝায়।[১৭] আগে পারস্যবাসীরা আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আনতেন তারা কৃষ্ণবর্ণ বলে পারসীক্‌রা ক্রীতদাস বা দাস অর্থে হিন্দু শব্দ ব্যবহার করতেন। ভারত জয়ের পরে মুসলমানরা আর্যদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনার্থে তাদেরকে হিন্দু নামে অভিহিত করেন বলে মনে হয়।[১৮]হিন্দু শব্দের এরূপ উৎপত্তি গ্লানিসূচক হলেও 'গুডফ্রাইডে' নামের মত তা কালে কালে ভারতবাসীরা গ্রহণ করেন। যীশুখৃষ্টের মৃত্যুদিনকে ইহুদীরা 'গুডফ্রাইডে' বলেন, কারণ প্রাচীন ধর্মবিরোধী খৃষ্টের মৃত্যুদিন জগতের উৎপাতের অন্তর্ধানজনিত 'উত্তম শুক্রবার'।

---

[১৪] শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ১৩৬-১৪৭

[১৫] তুলনীয়, J.P. Thiroux, Philosophy, Theory & Practice, New York ১৯৮৮, p. ৪১৫

[১৬] দ্রষ্টব্য, Raymond Hammer, " The eternal teaching;Hinduism",The Worlds Religions, R. Pierce Beaver & Others(Eds), Lion Publishing, England,১৯৮৪, p. ১৭০.

[১৭] হিন্দু শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ তার প্রমাণ

(ক) হিন্দুকোশ, হিন্দুকোহ্ বা কৃষ্ণপর্বত

(খ) পারস্য কবি হাফেজ স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন- আগর আঁন্ তুর্কশিরাজী বদস্তুয়দ্ দিলে মারা। বখালে হিন্দোয়েম বক্‌ষম্ সমরকন্দো বোখারারা।।

অর্থাৎ সিরাজনগর নিবাসিনী সেই সুন্দরী যদি আমাকে ভালবাসে, তবে তার গন্ডস্থলের কৃষ্ণবর্ণ তিলের পরিবর্তে আমি তাকে সমরখন্দ ও বোখারা নগরদুটি দান করব। (দ্রষ্টব্য,গুরুনাথ সেনগুপ্ত,তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা,পৃ,১৩৮)

[১৮] i. Max Weber, The Religions of India, New York 1967, p.৪

ii. Raymond Hammer, "The eternal teaching : Hinduism" p. ১৭০.

তখন ইহুদী জাতি প্রবল, এ নাম সর্বত্র প্রচারিত হ'ল। খৃষ্টানরা দেখলেন যে, এ নাম ফিরাবার উপায় নাই। তাই তাঁরা অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে এ নাম গ্রহণ করলেন। তাঁরা বললেন ঐদিনে প্রভু জগতের পাপ গ্রহণ করে দেহ ত্যাগ করেন এজন্য তা উত্তম শুক্রবার। এরূপ কারণবশতঃই ভারতবাসীরা হিন্দু নামে পরিচয় দিতে বাধ্য হলেন কারণ এ নাম এত প্রচলিত ছিল যে তার আর অন্যথা করা গেলনা। এজন্য তাঁরা "হীনঞ্চ দুষয়ত্যেব হিন্দু রিত্যুচ্যতে প্রিয়।" "হিম্বদ্‌বিন্দুসরসোর্মধ্যো হিন্দু প্রকীর্তিতঃ" এবং সিন্ধুশব্দাপভ্রষ্টত্বাৎ ম্লেচ্ছৈ হিন্দু রুদীরিত। ইত্যাদি রচনা দ্বারা নিজেদের গৌরব রক্ষা করলেন।

হিন্দুধর্ম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। বেদ-বিহিত ধর্ম হিসেবে বৈদিকধর্ম, আর্যদের ধর্ম বলে আর্যধর্ম, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের কারণে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বিভিন্ন মতের সহাবস্থানের কারণে 'সনাতন ধর্ম'[১৯] প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। এভাবে অন্যান্য ধর্মের নাম সম্বন্ধেও এরূপ নানা কারণ দেখা যায়। কিন্তু সব ধর্মই এক মূল ধর্ম অবলম্বনে কাজ করে; যদিও দেশ কাল পাত্রভেদে নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে।

হিন্দুশাস্ত্র বললে শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব ও গাণপত্য এ পাঁচটি মতকে বোঝায়। কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেক বিষয় একের মত অন্যের বিপরীত এমনকি এঁদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরস্পর বিপরীত ধর্মী। যেমন শাক্ত মতে মদ, মাছ-মাংস না হলে উপাসনা হয়না, কিন্তু বৈষ্ণবমতে ঐ সবের স্পর্শেও ধর্মহানি হয়। কাজেই শাস্ত্রের দোহাই দেয়া বিফল, কেননা এর এক অংশে যা ভাল অন্য অংশে তাকেই খারাপ বলা হয়েছে। যদিও কতগুলি বিষয় সবাই মানেন কিন্তু একের উপাস্যকে অন্যরা তাদের উপাস্য থেকে নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেন। যেমন, শাক্তেরা বলেন-

তুচ্ছং যৎপদসেবিনাং হরিহরব্রহ্মত্বমস্যৈ নমঃ[২০]

অর্থাৎ- যে শক্তিদেবীর পদ-সেবকদের পক্ষে বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব ও পিতামহত্বও তুচ্ছ, সেই দেবীকে নমস্কার।

বৈষ্ণবেরা বলেন-

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রেজ্য মুনির্ভির্নারদাদিভিঃ।

দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গাভির্বৃষণ মৈড়য়ণ্।।শ্রীমদ্ভাগবতম্

অর্থাৎ- নারদাদি ঋষি ও অনুচরসহ দেবগণের সাথে ব্রহ্মা ও মহাদেব এসে বিষ্ণুর স্তব করেছিলেন।

আবার ঐ গ্রন্থে অন্যত্র আছে, বিষ্ণু দুর্গাকে বলছেন, তুমি আমার এ আদেশ পালন কর, তা হলে আমার প্রসাদে বিবিধ কামনা সমন্বিত পুরুষদের শ্রেষ্ঠা নিয়ন্ত্রী হবে এবং অর্চ্চকগণের সমুদায় অভিলষিত বরদান করবে, অতএব মানুষেরা বিভিন্ন উপহার ও বলিদ্বারা তোমার অর্চনা করবে।

অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্তাং সর্বকামবরেশ্বরীম্।

---

[১৯] দ্রষ্টব্য, Karon Singh, Religions of India, Clarion Books, Delhi, ১৯৮৩, p. ১৯.

[২০] দ্রষ্টব্য, স্তব কবচমালা, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৪

নানোপহার বলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্। [ভাগবত]

আচার্য গুরুনাথ মনে করেন যে, হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে যত শাস্ত্র আছে তার মধ্যে শ্রুতি ছাড়া অন্য কোনটাকে প্রামাণিক বললে অন্যগুলিতে দোষারোপ করা হয়। আর এজন্য ঐসব শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কোন প্রকৃত বিষয় ত্যাগ করা ঠিক না। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার, যাবতীয় শাস্ত্রই কোন না কোন প্রধান উদ্দেশ্যের জন্য রচিত হয়েছে। কিন্তু সেটি যে সকলের কর্তব্য- এমন বুঝতে হবেনা।

বৈষ্ণবেরা বলেন যে, "বিষ্ণু অসুর ধ্বংসের জন্য শিবকে তন্ত্র নামক মোহ-জনক শাস্ত্র রচনা করতে এবং সে অনুসারে অসুরগণ যাতে কাজ করে সেজন্য অনুরোধ করেছিলেন। শিব এভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান নাশক তন্ত্রশাস্ত্র রচনা করেন।" আবার অন্যদিকে তান্ত্রিকেরা বলেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম তান্ত্রিক ধর্মের মত জ্ঞান-দায়ক নয়।" ... এসব উক্তি প্রত্যুক্তি থেকে বোঝা যায় যে, পূর্বোক্ত পাঁচটি মতের কোন একটি মতকে অন্য মতাবলম্বীরা সত্য বলে মানেন না। তবে আজকাল মিশ্রাচারের সময়, এখন বোধশক্তির অনুমোদন পরিত্যাগ করে যে যা বলে ধার্মিকন্মন্যগণ তাকেই উৎকৃষ্ট বলে মনে করেন।

অন্যদিকে, আচার্য গুরুনাথ দেখিয়েছেন, দর্শন শাস্ত্রও প্রায় এরূপ। কেউ নিরীশ্বরবাদী, কেউ ঈশ্বরবাদী, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এ উভয়দর্শনই উৎকৃষ্ট বলে আদর পাচ্ছে। যে বেদশাস্ত্র সর্বোপরি সমাদৃত সে সম্বন্ধে বৃহস্পতি বলেন,

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীধর্ম স্ত্রিদন্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।

বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকোঽতি বৃহস্পতিঃ।।

অর্থাৎ- অগ্নিহোত্র, বেদবোধিত কর্ম, ত্রিদন্ড ও ভস্মগুণ্ঠন- এগুলি বুদ্ধিহীন ও পুরুষকারবিহীন মানবদিগের জীবিকা।

জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্র উৎপন্ন হয়েছে। আবার অন্য শাস্ত্রে আছে যে, প্রথমে একটি মাত্র জাতি ছিল, ঐ জাতি থেকে বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য কতগুলি করে লোক নিযুক্ত হয়। এভাবে কাজের ভেদের দ্বারা বর্ণভেদ বা জাতিভেদ হয়েছে।

স্ত্রী জাতির গৌরব সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক কথা আছে। কিন্তু এরা যে ধর্মের দিক থেকে অধম স্থানীয় তা-ও শাস্ত্রে আছে। যেমন, স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। অর্থাৎ- স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত দ্বিজ- এদেরকে বেদ শুনাবে না। অথচ উপনিষদে মৈত্রেয়ী ও গার্গীকে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

যে ব্যাকরণ শাস্ত্র সবশাস্ত্রের প্রারম্ভ বলে নির্দিষ্ট হতে পারে, তাতে স্বরের বিভাগ সম্বন্ধে কেউ বলেন অ,ই প্রভৃতি প্রত্যেকটি আঠারো প্রকার, কেউ বলেন তিন প্রকার, কেউ বলেন দুই প্রকার। অতএব, শাস্ত্রে যেরূপ আছে- সেরূপই যে সম্পূর্ণ সত্য, এরকম মোহে মুগ্ধ না হওয়াই তত্ত্বার্থীর কর্তব্য। কেননা শাস্ত্রকারেরা অনেক এবং তাঁরা না বলেছেন এমন রকম প্রায় দেখা যায় না। শাস্ত্র সম্বন্ধে আরও বলা যায় যে, সবাই সমান অধিকারী নয় বা সবাই একরূপ জ্ঞানসম্পন্ন নয়; কাজেই সকলে কোন একটি বাক্যের একরকম অর্থে সন্তুষ্ট হয়না।

এ আলোচনা শেষে আচার্য গুরুনাথ মন্তব্য করেন যে, শাস্ত্রের নাম শুনেই বিমোহিত না হওয়াই শ্রেয়।ব্যাখ্যাকারেরা ভুলবশতঃ অনেক জায়গায় শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন; এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এ ছাড়া আর একদল লোক শাস্ত্রের মধ্যে নিজেদের রচিত বচন প্রক্ষিপ্ত করে শাস্ত্রকে বিকৃত করে ফেলেছে। শাস্ত্র তন্ডুলে এত তুষের প্রক্ষেপ হয়েছে যে,এখন কোনটি প্রকৃত আর কোনটি প্রক্ষিপ্ত, তা নির্ণয় করা কঠিন। এজন্য যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হয় এই ঋষিবাক্য স্মরণ করে শাস্ত্রার্থ করতে হবে এবং যাঁরা নিস্পৃহ ও শাস্ত্রজ্ঞ সেরকম মহাত্মাদের নিকট থেকে যা জানা যাবে, তা-ই পরমশাস্ত্র; একথা মনে রাখতে হবে। দুঃখের কথা এই যে, শাস্ত্রের কথা দূরে থাক্ , কোন একটি সংস্কৃত বচন শুনলেই সাধারণ লোকে তাকে শাস্ত্র মনে করে; এ ভ্রান্তি হৃদয় থেকে দূর করতে হবে।

আচার্য গুরুনাথের এ মতের অনুকূলে আরও মত দেখা যায়। কুর্ম পুরাণে আছে-

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন বিবিধাণি চ।

স্মৃতি শ্রুতি বিরুদ্ধাণি তেষাং নিষ্ঠা তু তামসী।।

অর্থাৎ- এই লোকে বেদ-বিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে নানাবিধ শাস্ত্র দেখতে পাওয়া যায়, সে সমুদায়ের তামসী গতি। এসব শাস্ত্রানুসারে চললে অন্তে অধোগতি হয়।[২১]

হরিশ্চন্দ্র সান্যাল বলেন, “যে শাস্ত্রবাক্য যুক্তিযুক্ত, প্রত্যক্ষ ও সত্য এবং শ্রুতি ও স্মৃতির সাথে যার সামঞ্জস্য আছে, তা-ই প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র। এ ছাড়া যে সকল শাস্ত্র আছে, সেগুলো তামস বলে পরিগণিত।[২২] পরবর্তীকালে আধুনিক গবেষকগণও পূর্বমতের অনুকূলে প্রমাণ দিয়েছেন। বর্তমানে যেগুলোকে ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদা দেয়া হয়, তার মধ্যে বহু পরবর্তীকালের সংযোজন রয়েছে বলে মনে করা হয়। সুতরাং আসল গ্রন্থ কতটুকু তা জানা এক সমস্যা। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এরূপ পরবর্তীকালের যোজনা কিছু কিছু উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। হিন্দুধর্মের শাস্ত্র অনেক কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটেছে। যেমন, মূল মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা ৮৮০০ অথচ বর্তমানে এর শ্লোকসংখ্যা লক্ষাধিক।[২৩] এই অতিরিক্ত শ্লোকসংখ্যা পরবর্তীকালের সংযোজন, যেখানে ঘটনাগত ও তথ্যগত অসংগতি থাকা স্বাভাবিক। মূল বাল্মিকী রামায়ণ পঞ্চকান্ড[২৪] অথচ বর্তমানে রামায়ণ সপ্তকান্ড। রামকে পরমেশ্বরের আসনে বসাবার জন্য প্রথম ও শেষ কান্ডটি জুড়ে দেয়া হয়েছে।[২৫] এছাড়া রামায়ণের মূল অংশের মধ্যেও অনেক বিষয় অর্বাচীনকালের প্রক্ষিপ্ত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।[২৬]

প্রাচীনতম ঋক্‌গুলি যে ভাষায় প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল সেই ভাষায়ই যে সেগুলি বর্তমানে আছে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্য মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল।

---

[২১] দ্রষ্টব্য, হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, জ্ঞানদর্পন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃ: ৩১

[২২] ” ঐ, ঐ, পৃ: ৩০

[২৩] ” ধীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ: ২১, আরও দ্রষ্টব্য, পূরবী পাল, বেদ পরিক্রমা, হুগলী, ভারত, ১৯৮৭, পৃ: ১২

[২৪] দ্রষ্টব্য, ধীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪

[২৫] দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ৫। আরও দ্রষ্টব্য, বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, কলিকাতা, ১৯৬১, রামায়ণ অধ্যায়

[২৬] দ্রষ্টব্য, ধীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮-৪৯ (পাদটীকা ১৫ ও ২১ দ্রষ্টব্য)

যুগাবর্তনের সাথে ভাষার আবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছিল এবং ঋষি পুরোহিতদের অর্থবোধ সৌকর্যার্থে ঋক্‌গুলির ভাষারও পরিবর্তন হয়েছিল মনে করা খুবই যুক্তিযুক্ত। কারণ অর্থবোধ ব্যতীত বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপ ঠিকমত পরিচালনা করা পুরোহিতদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।[২৭] ভাষার পরিবর্তনের সাথে ভাবেরও কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে।

বেদ সংহিতার বহু জায়গায় পরবর্তী সময়ে অনেক কিছু জুড়ে দেয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন- বেদের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেখাবার জন্য মার্কণ্ডেয় পুরাণকে চণ্ডীর পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ঋক্‌বেদের সুন্দর কবিত্বময় রাত্রি সূক্তে (১০/১২৭) সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে দুর্গাদেবীর উদ্দেশ্যে একটি স্তুতি জুড়ে দেয়া হয়েছে। দুর্গা, কালী, এসব দেবীর নাম যাস্ক তাঁর নিরুক্তে উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং বোঝা যায় যে, এগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন। ঋক্‌বেদের পঞ্চম মন্ডলের শেষে একটি দীর্ঘ লক্ষ্মীদেবীর স্তুতি (শ্রী-সূক্তম্‌) যুক্ত করা হয়েছে, যার ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণ পৌরাণিক। এসব দেবীকে ঋগ্বেদীয় দেবীর মর্যাদা দেয়ার জন্য এগুলো করা হয়েছে। অনুরূপভাবে শিব, মহাদেব, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি ঋগ্বেদের দেবতা নন। এদের কারো কারো নাম অথর্ব বেদ বা সাম্প্রদায়িক উপনিষদে পাওয়া যায়। এঁরা পৌরাণিক বা তান্ত্রিক দেবতা।[২৮]

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন,

"বেদে নরকের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের পরবর্তীকালের গ্রন্থ পুরাণ রচয়িতাদের মনে হইল যে, নরকের কল্পনাকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তাই তাঁহারা নানারকম নরক কল্পনা করিয়াছেন। তবে দয়া করিয়া এই সকল গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, এই সব যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নহে।"[২৯]

এছাড়া পরবর্তীকালে যেসব ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলি ঋষি রচিত নয়। সেখানে ধর্মকে বা ধর্মতত্ত্বসমূহকে অনুমান দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে; মুনি ঋষিদের ধ্যানলব্ধ জ্ঞান সেখানে নাই। এসব গ্রন্থে নানা অসংগতি দেখা যায়। পৃথিবীতে আরো যেসব ধর্ম আছে, সেখানেও যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে নাই, তা বলা যায় না। ধর্মশাস্ত্র সংখ্যায় অনেক, তার সার উদ্ধার করা খুবই কঠিন। কোনটা আসল কোনটা নকল, তা বোঝাও কষ্টসাধ্য। এজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে- "শাস্ত্র অনন্ত, তা জানতে হলে বহুদিন দরকার, এদিকে জীবন অত্যল্পকাল স্থায়ী এবং এর মধ্যে বাঁধা। সুতরাং হাঁস যেমন জলমিশ্রিত দুধ থেকে সারাংশ দুধ গ্রহণ করে, তেমনি নানা শাস্ত্রের যা সার তা লাভে যত্ন নেয়াই ভাল।[৩০]

যাদের মাতৃভাষা বাংলা তাদের অধিকাংশের ধারণা বাংলা ভাষায় ধর্মকর্ম হয়না; এ ভাষা এত মহিমান্বিত নয় যে, ঈশ্বরের উপাসনা, নামাজ, মোনাযাত, পূজা বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এ ভাষায় হতে পারে। বাংলা ভাষা-ভাষী যাঁরা ধর্মকর্ম করেন, তাঁদের অধিকাংশের মূল ধর্মগ্রন্থ বাংলা ভাষায় নয়।

---

[২৭] দ্রষ্টব্য, পূরবী পাল, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২

[২৮] দ্রষ্টব্য, পূরবী পাল, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৬-১১৭

[২৯] স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দু ধর্ম, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ: ৬৯

[৩০] উত্তর গীতা, ৩খ ১ শ্লোক, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

যিনি যে ধর্ম অনুসারী, সে ধর্মগ্রন্থ যে ভাষায় রচিত , সে ভাষাকেই তিনি ধর্মীয় ভাষা বলে মনে করেন। বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় সংস্কৃতকে, মুসলমানগণ আরবীকে, বৌদ্ধ সম্প্রদায় পালি ভাষাকে, বাংলার খৃষ্টানগণ হিব্রু, আর্মেনিক বা ইংরেজীকে ধর্মীয় ভাষার মর্যাদা দেন। এরূপ অন্যদের বেলায়ও দেখা যায়। যদিও বর্তমানে সব ধর্মের ধর্মীয় বিষয়গুলির বাংলা তর্জমা করা হচ্ছে কিন্তু বাংলাকে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছেনা।

কিন্তু আচার্য গুরুনাথ প্রকাশিত সত্যধর্ম বাংলা ভাষায় প্রত্যাদিষ্ট একটি ধর্ম। এ ধর্ম পারলৌকিক মহাত্মাদের নিকট থেকে তিনি বাংলা ভাষায় লাভ করেছিলেন। এ ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বাংলা ভাষাভাষীরা বাংলা ভাষায় করেন। অন্যান্য ভাষাভাষীরা তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় করতে পারেন। ধর্মের ক্ষেত্রে ভাষার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। মূলতঃ প্রচারক বা প্রকাশকগণ যে ভাষায় কথা বলেন, ধর্মীয় বিষয়গুলি সে ভাষায় অর্থাৎ তাঁর ভাষাতেই এসেছে।

উদাহারণস্বরূপ, আমরা আল-কোরানের কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছি।

“আমি সমস্ত রসুলকে তাঁহার জাতির ভাষাতেই ওহী পাঠাইয়াছি যেন সে সহজভাবে তাহাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে পারে।” (১৪:৪)

“আমি উহাকে আরবী কোরানরূপে নাজেল করিয়াছি যে তোমরা সহজে বুঝিতে পার।” (১২:২)

“আমি ইহাকে (কোরানকে) তোমার নিজের ভাষায় বুঝিবার জন্য সহজ করিয়াছি, যাহাতে তুমি তাহা দ্বারা ধার্মিকগণকে সুসংবাদ দিতে পার।” (১৯:৯৭)

“আমি তোমার নিকট আরবী কোরান পাঠাইয়াছি এই হেতু যে, তুমি সতর্ক করিবে মক্কা ও উহার আশেপাশে যাঁহারা বাস করে তাহাদিগকে ...”(৪২:৭, ৬:৯৩)

“আর আমি এই কোরানকে তোমার ভাষায় সহজ করিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছি যে, ইহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে।”(৪৪:৫৮) ইত্যাদি।

তবে ভাষা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথ বলেন যে,

“সমস্ত মণ্ডলের নিখিল জীবের নিখিল ভাষা একই মহতী ভাষা হইতে উৎপন্ন,...যে জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে তৎসমস্তই উক্ত জাতীয় পদার্থ হইতে উৎপন্ন। কেননা, ভূত সকল মূলভূত আকাশ হইতে এবং মণ্ডলসমূহ সূর্যমণ্ডল হইতে উৎপন্ন, ইত্যাদি। অতএব সমস্ত ভাষাও যে কোন একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সর্বমণ্ডলের সর্বমনুষ্যের সমস্ত জীবজন্তুর যে সাধারণ ভাষা, তাহাই ঐ মূল ভাষা। এই সার্বভৌম সার্বজীবিক ভাষাকে বৈজিক ভাষা কহে। যেমন বীজ হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বীজভূত ভাষা হইতে নিখিল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই উহার ঐ নাম হইয়াছে। বৈজিক ভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত জীবের সমস্ত ভাষা জ্ঞাত হওয়া যায়। ... বৈজিক ভাষায় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মাকে বহুগুণে উন্নত করিতে হয়...”[৩১]

---

[৩১] শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম : গুণ প্রকরণ, পৃ: ১২৭

"প্রচলিত পার্থিব ভাষা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার মধ্যে কোন একটি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না। কেননা উহাদিগের মধ্যে কোনটাই সম্পূর্ণ নহে। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, আরবী, পার্শী, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় উচ্চার্যমান বর্ণাবলীরই যখন অভাব আছে, তখন ঐ সকল ভাষা উচ্চারণ দ্বারা উল্লিখিত মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তবে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে যে ভাষার যে অংশ পূর্ণভাষা বৈজিক ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহাতেই উল্লিখিত অভিপ্রায় অধিক পরিমাণে সিদ্ধ হয়। কিন্তু বৈজিক ভাষা উচ্চারণে যেরূপ সম্পূর্ণ হয় অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হয়না। কেননা বৈজিক ভাষাই পূর্ণ ভাষা, বৈজিক ভাষাই নিখিল ভাষার মাতা ও পিতা, বৈজিক ভাষাই সমস্ত ভাষার উৎকর্ষ বিধানের মূল এবং বৈজিক ভাষাই সার্বভৌম সার্বজীবিক ভাষা।"[৩২]

[৩২] ঐ, ঐ, পৃ: ১২৫।

তৃতীয় অধ্যায়

আচার্য গুরুনাথের ঈশ্বরতত্ত্ব

(১)

ঈশ্বরতত্ত্ব : অস্তিত্ব

আচার্য গুরুনাথ তাঁর প্রচারিত সত্যধর্মে উপাসনার কর্তব্যতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।তাঁর মতে, চিন্ময়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, অশরীরি বিভুর উপাসনা করা কর্তব্য ।[১] উপাসনার কর্তব্যতার সাথে একটি প্রশ্ন এসে পড়ে যে, যাঁর উপাসনা করতে হবে তিনি যে আছেন তাঁর প্রমাণ কি, থাকলে তাঁর স্বরূপ কি অর্থাৎ তিনি কেমন? এসব প্রশ্নের আলোকে আচার্য গুরুনাথ যে আলোচনা করেছেন আমরা পর্যায়ক্রমে তা তুলে ধরার চেষ্টা করব। উপাস্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের সাথে আরও কয়েকটি বিষয় জড়িত। যেমন- ঈশ্বর থাকলে তিনি এক না বহু, সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুণ, সর্বোপরি তিনি কেমন অর্থাৎ তাঁর স্বরূপ কি? এ বিষয়গুলি ঈশ্বর সম্পর্কিত অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বিবেচনা করে আচার্য গুরুনাথ ক্রমে ক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে প্রথমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে এবং পরবর্তীতে তাঁর স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, দৃশ্যমান জগতে এরকম মানুষের সংখ্যা খুবই কম, যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন নাই, তাঁরাও এরূপ বলতে পারেন না, বা বলার কারণ লাভ করেন না যে, 'ঈশ্বর নাই'। সুতরাং যে যেদেশে, যে কালে বাস করুক অথবা যেকোনও অবস্থায় পড়ুক না কেন, জগতের প্রায় সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন ;এজন্য এবিষয়ের উল্লেখ না করলেও চলত।

কিন্তু মানুষের অনুচিকির্ষাবৃত্তির কারণে নিরীশ্বরবাদীদের দ্বারা অনেকেই চঞ্চলচিত্ত এবং কিছু নিরীশ্বরবাদী দর্শনও আছে। আর এ জন্য ঈশ্বরবাদী দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। গুরুনাথ সে সব প্রমাণ কিছু উল্লেখ করেছেন (কিছুটা সংস্কার করে) এবং নিজে সম্পূর্ণ নতুন কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি এরকম নয়টি প্রমাণ ও ধর্ম শাস্ত্র থেকে পাঁচটি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন । তিনি আরও বলেছেন, ঈশ্বর যেমন অনন্ত তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণও অনন্ত।

---

[১] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ৫৬-৫৮।

প্রথমত: ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ:

প্রথম প্রমাণ : কার্যমাত্রই সকর্তৃক।[২] জগতে যা কিছু দেখা যায়, অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, সকলেরই এক-এক জন কর্তা আছে। বাস্তবে এরকম চিন্তা বা ভাবনা হয় না যে, এ সকল আপনিই হয়েছে। ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি একটি কার্য সুতরাং এরও কর্তা আছে। তিনিই ঈশ্বর। এ বিষয়ে আচার্য গুরুনাথ উল্লেখ করেছেন যে, বেদে দেখা যায়, জনৈক ঋষি নভোমন্ডলের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেখে চিন্তা করছেন যে, "মি মিয়ং সৃষ্টিরকর্তৃকা? নৈতৎ সম্ভবতি।" অর্থাৎ এই সৃষ্টি কি অকর্ত্তৃকা ? কখনও ইহা সম্ভবপর নহে অর্থাৎ এই সৃষ্টির অবশ্যই একজন কর্তা আছেন। এই সময় থেকেই মানব হৃদয়ে প্রথম ঈশ্বরজ্ঞান প্রবেশ করল, বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রমাণ : জ্যোতিষ তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, শারিরীক বিষয় প্রভৃতি যে-কোন বিষয় অনুশীলন করার সময় দেখা যায় যে, মানুষ যথাশক্তি কারণ দেখাতে দেখাতে অবশেষে আর কারণ দেখাতে পারেনা। তখন সে শেষ কারণ কোন পরমাশক্তি বা অনন্তশক্তি সম্পন্ন কোন অজ্ঞেয় মহত্ত্বমকে মনে করতে বাধ্য হয়। এই পরমাশক্তি বা অনন্তশক্তিই ঈশ্বর[৩]।এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ বলেন, সকালে দুর্বাদলের উপরে মুক্তার মত শিশির বিন্দু দেখে চিন্তা হ'ল, শিশির কণাগুলো গোল হ'ল কেন? এর উত্তরে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলবেন, সংহতি প্রভাবে (Co-hesion) এরূপ হয়েছে। আবার প্রশ্ন হ'ল সংহতি কেন হ'ল, কিভাবে হ'ল, কে দিল ইত্যাদি রূপ চিন্তা করতে করতে অবশেষে অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমানকেই শেষ কারণ বলে নির্দেশ করতে হয় নতুবা আর উপায় থাকেনা। যদি মনে করা হয় যে, স্বয়ং ঐরূপ শক্তিযুক্ত হয়েছে; তাহলে এ কথা অযৌক্তিক ও অশ্রদ্ধেয়। কেননা মূলশক্তি স্বীকার না করলে সব পদার্থেই অপূর্বশক্তি স্বীকার করতে হয়। আর সর্বত্র সবিশেষ শক্তি স্বীকার করলে কেউ ছোট কেউ বড় হবে কেন? সকলেই ব্যাস বশিষ্ঠ গোতম কণাদের মত বড় হবে না কেন? সকলেই ব্যাস বশিষ্ঠ গোতম কণাদের মত বা ধ্রুব শুক প্রহলাদ প্রভৃতির মত হতে পারতো। তাছাড়া বিচারের প্রণালীর উৎকৃষ্ট নিয়ম হ'ল, বহু কল্পনার চেয়ে অল্প কল্পনা শ্রেয়। যদি প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ শক্তি- স্ব স্ব প্রকৃতি বলে কল্পনা করা হয়, তাহলে বহু কল্পনা হবে। আর সর্বত্র ঈশ্বরেচ্ছাশক্তি স্বীকার করলে বহু কল্পনার হাত থেকে মুক্তি (পরিত্রাণ) পাওয়া যায় এবং নিজের হৃদয়ের নিকটেও অনুকূলবাদিতাবশতঃ শান্তি পাওয়া যায়। অতএব, যে কোন বিষয়ের যত কারণই নির্দিষ্ট হোক না কেন, অবশেষে কোন মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিকে মূল কারণ বলতে হয়। এই শক্তিই ঈশ্বর। এজন্য তন্ত্র ও শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে, তিনি কারণসমূহের কারণ। কারণং কারণানাম।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রমাণ : কোন বিষয় নিরূপণ করতে গেলে প্রমাণ দেয়া প্রয়োজন। এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্তবাক্য বা শব্দভেদে চার প্রকার। ন্যায়দর্শন এ চার প্রমাণ স্বীকার করে, সাংখ্যেরা, জৈনরা ও রামানুজ উপমান ভিন্ন অন্য তিনটা স্বীকার করেন। বৈশেষিক দর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ স্বীকার করেন আর চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।শংকরাচার্যের মতে প্রমাণ তিন প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম(শব্দ)। পরবর্তী অদ্বৈতবেদান্তিরা উপমান, অর্থাপত্তি ও

[২] দর্শনে এটি কার্যকরণ যুক্তি বা বিশ্ব তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি নামে পরিচিত। ভারতীয় দর্শনে ও পাশ্চাত্য দর্শনে এ যুক্তি দেয়া হয়েছে।
[৩] এ যুক্তিটিও দর্শন শাস্ত্রে আছে। তবে গুরুনাথের এ যুক্তিটি নামে এক হলেও যুক্তি যোজনা ভিন্নতর। যুক্তিটি পাশ্চাত্য দর্শনে এ্যারিস্টিটলের দর্শনে দেখা যায় তবে তার বহু আগে তন্ত্র ও শ্রুতিতে এ যুক্তিটি রয়েছে।

অনুপলব্ধিকেও প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন। মীমাংসা দর্শনে প্রভাকর সম্প্রদায় অনুপলব্ধি ব্যতীত অন্য পাঁচটা স্বীকার করেন এবং ভাট্ট সম্প্রদায় অদ্বৈতবেদান্তিদের মত ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন। আচার্য গুরুনাথ ন্যায় দর্শনের মতানুসারে চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেছেন কেননা বাৎস্যায়ন একে শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র বলেছেন। যথা-(সেয় মান্বীক্ষিকী)--

প্রদীপ সর্ব বিদ্যানা, মুপায় সর্বকর্মনাম্ ।

আশ্রয় সর্ব ধর্মানাং বিদ্যোদ্দেশে গরীয়সী।।

অর্থাৎ, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা (ন্যায়দর্শন) সমস্ত বিদ্যার প্রদীপ, যাবতীয় কর্মের উপায় এবং নিখিল ধর্মের আশ্রয়; ইহা বিদ্যার গণনায় শ্রেষ্ঠতর। এছাড়া ন্যায়দর্শনের প্রশংসা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে দেখা যায়। বেদব্যাসও এর প্রশংসা করে বলেছেন যে, তিনি আন্বীক্ষিকী দর্শন অবলম্বন করে উপনিষদের সার উদ্ধার করেছেন। অতএব এরূপ প্রশংসনীয় এবং দ্বৈপায়নাদি তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণের পরম অবলম্বনস্বরূপ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিচার বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে গুরুনাথ এর প্রমাণসমূহ স্বীকার করেছেন।আচার্য গুরুনাথ প্রথমে এই প্রমাণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।পরে এদের দ্বারা কিভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় তা দেখিয়েছেন।আমরা পর্যায়ক্রমে তার উল্লেখ করছি।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ : (ক) বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট/সম্বন্ধ হলে বিষয়ের যে যথার্থ অনুভব হয়, তার করণ বলে বিষয় সন্নিকৃষ্ট/সম্বন্ধযুক্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(খ) যে প্রমাণের দ্বারা একটি জানা কিংবা দেখা বিষয়ের পিছনে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্পর্কিত অন্য একটি অজানা কিংবা অদেখা বিষয়ের অবস্থিতি নির্ধারণ করা হয় তার নাম অনুমান। পাহাড়ে ধূয়া দেখে অনুমিত হয় যে, সেখানে আগুন আছে। পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানা গেছে যে, যেখানে ধূয়া আছে সেখানে আগুন আছে (যেমন- পাকস্থান)। কিন্তু আগুন থাকলেই ধূয়া থাকবে এমন নয়। যেমন-উত্তপ্ত লোহায় আগুন আছে কিন্তু ধূয়া নাই। অতএব, ধূয়া দেখে আগুনের অনুমিতি হয় কিন্তু আগুন দেখে ধূয়ার অনুমিতি হয় না। ধূয়ায় আগুনের ব্যাপ্তি আছে এরূপ ব্যপ্তিজ্ঞান অনুমান। এবং তার দ্বারা যে অন্য বস্তুর জ্ঞান জন্মে ঐ জ্ঞান অনুমিতি। যার অনুমিতি, তা হেতু। এখানে ধূয়া হেতু। আগুনের অভাব জল জাতীয় জিনিষে আছে, সেখানে ধূয়াও থাকে না। সুতরাং ধূয়ায় আগুনের ব্যাপ্তি আছে। অতএব, ধূয়া আগুন-ব্যাপ্য। একারণে আগুন ব্যাপক ধূয়া ব্যাপ্য।

অনুমান তিন প্রকার- পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ দ্বারা কার্যের অনুমান পূর্ববৎ, কার্য দেখে কারণের অনুমান শেষবৎ এবং অন্যসব সামান্যতোদৃষ্ট। প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্য দ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন বা প্রজ্ঞাপনকে উপমান বলে। সাংখ্যেরা এই উপমানকে অনুমানের অন্তর্গত বিবেচনা করেন।

আপ্তোপদেশের নাম শব্দ প্রমাণ। যিনি শব্দ প্রতিপাদ্য অর্থ বিষয়ে অভ্রান্ত, যাঁর প্রতারণা বা ঐরূপ মন্দ অভিসন্ধি নাই, যথার্থ বিষয় অন্যকে জানানো যাঁর উদ্দেশ্য, তিনিই সে বিষয়ে আপ্ত এবং তাঁর উপদেশই আপ্ত বা শব্দ প্রমাণ। এ পর্যন্ত আচার্য গুরুনাথ চারটি প্রমাণ কিরূপ তার বিবরণ দিয়েছেন এবং কোনটি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত প্রত্যক্ষ : প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার- চাক্ষুষ, ঘ্রাণ, রাসন, শ্রাবণ, ত্বাচ ও মানস। কিন্তু জীবাত্মা যখন পরমাত্মার দর্শন লাভ করে তখন এ ছয় প্রকারের অতিরিক্ত আর এক প্রকার প্রত্যেক্ষের মত জ্ঞান হয়। এই শেষোক্ত প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান ব্যাপক এবং প্রথমোক্ত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ ব্যাপ্য। উল্লিখিত প্রত্যক্ষের পরে যখন জীবাত্মার ঐভাব মনে সঞ্চারিত হয় তখন বোধ হয় যে, পরমাত্মা সাক্ষাৎকার সময়ে তাঁকে দেখেছি, তাঁর মধুময় বচন শুনেছি ইত্যাদি। এর কারণ ব্যাপক প্রত্যক্ষে পূর্বোক্ত ব্যাপ্য ছয় প্রকার প্রত্যক্ষই অন্তর্গত থাকে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন উহা মানস প্রত্যক্ষ। কিন্তু বাস্তবে তা নয় কেননা তখন ইন্দ্রিয়সমূহ মনে লয় হয় ও মন জীবাত্মায় লয় হয়। শ্রুতিতেও আছে যে, মন: পরমাত্মাকে জানতে পারেনা। যথা-

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।

তদেব ব্রহ্ম তদ্বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।

অবাঙ মনস- গোচরম্.....।[৪]

মহাত্মা রামমোহন রায়ও তাঁর সঙ্গীতে লিখেছেন-

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে

সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয় বিষয় নয়... ইত্যাদি।[৫]

অতএব, চলিত ভাষায় বা ন্যায়াদি দর্শনে যাকে প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার সময়ে তার অতিরিক্ত অন্য এক প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় যা ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের সমষ্টির মত। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈশ্বর দর্শন সম্ভাব্য হলে সকলে কেন তার দর্শন লাভ করতে পারেনা? এর উত্তরে আচার্য গুরুনাথ বলেছেন, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, কালিদাস, ভবভূতি, নিউটন, সেক্সপিয়র, মিল্টন প্রভৃতি যা করতে পেরেছিলেন বা যা লাভ করেছিলেন, বহুবর্ষ পরিশ্রমকারী অন্য সকলে কেন সেরূপ করতে বা লাভ করতে পারেন না? এরূপ বিষয়ে যেরূপ কারণ পূর্বোক্ত বিষয়েও প্রায় একইরূপ কারণ। সকলে দেখতে পায় না বলেই যে ঈশ্বর নাই এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য নয়[৬]।

অনেকেই হিমালয় দেখে নাই, অনেকেই আফ্রিকা বা আমেরিকা দেখে নাই সেজন্য কি হিমালয়, আফ্রিকা বা আমেরিকার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা যাবে না? অনেকে দেখে নাই কিন্তু অনেকে দেখেছে; যারা দেখে নাই তারাও ইচ্ছা করলে দেখতে পারে। এজন্যই আমেরিকা, আফ্রিকা বা হিমালয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ অবস্থা দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে এর একটি প্রস্তাব অবলম্বন করে আচার্য গুরুনাথ উত্তর দিয়েছেন। যারা আমেরিকা দেখে নাই বা দেখতে পাচ্ছে না তার কারণ অবশ্যই

[৪] কেনোপনিষদ ৬

[৫] রাজা রামমোহন, উদ্ধৃত : গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ৭১।

[৬] এতে Fallacy ad ignorantium ঘটে। দ্রষ্টব্য, I,M, Copi, *Introduction to Logic*, ৫th Ed. Macmillan Publishing Co. New York, ১৯৭৮, p.৯১

অর্থের অভাব, বলবতী বাসনার অভাব, সমাজের বাঁধা, রাষ্ট্রের বাঁধা প্রভৃতি। এগুলোই আমেরিকা দেখার জন্য ব্যাঘাত-কর। সেরকম ভক্তি প্রেমাদি গুণের অভাব, পাশের বাঁধা, ঈশ্বর দর্শনের জন্য বলবতী বাসনার অভাব, প্রভৃতি ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাঘাত-কর। এ গুণাবলী লাভ করলে, পাশের বাঁধা দূর করলে, বলবতী বাসনা জন্মিলে এবং সেরূপভাবে কাজ করলে অবশ্যই ঈশ্বর দর্শন হবে। যদি আমেরিকা না দেখে তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যায়, তবে ঈশ্বরের দেখা না পেয়েও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যাবে। যেমন কিছু লোক আমেরিকা দেখেছে বলে আমেরিকার অস্তিত্বে বিশ্বাস হচ্ছে, সে রকম ঐরূপ দর্শনকারীর চেয়ে সব বিষয়ে উন্নত শত শত মহাত্মা ঈশ্বর দর্শন করেছেন বলে ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করা যাবে। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুসারে প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বর আছেন।

দ্বিতীয়ত অনুমান: অনুমান পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এ তিন প্রকার। পূর্ববৎ অর্থাৎ কারণবৎঅর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্যের অনুমান, শেষবৎ অর্থাৎ কার্যবৎ অর্থাৎ কার্য দেখে কারণের অনুমান। কারণ দেখে কার্যের অনুমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খাটে না। কেননা ঈশ্বর কার্য নন তিনি পরম কারণ। এরপর কার্যদর্শনে কারণের অনুমান। প্রস্তাবিত বিষয়ে এটি অবলম্বন করা যায়। এর একাংশ প্রথম প্রমাণে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব অনুমান দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়।

কারণ ছাড়া কার্য হয়না।বিশ্বজগৎ একটি কার্য, সুতরাংএর দ্বারা তার মূল কারণের অনুমান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে যে, অভাবকে ভাবের কারণ বলা যেতে পারে। যেহেতু বীজ থেকে যে অঙ্কুর জন্মে সেখানে ভাব-বীজ অঙ্কুর কার্যের কারণ নয়। বরং ভূমির উষ্ণতা ও জলাদিযুক্ত হয়ে বীজের ধ্বংস হ'লে ঐ বীজের অভাবই ভাব-অঙ্কুরের উৎপত্তির কারণ। বৌদ্ধাচার্যগণ এ প্রকার মত দেন।

সাংখ্যাচার্যেরা এমতকে ভুল বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন বীজের ধ্বংসের পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় বটে কিন্তু বীজের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়না; বীজ বিনষ্ট হয় বটে কিন্তু বিনষ্ট বীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না। ঐ (ভাব-ভূত) বীজের অবয়ব থেকেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। অতএব বীজের অভাব অঙ্কুর উৎপত্তির কারণ নয়। আচার্য গুরুনাথ সাংখ্যদের এ মতের সাথে একমত হননি। তাঁর মতে বীজের ধ্বংস হয়না, বিকারমাত্র হয়। সেই (ভাব-ভূত) বিকার অবস্থা থেকেই ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয়।

ঐতরেয় উপনিষদে আছে-

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ

স ঈক্ষত লোকান্নুসৃজাইতিঃ।[৭]

অর্থাৎ- সৃষ্টির পূর্বে এ দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিলনা। সেই আত্মা এরূপ চিন্তা করলেন- আমি লোকসকল সৃষ্টি করব।

অতএব বৌদ্ধেরা বীজের অঙ্কুরের দৃষ্টান্ত দেখায়ে সবক্ষেত্রে অভাবকে যে ভাবের উৎপত্তির কারণ বলে সিদ্ধান্ত করেন, এদ্বারা তার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা যায়।

[৭] ঐতরেয় উপনিষদ ১

চার্বাক মতে কার্যের কোন কারণ নাই- তা আপনিই উৎপন্ন হয়ে থাকে। কার্য সকারণ হ'লে যে সময়ে কারণসমূহের উপযুক্ত মিলন হয় তখন কার্যের উৎপত্তি হতে পারে। আর কার্য কারণ ছাড়া হলে তাতে কারও অপেক্ষা থাকেনা, কার্য সকল সময়ই হতে পারে বা কোন সময়েই হতে পারেনা। কিন্তু কার্য সকল সময় হয় না, কখনও কখনও হয়। এজন্য তার কারণ স্বীকার করতে হয়- এভাবে চার্বাকদের এ কথা আচার্য গুরুনাথ যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন নি। আবার, অভাবকে ভাবের উৎপত্তির কারণ স্বীকার করলে সবখানেই যেহেতু অভাব আছে এজন্য সবখানেই সবরকম ভাব পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ আমবীজ থেকে কাঁঠাল এবং কাঁঠাল বীজ থেকে আম হতে পারে। যখন আমবীজ থেকে আম গাছ এবং কাঁঠাল বীজ থেকে কাঁঠাল গাছ হয় তখন অভাবকে ভাবের উৎপত্তির কারণ বলা যায়না। অতএব বলা যায় অভাব থেকে ভাব উৎপন্ন হয় না বরং ভাব পদার্থ থেকেই ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয়। "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ।"[৮] অতএব জগদ্রূপ কার্য দেখে এর যে কারণ অনুমান করা যায় তাও ভাব পদার্থ। অতএব এ প্রমাণ অনুসারেও স্থির করা যায় যে, ঈশ্বর আছেন।

তৃতীয়ত : ঈশ্বর তুল্য পদার্থ নাই, এ জন্য উপমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয় করা দু:সাধ্য। অনুমানের অন্যান্য অংশের সাথে উপমান প্রমাণের যোগে তা নির্ণয় করা যায়, কিন্তু সে প্রমাণ খুব জটিল।

চতুর্থত : আপ্তবাক্য বা শব্দ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অংশে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে জানা গেছে, আপ্তবচন প্রমাণ স্বীকার না করলে চলে না। আবার মহাত্মারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সবসময় অনুভব করেন। অতএব আপ্তবচন প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়। কোন কানাডাবাসী কোন ভারতবাসীকে বললেন যে, তাদের দেশে এরূপ পাঁচটি হ্রদ আছে যে, প্রথম হ্রদ থেকে একটি নদী দ্বিতীয় হ্রদে, দ্বিতীয় হ্রদ থেকে একটি নদী তৃতীয় হ্রদে, তৃতীয় হ্রদ থেকে একটি নদী চতুর্থ হ্রদে,চতুর্থ হ্রদ থেকে একটি নদী পঞ্চম হ্রদে এবং পঞ্চম হ্রদ থেকে একটি নদী মহাসাগরে পড়েছে। এ কথা শুনে ভারতবাসী বিশ্বাস করতেও পারে, নাও করতে পারে কারণ বক্তা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী তা সে জানেনা; আর এরূপ হ্রদ-নদ সংস্থান এদেশে নাই। কাবুল, চীন, ইরান থেকে যাঁরা এদেশে এসেছেন তাঁরাও এরূপ দেখেন নাই। কিন্তু একজন প্রসিদ্ধ লেখকের বইয়ে এ বিষয় পাঠ করলে এবং আর কিছুদিন যেতে না যেতে আরও অনেকের লেখায় ঐ বিষয়টি দেখা গেলে স্বীকার করা যায় যে, ঐরূপ হ্রদ-নদ-সংস্থান আছে। কেননা যাদের বইয়ে ওটা দেখা গেছে তাঁরা সকলেই সৎস্বভাব, পৃথিবীর প্রধান প্রধান স্থানসমূহের প্রত্যক্ষকারী, এঁরা কখনও মিথ্যা কথা লেখেন না। যাঁরা সবসময় ঐ হ্রদ দেখছেন তাঁরা ঐ লেখকদের লেখাকে ভুল বলছেন না। এ সকল বিবেচনা করে বোঝা যায় যে, ঐ লেখকগণ ঐ বিষয়ে আপ্ত এবং তাঁদের বাক্য আপ্ত বাক্য। এ আপ্তবাক্য স্বীকার না করলে জগতের অনুমাত্র উন্নতি হতে পারে না। আপ্তবাক্য স্বীকার না করলে পশুতে ও মানুষে কোন ভেদ থাকতো না। অতএব আপ্তবাক্য সর্বদা স্বীকার্য। যদি আপ্তবাক্য প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত হয়, তবে যে সকল মহাত্মারা ঈশ্বর দর্শন করেছেন তাঁদের বাক্য অনুসারে স্বীকার করতে হয় যে, ঈশ্বর আছেন।

আপ্তবাক্য সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথ আরও কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধ, তিনি সে বিষয়ে যা বলে গেছেন, তাও একটি প্রমাণ। এ প্রমাণকে আপ্তবচন বা শব্দ প্রমাণ বলে। এ প্রমাণ কেউ স্বীকার করেন, আবার কেউ স্বীকার করেননা। কণাদের দর্শনেও এ প্রমাণের উল্লেখ নাই। কিন্তু যিনি এ

[৮] শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ২/১৬

প্রমাণ স্বীকার করেননা তিনি কিভাবে ভূগোল, ইতিহাস বা অন্যান্য শাস্ত্রকে সত্য বলবেন! আমেরিকায় যে আন্দিজ পর্বত আছে, সুইজারল্যান্ডে যে আশ্চর্য জলপ্রপাত আছে কিংবা আফ্রিকা বা আমেরিকা নামে যে একটি মহাদেশ আছে এটাও আমাদের অস্বীকার করতে হয় কেননা এসব বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষ নয় বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের বিষয়ও নয় কিংবা উপমান দ্বারাও ঐগুলি জানা যায়না। অতএব শব্দ প্রমাণ মানতে হয়।

তবে আপত্তি হতে পারে যে, মানুষ মাত্রেরই যখন ভুল আছে তখন কিভাবে কারো কথায় বিশ্বাস করা যাবে? এর উত্তরে তিনি বলছেন, ভুল থাকলেই সব বিষয়ে ভুল থাকে না। কোন একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উনি সব বিষয়ে অভ্রান্ত নন, এটা সত্য। কিন্তু উনি যে বর্ণ পরিচয়ের ১ম ভাগ বা ২য় ভাগ পাঠদান করছেন, এ বিষয়ে তাকে অভ্রান্ত বলায় কোন দোষ নাই। সুতরাং যিনি যে বিষয়ে বহু পরিশ্রম করে জ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি অন্য বিষয়ে ভ্রান্তিযুক্ত হলেও ঐ বিষয়ে তাকে অভ্রান্ত বিবেচনা করায় কোন দোষ নাই এবং এটাই সব দেশে সব জাতির ব্যবহার। সকলেই বিজ্ঞান বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করেন না, যাঁরা আলোচনা করে ঐ বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করেছেন, ঐ বিষয়ে তাদের বাক্য শ্রদ্ধেয়। যদি তা না হ'ত তবে আজ পৃথিবীতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে এরূপ উন্নতি, আজ যে বিজ্ঞান শাস্ত্র চর্চ্চার প্রভাবে যেসব অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হচ্ছে, আজ যে স্থলচর মানুষ জলে বা আকাশে ভ্রমণ করছে, আজ যে বহুদূরের সংবাদ মূহুর্তের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, আজ যে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছে, এর কিছুই হ'তোনা। শব্দ প্রমাণ না মানলে প্রাচীনকালে মানুষ যেমন ছিল আজও তেমনই থাকতো, কোন উন্নতি হতোনা।

মানুষ যে অন্যান্য প্রাণী থেকে এত উন্নত ও দিন দিন এত উন্নত হচ্ছে, আপ্তবচন স্বীকার তার মূল কারণ। পশুদের এমন শক্তি নাই যে এক পশুর উপার্জিত জ্ঞান তার সন্তানেরা বা নিকটবর্ত্তীয়েরা লাভ করে। এ কারণে বলা যায় আপ্তবচন স্বীকারে মানুষের উন্নতি এবং এর অভাবে পশু প্রভৃতির একভাবে অবস্থান ঘটছে। অতএব আপ্তবচন স্বীকার কর্তব্য। এর বিরুদ্ধে আপত্তি হতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে আপ্তবচন স্বীকার করলেও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে সে প্রমাণ স্বীকার করা চলেনা। কেননা মুক্তি প্রভৃতি যখন ইন্দ্রিয়গোচর হয়না তখন কিভাবে সে বিষয়ে শব্দ প্রমাণ স্বীকার করা যাবে। অবশ্য যদি ঈশ্বর কথিত কোনও শব্দ পাওয়া যায় তবে ঈশ্বরের অভ্রান্ততার জন্য তা অভ্রান্ত মানা যেতে পারে। বেদাদিকে অনেকেই ঈশ্বরের উক্তি বলে স্বীকার করেন না। যদিও হিন্দু, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মে ঈশ্বরের উক্তি হিসাবে শাস্ত্রকে সম্মান করা হয় কিন্তু অনেকেই তা ঈশ্বরের উক্তি বলে মানেন না কেননা ঈশ্বর যে মানুষের মত কিছু কথা বলে গেছেন এবং তার উপাসক সেগুলি লিখে রেখেছেন- এগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে আচার্য গুরুনাথ বলছেন যে, বিজ্ঞান সত্যপথের পরিচালক হলেও তার পরিচালনা শক্তি খুবই সামান্য। বিজ্ঞানে যে সব প্রমাণ দেয়া হয় তার চেয়েও একটি প্রধান প্রমাণ আছে। অনেকেই দেখেছেন মহাপুরুষরা বহু দূরস্থ ব্যক্তি বা বস্তুর বিষয় বলে দিতে পারেন। এদেশে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আজকাল পৃথিবীর অন্যান্য দেশে (আমেরিকা, ইউরোপ) এরূপ লোক আছেন। এ সকল বিষয় প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, অনুমানের বিষয় নয় বা অন্য কোন প্রমাণের বিষয় নয়- এটা নিশ্চিত। তাহলে এটা কোন প্রমাণের বিষয় হবে? অতএব এরূপ একটি প্রমাণ আছে যা অবলম্বন ছাড়া অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হতে

পারেনা, যার আশ্রয় ছাড়া ঈশ্বর, আত্মা মুক্তি প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্বের কিছুই জানা যায় না এবং যা না জেনে কূটতর্কে প্রবৃত্ত হলে আধ্যাত্মিক রাজ্য শূন্য বলে গণ্য হয়, সেই পরম প্রমাণ প্রত্যক্ষ হতেও শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ আমরা যেসব প্রমাণ অবলম্বন করি সে সকলের কাজ আমাদের বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রমাণ বুদ্ধির অতীত। বুদ্ধির চেয়ে উন্নত আমাদের এরূপ একটি শক্তি আছে যার দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান দ্বারা যা জানা যায় না, সেরূপ বিষয়ও জানতে পারি। সাধারণ লোকে ঐ সব বিষয় বুঝতে পারেনা। বিশেষতঃ শব্দ প্রমাণ অন্ততঃ আংশিক স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক। এ কারণে আচার্য গুরুনাথের মতে, ভারতীয় চিন্তাবিদরা ঐ প্রমাণকে পৃথক প্রমাণ না বলে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত করেছেন। মহাপুরুষেরা বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট শক্তির দ্বারা কোন বিষয় জেনে তা লাভের উপায় অজ্ঞাত রেখে সে বিষয়ে যা বলে গেছেন, তা আপ্তবচন নামক প্রমাণ হিসেবে জ্ঞানার্থী মাত্রেরই স্বীকার্য। এ কারণ আপ্তবচনকে প্রমাণ বলে অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

উপরে আপ্তবচন সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে ভারতবর্ষ ছাড়া যে অন্য কোথাও তা অনুশীলন করা হয়নাই, এমন নয়। জার্মান পন্ডিতগণ এ বিষয়ে যথেষ্ঠ উন্নত চিন্তার অধিকারী। কান্টের মতে, "আমরা যে শক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ থেকে জ্ঞান লাভ করে বিচার করি তাকে সাধারণত বুদ্ধি বলে মনে করা হয়। এ বুদ্ধির চেয়ে আমাদের একটি মহতী শক্তি আছে- যা আমাদের স্বত:সিদ্ধ কিন্তু উহার উন্নতি ও বিকাশ প্রযত্ন সাপেক্ষ। এই মহীয়সী শক্তির দ্বারা আমরা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান লাভ করি।[৯]

কান্টের এ মত প্রকাশ হবার পরে অনেক দার্শনিক তা স্বীকার করেছেন, তবে যাদের এরূপ চিন্তাশীলতা নাই তাঁরা কান্টের এ মত স্বীকার নাও করতে পারেন। যা হোক এর দ্বারা জানা যাচ্ছে, অধ্যাত্মবিষয়ক আপ্তবাক্যও স্বীকার্য। আগে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সংক্রান্ত পরে অতীন্দ্রিয় পদার্থ সংক্রান্ত আপ্তবাক্য স্বীকার্য হ'ল। সুতরাং আপ্তবচন পরম প্রমাণ। শত শত আপ্ত ব্যক্তি যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলেছেন তখন তাদের বাক্য অনুসারে স্বীকার করতে হয় যে, ঈশ্বর আছেন।

ষষ্ঠ প্রমাণ: সহজ জ্ঞান/আত্ম প্রত্যয়

আচার্য গুরুনাথের মতে, কোন তত্ত্ব নিরূপন করার জন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চারটি যেমন অবলম্বন করা হয় তেমনি আরও একটা উপায় অবলম্বন করা হয় একে সহজ জ্ঞান[১০] বা আত্ম প্রত্যয় বলে। এমন বহুবিষয় আছে যে, যুক্তি-তর্ক দ্বারা সে বিষয়ের কর্তব্যতা/অকর্তব্যতা সঠিকভাবে নিরূপন করা যায়না। তখন সহজ জ্ঞান বা আত্ম প্রত্যয় দ্বারাই তা স্থির করতে হয়। সহজ জ্ঞান মানে জন্মের সাথে যে জ্ঞান লাভ হয়[১১] অর্থাৎ জ্ঞান সাধন উপায় অবলম্বন ছাড়া যে জ্ঞান আত্মায় স্বভাবতই আছে। আর আত্ম প্রত্যয় বললে বোঝায় জ্ঞানাজ্ঞান সাধন উপায় অবলম্বন না করে যে জ্ঞান আত্মায় আছে অর্থাৎ অন্য উপায় অবলম্বন ছাড়া

---

[৯] দ্রষ্টব্য, Frederick Copleston, S.J. *A History of Philosphy*, Vol. ৬, Part-II Kant, Image Books, NewYork, ১৯৬০, P.৯৯.

[১০]পাশ্চাত্য দর্শনে Moore ও Russell এ সহজ জ্ঞানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন- (Common Sense) এ প্রসঙ্গে J.T. Sunderlal-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। দ্রষ্টব্য, J.T. Sunderlal, D.D. The Souls Cry for God. *Kalyan Kalpataru,* edited by C.L. Goswami, God number V.1 January ১৯৩৪, Gorakpur, India, p.১৬৯. দ্রষ্টব্য- পাদটীকা-৪৩

[১১] তুলনীয়- innate idea

আত্মনিষ্ঠ যে দৃঢ় জ্ঞান তা-ই। এ উপায় দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপন করা যেতে পারে। সহজ জ্ঞান বা আত্ম প্রত্যয়ের বিকৃতি জন্মালে বহুবিধ জ্ঞান লাভ করলেও মানুষ ধর্মচ্যুত, স্বাস্থ্যভ্রষ্ট ও ক্ষীণায়ু হয়ে অচিরেই মৃত্যুবরণ করে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আচার্য গুরুনাথ বিষয়টি বুঝিয়েছেন। আত্ম প্রত্যয় বিশিষ্ট বা সহজ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ব্যভিচারকে পাপজনক মনে করেন। কিন্তু শুস্ক তর্কে নানা তর্ক আসতে পারে। যেমন- প্রথমে বলা যায় ব্যভিচার পাপজনক কেননা এতে প্রকৃত প্রেমের ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত প্রেম নাই সেখানে যদি ঐ স্ত্রী অপর পুরুষের সাথে ব্যভিচার করে তা হলে পাপ হবে কি-না, তখন উত্তরে বলা যায় যদিও ঐ স্ত্রীর সাথে এখন প্রকৃত প্রেম নাই বরং এরূপ বিবাদ বর্তমান যে ভবিষ্যতেও প্রকৃত প্রেমের সম্ভাবনা নাই তবুও যে পুরুষ ঐ স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে তার নিজের স্ত্রীর সাথে প্রেম ভঙ্গ হতে পারে, এ জন্য তা পাপজনক। এরপর আবার যদি প্রশ্ন হয় ঐ পুরুষেরও যদি তার স্ত্রীর সাথে প্রকৃত প্রেম না থাকে তা হলে এস্থলে ঐ ব্যভিচার পাপজনক হবে কিনা? আবার যে পুরুষ কখনও বিবাহ করবেন না, সে যদি বারাঙ্গনা সমাগমে যায় তবে তা পাপজনক হবে কিনা।এভাবে শুস্ক তর্কে এসব বিষয় পাপজনক প্রমাণিত করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচার সবসময়ই পাপজনক।

আরও একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলছেন, যেমন, সহজ জ্ঞানে বা আত্ম প্রত্যয়ের দ্বারা সকলের ই জানা আছে যে, সদা সত্য কথা বলা ই কর্তব্য। কিন্তু যদি সহজ জ্ঞান বা আত্ম প্রত্যয়ের বিকৃতি হয়, তবে যুক্তি দ্বারা সত্য কথা বলা যে সব অবস্থায় সবার কর্তব্য, এটা স্থির করা যাবে না। যখন মনে হবে একটু মিথ্যা বললে কারো আপাতঃ উপকার হচ্ছে, কারও অপকার হচ্ছেনা তখনই কেউ মিথ্যা বলে বসতে পারে।[১২] কিন্তু যে শুদ্ধচিত্ত মহাত্মা সব সময় সত্য কথা বলেন, প্রাণান্তেও মিথ্যা বলেননা, মনেও মিথ্যা চিন্তা করেননা, কার্যক্ষেত্রে অসীম নির্ভিকতা সহকারে সত্যব্রত পালনে বদ্ধ পরিকর হয়ে সত্য কথা বলার দৃষ্টান্ত স্বীয় জীবনে জগদ্‌বাসীর শিক্ষার জন্য তুলে ধরেন এবং যে মহাত্মারা সত্যের বিষয়, সত্য কথা বলার ফল এবং অসত্যের বিষময় ফলের বর্ণনা বিভিন্ন বইয়ে লিখেছেন তাঁরাই জানেন যে, উপহাস করেও যদি মিথ্যা বলা হয় তবে হৃদয়ের কি রকম হানি হয়- কিরূপ মলিনতা জন্মে।[১৩] অতএব যুক্তি দ্বারা যা নিশ্চিত হয় না এ রকম বিষয় ও সহজ জ্ঞান ও আত্ম প্রত্যয় দ্বারা নির্ণয় করা যেতে পারে।

আচার্য গুরুনাথ মন্তব্য করেন যে, যাঁরা পাপমুক্তির স্বাদ ক্ষণকালের জন্যও পেয়েছেন, পুণ্যভাবেরপ্রভাব সবসময় অনুভব করেন, পাপকাজে বা পাপচিন্তায় মনের কি-রকম মলিনতা উৎপন্ন হয় তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, তারা সব অবস্থায় সব জায়গায় সবসময়ে সবলোকের পক্ষে ব্যভিচার পাপজনক[১৪] বলে স্বীকার করেন। অতএব যা শুস্ক তর্ক দ্বারা নিরূপিত হয়না তা সহজ জ্ঞান বা আত্ম প্রত্যয়

---

[১২] মহাভারতেও আছে যে, ক্রীড়ায়, পরিহাসে, স্ত্রীর নিকট, বিবাহ সময়ে ও প্রাণ বিনাশকালে মিথ্যা বলা যায়। দ্রষ্টব্য- কালী প্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, ২য় খন্ড, রাজ সংস্করণ, তুলি কলম, ১৯৯৭, শান্তি পর্ব, পৃ. ৫৯৩।
ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি, ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহ রপাতকানি।—মহাভারত

[১৩] তুলনীয়, নাস্তি সত্যসমং কিঞ্চিৎ ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদ্ অনৃতাদিহ বিদ্যতে।। মহাভারত
অর্থাৎ-সত্যের তুল্য কিছুই নাই, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠও নাই। আর মিথ্যা হইতে তীব্রতর কিছু নাই।

[১৪] ব্যভিচারের বিরুদ্ধে শাস্ত্রেও আছে-

দ্বারা নিরূপিত হয় বা মীমাংসা হয়। অতএব সহজ জ্ঞান একটি পরম প্রমাণ। সহজ জ্ঞান বা আত্ম প্রত্যয় না মানলে কেমন অবস্থায় পড়তে হয়, মহর্ষি কপিলের উক্তিতে তা বোঝা যায়।

আত্ম প্রত্যয় বাদ দিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে কপিল লিখলেন 'ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ' অর্থাৎ প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরকে সিদ্ধ করা গেলনা। 'ঈশ্বর নাই' তিনি এরূপ লেখেননি তাহলে 'ঈশ্বরাভাবাৎ' এরূপ সূত্র লিখতেন। বস্তুত কপিল নিরীশ্বরবাদী নন।[১৫] সহজ জ্ঞান বা আত্ম প্রত্যয় স্বীকার না করায় মহর্ষি কপিলকে কূট ব্যবহার শাস্ত্র দোষ নিবন্ধন নির্দোষ সাধুর দন্ডকারী বিচারপতির মত মনে একরকম ও কাজে আর একরকম ভাব ধারণ করতে হ'ল।

আত্ম প্রত্যয় যে কেবল এ দেশীয় মত বা সাধারণ জনগণের মত এমন নয়, ইউরোপীয় পন্ডিতগণও একে স্বীকার করেন।[১৬] শ্রুতিতে আছে- ব্রহ্ম নির্ণয় একমাত্র বা অদ্বিতীয় আত্ম প্রত্যয় দ্বারাই হয়।[১৭] এ জন্য যারা 'ঈশ্বর আছেন' একথা না বলে, ঈশ্বর কি প্রকারে তাদের কাছে উপলব্ধ হবেন! এ আত্ম প্রত্যয় বা সহজ জ্ঞান সব দেশের সাধুদের অভিমত;এটি মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। এর প্রামাণ্য অস্বীকার করলে অনেক বিষয়ের মীমাংসা হতে পারে না, এজন্য এটি একটি পরম প্রমাণ। এবার বিবেচনা করতে হবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জগদ্‌বাসীর কিরকম সহজজ্ঞান বা আত্ম প্রত্যয় আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িককাল পর্যন্ত সকলেই ঈশ্বরের সত্ত্বা সম্বন্ধে সত্তাবান। তাঁরা বিচারে অপ্রবৃত্ত ও শিক্ষা নিরপেক্ষ হয়েও সহজ জ্ঞান বা আত্ম প্রত্যয় প্রভাবে ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করেন। অতএব এ প্রমাণ দ্বারাও স্থির করা যায় যে, ঈশ্বর আছেন।

সপ্তম প্রমাণ : মহাত্মাদের বিভূতি

আচার্য গুরুনাথ বলেন যে, মহাত্মাদের বিভূতি দেখেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আস্তিকদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরভক্ত ও ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত, তাঁদের জীবনে সাধারণ জনগণের অসাধ্য অতি আশ্চর্য কাজ দেখা যায়। তাঁরা যে সামান্য মানুষের অসাধ্য অদ্ভুত কাজ করতে পারেন তার প্রমাণ প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। অতএব বোঝা যায় ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা তারা এ জাতীয় ক্ষমতা (বিভূতি) লাভ করেছেন। অতএব ঈশ্বর যে আছেন সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। এ বিষয়ে আচার্য গুরুনাথ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ক ও খ দুই ব্যক্তি, এদের কারো কোন সম্পত্তি নাই। খ অপরের সাহায্য করা দূরে থাকুক নিজের ভরণ-পোষণই করতে পারে না। আর ক নিজের ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও অর্থ দ্বারা বহু লোকের উপকার করতে পারছে। এতে কি প্রমাণ হয় না যে, ক এর একজন পৃষ্ঠপোষক আছেন, যে তার বাসনা পূরণ করছেন, যখন যা দরকার তখন তাই দিচ্ছেন। একজন ঈশ্বর উপাসক অন্যজন উপাসনাবিমুখ। উভয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একরূপ হ'লেও, বাইরে থেকে উভয়কে একরকম দেখতে মনে হলেও বস্তুত: তাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। বাইরে থেকে দেখা না গেলেও প্রথম ব্যক্তি যখন দ্বিতীয় ব্যক্তির অসাধ্য অদ্ভুত কাজ করতে পারেন, তখন স্বীকার করতে হবে প্রথম ব্যক্তি যার উপাসনা করেন, তিনিই

মাতৃবৎ পরদারেষু.....

[১৫] শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আছে-

আমি সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি, "..... সিদ্ধানাং কপিল মুনি।"- ১০/২৬

[১৬] দ্রষ্টব্য, Moore & Russell, Theory of Common Sense

[১৭] কঠোপনিষদ ১১৩, ১১৪ (তৃতীয় বল্লী ১২, ১৩)

(ঈশ্বর) তাঁর উপাসক দ্বারা এ সকল আশ্চর্য কাজ করান। অতএব মহাত্মাদের বিভূতি দেখেও প্রমাণ হয় যে, তাঁরা যাঁর উপাসনা করেন, তিনি (সেই ঈশ্বর) আছেন।

অষ্টম প্রমাণ : পরমোৎকর্ষ

পরমোৎকর্ষ প্রমাণের সাহায্যে আচার্য গুরুনাথ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দেন। তাঁর মতে, উৎকর্ষ থাকলে পরমোৎকর্ষ অবশ্যই আছে। সর্ব বিষয়ে যাঁর পরমোৎকর্ষ তিনিই ঈশ্বর। জগতে যা কিছু দেখা যায়, সব বস্তু বিষয়েই তারতম্য আছে। কুল থেকে আমলকী বড়, আমলকী থেকে বেল বড়, এভাবে ক্রমশ: বড় হতে হতে একস্থানে সবচেয়ে বড় অর্থাৎ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা বা শেষ সীমা পাওয়া যাবে। যাতে মহত্ত্বের শেষ সীমা বা নিরতিশয়ত্ব, তিনিই ঈশ্বর।

মানুষের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য আছে। মুর্খের চেয়ে জ্ঞানীর জ্ঞান বেশী। জ্ঞানীদের মধ্যেও একের জ্ঞান অন্যের চেয়ে বেশী। এভাবে জ্ঞানের আধিক্য অনুভব করতে করতে যাঁতে জ্ঞানের নিরতিশয়ত্ব বা শেষ সীমা, তিনি অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন এবং তিনিই ঈশ্বর।

এ জাতীয় প্রমাণ যোগদর্শনে দেখা যায়। পতঞ্জলি এ বিষয়ে চারটি সূত্র লিখেছেন-

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈ রপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ। ২৪ সা. পা.

যিনি দুঃখ, কর্মফল বা বাসনা দ্বারা অপরামৃষ্ট সেই মহিষ্ঠ পুরুষই ঈশ্বর।

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম। ২৫ সা. পা.

অপরের যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ আছে, তা তাঁতে নিরতিশয় বা শেষ সীমাপ্রাপ্ত।

স পূর্বেষামপি গুরু কালেনানবচ্ছেদাৎ। ২৬ সা. পা.

তিনি পূর্ব গুরুগণেরও গুরু, যেহেতু তিনি কালদ্বারা সীমাবদ্ধ নন।

তস্য বাচক প্রণবঃ। ২৭ সা.পা.

প্রণব অর্থাৎ ওঁঙ্কার তাঁর বাচক।

মহর্ষি পতঞ্জলি যে পদ্ধতি অনুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপন করেছেন, তা অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু এতেও আপত্তি আছে। আচার্য গুরুনাথ সে আপত্তি ও তার খন্ডন নিম্নরূপে করেছেন-

ক্রমশ: অধিক হতে হতে শেষে যে সবচেয়ে মহৎ বা বড় হবে, শূন্য পাওয়া যাবে না তার প্রমাণ কি? যোগীরা এর উত্তরে বলেন, যার প্রথম আছে তার শেষ আছে। কোন পদার্থ বাড়লে তা কমেনা। সুতরাং মহত্ত্বের- সর্বজ্ঞত্ব বীজের যে নিরতিশয়ত্ব কোনখানে আছে তা বলা যায়।

গণিত শাস্ত্র অনুসারে বিচার করলে এ বিষয়টি সহজে বোঝা যায়। মনে করা যাক্, ক এর যেজ্ঞান আছে তা অল্প হোক বা বেশী হোক তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এ জ্ঞান ‘অ’ দ্বারা প্রকাশ করা হ’ল।এখন খ এর জ্ঞান ক এর চেয়ে বেশী সেজন্য উহা অ×ই হ’ল।[১৮]এরূপে অ×ই×উ প্রভৃতিক্রমে চলতে চলতে শেষ

[১৮]গুণ অনুসারে না ধরে যোগ অনুসারে ধরলেও একই ফল হবে। এক জাতীয় রাশি দুটির যোগফল যা, প্রথম রাশি ও রাশি দুটির সম্বন্ধবাচক- এদের গুণফল ও তা; এটি গণিত শাস্ত্রের শ্রেঢ়ী ব্যবহারের অনুরূপ। দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ৯৬।

জ্ঞান স্থান "অ×ই×উ×..... অনন্ত হ'ল। ক এর যে কিছু না কিছু জ্ঞান আছে তা জানা গেছে এবং ই উ প্রভৃতি ধনাত্মক ও সত্ত্বাত্মক (Positive & real) রাশি সুতরাং শেষ জ্ঞান স্থান অনন্ত জ্ঞানময়। শেষ জ্ঞানস্থান শূন্য হতে পারেনা কেননা এর কোন সংখ্যাই শূন্য নয়। শেষ গুণফল শূন্য হলে প্রথমটা শূন্য হতে হয় কিন্তু তা যে না, তা আগেই জানা গেছে। অতএব শেষ জ্ঞানস্থান অনন্ত জ্ঞানময়। তিনিই ঈশ্বর। এভাবে পরমোৎকর্ষ আলোচনা দ্বারা স্থির করা যায় যে, ঈশ্বর আছেন।

নবম প্রমাণ : লয়বাদ

আচার্য গুরুনাথ লয়বাদ অনুসরণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দেন।পাঞ্চভৌতিক মত অনুসারে জগৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও ব্যোম এ পাঁচ উপাদানের সৃষ্টি। এ পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হয়ে যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে। এমত সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এমতটি প্রথম দেখা যায় উপনিষদে।[১৯] ইউরোপীয় বিজ্ঞানেও এ মত স্বীকার করে।

পাঞ্চভৌতিক মত অনুসারে জগদীশ্বরের অনাদি অনন্ত নিরাকারত্ব গুণ থেকে অনন্ত নিরাকার আকাশের উৎপত্তি হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বাতাস, বাতাস থেকে তেজ: (আগুন), আগুন থেকে জল এবং জল থেকে ভূমির উৎপত্তি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাও এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার প্রলয়ের সময়ে ভূমি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ অনাদি অনন্ত ব্যোমাতীতে লয় হবে। এই লয়ের অন্তিম স্থান যিনি তিনি ঈশ্বর। বস্তু সকল যে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যায় তা বাস্তবে দেখা যায়। এর মধ্যে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাওয়াকে লয় বলে। যা অধিকতর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাকে স্থূল বলে, যা কম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা শূন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাকে সূক্ষ্ম বলে। ভূমি পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য (পঞ্চগুণা) জল চতুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য (চতুর্গুণা), তেজ তিনইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (ত্রিগুণা), বায়ু দুইইন্দ্রিয় গ্রাহ্য(দুই গুণবিশিষ্ট), ব্যোম এক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (এক গুণ বিশিষ্ট)।[২০]

এ কারণে ভূমি অপেক্ষা জল, জল অপেক্ষা আগুন, আগুন অপেক্ষা বায়ু, বায়ু অপেক্ষা আকাশ সূক্ষ্ম। আর আকাশ অপেক্ষা বায়ু, বায়ু অপেক্ষা আগুন, আগুন অপেক্ষা জল, জল অপেক্ষা ভূমি স্থূল। আর যিনি ব্যোমের অতীত, তিনি অতীন্দ্রিয় সুতরাং সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। প্রলয়ের সময় ভূমি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে ইত্যাদি ক্রমে লীন হতে হতে অবশেষে যাঁতে লীন হবে অর্থাৎ যিনি লয়ের শেষ স্থান তিনি ঈশ্বর। আচার্য গুরুনাথ জ্ঞান সংকলিনী ও মনুসংহিতা থেকে এর অনুকূলে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।যাঁরা কিছু জ্ঞান চর্চ্চা করেন, তাঁরা এ লয়বাদ প্রণালী বুঝতে পারেন। আর যাঁরা রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে বহুবিধ পরীক্ষা করেছেন তাঁরাও এর দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং লয়বাদ প্রণালী অনুসারেস্থির করা যায় যে, ঈশ্বর আছেন।[২১]

দশমাদি প্রমাণ : ধর্মশাস্ত্র

জগদীশ্বর যেমন সব বিষয়ে অনন্ত তেমনি তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণও অনন্ত। কিন্তু সেসব উন্নত অধিকারিদের জ্ঞেয় প্রমাণ সাধারণভাবে নির্দেশ না করাই শ্রেয় বিবেচনা করে আচার্য গুরুনাথ উপরের

[১৯] পঞ্চদশী, ভূতবিবেক; সৃষ্টি প্রকরণে এর বিস্তারিত বিবরণ থাকবে ।

[২০] পঞ্চদশী ভূতবিবেক ১-৬, মনু সংহিতা ১-২ Quoted from গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা- পৃ. ২২৮-২৩১

[২১] দ্রষ্টব্য- ঐ, ঐ, পৃ. ২২৫ (জ্ঞান সংকলিনীর অংশ) ২৩০ (মনুসংহিতার অংশ)

নয়টি প্রমাণ দেবার পরে উপনিষদ, কোরান শরীফ এবং বাইবেল থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণ তুলে ধরেছেন। তিনি অনেক উক্তির উল্লেখ করেছেন, আমরা সেখান থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(ক)উপনিষদ

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়াঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাথী চেতা: কেবল নির্গুণশ্চ।। [২২]

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা আছেন। তিনি সর্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সর্বব্যাপী, সর্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতে অবস্থিত, সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, মুক্তিদাতা ও গুণাতীত।

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ব্যাবস্থিতম্

মহান্তং বিভুমাত্মানম্ মত্বা ধীরো না শোচতি।।[২৩]

অর্থাৎ- যিনি স্বয়ং অশরীর, কিন্তু অনবস্থ শরীরসমূহে অবস্থিত, সেই মহান বিভূ পরমাত্মাকে মনন করে ধীর ব্যক্তি কখনও শোক করেন না।

(খ) কোরান শরীফ

কুল হু আল্লা হো আহ্দ অর্থাৎ বল (মহম্মদ) আল্লাহ এক

আল্লাহু সামদ্ অর্থাৎ জগদীশ্বর সর্বশক্তিমান।

আস্যাদো আন্লা এলাহা ইল্লেল্লা বহেদা হুলা সারিকা লাঃ।

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, ঈশ্বরের দ্বিতীয় নাই, তিনি একমাত্র।

ল্যাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম জু উল্যাদ ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু ফুকওয়ান আইদ।

অর্থাৎ (স্ত্রী পুরুষবৎ) তাঁহাদ্বারা কেহ জন্মপ্রাপ্ত নয়, তিনি মানুষের মত হন নাই অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষোৎপন্ন নন। তাঁর জোড়া কেউ নাই, তিনি একমাত্র নিরাকার জ্যোতি:স্বরূপ।[২৪]

(গ) বাইবেল (পুরাতন নিয়ম)

মুসার উক্তি

ঈশ্বর আমার শক্তি, আমার সঙ্গীত,

তিনিই মুকুতি মোর, জানিহে নিশ্চিত।

তিনিই আমার প্রভু, তাঁর স্তুতি গান,

গাইব জীবন ভরি নাহি তাহে আন।

---

[২২] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ১০১

[২৩] কঠোপনিষদ-৫১

[২৪] আল কোরান, অনুবাদ : আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১০৫

আমার পিতারো প্রভু সেই মহেশ্বর,

বন্দনা করিব তার আমি নিরন্তর।[২৫]

দাউদের উক্তি

যিহোবা আমার জ্যোতি: আমার মুকুতি,

যিহোবাই হন মম জীবন শকতি

কি ভয় আমার ভবে কি ভয় কি ভয়,

যখন পেয়েছি আমি পরম অভয়।[২৬]

বাইবেল (নতুন নিয়ম)

খৃষ্টের উক্তি

মোদের স্বর্গীয় পিতা নামটি তোমার,

পবিত্র পবিত্রভাবে গাউক সংসার

স্বরগে তোমার রাজ্য যথা সুখময়,

তেমনি হউক নাথ, ভুমন্ডলময়।

স্বরগে যেমন সিদ্ধ তব অভিপ্রায়,

তেমনি ভূলোকে পূর্ণ হউক ত্বরায়

প্রতিদিন আমাদের যাহে প্রয়োজন,

অদ্যকার সেই খাদ্য করহ অর্পন।

অপরাধীগণে ক্ষমি আমরা যেমন,

আমাদের পাপচয় ক্ষমহ তেমন।

ফেলিওনা আমা সবে কভু প্রলোভনে,

অসৎ হইতে রক্ষ এই দীনগণে।[২৭]

এভাবে নয় রকম যুক্তির সাহায্যে ও পাঁচ প্রকার ধর্ম শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আচার্য গুরুনাথ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, এই পঞ্চবিধ পবিত্র শাস্ত্র যাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছে এবং অধিকাংশ দর্শনকার যাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাসসম্পন্ন ,তাঁর অস্তিত্ব সংশয়াতীত।

[২৫] Exodus ch XV.২ অনুবাদ: ঐ, ঐ, পৃ: ১০৬

[২৬] Palms XXVII. ১ অনুবাদ: ঐ, ঐ, পৃ: ১০৬

[২৭] St. Mathew, ch. VI, ৯-১৩, অনুবাদ : আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১০৭

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

ঈশ্বরতত্ত্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি প্রধান বিষয়। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর অস্তিত্বের প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা মনে করেন, ঈশ্বর নির্বিকার অর্থাৎ তাঁর কোন বিকার নাই। বিকার ছয় প্রকার যথা- জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, নাশ, পরিণতি ও অস্তিত্ব। সুতরাং অস্তিত্বের বিষয়টি ঈশ্বরের স্বরূপের সাথে যুক্ত। দার্শনিক বিচারপ্রিয় ঈশ্বরবিশ্বাসীরা মনে করেন যে, ঈশ্বর আছেন বললে কোথায়, কিভাবে আছেন- এ বিচার করতে হয়। কিন্তু এতে ঈশ্বরকে দেশ-কালের অধীন করা হয়, ফলে ঈশ্বরের ধারণায় জটিলতা দেখা দেয়। তবে অস্তিত্বকে সকলেই বিকার বলে স্বীকার করেননি। ঈশ্বরকে সকল কিছুর মূল মনে করলে এই কূটতর্ক থাকে না।

তবে অস্তিত্ব বিকার হোক বা না হোক, ঈশ্বর কোথায়, কিভাবে আছেন- এ প্রশ্নের উত্তর ছাড়া ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই ধারণা করা যায় না বলে অনেকে মনে করেন। এসব কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি তাঁর ধারণার সাথে যুক্ত। ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনেক রকম প্রমাণ আছে, তা নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনাও আছে। আমরা অস্তিত্বের প্রচলিত প্রমাণ নিয়ে তেমন কথা বলবনা। শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব।

(ক) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি বড় অসুবিধা হ'ল, ঈশ্বর কোথায় কিভাবে আছেন তা নিরূপণ করা কঠিন। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মতে, ঈশ্বর সব কিছুর কারণ- তাঁর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। কখন, কোথায়, কিভাবে এগুলি দেশ-কাল সম্পর্কিত প্রশ্ন। দেশ-কাল সৃষ্ট সত্ত্বা- ঈশ্বরই এদের স্রষ্টা। সুতরাং দেশ-কাল সম্পর্কিত প্রশ্ন ঈশ্বরে আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা এতে স্রষ্টাকে সৃষ্টির অন্তর্গত করা হয়। এ্যারিস্টটলের মতে, গতির অভাবে যখন স্থানের ধারণা জন্মে না তখন মহাসত্তা যে স্থান জুড়ে আছেন, এমন কল্পনা করা ভুল। নিখিল বিশ্ব, বস্তু মাত্রই যাঁর অন্তর্ভুক্ত এবং যাঁর বাহিরে আর কিছুরই ধারণা হয় না, তা স্থানের অধীন নয়।[২৮] একইভাবে তিনি দেখিয়েছেন মহাসত্ত্বা কালেরও অধীন নয় কেননা স্থানের ন্যায় কালও গতির ধর্ম রূপে গণ্য। ইলিয়াটিকস্ দার্শনিকরাও গতি ও বহুত্ব অস্বীকার করেন। তাঁরা সত্ত্বাকে এক ও স্থির মনে করেন। সুতরাং সত্তা দেশ-কালের অধীন নয়।

"ঈশ্বর কোথায়, কিভাবে আছেন"- এ বিষয়ের ধারণা ছাড়া ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু বোঝা যায় না ব'লে যে মতবাদ রয়েছে, গুরুনাথের মতে, এটা ধারণা- শক্তির অপারগতার কথা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বিষয়ক কথা নয়। একটি বিষয় সকলেই স্বীকার করেন যে, সবার সবকিছু ধারণা করার বা বোঝার ক্ষমতা থাকে না। সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্ব অধিকাংশ লোকেই বোঝেন না; এমন কি যাঁরা দর্শন চর্চ্চা করেন তাঁরাও অনেকে এসব বিষয়ে সংশয়ে ভোগেন। উচ্চতর গণিতের সমস্যাবলীও অনেকেই ধারণা করতে পারেন না। কেউ বোঝেন না বা ধারণা করতে পারেন না ব'লে সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বা গণিতের সমস্যাবলী যেমন অস্বীকার করা যায় না বা এ আলোচনা নিরর্থক বলা যায় না; তেমনই কেউ বুঝতে পারবেন না এজন্য ঈশ্বরকে দেশ-কালের অন্তর্গত করে তাঁর ধারণায় বিকৃতি আনা যায় না বা এবং তাঁর

[২৮] এ্যারিস্টোটল, জড়বিজ্ঞান, দ্রষ্টব্য, মো: আবদুল হালিম, গ্রীক দর্শন, প্রজ্ঞা ও প্রসার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৭১।

অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না বা এ আলোচনা নিরর্থকও বলা যায় না। রবীন্দ্র কুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী বলেন, "স্থূল বুদ্ধি লোকেরা (উন্নত চিন্তাশীলতার অভাব হেতু) পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়ে থাকে। তারা মনে করে, যা চোখে দেখা যায় না তার অস্তিত্ব নাই ; বা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা না গেলে তাঁর অস্তিত্ব নাই। ভগবান বা কর্মফল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় তাঁর অস্তিত্ব তারা স্বীকার করে না। এ সকল দুর্বল মস্তিস্ক নাস্তিকদের অসার যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি আছে।মহাভারতে আছে যে, "হিমালয়ের অপর পার্শ্ব ও চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ যদিও কখনো মানুষ দেখতে পায়না তথাপি যেমন বলা চলে না যে, এদের অস্তিত্ব নাই; ঠিক তেমনি সূক্ষ্ম জ্ঞানময় জীবাত্মা প্রত্যেক প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে বিরাজ করছেন এবং তিনি চর্মচক্ষুর অগোচর হলেও একথা বলা চলে না যে, তাঁর অস্তিত্ব নাই।"[২৯]

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মতে, কোন বিষয় দেখা না গেলেও যদি দেখার সম্ভাবনা থাকে তাহলেতাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়[৩০] যেমন চন্দ্রের অপর পিঠ দেখা না গেলেও গিয়ে দেখে আসা যায়, অর্থাৎ দেখার সম্ভাবনা আছে এজন্য তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়; কিন্তু ঈশ্বরকে দেখা বা জানা যায় না ।এবং এরূপ সম্ভাবনাও নাই, তাই এ সম্পর্কীত আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু তাদের এমতে বিতর্কের অবকাশ আছে বলে মনে হয়। বাস্তবে চন্দ্রের অপর পিঠ দেখা যায় না, দেখার সম্ভাবনাও নাই; কেননা গোলাকার জিনিষের সবদিক একসাথে দেখা যায় না। অন্য পিঠের অস্তিত্ব তাকে অনুমান দ্বারা বা অন্যের কথায় স্বীকার করতে হয়। তবুও চাঁদের অপর পিঠের অস্তিত্ব যখন মানুষ স্বীকার করে, তখন ঈশ্বরকে না দেখে বা না জেনেও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা যেতে পারে।

তাছাড়া আচার্য গুরুনাথ দাবী করেন যে, ঈশ্বরকে দেখার বা জানার সম্ভাবনা আছে। ঈশ্বর গুণময়, তাঁকে জানতে হলে গুণের উৎকর্ষ প্রয়োজন। অভিজ্ঞতাবাদী বার্কলের মতে "অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর। এই প্রত্যক্ষ নিজের না হয়ে অন্যের হলেও তা স্বীকার্য্য। এই নীতিটি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের হাতে এসে পরখ নীতি হিসাবে এরকম দাঁড়িয়েছে যে, কোন বিষয় নিজে না দেখলেও যদি অন্যে দেখেছে বলে জানা যায় তাহলে ঐ বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে।[৩১]

এই যুক্তি অবলম্বন করে বলা যায় যে, অন্যের জানা বিষয়ের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা যায় বা জানার সম্ভাবনা আছে এমন বিষয় যদি স্বীকার করা যায় তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করা যায়। কেননা অনেক উন্নত মহাপুরুষ ঈশ্বর-দর্শন করেছেন বলে জানা গেছে বা তাদের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে ঈশ্বর দর্শনের সম্ভাবনা আছে; সুতরাং তাঁদের জানা তথ্য থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। আমেরিকা মহাদেশ না দেখেও এদেশের লোকেরা আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সুতরাং ঈশ্বরকে না দেখেও তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের কথা হ'ল যে, আমেরিকা মহাদেশ বা চাঁদের অপর পিঠ গিয়ে দেখে আসা যায়, এরূপ সম্ভাবনা আছে সুতরাং তাদের অস্তিত্ব স্বীকারে বাঁধা নাই। কিন্তু ঈশ্বরকে দেখার

---

[২৯] মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮৯ অধ্যায়, শ্লোক ৫৪-৫৪। উদ্ধৃত : রবীন্দ্র কুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, পরলোকতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ, কলিকাতা ১৩৮০ বাং, পৃ: ৩৫।

[৩০] দ্রষ্টব্য, Jhon Hosperse, *An Introduction to Philosophical Analysis,* Allied Publishers Pvt. Ltd. Bombay, Calcutta-১৩, New. Delhi, ১৯৭১ (First Indian Print), P.২৬১

[৩১] ঐ, পৃ. ২৬৩-২৬৪

কোন সম্ভাবনা নাই সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নয়। আচার্য গুরুনাথ এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ঈশ্বরকেও দেখার সম্ভাবনা আছে নতুবা কিভাবে বিভিন্ন মহাত্মা ঈশ্বর দর্শন করলেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক আমেরিকা দেখে নাই তার কারণ অর্থের অভাব, সমাজের বাঁধা, রাষ্ট্রের বাঁধা বা দেখার ইচ্ছার অভাব ইত্যাদি।[৩২] ঈশ্বর গুণময়, তাঁকে জানতে হ'লে গুণের উৎকর্ষ প্রয়োজন। সুতরাং ঈশ্বরকে জানার বা দেখার সম্ভাবনা আছে। অতএব স্থূল বুদ্ধিতে বা উন্নত চিন্তার অভাবে তাঁর উপলব্ধিতে অসমর্থ হ'য়ে তাঁকে অস্বীকার করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে না পেরে তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা এ জাতীয় আলোচনা নিরর্থক বলায় যৌক্তিক অনুপপত্তি ঘটে বলে I.M. Copi মনে করেন। এ অনুপপত্তির নাম Argumentum ad Ignorantium এ ধরনের যুক্তি এরকম যে, কোন একটি বাক্য সত্য ব'লে প্রমাণ করা গেল না, এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, "বাক্যটি মিথ্যা"।[৩৩]

(খ) নিজেদের ধারণাশক্তির অপারগতার জন্য ঈশ্বর সম্পর্কিত কোন সমস্যার সমাধান দিতে না পেরে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় করার প্রবণতা বর্তমানে এক ধরনের নাস্তিক (ঈশ্বর-অবিশ্বাসী) মনোভাব। এমতে নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা চিন্তা না করে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়। এ ধরনের মনোভাব যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা নিজেদের জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা না রেখে ধরে নেন যে, তাঁদের সবকিছুই জানার বা বোঝার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে নির্বিচারে নিজের ক্ষমতা স্বীকার করার জন্য অজ্ঞানতার সাথে সাথে নির্বিচার দোষেও আক্রান্ত হবার সম্ভবনা থেকে যায়। অথচ সবার সব কিছু বোঝার ক্ষমতা থাকে না বা সবার ক্ষেত্রে সব জিনিষ প্রযোজ্য নয়- এ অধিকারীভেদ বাস্তব তত্ত্ব।[৩৪] সুতরাং কোন বিষয় আমি জানতে পারলাম না বা আমি বুঝতে পারলাম না বলে তাকে অস্বীকার করা বা সে আলোচনা নিরর্থক বলায় ঈশপের গল্পের 'আঙুর ফল টক' বলার মত অসংগত সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়।

ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এরূপ একটি সমস্যা হচ্ছে অমঙ্গালের সমস্যা (Theory of evil or Problem of evil)।[৩৫] ঈশ্বরের ধারণা অনুযায়ী তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, পরম মঙ্গালময়, স্রষ্টা, রক্ষক, পালক, সমস্ত সৃষ্টির মঙ্গাল-বিধায়ক। তা'হলে সৃষ্টিতে অমঙ্গাল কিভাবে আসে? প্রাচীনকাল থেকে এ সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় ধর্মতত্ত্ববিদ ও দর্শনতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কিন্তু এগুলোর

---

[৩২] পাশ অর্থ রজ্জু বা দড়ি। ধর্মতত্ত্ব অনুসারে জীবাত্মা কতগুলি পাশ দ্বারা বদ্ধ, যার ফলে সে নিজের স্বরূপ এবং স্রষ্টার স্বরূপ বুঝতে পারেনা। এগুলি হচ্ছে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, জুগুপ্সা (গোপন করার ইচ্ছা), কুল, শীল ও জাতি। এছাড়া আত্মা জীবভাবে বদ্ধ হবার সময় সত্ত্ব, রজ: ও তম: এ তিনগুণ, অর্থাৎ এই তিন পাশ দ্বারা বদ্ধ হয়। সাধনার দ্বারা এসব পাশ থেকে মুক্ত হতে পারলে আত্মা নিজের স্বরূপ ও ঈশ্বরের স্বরূপ ক্রমে ক্রমে জানতে পারে।

[৩৩] এ বিষয়ে I.M. Copi'র মন্তব্য হ'ল :

"The fallacy often arises in connection with such matters, as, psychic phenomena, telepathy and the like where there is no clear cut evidence either for or against. It is curious how many of the most enlightened people are prone to this fallacy, as witness the many students of science who affirm the falsehood of spiritual and telepathic claims simply on the grounds that there truth has not been established দ্রষ্টব্য, I.M. Copi, *Introduction to Logic*, 5th Ed. Macmillan Publishing Co. New York, ১৯৭৮, P.৯১.

[৩৪] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান সাধনা, অধিকারী ভেদ প্রবন্ধ, পৃ. ১৩২।

[৩৫] দ্রষ্টব্য, Abdul Matin, *An Outline of Philosophy*, Mallick Brothers, Dhaka, ১৯৬৮, P.৩৩৯.

কোনটিই ত্রুটিমুক্ত বলে গণ্য হয়নি এবং এ কারণে ঈশ্বরের ধারণাকে কল্পনাপ্রসূত ও বিরোধিতাপূর্ণ বলে কল্পনাপ্রসূত বা বিরোধিতাপূর্ণ মনে করা কতখানি যুক্তিযুক্ত তা আলোচনার দাবী রাখে।

আচার্য গুরুনাথের মতে ঈশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়, তিনি সমস্ত সদগুণের আধার। স্রষ্টা সমস্ত সদগুণের আধার হওয়া সত্বেও তাঁর সৃষ্টিতে কিভাবে অমঙ্গল আসে এ সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত যে তত্ত্ব দিয়েছেন, তা নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

স্রষ্টা অনন্ত, সৃষ্টি সান্ত; স্রষ্টার অনন্ত গুণ সৃষ্টিতে এসে সান্ত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। পরমাত্মা পূর্ণ, তাঁতে সমস্ত গুণ অসীম। তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি জীবাত্মা সসীম। পূর্ণ পরমাত্মার যে যে গুণ নাই, সৃষ্ট আত্মায় বা অপূর্ণ আত্মায় তার অতিরিক্ত যে যে সীমাবদ্ধ গুণ দেখা যায়, সেগুলি অংশের পূর্ণনিষ্ঠ গুণ ধারণায় অক্ষমতা ও জড় জগতের সাথে সম্বন্ধাধীন উৎপন্ন হয়। জীবাত্মার গুণগুলি সসীম বা সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ গুণসমূহের যোগে নানা অপকৃষ্ট গুণ (দোষ) ও মিশ্রগুণ উৎপন্ন হয়। এই অপকৃষ্ট গুণের (যার অন্য নাম দোষ) প্রভাবে জগতে অমঙ্গল আসে। মূলে যে যে জিনিষ আছে, মিশ্রনে তার অতিরিক্ত জিনিষ আসতে পারে। মূল বিষয়ে যা নাই, একাধিক মূল জিনিষের মিশ্রনে তা আসতে পারে। যেমন- পান, সুপারি ও চুন এদের কোনটিতে লাল রঙ নাই অথচ এদের মিশ্রনে লাল রঙ আসে। গন্ধক ও পারদ এদের কোনটিতে কালো রং নাই কিন্তু এদের অণুগুলি অত্যন্ত কাছাকাছি আনলে সেখানে কালো রং দেখা যায় এবং মলিনতা জন্মে। আবার এই মিশ্রিত অবস্থায় যদি তাপ দেয়া হয় তাহলে লাল রং আসে। স্রষ্টার অনন্ত সদ্‌গুণ। এ গুণগুলি জীবাত্মায় সীমাবদ্ধভাবে আছে। জীবাত্মায় এ গুণগুলি মিশ্রনের ফলে সেখানে মিশ্রগুণ ও অপকৃষ্ট গুণ (দোষ) জন্মে। এদের প্রভাবে জগতে অমংগল দেখা দেয়। তবে জীবাত্মায় এ গুণ গুলি যদি অসীম হয় তবে অপকৃষ্টের সম্ভাবনা নাই। যেমন যাঁর মধ্যে দয়াবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলকিন্তু ন্যায়পরতা সে রকম প্রবল নয়,সে ব্যক্তি দয়ার বশে অতি অন্যায় কাজও করতে পারেন। কিন্তু যাঁর দয়াও অনন্ত, ন্যায়পরতাও অনন্ত অর্থাৎ এ দুটি গুণই যাঁর মধ্যে পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে, তাঁর দ্বারা জগতে অমঙ্গালের আশঙ্কা নাই।[৩৬] সাধনার দ্বারা জীবাত্মা তাঁর সীমাবদ্ধ গুণসমূহের উন্নতি ঘটিয়ে যদি সেগুলি অসীম করতে পারে, অর্থাৎ ঐ ঐ গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ করতে পারে, তাহলে তাঁর দ্বারা জগতে অমঙ্গালের আশঙ্কা নাই।

ভৌতিক জগতের সাথে সম্বন্ধকালে আত্মায় কিছু কিছু গুণ উৎপন্ন হয়, যেগুলি আত্মায় স্বাভাবিকভাবে থাকে না, এগুলিকে জাতগুণ বলা হয়। এগুলি হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা। এগুলোকে সাধারণত দোষ বলা হয়।[৩৭] এই অপকৃষ্ট বা জাতগুণের (দোষ) প্রভাবে জীবাত্মা যেসব কাজ করে, তা থেকে জগতে অমঙ্গাল উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া জীবভাবে বদ্ধ হবার সময় আত্মা কতগুলি পাশ দ্বারা আবদ্ধ হয়। এ গুলি হচ্ছে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, জুগুপ্সা (গোপন করিবার ইচ্ছা), কুল, শীল ও জাতি। এগুলো দ্বারা পরিচালিত হয়ে আত্মা যে সকল কাজ করে, তা থেকেও জগতে অমঙ্গাল আসে। সুতরাং স্রষ্টায় অমঙ্গাল না থাকলেও সৃষ্টিতে অমঙ্গাল আসতে পারে এবং গুণ সাধনা অর্থাৎ গুণের উন্নতি দ্বারা এ সকল অবস্থা দূর করা যায়। কাজেই অমঙ্গালের সমস্যা তুলে ধরে এবং এ সমস্যার সমাধান দিতে না পেরে, ঈশ্বরের ধারণাকে কল্পনা

[৩৬] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত (প্রকাশক), *সত্যধর্ম*, পৃ. ৭৯ (ভক্তি প্রবন্ধ)।
[৩৭] ঐ ঐ পৃ. ৩৮

প্রসূত বা বিরোধিতাপূর্ণ বলা এবং তাঁর অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করার পিছনে কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আচার্য গুরুনাথ মনে করেন না।

(গ) যে সব নাম বা শব্দ দ্বারা 'ঈশ্বর' বুঝানো হয় এ গুলোকে ব্যক্তিক নাম মনে করার ফলেএবং ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব ও মানবীয় গুণাবলী আরোপ করার ফলে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একই ভাষায় বা বিভিন্ন ভাষায় ঈশ্বরের যে বিভিন্ন নাম রয়েছে, সেগুলো কোন ব্যক্তিক নাম নয়, সেগুলো একই ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের নাম। ঈশ্বর স্থলে যত নাম পাওয়া যায়, সবগুলো গুণবাচক শব্দ। এই নামগুলো দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর না বুঝিয়ে এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ বুঝায়। এসব নাম একই স্রষ্টা, উপাস্য, আদিসত্ত্বা বা পরম সত্ত্বাকে বুঝায়।

আমরা যে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করছি এটিও একটি গুণ প্রকাশক শব্দ। এর অর্থ হ'ল যিনি প্রধান, সব কিছুতে সমর্থ ও সৃষ্টির একমাত্র অবলম্বন।[৩৮] এখানে যিনি শব্দ দ্বারা ব্যক্তিসত্ত্বা না বুঝিয়ে ঐ বিশেষ গুণের আধার স্বরূপ বুঝায়। এ আধারও আবার অনন্ত গুণসমষ্টি।[৩৯] এরূপে,বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর-স্থলে যত নাম আছে, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সবই গুণ প্রকাশক শব্দ, কোন ব্যক্তিক ঈশ্বরের নাম নয়, একই ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের নাম। যেমন-

হরি- (সকল মানুষের হৃদয়) হরণকারী

ভগবান-ষড়ৈশ্বর্যশালী

বিষ্ণু- শুদ্ধ,

বিভু- সর্বব্যাপক,

কৃষ্ণ-কৃষ্ +ন (কর্ষণকারী),

রাম- মনোহর, রমনীয়,শুভ্র,

প্রভু- অনুগ্রহ ও নিগ্রহে সমর্থ,

আল্লাহ্- একমাত্র উপাস্য,

রহিম- চাইলে দানকারী

খোদা-স্বয়ম্ভু,

জলিল- সর্বশ্রেষ্ঠ,

আজিম- মহান,

বাক্কি- নিত্য বিরাজিত; ইত্যাদি।[৪০]

---

[৩৮] Vaman Shivram Apte. *The Students Sanskrit-English Dictionary*, Motilal Banarasidas, Delhi, ১৯৭৬, P.৯৬, ঈশ্বর শব্দের অর্থ এখানে Powerful, Lord, able, capable of, Master, ruler.

[৩৯] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, একাগ্রতা প্রবন্ধ, সত্যধর্ম, পৃ. ১০২-১৪৪, আরও দ্রষ্টব্য, 'ঈশ্বরের সগুণত্ব-নির্গুণত্ব' অধ্যায়

[৪০] দ্রষ্টব্য, ১। আশুতোষ দেব, প্রকৃতিবোধ অভিধান, কলিকাতা, ১৩১৬ বাং ২। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামী বিশ্বকোষ।

গুণ বলতে সাধারণতঃ বিশেষণ মনে করা হয়, এজন্যই গুণের আধার স্বরূপ কোন ব্যক্তিক ঈশ্বরের অনুমান করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আচার্য গুরুনাথ বলছেন, গুণ মাত্রেই বিশেষণ নয়। গুণের প্রকার হিসাবে বিশেষ্য-গুণও আছে। অবলম্ব্য দ্রব্য ভেদে গুণ দুই প্রকার যথা- ভৌতিক গুণ ও আধ্যাত্মিক গুণ। ভৌতিক পদার্থের গুণগুলো তাকে বিশেষ করে এজন্য এদেরকে বিশেষণ গুণ বলে। আত্মার গুণকে আধ্যাত্মিক গুণ বলে, এদের পরিচয়ের জন্য আধারের অপেক্ষা করেনা, এজন্য এদেরকে বিশেষ্য গুণ বলে।[৪১] যেমন- প্রেম, সরলতা, দয়া ইত্যাদি। সুতরাং গুণের নামের পরিচয়ের জন্য কোন ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা করা আবশ্যিক নয়। ঈশ্বরের যত নাম পাওয়া যায় সবই তার গুণ-প্রকাশক শব্দ, এ নামগুলো ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরের নাম নয়- এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন গুণের নাম। আমরা ঈশ্বরের যেসব বিভিন্ন গুণের পরিচয় সৃষ্টিতে পাই, সেসব নামেই তাঁকে আখ্যায়িত করি। বাইবেলে আছে, "ক্রিয়া সাধক গুণ নানা প্রকার কিন্তু ঈশ্বর এক"।[৪২]

বিভিন্ন গুণবাচক শব্দের সাথে 'পরম' গুণটি যোগ করে ঈশ্বরকে পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরম-পালক ইত্যাদি বলা হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বর গুণময় তাঁর সব নামই গুণের নাম। গুণ বাস্তব অর্থাৎ এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে। গুণের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং গুণময় ঈশ্বরের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। জগতে গুণ আছে এই সমুদয় গুণের যে পরাকাষ্ঠা তা-ই ঈশ্বর। ঈশ্বর গুণময়। তাঁর গুণ থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। গুণই শক্তি। এই গুণই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিচায়ক। যেমন- জগতে দয়া, প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা ইত্যাদি গুণ আছে। এই গুণ সমূহের পরাকাষ্ঠা-ই ঈশ্বর।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আসছে কিন্তু যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাস্তবে এক পরমসত্ত্বা বা ঈশ্বরকে সকলেই স্বীকার করেন। যেমন- সাংখ্য মতকে নিরীশ্বরবাদী বলা হয়, কিন্তু সাংখ্যমত নিরীশ্বরবাদী নয় বলে অনেকের ধারণা। জে.এইচ. মজুমদার খুব জোরের সাথেই বলেছেন, সাংখ্যমত ঈশ্বর স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়েছে।[৪৩] সাংখ্য দর্শনকার মহর্ষি কপিল 'ঈশ্বর নাই' এমন কথা লেখেন নি; লিখেছেন 'ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ' (সাংখ্য সূত্র ১/৯২) অর্থাৎ প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরকে সিদ্ধ করা গেল না। ঈশ্বর নাই এরকম সিদ্ধান্ত দিলে 'ঈশ্বরাভাবাৎ' এরকম সূত্র লিখতেন। বৌদ্ধ দর্শনকেও নিরীশ্বরবাদী বলা হয় কিন্তু এ বিষয়েও বিতর্ক আছে। গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব ছিলেন। তিনি মানুষের নৈতিক চরিত্রের ও কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সুতরাং বলা যায়, এক পরম শক্তি বা সত্ত্বাকে (যাঁকে ঈশ্বর, গড, আল্লাহ প্রভৃতি বলা হয়) অনেকেই স্বীকার করেন যদিও সে শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে তাঁরা সফল হন নাই। বাস্তবেও দেখা যায়, অনেক বিষয়েরই প্রমাণ দেয়া যায় না। যে বিষয় যত সূক্ষ্ম তাঁর প্রমাণও ততই সূক্ষ্ম, সহজে সে সব প্রমাণ দেয়া যায় না বা বোঝাও যায় না। ঈশ্বর সূক্ষ্মতম সুতরাং উপযুক্ত জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ছাড়া তাঁর

---

[৪১] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম, পৃ. ৩৭

[৪২] বাইবেল ১ করিন্থীয় ১২:৬

[৪৩] সাংখ্যমত সম্পর্কে J.H. Majumder বলেন – '...the Sankhya does not teach atheism or agnosticism at all, but it positively and emphatically admits and declares the existence of Isvara or God' (J.H. Majumder, "Isvara in Sankhya Philosophy, *Kalyan-Kalpataru*. A monthly for the propagation of spiritual ideas and love of God ; edited by C.L. Goswami, God-Number Vol. 1. No. 1, January ১৯৩৪, Gorakpur, India, p.১৫৬)

অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়া ও বোঝা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের কাছে তা সহজে বোধগম্য হবার কথা নয়। J.T. Sunderlal বলেন,যদি এমন সময় আসে, যখন মাছেরা পানি ছাড়া বাঁচতে পারবে , আলো ছাড়া উদ্ভিতাদি, মা ছাড়া সন্তান, সূর্য ছাড়া পৃথিবী চলতে পারবে, তাহলে হয়তো আমরা সৃষ্টি কর্তাকে অস্বীকার করতে পারি; কিন্তু তার আগে নয়।... বিরাট মহাবিশ্বের এই ক্ষুদ্র অবস্থানে থেকে যুক্তি যোজনা করে আমরা যে যা-ই বলিনা কেন, বাস্তবে এক মহৎ সত্ত্বাকে আমরা স্বীকার করি। সেই সত্ত্বাই আমাদের জীবন। সেই সত্ত্বার অস্তিত্বেই আমাদের সবকিছুই জীবন্ত, অর্থবহ, আশাময় এবং আনন্দময়।[৪৪]

ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনার গুরুত্ব

ধর্মে ঈশ্বরতত্ত্ব একটি প্রধান বিষয়। দর্শনে যাঁরা ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনাকে নিরর্থক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তাঁরাও এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। কোন কোন দার্শনিকের মতে ঈশ্বর আদৌ নাই, আর কারো কারো মতে ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু এ যাবৎ যত যুক্তি দেয়া হয়েছে তাতে এর কোনটিই প্রতিপন্ন হয়েছে বলে মনে হয়না। এ জন্যই ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যৌক্তিক আলোচনা করে যদি জানা যায় যে, ঈশ্বর নিছক কল্পনা, এরূপ কোন পরমসত্তা নাই তাহলে এ জাতীয় একটা সংশয় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং যৌক্তিক আলোচনা দ্বারা ঈশ্বরের ধারণাকে বিচার করতে হবে যে, যথার্থই ঈশ্বর যৌক্তিকভাবে এবং প্রকৃতভাবে আছেন কি-না। এজন্য দরকার তাঁর স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনা। ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে যদি কোন অযৌক্তিকতা, অসংগতি না থাকে তবে ঈশ্বর সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমস্যা, জড়জগতের সাথে সম্বন্ধের সমস্যা, ব্যক্তিত্বের সমস্যা ইত্যাদি আরও যে সমস্যাগুলো রয়েছে, ঈশ্বরের স্বরূপ যথাযথভাবে উদঘাটিত হ'লেই এ সমস্যাগুলোর অবসান সম্ভব বলে আমাদের মনে হয়।। আর এ সমস্যাগুলো আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে জড়িত। তাই ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না ; আর সে আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিৎ ঈশ্বরের স্বরূপ। উপযুক্ত প্রাজ্ঞিক আলোচনা দ্বারা এ সত্ত্বার ধারণা পরিস্ফুট করা উচিৎ। এ ধারণা যত প্রাঞ্জল ও যুক্তিযুক্ত হবে, বাস্তবের সমস্যাগুলো নিরসনে ততই সহায়ক হবে। বাস্তব জীবনে এক উচ্চতম শক্তিতে নির্ভর করেই আমরা বিভিন্ন কাজ করি। সুতরাং এই সত্ত্বা সম্বন্ধে যথাযথ যৌক্তিক ধারণা

---

[৪৪]এ প্রসঙ্গে J.T. Sunderlal এর লেখা প্রণিধানযোগ্য।

"If the time ever comes, when fish are able to do without water, or plants without light, or babes without mothers or earth without sun, then, but, not before, may we, we puny children of earth, turn our backs upon Him who is our strength and our life, or stop our ear to those voice, without or within, that for ever calls us to his protection and his love.

We little realize what treasures exhaustless and infinite we have in God. Imagine world without God, and then we shall see, without God the universe loses its meaning. Without God reason is baffled in its every fight. Without God, our ideals are dreams and our hopes are bubbles. Without God, faiths feet stand on nothing. Without God, immortality fades away and man sinks down essentially to the level of the brute, and death speedly sallow's up all.

But with God, a real God, a God of Infinite wisdom and love, the world is rational, the universe is alive; man is immortal, hope lights eternal fires, love reigns in all worlds ; and there is no good thing in earth or heaven that is not waiting to be ours. "(J.T. Sunderlal, D.D., The Souls Cry for God", *Kalyan Kalpataru*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

প্রয়োজন, যাতে সবাই উপলব্ধি করে ও একভাবে এ ধারণা গ্রহণ করতে পারে। এ জন্যই ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মমত প্রচারিত হয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে সর্বত্রই কিছু না কিছু আলোচনা আছে। কোথাও কোথাও 'ঈশ্বর কেমন' সে সম্পর্কে ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে ধারণাগুলি কতখানি যুক্তিযুক্ত বা সবার জন্য গ্রহণ করার মত কি-না, এ বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা দেখা যায় না। বিভিন্ন ধর্মের যে ধারণা তাতে দেখা যায়, এক ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্মের ধারণা গ্রহণ করতে চান না। এমনকি এক ধর্মের মধ্যকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ই অভিন্ন ধারণা পোষণ করেন না। দর্শনেও ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে এবং এর বিপরীত তত্ত্বেরও উদ্ভব হচ্ছে। এ বিষয়ে একটা সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা এখনো পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ের তেমন কোন আলোচনাও দেখা যায় না। ঈশ্বর যদি এক হন তবে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হলে সর্বত্রই তা এক হওয়াই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ধারণা থাকার অর্থই হ'ল সবকটি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, সেগুলি ঠিক কি-না। সুতরাং সংস্কারমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে যৌক্তিক আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে বর্ণিত ঈশ্বরের ধারণাসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন যে, সেগুলো যুক্তিযুক্ত কি-না এবং সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বা সমস্ত বিদ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না। নতুবা ধর্মে ধর্মে যে বিভেদ বৈষম্য বা ধর্মের নামে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ,অশান্তি, এ গুলোর হাত থেকে মানব জাতি মুক্তি পাবে কিনা, এ সন্দেহ থেকেই যায়।

(২)

ঈশ্বরতত্ত্ব : ঈশ্বর এক না বহু

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দেবার পর আচার্য গুরুনাথ 'ঈশ্বর এক না বহু' এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৪৫] তাঁর আলোচনায় দেখা যায় তিনি একেশ্বরবাদী। তিনি বহু ঈশ্বরবাদ, দ্বি-ঈশ্বরবাদ, ত্রি-ঈশ্বরবাদ প্রভৃতি মত পর্যালোচনা করে ঈশ্বরের একত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

আচার্য গুরুনাথ বলেন, সহজ জ্ঞানে যে সব তত্ত্ব সহজে লাভ করা যায়, তর্কের মাধ্যমে তা লাভ করা তেমন সহজ না। যেমন 'রোধ' বললে আটকান বুঝায় যা সকলেই সহজে বুঝতে পারে কিন্তু এর সংজ্ঞা যদি এরকম দেয়া হয় যে, "নির্গম-নিবারণপূর্বক যৎ কিঞ্চিদধিকরণকস্থিত্যনুকুল ব্যাপারকে রোধ কহে" তাহলে রোধটা যে কি তা সহজে বোঝা যায় না। আবার 'দোহন' কাকে বলে- এর উত্তরে যদি বলা হয় "অন্তঃস্থিত-দ্রবদ্রব্য-বিভাগানুকুল ব্যাপারকে দোহন কহে।" তাহলে বেশী লোকে বুঝতে পারবেনা।

[৪৫] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১০৮-১২৩

শিক্ষার্থীর পক্ষে এটি জটিল বলে মনে হবে। কিন্তু উত্তর জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের কূটতর্কের জন্য অনেক সহজ বিষয় বাধ্য হয়ে জটিলভাবে বর্ণনা করতে হয়। ঈশ্বরের একত্বের বিষয়টিও এরকম।

প্রথম প্রমাণঃ

তিনি বলেন, জগতে দেখা যায়, সব সময় একই সময়ে একইভাবে দুটি পরস্পর বিপরীত শক্তি কাজ করছে। পৃথিবীতে যেমন দিবা তেমনি রাত্রি, যেমন ঊষা তেমন সন্ধ্যা, যেমন মধ্যাহ্ন তেমনি মধ্যরাত আছে। নৈসর্গিক নিয়মে দেখা যায়, যে পরিমাণ উষ্ণতা সেই পরিমাণ শীত, যে পরিমাণ আলোক সেই পরিমাণ অন্ধকার, যে পরিমাণ সুখ সেই পরিমাণে দুঃখ, যে পরিমাণ দয়া সেই পরিমাণ নিষ্ঠুরতা, যে পরিমাণ সাহস সেই পরিমাণ ভীরুতা জগতে সব জায়গায় আছে। আবার পরমাণুতে যেমন আকর্ষণ শক্তি আছে তেমনই বিকর্ষণ ক্ষমতা আছে। বাতাসে জীবন রক্ষকতা আছে, আবার জীবন নাশকতা আছে। সূর্য রশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, আবার রোগজনন প্রবণতা আছে। নদী দ্বারা ভূমিক্ষয় হয় আবার ভূমি বৃদ্ধি হয়।

স্থূল জগৎ থেকে আধ্যাত্মিক জগতেও দেখা যায়, যে প্রেম সুখের কারণ সে প্রেম আবার অশেষ দুঃখের কারণ, যে দয়া আত্ম প্রসাদ সাধন করে তা-ই আবার ঘোরতর দুঃখের কারণ। এরূপ, ধন-জন-যৌবন নারী পুরুষ মানুষ গরু ঘোড়া গাছপালা লতা প্রভৃতি যারই অনুশীলন করা যায়, দেখা যায়- জগতে কোন বস্তু অমিশ্র নয়; সবই বিপরীত গুণদ্বয় সংযুক্ত। অতএব যদি সৃষ্ট পদার্থের অনুশীলন করে জগতের আদি কারণ বা মূল কারণের স্বরূপ নির্ণয় বা বিচার করতে হয়, তাহলে সাধারণভাবে বলতে হয় দুটি শক্তি থেকে জগৎ উৎপন্ন, যার একটি অন্যটির বিপরীত। একটি সুখ হলে অন্যটি দুঃখ, একটি আকর্ষণ হলে অন্যটি বিকর্ষণ, একটি চেতন হলে অন্যটি অচেতন, ইত্যাদি।

এরূপে বহু যুক্তি দেখে এবং দেখিয়ে জগতের আদি কারণ পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন দুটি ভেবে, ন্যায় শাস্ত্রে চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বর ও অচেতন পরমাণুর নিত্যতা অনুমান করা হয়েছে; সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতিকে আদি কারণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এমনি ভাবে তন্ত্র শাস্ত্রে শিব ও শক্তি, প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রে লক্ষ্মী ও নারায়ণ, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মে রাধা ও কৃষ্ণ প্রকৃতি ও পুরুষের আসনে আসীন হয়েছেন।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ দুটি এবং এ দুটির কার্য পরস্পর বিপরীত। কিন্তু আবার অন্যদিক বিবেচনা করলে দেখা যায় জগতের আদি কারণ দুটি হলে তাহলে একই পদার্থে পরস্পর বিপরীত গুণের সমাবেশ ঘটত না, পরস্পর বিপরীত গুণসম্পন্ন দুই ধরণের বস্তু সব জায়গায় দেখা যেতো। বিপরীত গুণদ্বয় এককালে ও এক আধারে সৃষ্টি হতো না , একই বস্তুতে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি না থেকে কতগুলি আকর্ষক ও কতগুলি বিকর্ষক পরমাণু সৃষ্টি হতো। কাজেই বলা যায়, আদি কারণ একটির বেশী হতে পারে না। এর উত্তরে আপত্তিসহ বলা যেতে পারে যে, মাতা ও পিতা যুগপৎ অভিন্নভাবে মিলিত হওয়াতে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তার মধ্যে মায়ের বা পিতার গুণ দেখা যায়, কাজেই বিপরীত দুটি শক্তি মিলিত হয়ে বিপরীত ধর্মদ্বয় বিশিষ্ট একই পদার্থ উৎপন্ন করছে। কাজেই জগতের কারণ এক নয় দুই। এমত ন্যায় দর্শন সাংখ্য দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত।

আচার্য গুরুনাথ এসব আপত্তি খন্ডনের ক্ষেত্রে বলছেন যে, শাস্ত্রকারদের মধ্যে যিনি যা বলেছেন, সেগুলি প্রায় সত্য। কিন্তু তা যে কেমন, একটা উদাহরণ দিয়ে গুরুনাথ তা বুঝিয়েছেন। সিদ্ধ সর্ববর্মাচার্যের

মতে অ ই উ ঋ ঌ প্রত্যেকে দুরকম- হ্রস্ব ও দীর্ঘ। অর্থাৎ তাঁর মতে ই হ্রস্ব ও দীর্ঘ- এ দু'প্রকার। বৈষ্ণব বোপদেবের মতে 'ই' তিন প্রকার হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। আবার মহর্ষি পাণিনির মতে 'ই' আঠারো প্রকার। এখন বিবেচনার বিষয় যে, সর্ববর্মা কিংবা বোপদেব এঁরা কি ভুল মত দিয়েছেন! এরূপ চিন্তা করা ঠিক নয়। তাঁরা যেরূপ অধিকারীর জন্য শাস্ত্র রচনা করেছিলেন, তাদের ধারণাশক্তি অনুসারে নিজের রচিত শাস্ত্রে অল্প বা অধিক বিষয় বর্ণনা করেছেন।

এখন বলা যেতে পারে যে, বহু শাস্ত্রে জগতের আদি কারণ দুটি স্বীকার করলেও কেউ যদি আদি কারণ এক বলেন তাতে যে শাস্ত্রে দোষারোপ করা হ'ল, এমন না। কারণ অন্য বহু শাস্ত্রে আদি কারণ 'এক' বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এ সব আপত্তি নিরসনের জন্য তিনি আরো বলেছেন যে, দুটি শক্তি যদি অভিন্নভাবে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে তবে আর দুটি না বলে একটি বললেই হয়। কেননা 'দুই' হোন বা 'তিন' হোন সৃষ্টিকালে যখন মিলিত হয়েছেন তখন 'এক' বলাই সঙ্গত। সব জায়গায় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ- এ তিন গুণ দেখে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এ তিন দেবকে জগৎ কারণ মনে করা হয়, এ কথায় সে মতও খন্ডন করা হ'ল। জগৎ সুখ-দুঃখ মোহাত্মক। এ কারণ বলা হয় যে জগতের কারণ ও সুখ দুঃখ মোহাত্মক। এ যুক্তি দ্বারা সাংখ্যরা জগতের কারণ বলে সত্ত্বরজস্তমো গুণাত্মিকা প্রকৃতির উল্লেখ করেছেন, ত্রিত্ববাদী হিন্দুরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ বলে মনে করেন। খৃষ্টানগণও পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা এ তিনের অভিন্ন ভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু উপরের যুক্তি দ্বারা এসব মতও খন্ডন করা যায়। মূলকারণ সম্বন্ধে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ যেমন আছে সেরকম চতুষ্টত্ব-জ্ঞান ও পঞ্চত্বজ্ঞানও দেখা যায়। কারণভাবে স্থিতি, কার্যরূপে পরিণতি বা উৎপত্তি, উৎপন্ন কার্যের স্থিতি ও তার কারণরূপে পরিণতি অনুসারে চতুষ্টত্ব জ্ঞান, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ও ব্যোম-এর জন্য পঞ্চত্ব জ্ঞান জন্মে। এ সব কারণে বিভিন্ন মতে জগতের মূল কারণ ঈশ্বরকে দুই তিন চার পাঁচ বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু মূল যুক্তিতে এসব মত খন্ডিত হয়ে একত্ববাদই প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় প্রমাণঃ

আকাশে অসংখ্য-অসীম প্রায় গ্রহ-নক্ষত্র। এরা প্রত্যেকে এক একটা নির্ধারিত পথে চলে ও নির্দিষ্ট এক এক রকম কাজ করে। এগুলো অসংখ্য প্রায় এবং নিয়মিত গতিশীল হয়েও যখন এক নিয়মে চলছে, কারো সাথে কারো কোন সংঘাত হচ্ছেনা, তখন এদের সৃষ্টিকর্তা একজন অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। যদিও প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রে কেন্দ্রাকর্ষিণী ও কেন্দ্রাপসারিণী নামে দুটি শক্তি আছে তবু তারা এক হয়ে কাজ করছে। কাজেই এদের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্তা ও পরিচালক একজন। অতএব, উপযুক্ত প্রমাণসাপেক্ষে বলা যায় যে, জগদীশ্বর এক।

তৃতীয় প্রমাণঃ

জগৎ পঞ্চভূতাত্মক (পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম সহযোগে উৎপন্ন)। এর মধ্যে আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে অপ এবং অপ থেকে ভূমি উৎপন্ন হয়।(জ্ঞান সংকলিনী, মনুসংহিতা, উপনিষদ, তন্ত্র, দর্শন শাস্ত্র অনুসারে)। আবার ভূমি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের উৎপত্তি এবং প্রত্যেক স্থূল পদার্থ তার

পূর্ববর্তী সূক্ষ্মে লীন হয়।[৪৬] এ নিয়ম অনুসারে যিনি সূক্ষতম তাতে সকলেরই লয় হয়। যিনি সূক্ষ্মতম তিনি জগতের আদি কারণ। অতএব তিনি এক শেষ লয় স্থান "এক" স্বীকার না করলে ক্রমপূর্ণ জগতে অক্রমতা দোষ কল্পনা করা হয়-যা অসঙ্গত। অতএব লয়বাদ প্রণালী অনুসারে জগদীশ্বর এক।

চতুর্থ প্রমাণঃ

যোগদর্শনে পতঞ্জলির মতে, সব পদার্থেরই তারতম্য আছে। যে সব পদার্থের তারতম্য আছে তাদের তারতম্য কোন স্থলে অবশ্যই বিরাম বা বিরতি হবে। জগতে পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। বিভিন্ন দর্শনে আত্মাতে পরিমাণের নিরতিশয়ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মা সবচেয়ে মহান। আত্মাতে পরিমাণ চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত। এমনিভাবে জ্ঞানের উৎকর্ষ আছে এবং পরমোৎকর্ষও আছে। যেখানে জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ তিনি সর্বজ্ঞ তিনি ঈশ্বর। ঐশ্বর্যের তারতম্য আছে, যিনি চরম ঐশ্বর্যশালী তা ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যের তুল্য আর কোন ঐশ্বর্য্য নাই। কেননা তার তুল্য ঐশ্বর্য্য কারও থাকলে সে ঐশ্বর্য্যশালীও ঈশ্বর বলে গণ্য হবেন। কিন্তু একাধিক ঈশ্বর থাকা অসম্ভব কেননা দুইজন ঈশ্বরের পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছা উৎপন্ন হলে উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে না।কারণ এক বস্তুতে বিরুদ্ধ অবস্থা একসময়ে কোন মতেই থাকতে পারে না। সুতরাং একের ইচ্ছা পূর্ণ হবে অন্যের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে। যাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে তিনি ঈশ্বর নন। ঈশ্বরের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে- এটা অসম্ভব। যার ইচ্ছা পূর্ণ হবে তিনিই ঈশ্বর। অতএব ঈশ্বর এক।

বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র প্রভৃতি আর্যশাস্ত্রে, বৈশেষিক, ন্যায়, পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করা হয়েছে। নূতন ও পুরাতন বাইবেলে, কোরান শরীফে ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। আচার্য গুরুনাথের ঈশ্বরের একত্বের ধারণার সাথে আমরা ঐসব মতের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

হিন্দুধর্মঃ বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র

বেদের একেশ্বরবাদের মধ্যে অদ্বৈতভাব কিছু লক্ষ্য করা যায়। এই একেশ্বরবাদের রয়েছে বিভিন্ন দেবতাকে এমন এক দেবতায় পরিণত করার প্রবণতা; যিনি জগৎ থেকে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা এবং জগতের নির্মাতা ও পরিচালক। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে অদিতিকে সব দেবতা, সব মানুষ, আকাশ, বায়ু অর্থাৎ কি-

---

[৪৬] আধুনিক বিজ্ঞানেও এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, তেজকণা থেকে এ দৃশ্যমান স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা নভোমন্ডল থেকে আগত মহাজাগতিক রশ্মি থেকে ধূলিকণা (সূক্ষ্ম তেজ কণা) সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি যন্ত্র বসিয়েছেন।

বিজ্ঞানীদের মতে স্থূলকণা সূক্ষ্ম হতে হতে পরবর্তী সূক্ষ্মভূত তেজঃকণায় পরিণত হয় এবং তেজঃকণাও সূক্ষ্ম হতে হতে পরবর্তী সূক্ষ্মভূত বায়ুকণায় পরিণত হয়। বিলীন হবার সময়ে ভূমিকণা (স্থূল পদার্থ কণা) তেজে লীন হয়, তেজ বায়ুতে লীন হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়ার ভেঙে যাবার সময় আলফা ও বিটা কণা এবং গামা রশ্মি নির্গত হয়। আলফা ও বিটার ভর আছে, এরা কণা কিন্তু গামার ভর নেই, তেজরূপেই এর প্রকাশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্থূলকণা সূক্ষ্ম হতে হতে যে মুহূর্তে ভরহীন হয়, তখনই তা তেজে পরিণত হয়। এরূপ এক্স-রশ্মিও ভরহীন ও তেজরূপে প্রকাশিত। এই তেজকণাগুলো বায়ুতে লীন হয় বা বায়ু দ্বারা শোষিত হয়। নভোমন্ডল থেকে আগত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি, নভোমন্ডলের সূক্ষ্ম উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে আসে। এ রশ্মিও বায়ুতে লীন হয় ও বায়ু দ্বারা শোষিত হয়।

(দ্রষ্টব্য, Alan H Cromer, *Physics for the Life Sciences*, Mc Graw, Hill Book Company, New York, ১৯৭৪, পৃ. ৪৪৫, ৪৫৫-৪৫৬)

না যা আছে বা যা কিছু হতে পারে, তার সাথে অভিন্ন করা হয়ছে।[৪৭] এখানে ঈশ্বরকে প্রকৃতির সাথে অভিন্ন করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদী ধারার সর্বেশ্বরবাদের মধ্যে এ ধরনের মতবাদ দেখা যায়। এই সর্বেশ্বরবাদ ঐক্যের কথা বললেও ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই দুই সত্ত্বাকেই রক্ষা করে। যথার্থ-ঐক্যের ধারণা পাওয়া যায় ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে। সেখানে সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে-

"তৎকালে পৃথিবীও ছিলনা, আকাশও ছিলনা, স্বর্গও ছিলনা, ভোক্তাও ছিলনা, ভোগ্যও ছিলনা, আবরণও ছিলনা, তখন মৃত্যুও ছিলনা, অমরত্বও ছিলনা, প্রাণীও ছিলনা, দিন-রাত্রিও ছিলনা, তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।"[৪৮]

এখানে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার পরিস্ফুট ভাব পাওয়া যায়। এই সূক্তে একটি মাত্র পরমসত্ত্বার কথা হয়েছে, যা থেকে সমস্ত জগৎ নি:সৃত হয়েছে, যা সবকিছুর আধার। এখানে জগৎ বহির্ভূত বাহ্য স্রষ্টার দ্বারা জগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়নি। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য এই জগৎ এক অতীন্দ্রিয় আদি কারণের স্বত:স্ফুর্ত বিকাশের ফল স্বরূপ। বেদের অন্যান্য মন্ত্রেও অদ্বৈতবাদ বিধৃত হয়েছে। যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে-

"যিনি আমাদিগের পালনকর্তা, উৎপাদক, মোক্ষ-সুখ-বিধায়ক, বিশ্বব্রহ্মান্ডের জ্ঞাতা, যিনি সূর্যাদিলোক, ইন্দ্রিয়াদি এবং বিদ্বানগণের ব্যবস্থাপক, তিনি এক অদ্বিতীয় ও স্বজাতীয়-বিজাতীয় বিহীন।[৪৯]

অথর্ব বেদে আছে-

ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।
তমিদং নিগতং স হ স ত্রষ একবৃদেক এব।।[৫০]

অর্থাৎ সেই দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থাদি পরিশূন্য পরমেশ্বর, যাতে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তিনি বহু নহেন, এক ও অদ্বিতীয়। হিন্দু ধর্মের এসব শাস্ত্রে উপাসনার ক্ষেত্রেও একমাত্র সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী পুরুষ ভিন্ন আর কাউকে উপাস্যরূপে নির্দিষ্ট করা হয়নি। যজুর্বেদে আছে-

"যিনি স্বীয় অপার মহিমা বলে এই স্থাবর জঙ্গামাত্মক বিশ্বের এক রাজা, যিনি মনুষ্য পশু-পক্ষ্যাদি সমুদয়েরই রচয়িতা, সকল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র প্রদাতা, সেই পরমাত্মাকে দৃঢ় ভক্তি সহকারে আরাধনা করো।"[৫১] সাম বেদে আছে-

---

[৪৭] ঋগ্বেদ ১/৮৯/১০, তুলনীয়, ঋগ্বেদ পুরুষসূক্ত ১০/৯০/১-৪

[৪৮] ঋগ্বেদ ১০/১২৯/১-২, *ঋগ্বেদ সংহিতা,* ২য় খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৭৬, পৃ. ১২৯।

[৪৯] যজুর্বেদ ২৭/১৭ অনুবাদঃ হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, *জ্ঞান-দর্পন,* রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৩৭১ বাং, পৃ. ৪৫।

[৫০] অথর্ববেদ ১৩/৪/১৬-১৮

[৫১] যজুর্বেদ ২৩/৩

"হে সখাগণ! তোমরা সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী পুরুষ ভিন্ন আর কারও নিমিত্ত স্তোত্র সকল উচ্চারণ করোনা এবং তজ্জন্য বৃথা সময়ক্ষেপন করোনা।"[৫২]

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে-

"পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য দেবতা।"[৫৩]

ভক্তিসূত্রে নারদ বলছেন-

"সর্বদা সর্বভাবে নিশ্চিন্তি তৈর্ভগবান এব ভজনীয়।"[৫৪]

অর্থাৎ, সকল প্রকার চিত্ত বিক্ষেপকর চিন্তারহিত হইয়া দিবারাত্র একমাত্র ভগবানের ভজনা করা কর্তব্য। পঞ্চদশী অনুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব না জানলে মানুষ ভ্রান্ত থাকে এবং তার মুক্তিও হয় না।[৫৫]

বেদের ও অন্যান্য শাস্ত্রের এসব মন্ত্রে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে একমাত্র সত্ত্বা বলা হয়েছে এবং উপাস্য হিসেবে কেবল তাঁকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অন্য কারো উপাসনা করলে বৃথা সময়ক্ষেপন হবে বা মুক্তি হবে না- এরকম কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু হিন্দু ধর্মে পরবর্তীকালে যে পাঁচটি সম্প্রদায়ের[৫৬] উদ্ভব ঘটে, এই সম্প্রদায়সমূহের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য আছে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে হিন্দু ধর্মকে বহু উপাস্যবাদী মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টি হিন্দু শাস্ত্র বিরোধী। এই সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ স্ব স্ব উপাস্যকে সর্বপ্রধান বলে নির্দেশ করেন। এই সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে- শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব ও গাণপত্য। এদের উপাস্য হচ্ছে যথাক্রমে শক্তিদেবী(দুর্গা), বিষ্ণু ও তার অবতারগণ, সূর্য্য, শিব ও গণেশ বা গণপতি। উপাস্যভেদেই এঁদের এরূপ নামকরণ হয়েছে। এঁদের বিভিন্ন স্তব-স্তুতিতে স্বীয় উপাস্যকে অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্যদের থেকে বড় বলা হয়েছে। কিন্তু এই সম্প্রদায়সমূহের উপাস্যদের কেউই পূর্ণ নন এবং এঁরা পরব্রহ্মও নন। এঁদের প্রত্যেকের উপাস্য আছে। সকলেই যার উপাসনা করে তিনিই একমাত্র পূর্ণ, আর কেউই পূর্ণ নন বা উপাস্য নন। এ প্রসঙ্গে শিব সংহিতায় আছে-

ন খং বায়ুর্নচাগ্নিশ্চ জলং পৃথিবী ন চ

নৈতৎ কার্য্যং নেশ্বরাদি পূর্ণৈকাত্মা ভবেৎ কিল।[৫৭]

অর্থাৎ, একমাত্র পরমাত্মাই পূর্ণ, তদ্ভিন্ন কি আকাশ, কি বায়ু, কি অগ্নি, কি পৃথিবী, কি ঈশ্বরগণ (ব্রহ্মাদি দেবগণ) কেহই পূর্ণ নহেন।

---

[৫২] সামবেদ ৩/২৪২

[৫৩] শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/২

[৫৪]নারদীয় ভক্তি সূত্র ৭৯, দ্রষ্টব্য, নারদীয় ভক্তিসূত্র, স্বামী প্রভবানন্দ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা, ১৩৯২ বাং, পৃ. ১৬০; তুলনীয়, "সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ভক্তের একমাত্র ভজনীয়" দ্রষ্টব্য, হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, পূর্বোক্ত পৃ. ৬২।

[৫৫] পঞ্চদশী, চিত্রদীপ ১৭।

[৫৬] দ্রষ্টব্য, স্তবকবচ মালা, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা ১৩৩৪ বাং, পৃ. ৪৩, ২৬৮, ৩২৯, ৩৩৫। আরও দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ১৭-৩৮।

[৫৭] শিব সংহিতা ১/৬২।

ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ঈশ্বর নামে যাঁরা খ্যাত, তাদেরকেও এখানে অপূর্ণ বলা হয়েছে। সুতরাং ঐ সম্প্রদায়সমূহে যাদেরকে উপাস্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে তারা অপূর্ণ। এই দেবগণ ও ঈশ্বরগণ জন্ম ও মৃত্যুর অধীন। এঁরাও বিনাশপ্রাপ্ত হবেন। যোগবাশিষ্ট আরও বলছে-

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্বা বা ভূতজাতয়:।

নাশমেবানুধাবন্তি সলিলমীব বাড়বম্ ।।[৫৮]

অর্থাৎ, জলরাশি যেমন বাড়বানলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও নিখিল প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এঁরা যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে এঁরা সৃষ্ট; সৃষ্ট ও স্রষ্টা এক নয়। সুতরাং এঁরা পরাৎপর পরব্রহ্ম বা উপাস্য নন। পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর একমাত্র সত্ত্বা যিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন।

এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "জীবাত্মা ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর বহু হতে পারেন না। ঈশ্বর নামে খ্যাত ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাদি এঁরা শক্তি সম্পন্ন মুক্ত আত্মা। এই মুক্ত আত্মারা বিপুল শক্তির আধার, প্রায় সর্বশক্তিমান। কিন্তু কেউই ঈশ্বরের মত সর্বশক্তিমান হতে পারেননা।[৫৯]

হিন্দু শাস্ত্রের বেদ, পুরাণ তন্ত্র এবং অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে একমাত্র ব্রহ্ম[৬০] ব্যতীত মানুষের উপাস্য ও ত্রাণকর্তা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী আর দ্বিতীয় কেউ নাই। সুতরাং বলা যায় যে, আপাত: দৃষ্ট বহুত্বের মাঝে উপাস্যকে দৃঢ়ভাবে 'এক' প্রতিপন্ন করার জন্য হিন্দু ধর্ম একেশ্বরবাদী। এ একেশ্বরবাদ কখনো একাতিদেববাদ কখনো অদ্বৈতবাদ।

---

[৫৮] যোগবাশিষ্ট ১৬৩।

[৫৯] দ্রষ্টব্য, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র,* প্রসূন বসু ও শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (পরিকল্পনা ও সম্পাদনা) নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা ১৩৯১ বাং, পৃ. ৫৩৬।

[৬০]ব্রহ্মের ধারণা বেদান্ত দর্শনে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ লাভ করেছে। ঋগ্বেদেই এ ধারণার উদ্ভব এমনটি বলা চলে না। অথর্ব বেদের দশম কান্ডের দ্বিতীয় সূক্তে ব্রহ্ম কি সে সম্বন্ধে একটি তত্ত্বের নির্দেশ করা হয়েছে। সেখানে পুরুষকে কেন্দ্র করেই ব্রহ্মের পরিকল্পনা। পুরুষ হচ্ছেন দেবতাদের শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বের অর্থাৎ সমস্ত সদগুণের এবং বলবীর্যের প্রতীক। ব্রহ্মের সত্ত্বার মধ্যেই পুরুষের সত্ত্বা বিদ্যমান। সংহিতায় ব্রহ্মের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মই দেবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট থেকে তাকে সুবিজ্ঞ করে তুলেছে, তাকে জীবন যাপনের উপযোগী সবকিছু শিখিয়েছে। পুরুষ এই ব্রহ্মের সঙ্গে সর্বশক্তি অর্জন করে সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করেছেন। পুরুষ শব্দে মনুষ্যের সর্বাধিক গুণ বুঝানো হয়েছে। পুরুষকে যে বিজ্ঞান ও মনন শক্তি দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হত তাকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ইংরেজীতে একেই Wisdom বলা হয়। অথর্ব বেদের ১৪/২/৩৫ মন্ত্রে ব্রহ্মের সাথে বিশ্বাবসুকে নমস্কার জানিয়েছেন মহাজ্ঞানী গন্ধর্বগণ। সংহিতার ব্রহ্ম একটি আত্মিক শক্তি। সময় বিশেষে ব্রহ্ম শব্দে জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ এবং দেবতা সকলকে বুঝানো হয়েছে। বেদের স্তোত্রসমূহ যা তাদের অন্তরের বৃহত্তম উচ্ছাস তাকেও ব্রহ্ম বলা হত।সামবেদের ঐন্দ্র পর্বে ৩৩০ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে-খ্যাতিমান বশিষ্ট ব্রহ্মসমূহ অর্থাৎ স্তোত্রসমূহ উচ্চারণ করেছিলেন। উক্ত পর্বের ৩৮৮ নং মন্ত্রে ইন্দ্রকে ব্রহ্মকৃৎ বলা হয়েছে এবং ৩৯০ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'হে মিত্রগণ, বজ্রধারীকেই ব্রহ্ম বলে স্তুতি করবে।' আর একটি মন্ত্রে ইন্দ্রকে ব্রহ্ম-অর্চনা অর্থাৎ স্তোত্রসমূহ দ্বারা অর্চনা করার কথা আছে। বেদে আরো আছে, ইন্দ্র ব্রহ্মদ্বেষ্টাদের (অর্থাৎ যারা দেবজাতীয়দের দ্বেষ করতেন) হত্যা করতেন। জ্ঞানার্জনে ব্রতী দেবতাদেরকে ব্রহ্মচারী বলা হত। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য ব্রহ্ম শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন। এগুলি হ'ল (১) খাদ্য, উৎসর্গীকৃত খাদ্য, (২) সুরে গীত, সামগীত, (৩) ঐন্দ্রজালিক বিধি, (৪) যথাযথ সুসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান, (৫) সুরে গীত সংগীত এবং উৎসর্গীকৃত উপহার উভয়কে একত্রে, (৬) হোতৃ পুরোহিতের আবৃত্তি, (৭) মহান। রথ (Roth) বলেন যে, ব্রহ্ম বলতে বোঝায় সেই গভীর অনুরাগ যা আত্মার বাসনা ও সন্তোষের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মের ধারণার এক গভীর তাৎপর্য্য আছে; যেখানে ব্রহ্ম এক পরমনীতি যা দেবতাদের অন্তরালে চলমান শক্তি রূপে ক্রিয়াশীল।শতপথ ব্রাহ্মণে বলা আছে যে, শুরুতে বিশ্বজগৎ ছিল ব্রহ্ম। অন্য এক জায়গায় ব্রহ্মকে বিশ্ব জগতের পরম বস্তুরূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং প্রজাপতি, পুরুষ ও প্রাণের সাথে তাকে এক ও অভিন্ন গণ্য করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে উপনিষদ এই ব্রহ্ম বা দেবতাদের চিৎশক্তিকে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় দার্শনিকতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন (দ্রষ্টব্য, যজ্ঞেশ্বর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০)।পরবর্তী উপনিষদের যুগে ব্রহ্ম অর্থে নির্গুণ পরমাত্মা, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই বুঝায়। ব্রহ্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ যিনি সবচেয়ে বড় (বৃহ+মন্)।

উপনিষদ :

হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদী চিন্তাধারার চরম পরিণতি দেখা যায় উপনিষদে। উপনিষদের ভিত্তিতেই শংকরাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকে তজ্জলান বলে বর্ণনা করা হয়েছে; অর্থাৎ ব্রহ্ম হ'ল সেই, যাঁর থেকে এ জগৎ জাত হয়, যাতে লীন হয় ও যাতে স্থিত থাকে।[৬১] তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে- "যা থেকে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যার দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং বিনাশকালে যাতে গমন করে ও যাতে বিলীন হয় তিনি ব্রহ্ম।[৬২] উপনিষদে এই ব্রহ্মকেই একমাত্র উপাস্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

কেনোপনিষদ বলছে-

"তদ্ধ তদ্ধনং নাম, তদ্বন মিত্যু পাসিতব্যম।

স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বানি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।[৬৩]

অর্থাৎ, এই ব্রহ্ম নিখিল প্রাণিবর্গের ভজনীয়, এজন্য তিনি তদ্বন নামে প্রসিদ্ধ। তদ্বন শব্দ তাহার গুণব্যঞ্জক বলিয়া এই নামেই তাঁহার উপাসনা ও চিন্তা কর্তব্য। যিনি এই ব্রহ্মকে যথোক্ত গুণ বিশিষ্ট বলিয়া জানেন, সমস্ত প্রাণী তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করে।"

কঠোপনিষদে আছে_

"সর্বেবেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি,

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাঞ্চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেন ব্রবীম্যেমিত্যেতৎ।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধেবাক্ষরং পরম্।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাতা যে যদিচ্ছতি তস্য তৎ।[৬৪]

অর্থাৎ, সমস্ত বেদ যে পদকে প্রাপ্তব্য বলিয়া কীর্তন করে, যাহার উদ্দেশ্যে সমস্ত তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, যাহাকে পাইবার বাসনায় সাধকগণ ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সংক্ষেপে সেই ব্রহ্মের পদ বা স্বরূপ তোমাকে বলিতেছি, সেই পদ হইল ওম্। এই অক্ষরটিই সর্বগত ব্রহ্ম, এই অক্ষরটিই সর্বাতীত ব্রহ্ম; এই অক্ষরটিকে জানিয়া যে যাহা চায় সে তাহা পায়।

কিন্তু হিন্দুধর্মে বেদ বিরুদ্ধ কিছু মতবাদ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হ'ল ত্রিত্ববাদ[৬৫]। ত্রিত্ববাদী হিন্দুরা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা হিসাবে তিনজন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) কল্পনা করেন। এমত

---

[৬১] ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩/১৪।

[৬২] তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/১/৩।

[৬৩] কেনোপনিষদ ৪/৬/৩২।

[৬৪] কঠোপনিষদ ১/২/৪৪-৪৫।

[৬৫] হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা হিসেবে তিনজন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের কথা বলে। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব প্রলয় করেন। এ তিনজনই এক হয়ে কাজ করেন। এঁরা তিনে মিলে এক-এঁদের এই তত্ত্বকেই হিন্দু ত্রিত্ববাদ বলা হয়; যদিও ইহা সম্প্রদায় বিশেষের একটি তত্ত্ব। তবে এই শক্তিগুলো এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন শক্তি হিসেবে প্রকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে ঐ সম্প্রদায়ীরা এঁদেরকে স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। এ প্রসঙ্গে Pandit Bhawani Shanker বলছেন-

শ্রুতি বিরুদ্ধ, কারণ উপনিষদে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা এক ব্রহ্ম। উপনিষদের পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। পরব্রহ্ম এক, অবিভাজ্য, অংশহীন এবং দ্বৈত ও বহুত্ব বর্জিত। পরব্রহ্ম পরমতত্ত্ব ; পরব্রহ্ম থেকে অনুতর বা বৃহত্তর কিছুই নাই।[৬৬] ভেদ, দ্বৈত, বহুত্ব এগুলি অধ্যাস; এগুলোর ব্যবহারিক সত্ত্বা আছে কিন্তু পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। নির্বিশেষ পরমাত্মা এক ও অদ্বৈত। ত্রিত্ববাদে যাদের সৃষ্টি স্থিতি, লয়, কর্তা কল্পনা করা হয়েছে তাঁরা সৃষ্ট সুতরাং নিত্য নয়, তাঁরা নিজেরাই সৃষ্টি ও ধ্বংসের অধীন।[৬৭] সুতরাং এ মত বেদ-বিহিত নয়। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনাই উপনিষদের উদ্দেশ্য সেখানে পরমসত্ত্বা বা পরমতত্ত্বই ব্রহ্ম।[৬৮] উপনিষদেই অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার পূর্ণতার ছোঁয়াচ পাওয়া যায়।

ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনায় "পরম" গুণ বা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, তিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, পরম করুণাময়, পরম দয়াময় ইত্যাদি। এই পরম গুণটি ঈশ্বরের অদ্বৈতভাব প্রকাশ করে। সবকিছুর বা সবগুণের যিনি পরম, তিনি এক। যার সম্পর্কে এই "পরম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তিনি এক। সবকিছুর যিনি পরাকাষ্ঠা, বা যেখানে সব কিছু চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছে, তিনি এক। যোগদর্শনকার মহর্ষি পতঞ্জলির মতে "অপরের যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ আছে তা তাঁতে নিরতিশয়ত্ব বা শেষ সীমা প্রাপ্ত।[৬৯]অর্থাৎ যাঁহাতে জ্ঞানের নিরতিশয়ত্ব বা শেষ সীমা ,তিনি অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন এবং তিনি ঈশ্বর।

বেদান্ত দর্শনে শংকরাচার্য্য ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই দুই সত্ত্বার কথা বলেছেন। তিনি ঈশ্বরের অদ্বৈতভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য সত্ত্বার স্বীকৃতি পারমার্থিকভাবে দেননি। ঈশ্বরই একমাত্র সত্ত্বা, অন্য যা কিছু তা অবভাস- এ গুলোর ব্যবহারিক সত্ত্বা আছে, পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। রামানুজাচার্য্য একত্বের মাঝে বহুত্ব এবং বহুত্বের মাঝে একত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। শংকরাচার্য্যের মতে, ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। আর যা কিছু প্রত্যক্ষ হয় সবই মিথ্যা, অবভাস, মায়ার সৃষ্টি। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, তার মাঝে বা বাইরে কোন বহুত্ব নেই। তার এ মতকে কেবলাদ্বৈতবাদ বলে।

অপরপক্ষে আচার্য রামানুজের মতে, ঈশ্বর বহুত্বের একত্ব এবং বহু সদ্‌গুণের একত্ব। শংকরাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ। শংকরাচার্য্য সৃষ্টিকে অস্বীকার করেন কিন্তু রামানুজের সগুণ ব্রহ্মের সাথে সৃষ্টি সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত। তবে উল্লেখ্য এই যে, শংকরাচার্য্য ব্রহ্মকে নির্গুণ বা নির্বিশেষ বলেন এই অর্থে যে, তাঁকে বিশেষ কোন গুণে ভূষিত করা যায় না। এর অর্থ এই নয়

...The trinity or trimurti and other lower debas menifesting in course of evolution are but different aspect of the one Brahma and never separate from or independent of it... But it cannot be denied that many Hindus in these days make distinction between Vishnu and Shiva and even go the length of creating antagonism between the two; such erroneous belief in the past led to unfortunate strife between the followers of the two sects, which led many to lose faith in God altogether (Pandit Bhawani Shanker, Unity of Godhead, Kalyan Kalpataru, a monthly for the propagation of spiritual ideas and love of God, edited by C.L. Goswami (God-Number), Vol. 1, No. 1 Gorakpur, India, January, ১৯৩৪. p.৭১) আরও দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, *Comparative Religion,* New Delhi, ১৯৮৩, p.১৫-১৬.

[৬৬] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৩/৯।

[৬৭] দ্রষ্টব্য, যোগবাশিষ্ট ১৬৩।

[৬৮] দ্রষ্টব্য, Saral Jhingram, *The Roots of Worlds Religions*, Books and Books, New Delhi, ১৯৮২, p.২৬-২৮.

[৬৯] পতঞ্জলি, যোগদর্শন, যোগপাদ ২৫।

যে, তাঁর কোন গুণ নাই। কারণ তিনি ব্রহ্মকে সৎ চিৎ আনন্দ এসব গুণে ভূষিত করেছেন। অন্যদিকে রামানুজ তাঁকে বহুগুণের একত্ব বলে মনে করেন।

সাংখ্য দর্শনকে সাধারণভাবে নিরীশ্বরবাদী বলা হলেও জে. এইচ. মজুমদার, সি.ডি. শর্মা প্রমুখ পন্ডিতগণ সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের স্বীকৃতি আছে বলে মনে করেন।[৭০] তারা সাংখ্য পুরুষকেই ঈশ্বর বলে মনে করেন। তাঁরা এই পুরুষ বা ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করেন। যদিও সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্ব ; কিন্তু তাঁরা মনে করেন প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি। প্রকৃতি দ্বারা পুরুষের একত্ব ক্ষুণ্ন হয় না।[৭১]

হিন্দু শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বৈদিকী শ্রুতি ও তান্ত্রিকী শ্রুতি অনুযায়ী ঈশ্বর এক। কিন্তু পরবর্তী শাস্ত্রসমূহে এক ঈশ্বরের স্থলে বহুত্বের চিন্তা এবং প্রতীকবাদ দেখা যায়। ফলে ঈশ্বরের একত্বের নিরপেক্ষ ধারণা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

মহানির্বাণতন্ত্রে পরমেশ্বর সম্পর্কে আছে যে, পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।[৭২] তিনি সব সময় একরূপ ও পরিণাম রহিত।[৭৩]মহানির্বাণতন্ত্রে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "তুমি একমাত্র শরণ্য, তুমি একমাত্র বরেণ্য, তুমি একমাত্র জগত পালক ও স্ব-প্রকাশ। তুমি একমাত্র জগতের কর্তা, পাতা ও প্রহর্তা এবং তুমি একমাত্র শ্রেষ্ঠ নিষ্কল (পূর্ণ) ও নির্বিকল্প।[৭৪]

কিন্তু ত্রিত্ববাদী হিন্দুরা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা হিসাবে তিনজন দেবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) কল্পনা করেন এবং এদের স্বতন্ত্র সত্ত্বার স্বীকৃতি দেন।[৭৫] যদিও তারা বলেন যে এক ঈশ্বরকেই তিন নামে আখ্যা দেয়া হয় কিন্তু তারা এদের তিনজনের মধ্যেও ভেদ সৃষ্টি করেন।[৭৬]

কিন্তু মহানির্বাণতন্ত্রে একমাত্র পরমেশ্বরকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তারূপে স্তুতি করা হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে আরও বলা হয়েছে, যেমন এ জগতে এক সূর্য্য ব্যতিরেকে আর সূর্য্য নাই, সেরূপ জগতে

---

[৭০] সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর নাই-এরূপ কথা সাংখ্য দর্শনে বলা হয়নি। সাংখ্য মত সম্পর্কে J.H. Mazumder বলেন-
"the Sankhya does not teach atheism or agnosticism at all, but it positively and emphatically admits and declares the existence of Isvara or God (J.H. Mazumder, Isvara in Sankhya philosophy, *Kalyan- kalpataru*, পূর্বোক্ত পৃ. ১৫৬।

[৭১]সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের একত্ব প্রসঙ্গে জে. এইচ. মজুমদার লিখেছেন-
"... the Sankhya teaches that there is, One Absulute Purusa... one Absolute self conscious Self or Isvara who includes Prakriti as one of His Constituent elements, and uses here as the means to differentiate or embody Himself into numberless objects which constitute the world; and that He being thus a self conscious system or world and also the ultimate source of all activity or effort may be properly designated a person; but being a perfect unity..." দ্রষ্টব্য ঐ, পৃ. ১৫৬।

[৭২] মহানির্বাণতন্ত্র ২/৩৪।

[৭৩] ঐ, ৪/২৭।

[৭৪] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, *তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা,* কলিকাতা ১৩৩৩, পৃ. ১২১।

[৭৫]এ ত্রিত্ববাদ প্রসঙ্গে Madan Mohan Malabiya লিখেছেন, One God is known by three names as Brahma, Vishnu and Mahesa. The Vishnu purana says-
Lord... though essentially one, assumes the name Brahma at the time of creation of the universe, that of Vishnu while maintaining it and that of Shiva while destroying it... দ্রষ্টব্য Pandit Madan Hohan Malabiya, God and Sanatana Dharma, *Kalyan Kalpataru,* পৃ: ২৭।

[৭৬] দ্রষ্টব্য, Pandit Madan Hohan Malabiya, Unity of God Head, *Kalyan Kalpataru,* পৃ: ৭১।

এক দেব ব্যতীত আর দেব নাই। যেমন জল বহুপাত্রে থাকলে তার মধ্যে বহু সূর্য্য দেখা যায়, তেমনি হৃদয়ে বহু ভাব থাকলে একই দেব বহুরূপে দৃষ্ট হন।[৭৭]সুতরাং হৃদয়ের বহুভাবের জন্যই বহুদেবতার কল্পনা; মূলতঃ ঈশ্বর এক।

মহর্ষি দত্তাত্রেয় তাঁর অবধূত গীতায় যা বলেছেন তার তাৎপর্য্য এরূপ-

একমাত্র জ্ঞানময় আছেন, তাকেই জ্ঞাত হও, অন্য কিছুই নাই।[৭৮]

শ্রুতিতে আছে-

ব্রহ্ম একমাত্র, তার দ্বিতীয় নাই।[৭৯] অগ্রে এক ছিল, অন্য কিছুই ছিল না।[৮০] এক হয়েও তিনি বহু প্রাণীর কাম্য বস্তু বিধান করেন ইত্যাদি।[৮১]

হিন্দুশাস্ত্রের এসব বর্ণনায় 'ঈশ্বর এক'। কিন্তু একত্বের পক্ষে এরূপ যথেষ্ঠ প্রামাণ্য উক্তি থাকা সত্ত্বেও এক ঈশ্বরের স্থলে হিন্দুধর্মে বহুদেবতার এবং ত্রিত্ববাদের কথা পাওয়া যায় এবং এসব দেবতাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা পাওয়া যায়। প্রাচীন দেববাদের প্রভাব এঁরা এড়াতে পারেন নি। অবশ্য দেবতাদের এই স্বতন্ত্র সত্ত্বার অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করেননি। তন্ত্রসাধক কমলাকান্তের মতে, ব্রহ্ম হচ্ছে শিব ও শক্তির একাত্মভাবেরই নামান্তর, নিজেদের মধ্যে এই শিব ও শক্তির মিলন ঘটানোই হল তন্ত্র সাধনার মূল লক্ষ্য আর পারাটাই হ'ল ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ।[৮২]

একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্মে বহুত্বের আবির্ভাব সম্পর্কে পন্ডিত ভবানীশংকর বলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রে একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য। হিন্দুধর্মের ত্রিত্ববাদ ত্রিমূর্তি এবং অন্যান্য দেবতাগণ এই ব্রহ্মেরই প্রকাশ; এরা ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নন। এজন্য হিন্দুধর্মে বহু ঈশ্বরবাদ নাই। তবে আজকালকার হিন্দুরা এ সকল দেবতার স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকার করেন এবং এদের মধ্যে ভেদ করেন।[৮৩]

সুতরাং দেখা গেল হিন্দু ধর্ম একেশ্বরবাদী। এ একেশ্বরবাদ ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্রম বিবর্তনের ফল। প্রাকৃতিক শক্তিতে ঈশ্বরত্ব আরোপ থেকে ক্রমশ: সমস্ত সৃষ্টির একজন নিয়ন্তায় বিশ্বাস আসতে অনেক

---

[৭৭]দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্তজ্ঞান, উপাসনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

[৭৮] দ্রষ্টব্য, ঐ ঐ

[৭৯] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৬/৫

[৮০] ঐতরেয় উপনিষদ ১/১/১-২

[৮১] কঠোপনিষদ ২/২/১৩

[৮২] দ্রষ্টব্য, সুধাংশ রঞ্জন ঘোষ, ভারতের সাধক সাধিকা পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৪

[৮৩]"Hindu Scriptures postulate only one Absolute Brahma or Maheswara (Logos) called (one without a second). It is described as the source and root of all manifestation. The trinity or trimurti and other lower Debas manifesting in course of evolution are but different aspects of the one Brahma and never separate from, or independent of it. There is no multiplicity of independent goods in Hinduism. But it cannot be denied that many Hindus in these days make distinction between Vishnu and Shiva and even go to length of creating antagonism between the two. Such erroneous belief in the past led to unfortunate strife between the followers of the two sects, which led many to lose faith in God altogether. Vishnu and Shiva are really one and same when viewed from the stand point of the first root cause of manifestation which is the only existence..." দ্রষ্টব্য, Pandit Bhawani Shanker, Unity of God head. *Kalyan Kalpataru,* পৃ. ৭১।

সময় লেগেছিল; মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল অনেক মতবাদ। স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার সাহায্যে স্রষ্টার একত্বের ধারণায় পৌঁছাতে মানুষ সক্ষম হয়েছে অনেক ধাপ পেরিয়ে। এ ধাপগুলোকে অনেকে ভুল বুঝে চূড়ান্ত মত বলে গণ্য করেছে, কিন্তু তা ঠিক নয়।

তবে বিভিন্ন সময়ে এক ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্নভাবে।ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর স্বরুপও অনন্ত। যে সাধক যখন তাঁকে যেভাবে জেনেছেন, সেভাবে প্রকাশ করেছেন; আর এ ধারণাসমূহ তাঁর অনুসারীগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই ধরে রেখেছেন। সেজন্য, ঈশ্বর এক- একথা প্রমাণ করা শক্ত। তাছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্যের বিভিন্ন নাম এবং নামের সাথে এক এক জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা ঈশ্বরের একত্ব প্রমাণ করতে বাঁধার সৃষ্টি করে। হিন্দু ধর্মে শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব ও গাণপত্য এ পাঁচটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের উপাস্য ভিন্ন ভিন্ন। এদের প্রত্যেকের উপাস্য ভিন্ন হওয়ায় ঈশ্বর এক, এ ধারণা হিন্দু ধর্মে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে শ্রুতিতে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের একত্ব সমর্থিত হয়েছে। সেখানে একমাত্র উপাস্যের (ব্রহ্মের) উপাসনা করার কথা আছে। অন্য কারো উদ্দেশ্যে স্তোত্রসকল উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

জরথুস্থ্র ধর্ম

এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জরথুস্থ্র পারস্যদেশের বহুদেববাদের সংস্কার করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বর্তমানে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে তেমন না হলেও প্রাচীনতার বিচারে এধর্ম উল্লেখযোগ্য মর্যাদার দাবী রাখে। প্রাচীন পারস্যে জরথুস্থ্র ধর্ম[৮৪] প্রচলিত ছিল। বলা হয়, বেদ ও জরথুস্থ্র ধর্মগ্রন্থ অবেস্তা সমসাময়িক। সাধারণভাবে জানা যায়, জরথুস্থ্র ধর্ম দ্বি-ঈশ্বরবাদী। এ ধর্মে কল্যাণের ঈশ্বর আহুরা মাজদা ও অকল্যাণের ঈশ্বর আহ্রিমনকে স্বীকার করা হয়। এ কারণে জরথুস্থ্র ধর্মকে দ্বি-ঈশ্বরবাদী বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে এ ধর্ম একেশ্বরবাদী। এ ধর্মে আহুরা মাজদাকেই একমাত্র ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হয়। আহুরা মাজদাই একমাত্র পরম ঈশ্বর, তিনি স্রষ্টা, পালক, সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গালের আধার।[৮৫] জরথুস্থ্র একেশ্বরবাদী ধর্ম তথা এক উপাস্যের কথা প্রচার করেন। তিনি তৎকালীন আর্য্য ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত ছিলেন।[৮৬] সেখানে বিভিন্ন দেবতাকে এক পরম সত্ত্বার অন্তর্গত মনে করা হ'ত ; পরমসত্ত্বা একই- যাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এ ধর্মে অকল্যাণের ঈশ্বর আহ্রিমন স্বাধীন বা নিরপেক্ষ শক্তি নয় বরং তা পরম সত্ত্বা আহুরা মাজদারই শক্তি। ইসলাম, খ্রীষ্টান বা বেদান্তের শয়তান, দিয়াবল বা মায়ার মত আহ্রিমনকে মনে করা হয়। সুতরাং অমঙ্গালের ঈশ্বরের জন্য একেশ্বরবাদ ক্ষুণ্ন হয়না। এ ধর্মের বক্তব্য হ'ল, একই পরম সত্ত্বা

---

[৮৪] Zoroastrianism is one of the oldest religions of the world, perhaps 2500 to 3000 years old. (দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, *Comparative Religion*, Delhi ১৯৮৩, পৃ. ৯০)

[৮৫] Ahura Mazda is the One Supreme God who is regarded as all powerful, all-wise and all-good. He is also regarded as the creator and ruler of the world.(দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২)

[৮৬] Zoroaster taught that, Ahura Mazda was the only God to be worshiped. Zoroaster was well aware of the Aryan Tradition which saw only one reality behind all-various deities, that people worshiped at the Vedic age. The Supreme being is one whom the wise call by various names. (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ৯১)

দ্বিবিধ শক্তি সমন্বিত। জগৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দুই শক্তির যুদ্ধক্ষেত্র। প্রত্যেকেই জগতে তার প্রভাব বিস্তার করতে চায়। মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিয়ন্ত্রক সত্ত্বা হ'ল ঈশ্বর আহুরা মাজদা। তিনি এক সুতরাং জরথুস্থ্র ধর্মের দ্বৈতবাদ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নয়।[৮৭] তবে এই একেশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের কথা বলে।[৮৮]

ইহুদী ধর্ম

ইহুদী ধর্ম একেশ্বরবাদী। ইহুদী ধর্মে ঈশ্বর এক। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আছে-

আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়, আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই।[৮৯]

বাইবেলের এসব উক্তি ঈশ্বরের একত্ব সাক্ষ্য দেয় এবং এই একত্বের ধারা পরবর্তী খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যেও চলে এসেছে।[৯০]

এজরা কোলেট এ সম্বন্ধে বলেন, ইব্রাহিম একেশ্বরবাদের ধারণা তৈরি করেন।[৯১] প্রফেসর বাহ্ম ইহুদী ধর্মের ঈশ্বরকে একক নৈতিক সত্ত্বা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৯২]

খ্রীষ্ট ধর্ম

এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব খ্রীষ্টধর্মের মূল বিষয়। খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বর, যীশু ও পবিত্র আত্মা-এই তিন স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে এক মনে করার ফলে একেশ্বরবাদ অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থ বাইবেলের নতুন নিয়মে প্রভু ঈশ্বরের একত্ব বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে একই সংগে খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও বাইবেলে স্বীকৃত। বাইবেলে আছে-

"তোমাদের পিতা একজন। তিনি সেই স্বর্গীয়।[৯৩] যীশু খ্রীষ্টকে সতের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলছেন "আমাকে সতের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা করছ? সৎ একজন মাত্র আছেন।"[৯৪]"আমাকে সৎ কেন বলছ, একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর।"[৯৫]

"তোমাদের পিতা একজন, তিনি ঈশ্বর।"[৯৬]

জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলী ঈশ্বরের বিভিন্ন ক্রিয়াসাধক গুণের জন্য। এগুলো এক ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ।

---

[৮৭] দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ৯২।

[৮৮] Dr. H.K. Mirza, Zoroastrianism, *Religions of India*, Delhi ১৯৮১, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

[৮৯] বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, যীশাইও ৪৬:৯

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আছে-"Hear, o, Israel! The lord our God is one lord and you shall love the lord, your God with all your heart, and with all your soul and all your might." (Deut, ৬:৪-৫)

[৯০] John Hick, *Philosophy of Religion,* Prentice Hall of India Pvt Ltd., New Delhi, ১৯৭৯, পৃ. ৫।

[৯১] Ezra kolet, Judaism, *Religions of India*, পৃ. ২৭৭ আরও দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

[৯২] A.Z. Bahm, *The Worlds Living Religions,* Arnold Weineme nn ১৯৬৪, পৃ. ২৫০।

[৯৩] বাইবেল মথি ২৩:৯

[৯৪] ঐ মথি ১৯:১৭

[৯৫] ঐ মার্ক ১০:১৮

[৯৬] ঐ যোহন ৮:৪১

বাইবেলে আছে-

"ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার কিন্তু ঈশ্বর এক।[৯৭]

বাইবেলে ঈশ্বর সম্পর্কে যে সব গুণবাচক শব্দের উল্লেখ আছে, "এক" গুণটি তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আছে। খ্রীষ্টধর্ম উপাস্য সম্বন্ধে একেশ্বরবাদী। যিনি উপাস্য তিনি সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি একমাত্র। বাইবেলের কোথায়ও কোথায়ও ঈশ্বরকে যীশুখ্রীষ্টের সাথে এক প্রতিপন্ন করা হয়েছে আবার কোথাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্ত্বা রূপে দেখানো হয়েছে।

যীশু নিজেই বলেছেন, "আমাকে সৎ কেন বলছ, একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর।[৯৮]এখানে যীশু বলছেন তিনি সৎ নন অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর নন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে যীশু পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বরের অভেদভাব স্বীকৃত হয়। একেই খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ বলে। এই ত্রিত্ববাদের জন্য অনেকেই খ্রীষ্টধর্মকে একেশ্বরবাদী বলতে দ্বিধা করেছেন।[৯৯]তবে 'জীব উদ্ধার কাজে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সাথে এক' এ অর্থে গ্রহণ করে ত্রিত্ববাদ একেশ্বরবাদের বিরোধী নয় বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ঈশ্বরের করুণা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রকাশিত সুতরাং তাঁকে না জেনে ঈশ্বরকে জানা যাবে না- এ অর্থে উভয়কে এক বলা যেতে পারে। তবে এ "এক" শব্দে অভেদত্ব বা অভিন্নতা বুঝায় না। এ প্রসঙ্গে Saral Jhingran-এর মতে, খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরের ধারণা আবশ্যিকভাবে ত্রিত্ববাদী। খ্রীষ্ট ধর্মের ঈশ্বরকে, তার প্রকাশ, পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমেই বুঝা যায়। খ্রীষ্টধর্ম একটি পাপ মুক্তির বা পরিত্রাণের ধর্ম এবং তা সম্ভব কেবল মাত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে।[১০০]

প্রকৃত অর্থে খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের তাৎপর্য যে কি, তা নির্ণয় করা সুকঠিন। খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ নি:সন্দেহে ঈশ্বরের একত্ব ব্যাখ্যায় জটিলতার সৃষ্টি করেছে। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রথম অবস্থায় খ্রীষ্টধর্মের অভ্যন্তরীণ পার্থক্যগুলি কেন্দ্রীভূত ছিল খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের অন্তর্গত। এর ফলে বিভিন্ন মত-বিরোধিতার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। অপর সত্ত্বাদ্বয়ের সাথে (ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা) খ্রীষ্টের প্রকৃতি সম্পর্কে বিতর্কের ফলে মতবাদের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

ইসলাম

ইসলাম ধর্মে উপাস্য আল্লাহ্। আল্লাহ্ শব্দের অর্থ হল একমাত্র উপাস্য।

কোরআনে আছে-

'আল্লাহ্ এক, তার দ্বিতীয় নাই, তিনি একমাত্র।'[১০১]

---

[৯৭] ঐ ১ করিন্থীয় ১২:৬

[৯৮] বাইবেল মার্ক ১০:১৮

[৯৯] এ প্রসঙ্গে কেদারনাথ তেওয়ারী বলেছেন- "The religion seems to be essentially monotheistic, although the idea of trinity found in it sometimes raised doubts whether it is really and strictly to be regarded as a monotheism" দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, *Comparative Religion*, Delhi, ১৯৮৩, পৃ. ১৩০।

[১০০] Saral Jhingran, *The Roots of Worlds Religions*, New Delhi, ১৯৮২, পৃ. ৭৯।

[১০১] কোরআন ১২১ : ১

'তোমাদের মাবুদ এক আল্লাহ্।'[১০২]

কোরআন অনুসারে, 'সৃষ্টির কোন কিছুই স্থায়ী নয়, শুধু আল্লাহ্ই স্থায়ী। সৃষ্টির সবকিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্র সত্ত্বাই শুধু থাকবে। আল্লাহ্ই আদি ও অন্ত।[১০৩]যিনি আদি ও অন্ত তিনি এক। এখানে একমাত্র সত্ত্বা আল্লাহ্র কথা বলা হয়েছে। সৃষ্টির কোন কিছু স্থায়ী সত্ত্বা নয়। আল্লাহ্ই চিরন্তন সত্ত্বা।

ইসলাম ধর্ম আল্লাহ্র একত্বের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করে। এ ধর্মে আল্লাহ্র সমান কেউ নাই। তাঁর একক সত্ত্বাই সব কিছুর কারণ। তিনি অনন্যনির্ভর শ্বাশত, সর্বশক্তিমান। ইসলামের এ বিশ্বাসের একটা গভীর তাৎপর্য্য আছে।[১০৪] ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় আল্লাহ্র একত্বের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করেন।

ইসলাম ধর্মের মৌলিক নীতি আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস। মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে মুতাজিলা সম্প্রদায় আল্লাহ্র একত্বের ব্যাখ্যায় আল্লাহ্র সত্ত্বা থেকে পৃথক কোন গুণ, কোরআনের নিত্যতা ও আল্লাহ্ র দর্শন স্বীকার করেন না। তাদের মতে, আল্লাহ্র পরম একত্বের সঙ্গে তাঁর বহুগুণের অধিকারী হওয়ার কোন যৌক্তিক সঙ্গতি নেই। আল্লাহ্তে গুণ আরোপ করা হলে সেইগুণ তাঁর সহনিত্য হয়ে থাকবে। সহনিত্য গুণাবলী আল্লাহ্র একত্বের ভিত্তিকে নস্যাৎ করে দেয়। মুতাজিলারা কোরআনের নিত্যতাকে আল্লাহ্র একত্বের পরিপন্থী বলে মনে করেন। তাদের মতে কোরআন প্রথমে আল্লাহ্র মনের উপাত্ত হিসাবে ছিল, কিন্তু ভাষায় এর প্রকাশ ঘটেছিল পরবর্তীকালে।

আশারীয়া সম্প্রদায় আল্লাহ্র একত্ব ব্যাখ্যায় আল্লাহর গুণাবলী, কোরআনের নিত্যতা এবং খোদার দর্শন স্বীকার করেন। তাদের মতে, এসব বুঝতে হবে এক স্বতন্ত্র অর্থে। আল্লাহ্ অসীম, তাঁর গুণ সৃষ্ট জীবের গুণের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্রষ্টার গুণ ও সৃষ্টের গুণ সমানার্থক নয়। স্রষ্টার গুণ অসীম অনন্ত আর সৃষ্টের গুণগুলি সসীম সীমাবদ্ধ।

সুফীরা আল্লাহ্র একত্ব বলতে সব ঘটনার অন্তর্নিহিত সারধর্মকে বোঝান। আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই নাই। বস্তু আল্লাহ্ থেকেই বিকীর্ণ এবং বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্র গুণাবলীই প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে। আল্লাহ্র ইচ্ছাই সব বিকিরণের কারণ। সুফীদের আল্লাহ্র একত্বের ধারণা সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন। কালেমা তাইয়েবা (লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু...) এর অর্থ সাধারণ মুসলমানেরা করেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়, সুফীরা এর অর্থ করেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্ত্বা নেই। সুফী দার্শনিক ইবনুল আরাবীর মতে, একমাত্র একটি পরম সত্ত্বাই অস্তিত্বশীল, পরম সত্ত্বা স্বরূপতই সরল ও অবিভাজ্য। কিন্তু

---

[১০২] ঐ, ২ : ১৬৩

[১০৩] ঐ, ৫৫ : ২৬-২৭, ১৭ : ৯৯, ৪৬ : ৩

[১০৪] এ সম্বন্ধে আব্দুল রশীদ বলেন-

This belief has many far reaching effects on society. Suffice, it to say that no part of humanity or universe remains… because they are all creations of one Allah. Moreover, knowing that Allah alone has the power of fulfill one's needs, a person will not pay homage to an earthling. Indeed, this belief, this submission to God, is the source of human freedom. দ্রষ্টব্য, Abdur Rashid, Islam-A way of life, *Comparative Religion* ed. by Amarjit Singh Sethi & Reinhard Pummer, N. Delhi ১৯৭৯, পৃ. ৪১-৪২।

গুণারোপের ফলে তা বহুরূপ লাভ করে। যখন তাতে দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধ আরোপ করা হয় তখন তা বহু হিসেবে দেখা দেয়।[১০৫]

ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে ইসলাম যে মত দিয়েছে তার দুইটি অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে। এ সম্বন্ধে Saral Jhingran- বলেন, একটা হ'ল ঈশ্বরের অভিনবত্ব ও অতিবর্তিতা, অন্যটি আপাতঃ দৃষ্টিতে এর বিপরীত, স্রষ্টার একক সত্ত্বার স্বীকৃতি, যা সুফীদের অদ্বৈতবাদের দিকে নিয়ে গেছে।[১০৬]

শিখ ধর্ম

শিখ ধর্ম এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এ ধর্ম মূলতঃ অদ্বৈতবাদী। এ ধর্ম সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরের কথা[১]বলে।

মানুষের মন যাকে জানতে পারে না সেই হ'ল পরব্রহ্ম। শিখ ধর্মের প্রচারক গুরু নানক পরমেশ্বরকে "ইক ওঙ্কার" পদ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এ পদটি পরব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্মের সমতুল্য। সৃজনী ও গুণাত্মক দিক থেকে "ইক ওঙ্কার" 'ওঙ্কার' হিসেবে গৃহিত হয়।[১০৭]শিখদের নৈতিকতা গড়ে উঠেছে ঈশ্বরের একত্বের ধারণার ভিত্তিতে তাঁরা বহুত্ব অবভাস এগুলি স্বীকার করেন না এবং ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন সত্ত্বা স্বীকার করেন না।

শিখধর্ম পূর্বপুরুষ-পূজা, সাম্প্রদায়িকতা, অহং মনোভাব, ঈশ্বর আরাধনার জটিল পদ্ধতি বর্জন করে। এ ধর্ম ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন স্রষ্টা স্বীকার করেনা এবং মায়া, শয়তান,দিয়াবল বা কলির মত কোন অমঙ্গল শক্তি স্বীকার করেনা।[১০৮]শিখদের প্রার্থনায়ও এক পরমসত্ত্বার স্তুতি দেখা যায়।[১০৯] তবে কারো কারো মতে, শিখ ধর্মের ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে মতবাদকে অদ্বৈতবাদ না বলে একেশ্বরবাদ বলাই শ্রেয়।[১১০]

বাহা'ই ধর্ম

বাহা'ই ধর্মমতে ঈশ্বর এক। বাহা'ই ধর্মের মূল কথা হল, মানুষের একতা নির্ভর করে ঈশ্বরের একত্বের উপর। এমতে ঈশ্বরের একত্ব যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সে ধারণাগুলো আব্রাহামের একেশ্বরবাদের ধারণা, মুসার নৈতিক আইন এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম, প্রভৃতি মতের সমন্বয় বলেই মনে হয়।[১১১] এ মতগুলো বাহা'ই ধর্মের অনেক পূর্ববর্তী।

---

[১০৫] দ্রষ্টব্য, আমিনুল ইসলাম, (রূপান্তর ও সম্পাদনা) মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৬১।

[১০৬] Saral Jhingran, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।

[১০৭]ম্যাক আরথার ম্যাকলিফ ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে গুরু নানকের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

There is only one God. Why should there be a second? I say, there is one lord and two ways, which shall I adopt and which reject? The guru replied, there is but one lord and one way, adopt one and reject the other, why should we worship a second, who is born and death? Remember the one God, who is contained in sea and land. দ্রষ্টব্য, Max Aurther Macauliffe, *The Sikh Religion*, Oxford ১৯০৯, পৃ. ১০২।

[১০৮] Amarjit Singh Sethi & Sutantar Singh, Sikhism & Inter faith Dialogue, *Comparative Religion,* ed. by Amarjit Singh Sethi & Reinhard Pummer, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬।

[১০৯] দ্রষ্টব্য, *Kalyan Kalpataru*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

[১১০] দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫, ১৭৮।

[১১১] দ্রষ্টব্য, J. Dauglas Martin, "The Baha'is Faith and its relation to other Religions, *Comparative Religion,* ed. by Amarjit Singh Sethi & Reinhard Pummer, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫০।

পর্যালোচনা

সব ধর্মেই স্ব স্ব ঈশ্বর বা উপাস্যকে এক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে, যদিও ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধর্মের ঈশ্বরকেই ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। কেননা প্রত্যেক ধর্মের ঈশ্বরের কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে যা অন্য ধর্মের লোকেরা গ্রহণ করে না। এজন্য দেখা যায় প্রত্যেক ধর্মের ঈশ্বর এক কিন্তু সব ধর্মের ঈশ্বর এক নয়। এমনকি এক ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঈশ্বর ও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর এক। এই এক ঈশ্বর কখনও প্রাকৃতিক শক্তি, কখনও প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ামক, কখনও পরম দেবতা, কখনও সগুণ ব্রহ্ম আবার কখনও নির্গুণ ব্রহ্ম। এমন কি হিন্দু ধর্মে কখনও সৃষ্ট মানুষকে পর্যন্ত ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে।

সুতরাং এক ঈশ্বরের প্রকৃতি সব সময় এক নয়।হিন্দু ধর্ম বহু যুগের চিন্তা-চেতনার ফসল। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন মনীষী ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যে যতটুকু জেনেছেন, তার ভিত্তিতে এক একটি মত গড়ে উঠেছে। এর সবগুলোই হিন্দু ধর্মে স্থান পেয়েছে। তাই এক ঈশ্বরের ব্যাখ্যায় এত বিভিন্নতা। সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর মতে হিন্দুধর্ম একটি মাত্র সত্ত্বায় বিশ্বাস করে এবং এই একমাত্র সত্ত্বা এই বস্তুজগতকে সৃষ্টি বা প্রকাশ করে।[১১২] পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলোও সমানভাবে ঈশ্বরের একত্বের দাবী করে। যেমন- কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই স্বীকার করা হয়নি। কোরআনে আছে-

... আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কেহই নাই আর কিছুই নাই, পূজার যোগ্য প্রভু, সদা সজীব, তিনি স্বয়ংসত্ত্ব ও বিশ্ব সত্ত্বার ধারক তিনি।[১১৩]

... যা কিছু আসমান ও জমীনে আছে সবকিছু তাঁরই।[১১৪] কোরআন অনুসারে, সৃষ্টির কোন কিছুই স্থায়ী নয়, শুধু আল্লাহ্ই স্থায়ী। সৃষ্টির সব কিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে, আল্লাহ্র সত্ত্বাই শুধু থাকবে।[১১৫] আল্লাহ্ই আদি ও অন্ত, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। আবার একদা সব কিছু তাঁর নিকটে ফিরে যাবে।[১১৬]কোরআন অনুসারে, আল্লাহ্ই সব কারণের কারণ বা পরম কারণ। জাগতিক সমস্ত পরিবর্তনের ভিত্তি ও উৎস আল্লাহ্; তিনি সব পরিবর্তন সংঘটিত করেন। আল্লাহ্ একই সাথে কার্য ও কারণ। পরম কারণ হিসাবে তিনিই একমাত্র স্থায়ী সত্ত্বা, যিনি কালিক ঘটনাবলীর যাবতীয় পরিবর্তন সংঘটিত ও নিয়ন্ত্রণ করেন। একক পরমসত্ত্বা হিসেবে তিনি বহু বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন- এ অর্থে তিনি কার্য।

আল্লাহ্ একাধারে অতিবর্তী ও অন্তবর্তী কেননা তিনি বহুর মধ্যে এক ও একের মধ্যে বহু। একক সত্ত্বা হিসাবে তিনি বহুর মধ্যে অভিব্যক্ত এবং আবার বহুকে বাদ দিয়ে পরিণত হন একটি বিমূর্ত ধারণায়। তাঁর অসীম সত্ত্বা সসীম জগতের বহুত্বের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় না; তিনি প্রকৃতি জগতের বাইরেও

---

[১১২] S.C. Chatterjee, *Fundamentals of Hinduism,* Calcutta, পৃ. ১৫-১৬।
[১১৩] কোরআন ৩/২।
[১১৪] ঐ ২/২৫৫।
[১১৫] ঐ ৫৫/২৬-২৭, ১৫-২৩।
[১১৬] ঐ ৩/৮৪।

বিরাজমান। আল্লাহ্ ও প্রকৃতি সমার্থক নয়। প্রকৃতি আল্লাহ্র সৃষ্টি। আল্লাহ্ প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত এবং প্রকৃতির বাইরেও আল্লাহ্র সত্ত্বা ব্যাপ্ত। আল্লাহ্ অনন্ত, প্রকৃতি তার ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ মাত্র। জগত আল্লাহ্র সৃষ্টিশীল ইচ্ছার ক্রিয়াপরতার প্রকাশ।[১১৭]

বাইবেলেও আছে-

... তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ এবং তোমার ইচ্ছা হেতু সকলেই অস্তিত্ব প্রাপ্ত ও সৃষ্ট হয়েছে।[১১৮]

আমি আলফা এবং ওমেগা, আদি ও অন্ত, ইহা প্রভু ঈশ্বর কহিতেছেন ...।[১১৯]

... যিনি সকলই সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর।[১২০]

... হে স্বামীন! তুমি আকাশ পৃথিৰী সমুদ্র এবং এই সকলের মধ্যে যা কিছু আছে সকলের নির্মাণকর্তা ...[১২১]

কোরআন ও বাইবেলের এ সব উক্তির মধ্যে ঈশ্বরের একক সত্ত্বা প্রতিপন্ন হয়েছে।

সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাতে তিনি হিন্দু ধর্মকে হিন্দু দর্শনের সাথে এক করেছেন এবং হিন্দু চিন্তাধারার সাথেও এক করেছেন।[১২২] হিন্দু চিন্তাধারায় ঈশ্বর ছাড়াও নানা সত্ত্বার স্বীকৃতি আছে। একমাত্র শংকরের কেবলাদ্বৈতবাদ পারমার্থিক দৃষ্টিতে একমাত্র সত্ত্বা হিসাবে ব্রহ্মকে স্বীকার করে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অন্যান্য সত্ত্বা স্বীকার করে।

এছাড়া অন্যান্য মতে, ঈশ্বর ছাড়া অন্যান্য সত্ত্বার কথা আছে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, ঈশ্বর ছাড়া সৃষ্টির উপাদান-কারণস্বরূপ নিত্য-পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন, আত্মা, এসবের স্বীকৃতি আছে। সাংখ্য যোগ মতে, প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি পঁচিশটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জীব ও জড় দ্বারা ঈশ্বর বিশিষ্ট, তাঁর মতে এক ও বহু উভয়ই সত্য।

ঈশ্বরের নাম প্রসঙ্গ

সকল ধর্মে যে ঈশ্বর এক নয় এর একটি বড় কারণ ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম। বিভিন্ন ধর্মে উপাস্যের যে বিভিন্ন নাম আছে, তাঁকে ব্যক্তিক মনে করা হয় এবং প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র মনে করা হয়। ফলে ঈশ্বর এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথের মত হ'ল, বস্তুতঃ বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের যে বিভিন্ন নাম রয়েছে, সেগুলো একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণের নাম- ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরের নাম নয়। আমরা যে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করছি এর অর্থ প্রধান, সব কিছুতে সমর্থ এবং একমাত্র অবলম্বন।[১২৩] এরূপ

---

[১১৭] দ্রষ্টব্য, আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি,* পৃ.৫৬-৫৭।

[১১৮] বাইবেল, প্রকাশিত ৪/১১।

[১১৯] ঐ ঐ ৪/৮।

[১২০] ঐ ইব্রীয় ৩/৪।

[১২১] ঐ প্রেরিত ৪/২৪।

[১২২] S.C. Chatterjee, পূর্বোক্ত, পৃ. ২-৩।

[১২৩]দ্রষ্টব্য, শ্রী আশুতোষ দেব সংকলিত, প্রকৃতিবোধ অভিধান, কলিকাতা, ১৩১৬ বাং। আরও দ্রষ্টব্য, Vaman Shivram Apte *"The Students Sanskrit English Dictionary*, p.৯৬. ঈশ্বর শব্দের অর্থ এখানে Powerful, lord, able, capable of, Master…. ruler ইত্যাদি।

হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর 'হরি' শব্দের অর্থ যিনি সকল হৃদয় হরণ করেন, বিষ্ণু অর্থ শুদ্ধ, ইত্যাদি।[১২৪] ইসলাম ধর্মের উপাস্য আল্লাহ অর্থই হচ্ছে একমাত্র উপাস্য, জলিল অর্থ সর্বশ্রেষ্ট, আজিম অর্থ মহান, ইত্যাদি।[১২৫] অন্যান্য ধর্মের ঈশ্বরের নাম বিশ্লেষণ করলেও জানা যায় সেগুলো গুণের নাম; এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণের নাম বা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একই গুণবাচক নাম। বস্তুতঃ ঈশ্বর গুণময়, তাঁর সব নামই গুণের নাম-ব্যক্তিক নাম নয়। ঈশ্বরের নামসমূহকে গুণের দিক থেকে বিচার করলে সকল ধর্মে একই ঈশ্বরের সাক্ষাত মেলে।

(৩)

ঈশ্বরতত্ত্ব : ঈশ্বর সাকার না নিরাকার

সাধারণভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসীগণ ঈশ্বরকে স্রষ্টা মনে করেন। এ মতে জগতে সাকার বা নিরাকার পদার্থ যা কিছু আছে, সবকিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'ঈশ্বর সাকার না নিরাকার' এ প্রশ্ন অবান্তর মনে হয়। কেননা ঈশ্বর যখন সবকিছুর কারণ, সাকার বা নিরাকার সবকিছু যখন তাঁর সৃষ্টি, তখন সাকারত্ব-নিরাকারত্ব উভয়ই তাঁর মধ্যে আছে, কাজেই এককভাবে এর কোনটি ঈশ্বরে আরোপ করা যায় না অর্থাৎ তিনি সাকার-নিরাকারের অতীত। বস্তুতঃ সাকারত্ব বা নিরাকারত্ব তাঁরই সৃষ্টি, সুতরাং এ সৃষ্ট বিষয়ের কোনটিই এককভাবে তাঁর উপর আরোপ করা যায়না;অর্থাৎ তাঁকে সাকার-নিরাকারের গন্ডীতে আবদ্ধ করা যায়না।

প্রচলিত ধর্মসমূহের কোনটিতে ঈশ্বর সাকার, কোনটিতে নিরাকার আবার কোনটিতে কখনও সাকার কখনও নিরাকার। সাকারবাদী মতে ঈশ্বরকে এককভাবে সাকার বলা হয়েছে এবং একটি বিশেষরূপে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে অথবা কোন বস্তু বা মানুষকে ঈশ্বর বলা হয়েছে। এতে অসুবিধা দাঁড়ায় এ রকম যে, ঈশ্বর সাকার হলে তাঁর আকার কোন্‌টি হবে, কেননা আকার বিশিষ্ট যা কিছু সবই তাঁর সৃষ্টি, সৃষ্টির কোন বিশেষ একটির মত তাঁকে ভাবা বোধ হয় ঠিক না। আর সবগুলো তাঁর আকার হলে একসঙ্গে এত আকার ধারণা করা যায় না। সাকারবাদীরা তাঁকে বিশেষ বিশেষ আকারে রূপ দেয়ার পক্ষপাতী। অন্যদিকে নিরাকারবাদীরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলেন। 'নিরাকার' অর্থে তাঁরা সাধারণতঃ আকারহীন মনে করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে আকারহীন মনে করা বোধ হয় সংগত নয় কেননা সমুদয় আকার বিশিষ্ট বস্তু যখন তাঁরই সৃষ্টি সুতরাং সমুদয় আকার তাঁর মধ্যে থাকাটাই স্বাভাবিক।

সাকার এবং নিরাকার উভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টি। সুতরাং সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব এ উভয়ের একত্ব ঈশ্বরে আছে। ফলে তিনি সাকার না নিরাকার-এ প্রশ্ন করা যায়না। এক বিন্দু জলকে হাইড্রোজেন ও

[১২৪] দ্রষ্টব্য, শ্রী আশুতোষ দেব সংকলিত, প্রকৃতিবোধ অভিধান, কলিকাতা, ১৩১৬ বাং।
[১২৫] দ্রষ্টব্য, ইসলামি বিশ্ব কোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

অক্সিজেনে বিশ্লেষিত করার পর যদি প্রশ্ন করা হয় যে, জল হাইড্রোজেনের মত না অক্সিজেনের মত, তা হলে এর সঠিক উত্তর দেয়া যায় না কেননা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দু'য়ের একত্বই জল। ঈশ্বরের সাকারত্ব ও নিরাকারত্বও এরূপ। সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব এ উভয়ের যে একত্ব তা ঈশ্বরে আছে, সুতরাং আলাদাভাবে এর কোনটি ঈশ্বরে আরোপ করা যায় না।

সাকারবাদের দুটি রূপ। একটি হ'ল বস্তু বা জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপ (De-i-fication--to look upon as a God)। এমতে জড়দ্রব্য, গাছ-পালা, পশু-পাখী বা মানুষকে ঈশ্বর মনে করে তাঁর আরাধনা করা হয়। অন্যরূপ হ'ল ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ (Anthropomorphism)। এ মতে ঈশ্বরকে মানুষের মত অনুভূতি সম্পন্ন ও দেহধারী মনে করা হয়। ঈশ্বরকে মানবীয় গুণাবলীর এক উন্নত রূপ মনে করা হয় এবং মানবীয় ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরে আরোপ করার প্রবণতা দেখা যায়। কোন কোন ধর্মে সাকারবাদের এ দুটি রূপই দেখা যায় আবার কোথাও এর একটি রূপ দেখা যায়। সাকারবাদে নিজেদের খুশীমত একটি আকার ঈশ্বরে আরোপ করা হয়। এ মতে যার যে গুণ নাই তাতে সেই গুণ আরোপ করা হয় অর্থাৎ যে যা নয় তাকে তাই মনে করা হয়। এ মতে সৃষ্টে স্রষ্টার গুণ আরোপ করা হয়।

যিনি যেমন তাঁকে তাই মনে করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলে কোন দোষ দেখা যায়না। দেবতাকে দেবতা জ্ঞানে, গুরুকে গুরু জ্ঞানে, মাতাকে মাতা জ্ঞানে, পিতাকে পিতা জ্ঞানে, শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে, গৌতম বুদ্ধকে গৌতম বুদ্ধ জ্ঞানে, যীশু খ্রীষ্টকে যীশু খ্রীষ্ট জ্ঞানে, শ্রীরাম চন্দ্রকে শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞানে স্তব করা যেতে পারে, শ্রদ্ধা নিবেদন করা যেতে পারে, ভক্তি করা যেতে পারে, এতে কোন দোষ দেখা যায়না। কিন্তু এঁদের যেসব গুণ নাই, এঁদের যদি সেসব গুণে ভূষিত করা হয় বা এঁদের উপর যদি পরম গুণসমূহ আরোপ করা হয় এবং পরমেশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করা হয়, তাহলে দোষ ঘটা স্বাভাবিক এবং এটাই সম্ভবতঃ সাকারবাদের দোষ।

নিরাকারবাদীরা 'আকার নাই যার' এই অর্থেই সাধারণতঃ স্রষ্টাকে নিরাকার মনে করেন। কিন্তু এ মতের সমস্যা হল যাঁর আকার নাই তাঁর সৃষ্টিতে আকার বিশিষ্ট পদার্থ কিভাবে সৃষ্টি হল। স্রষ্টার নিজের মধ্যে আকার না থাকলে সৃষ্টিতে আকার কিভাবে আসে। সুতরাং তাঁর আকার নাই- এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়না।

এ সাকার-নিরাকার বিষয়টি ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি জটিল বিষয়- যা বর্তমান ধর্মসমূহে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। সাকার-নিরাকারের যথাযথ অর্থ এবং এ বিষয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ সঠিকভাবে জানতে পারলেই এ দ্বন্দের মীমাংসা সম্ভব বলে আমাদের ধারণা। আমরা এ লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ঈশ্বরের সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথ মন্তব্য করেছেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে যত মতভেদ দেখা যায়, সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ সেগুলির মূল বললে বেশী বলা হয়না; অর্থাৎ উপাস্য কি সাকার না নিরাকার এ নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান ও ব্রাহ্মগণ নিরাকারবাদী, জড়োপাসকগণ সাকারবাদী, হিন্দুগণ উভবাদী, অর্থাৎ সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ উভয়ই স্বীকার করেন।

জগতের প্রথম দিকের অবস্থা (অতি প্রাচীনকালের) সম্বন্ধে যতদূর ধারণা করা যায় তাতে দেখা যায় যে, প্রথমদিকের মানুষেরা শক্তিসম্পন্ন পদার্থে ঈশ্বরত্ব আরোপ করতেন। মানুষের মধ্যে আরাধনা করার একটা বাসনা আছে, শক্তিমান পদার্থের আরাধনা করে তাঁরা সে বাসনা পূরণ করতেন। ইউরোপীয় পন্ডিতদের মতে, হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ অনুসারে আর্যেরা অগ্নি, আকাশ, সূর্য প্রভৃতির আরাধনা করতেন।

আচার্য গুরুনাথ জগতে প্রচারিত সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ পর্যালোচনা করে বলেন যে, সাকারবাদও নিরাকারবাদের মধ্যে একটি ক্রম দেখা যায় যে, নিরাকারবাদ প্রচারের জন্য যিনি যত চেষ্টাই করুন না কেন এক সময়ে তা সাকারবাদে পরিণত হয়েছে।উদাহরণ স্বরূপ আচার্য গুরুনাথ দেখিয়েছেন যে,বুদ্ধদেব সাকারবাদ মানতেন না সত্য কিন্তু তাঁর পরবর্তীগণ (শিষ্য-প্রশিষ্যেরা) অনেকেই সাকারবাদী হয়ে পড়েছিলেন। বুদ্ধদেবের পূজাই এ সাকারবাদের মূল। বুদ্ধদেবকে বুদ্ধদেব বলে পূজা করলে সাকারবাদ হতনা, তাঁকে পরমেশ্বরের আসনে বসানোর জন্যই সাকারবাদ ঘটেছে। আবার,খৃষ্ট উপদেশ দিলেন 'আমার স্বর্গস্থ পিতার ভজনা কর'। কিন্তু পরবর্তী খৃষ্টানদের মধ্যে তাঁর ও তাঁর মায়ের পূজার প্রচলন দেখা যায়। মা কে মা হিসেবে, বাবাকে বাবা হিসেবে, দেবতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করলে কোন দোষ হতে পারে না। কিন্তু তাদের কেউকে যদি পূর্ণব্রহ্মবোধে পূজা করা হয় তবে নানা দোষ হয় এবং সেগুলিই সাকারবাদের দোষ।

আর্য শাস্ত্র বেদ সংহিতায় সাকারবাদের উল্লেখ আছে কিন্তু উপনিষদে কেবল নিরাকারবাদই দেখা যায়। তান্ত্রিকী শ্রুতির কোন কোন স্থলে নিরাকারবাদ অধিকাংশ স্থলে সাকারবাদ দেখা যায়। ভারতে সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ এমন মিশ্রিতভাবে চলে আসছে যে এদের কোনটি ত্যাগ করা ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি ঋষি নিরাকারবাদ প্রকাশ করলেন। অথচ তাঁর দর্শনের ভাষ্যকার নিরাকারবাদী হয়েও নির্দেশ করেন যে, প্রথমে নির্গুণে চিত্ত প্রবেশ করতে পারেনা, একারণ সগুণে মনোনিবেশ করবে; তারপরে নিবিষ্টমনা হলে যখন চিত্তের একাগ্রতা হবে তখন উপাসিত ঈশ্বরের অনুগ্রহে সমাধিযোগ সিদ্ধি হবে। এখানে সাকার ও নিরাকারের উল্লেখ না থাকলেও সগুণ ও নির্গণ ব্রহ্মের উল্লেখ আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় গ্রন্থসমূহে ঈশ্বরকে সাকার বা নিরাকার কিংবা সগুণ বা নির্গুণ অথবা সাকার ও নিরাকার এবং সগুণ ও নির্গুণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। আর ইসলাম, খৃষ্ট, ইহুদী প্রভৃতি গ্রন্থে ঈশ্বর কেবল নিরাকার বলে নির্দিষ্ট হয়েছে।

আচার্য গুরুনাথ বলছেন, আমরা যে প্রণালীতে জ্ঞান লাভ করি, তাতে কতগুলি জ্ঞান সাকার থেকে ও কতগুলি নিরাকার থেকে লাভ হয়। প্রথম সাকার ফুল পরে তার নিরাকার গন্ধের জ্ঞান হয়। এখানে সাকার থেকে নিরাকারের জ্ঞান হয়। প্রথমে সাকার যন্ত্র পরে তা থেকে নিরাকার সুরের জ্ঞান। আবার অন্যদিকে প্রথমে নিরাকার ক্ষুধার জ্ঞান পরে সাকার খাদ্যের জ্ঞান। এরূপ আরও বহু ক্ষেত্রে নিরাকার থেকে সাকার জ্ঞান হয়। এ বিষয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের উক্তি তুলে ধরেছেন-

সাকারেন বিনা দেবি নিরাকারো ন লভ্যতে

নিরাকারং বিনা দেবি! সাকারোঽপি ন লভ্যতে।

বীজং বিনা ন বৃক্ষঃ স্যাদ্ বিনা বৃক্ষং ন বীজকম্।[১২৬]

এভাবে সাকার-নিরাকারের সম্বন্ধ আলোচনা করে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার আচার্য গুরুনাথ সে আলোচনা করেছেন।তিনি বলছেন, জ্ঞান লাভের মূল কারণ যে দর্শন শাস্ত্র, যার বিচারপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট এবং যার আভাসমাত্র অবলম্বন করে যাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায় সংঘটিত হয়েছে বললে বাড়িয়ে বলা হয়না, সেই সূক্ষ্ম বিচার পূর্ণ দর্শনশাস্ত্র মাত্রেই সাকারবাদ ঘৃণিত ও নিরাকারবাদ সমাদৃত হয়েছে। আরও দেখা যায়, যিনি সাকারবাদ প্রচার করেছেন তিনিও নিরাকারবাদ অগ্রাহ্য করেন নাই বরং উন্নত অধিকারীর অবলম্বনীয় বলে নির্দেশ করেছেন। যাঁরা প্রকৃত ভক্তির সাথে সাকার উপাসনা শুরু করেছেন তাঁরা স্বীয় অভীষ্ট দেবদেবীর আকৃতির নানাবিধ বর্ণনা করে শেষে নামমাত্র ঠিক রেখে নিরাকারবাদে উপনীত হয়েছেন।[১২৭]

সাকারবাদীরা নিজমতের অনুকূলে গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে যেন ভয়ে ভয়ে সাকারবাদ স্বীকার করছেন এরকম মনে হয়। কেননা তারা বলছেন-

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।"

অর্থাৎ সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের যে রূপ আছে তা কল্পনা করা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, সাধকেরা প্রথম অবস্থায় নিরাকার ব্রহ্ম ধারণা করতে পারেনা।

এজন্য শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মের রূপ না থাকলেও কল্পনা করেছেন।[১২৮] সুতরাং এরূপ কল্পনাকারীরাও স্বীকার করছেন যে, ব্রহ্মের রূপ নাই অর্থাৎ ঈশ্বর নিরাকার।

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ।

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।

এখানে প্রথমেই বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময়। যিনি জ্ঞানময় তাঁর জড়ীয় রূপ নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ তার পরিমাণ করা অসাধ্য- এর দ্বারাও জড়রূপের অভাব প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ তিনি নির্গুণ ও অশরীরী এ উক্তি দ্বারা তাঁর যে শরীর নাই তা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে। এ কারণ যিনি জ্ঞানময়, যিনি অপ্রমেয়, যিনি নির্গুণ, যিনি অশীরীরি, তাঁর রূপ নাই; কিন্তু প্রবেশার্থী সাধকদের হিতের[১২৯] নিমিত্ত সেই অশরীরীরও রূপ কল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং এ লেখকগণও স্বীকার করছেন ঈশ্বর নিরাকার। নিরাকারবাদীদের মতে কেউ কেউ 'হিতার্থায়' এ পদের অর্থ 'হিত নিবৃত্তির জন্য' এরকম বলেছেন। কেননা অমরের মতে অর্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়, ধন, বস্তু প্রয়োজন ও নিবৃত্তি। বাস্তবে সাধকদের

---

[১২৬] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ১২৭

[১২৭] "সাকারোঽপি নিরাকারা, নিরাকারা তারা... ঐ, ঐ, পৃ. ১২৯।

[১২৮] ঐ, ঐ, পৃ. ১২৯।

[১২৯] এ প্রসঙ্গে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে-

মনষা কল্পিতা মূর্তি নৃনাং চেন্মোক্ষসাধনী

স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজা নো মানবাস্তথা।। (১৪ উল্লাস, ১১৮ শ্লোক)

অর্থাৎ মন কল্পিত মূর্তি যদি মনুষ্যগণের মোক্ষসাধনী হয় তাহলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও রাজা হতে পারে।

অহিত করার জন্য অরূপের রূপ কল্পনা করা হয়েছে। তন্ত্র শাস্ত্র বা এর অন্তর্গত গ্রন্থে এরূপ বলা আছে যে, তন্ত্রশাস্ত্রকে অন্য শাস্ত্রে মোহনশাস্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অসুরদিগকে প্রকৃত-পথ-ভ্রষ্ট করার জন্য বিষ্ণুর অনুরোধে শিব ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব প্রকৃতপক্ষে 'হিতার্থায়' এ পদের অর্থ হিত নিবৃত্তয়ে অর্থাৎ হিত নিবৃত্তির জন্য।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যাবতীয় ঈশ্বরবাদীই ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস করেন। ভারতে বহু পূর্ব থেকে একটা মত চলে আসছে যে, ঈশ্বরের রূপ নাই অথচ তা কল্পনা করা হয়। এরূপ কেন করা হয়- এর উত্তরে বলা হয় যে, ঈশ্বরকে ধারণা করার জন্য। এর আপত্তিক্রমে বলা হয় যে, হিমালয়কে না দেখে দুর্বাকে হিমালয় ভেবে কাজ করলে কি কখনও হিমালয়ের জ্ঞান হবে? অতএব এ জাতীয় কল্পনা সঠিক নয়।[১৩০]

যদি কেউ বলেন যে, অপ্রমেয় চিন্ময় পরমেশ্বরের ধ্যান কিভাবে করবে- সেজন্য তার শরীর কল্পনা করা হয়। এক্ষেত্রে আচার্য গুরুনাথ বলছেন যে, যতকাল ঈশ্বর দর্শন না হবে ততকাল তাঁর ধ্যান করা অসম্ভব। তবে কল্পিত ধ্যানে কোন ফল হয় না অর্থাৎ ধ্যান শক্তি জন্মে না। যদি হত তবে ঘাস অবলম্বন করে আকাশ করতলগত হতে পারত। অতএব যে পর্যন্ত তাঁর দর্শন লাভ না হবে ততকাল পর্যন্ত সেই অনন্তগুণময়ের গুণরাশি চিন্তা(ধ্যান) করা কর্তব্য। এ কথার দ্বারা রূপ ধ্যানের নিস্ফলতার কথা বলা হচ্ছে না, তবে যাঁর রূপ নাই তাঁর রূপ কল্পনা করে ধ্যান করা যে নিস্ফল তাই বলা হচ্ছে।রূপ ধ্যানের অবলম্বনে আত্মোন্নতি করতে চাইলে পরমারাধ্য গুরুদেবের ধ্যান করা কর্তব্য- এর দ্বারাই ধ্যানলভ্য পরমোন্নতি লাভ হবে।

এ আলোচনার পর আচার্য গুরুনাথ ঈশ্বরের নিরাকারত্বের পক্ষে কিছু যুক্তি তুলে ধরেনঃ

প্রথমতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক নবম প্রমাণে বলা হয়েছে যে, সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের উৎপত্তি এবং সূক্ষ্মে স্থূলের লয় হয়। এর থেকে জানা যায় যে, ভূমি তার চেয়ে সূক্ষ্ম জলে লীন হয়। জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লীন হয়। সুতরাং আকাশ যাতে লীন হয় তিনি আকাশের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং ক্ষিতি অপ তেজ ও বায়ুময় নন। আকাশ যখন নিরাকার সুতরাং আকাশ যাতে লীন তিনি আকাশ থেকেও সূক্ষ্ম এবং তিনি অবশ্যই নিরাকার। সাকারবাদ স্বীকার করলে ঈশ্বরকে আকাশ থেকে স্থূল বলতে হয়। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি যে সৃষ্ট পদার্থের চেয়ে স্থূল হবেন একথা অযৌক্তিক। অতএব ,প্রমাণিত হয় যে ,ঈশ্বর নিরাকার।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের গবেষণায় যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, ভূমির চেয়ে জলভাগ বেশী, বায়ুর পরিমাণ ভূমি, জল ও তেজ থেকে বেশী, আকাশের পরিমাণ ঐ চারটির সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী। ভূমির চেয়ে জল, জলের চেয়ে তেজ, তেজের চেয়ে বায়ু এবং বায়ুর চেয়ে আকাশ বহুব্যাপী ও বহু পরিমাণ সম্পন্ন। ভূমি জল ও তেজের লয়েই নিরাকারভাব উপস্থিতি হয়। যখন দুই তিনটি ভূত সৃষ্টি

---

[১৩০] এ প্রসংগে মহানির্বানতন্ত্রে বলা হয়েছে-
মনষা কল্পিতা মূর্তি নূনাং চেন্মোক্ষসাধনী
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজা নো মানবাস্থতা।।(১৪ উল্লাস,১১৮ শ্লোক)
অর্থাৎ মন কল্পিত মূর্তি যদি মনুষ্যগণের মোক্ষসাধনী হয় তাহলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারা ও রাজা হতে পারে।

পর্যন্তও নিরাকারভাব ছিল তখন যিনি সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি অবশ্যই নিরাকার।

তৃতীয়তঃ জগতের সাকার পদার্থগুলো আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা না করে যদি সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করা হয় তবে সমষ্টি নিরাকার হবে। যাদেরকে সাকার বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান করা যায় তাদের সমষ্টি যখন নিরাকার তখন যিনি প্রত্যক্ষের অতীত তিনিও নিরাকার। অতএব ঈশ্বর নিরাকার।

চতুর্থতঃ ভূমি পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, জল চার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তেজ তিন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, বায়ু দুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং আকাশ এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর যিনি আকাশের অতীত তিনি কোন ইন্দ্রিগ্রাহ্য নন। যা সাকার তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। জগদীশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন সুতরাং তিনি সাকার নন, নিরাকার।

এরপর আচার্য গুরুনাথ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে ঈশ্বরের নিরাকারত্বের প্রমাণ উল্লেখ করেন। মহর্ষি দত্তাত্রেয় অবধূত-গীতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখেছেন-

নিরাময়ং নিস্প্রতিমং নিরাকৃতিং

নিরাশ্রয়ং নির্বপুষং নিরাশিষম্...।

(অর্থাৎ নিরাময়, নিস্প্রতিম, নিরাকার, নিরাশ্রয়, অশরীর নিরাশিষ...)

শ্রুতিতে আছে-

অশব্দ মস্পর্শ মরূপমব্যয়ং

তথাহরসং নিত্য মগন্ধবচ্চ যৎ।[১৩১]

(অর্থাৎ অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য অগন্ধ যেই...)।

ইসলাম ধর্ম গ্রন্থ আল-কোরানে ঈশ্বরকে নিরাকার বলা হয়েছে। খৃষ্টান ও য়িহুদী ধর্মেও ঈশ্বরকে নিরাকার বলা হয়েছে। সুতরাং ঈশ্বর নিরাকার এ তত্ত্ব যুক্তিসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ।

তবে সাকারবাদের অনুকূলে নিম্নরূপ কথা আসতে পারে বলে আচার্য গুরুনাথ মনে করেন। যেমন- যার জ্ঞানাভিমান আছে, তিনি সাকার না মানতেও পারেন কিন্তু যে ভক্ত, যে প্রেমিক, সে কিছুতেই সাকার না মেনে পারেনা। যখন অভীষ্টকে দেখার জন্য তার প্রবল বাসনা জন্মে তখন আরাধ্যদেবকে না দেখে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবেনা। মুহুর্মূহু মোহপ্রাপ্ত হবে, অশ্রুপ্লাবিত হতে থাকবে, মুখে হাহাকার শব্দ হতে থাকবে। কেবল হা নাথ, হা দেব বলে চিৎকার করতে থাকবে। তখন কেউ তাকে বুঝাতে পারবেনা যে সে তার উপাস্যকে দেখতে পাবে না। কেউ এরূপ বললেও সে তা সত্য বলে মেনে নেবেনা। গুণের মধ্যে ভক্তি ও প্রেম অতি প্রধান সুতরাং গুণীর মধ্যে ভক্ত ও প্রেমিক শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যা না মেনে পারেন না, তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। অতএব সাকারবাদ সত্য। সাকারবাদ সত্য বলে যে নিরাকারবাদ মিথ্যা তা নয় তবে বক্তব্য যে, ঈশ্বর নিরাকার সর্বশক্তিমান সুতরাং সর্বশক্তিমত্তা ধর্ম থাকায় তিনি নিরাকার হয়েও সাকার হতে পারেন।

---

[১৩১] কঠোপনিষদ, ৬৯

এর উত্তরে আচার্য গুরুনাথ বলছেন যে, কি ভক্ত, কি প্রেমিক, কি জ্ঞানী এঁরা স্বাবলম্ব গুণের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হলেই ঐ সকল গুণের পরমোৎকর্ষ-স্থান অর্থাৎ ঈশ্বর নিরীক্ষিত হন। এ বিষয়ে অন্য মত নাই। কিন্তু ঐ দর্শনের সময়ে কি ঈশ্বর পরমাণু সমুৎপন্ন দেহ ধারণ করেন? যদি করেন তবে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবেন। কিন্তু যিনি বাক্য মনের গোচর নন তিনি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবেন একথা যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, দর্শন স্বীকার করা হচ্ছে অথচ সাকার মানা হচ্ছেনা- এর কারণ কি? এর উত্তর এই যে, ঈশ্বর দর্শনের সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মনে লীন হয়। মন জীবাত্মায় লীন হয়। পরে জীব স্বীয় প্রভুর কৃপায় তার সাক্ষাত লাভ করে মুক্ত হয়। এ বিষয়ে দক্ষ সংহিতায় উক্ত আছে-

বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে।।
বহির্মুখানি সর্বাণি কৃত্বা চাভিমুখানি বৈ।
সর্বঞ্চৈবেন্দ্রিয়গ্রামং মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ।।
সর্বভাব-বিনির্মুক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ।
এতদ্ধ্যনঞ্চ যোগশ্চ শেষাঃ স্যু র্গ্রন্থ-বিস্তরা।।

(অর্থাৎ- মনকে বৃত্তিহীন করে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করলে মুক্তি হয়। এ-ই মুখ্য যোগ। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়দিগকে অন্তর্মুখ করে সমুদায় ইন্দ্রিয়কে মনে এবং মনকে জীবাত্মায় যোজনা করবে এবং সর্বভাব বিনির্মুক্ত হয়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় নিক্ষেপ করবে। এ-ই ধ্যান এ-ই যোগ, অবশিষ্ট সকল কেবল গ্রন্থবাহুল্য মাত্র।)

এই সাক্ষাৎকার সময়ে লীনেন্দ্রিয় মনের জীবাত্মায় লীনতা-নিবন্ধন দর্শন, শ্রবণ, মননাদি সর্বশক্তিই জীবে থাকে। এ কারণে সে এক অনির্বচনীয় দর্শন। সে অরূপ-রূপদর্শন যার ভাগ্যে ঘটে সে ব্যক্তিই তা অনুভব করতে পারে কিন্তু বলতে পারেনা। এ কারণে এটা নিশ্চিত যে সাধারণতঃ যে সব মূর্তি কল্পনা করা হয় ঈশ্বর তা নন। তবে তাঁর সর্বব্যাপীত্বের জন্য সব জায়গায় তাঁর সত্ত্বা স্বীকারে কোন দোষ নাই।

আচার্য গুরুনাথের মতে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বলে তাকে শরীরবিশিষ্ট কোন মানুষ বা মানবীয় আকারে বিশ্বাস করা অযৌক্তিক। গুণবান মানুষের প্রতি ভক্তি করা জীবনের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু তাই বলে এক খন্ড সামান্য পাথরকে হিমালয় জ্ঞান করাকে গুণাদরেচ্ছা বলা যাবেনা। জগতে যাঁরা অতি উচ্চ কাজ সম্পাদন করেছেন বা করছেন, তাদের প্রতি ভক্তি করা উত্তম এবং দেবদেবীগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাদের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রকাশ অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাই বলে ঐ সকল ভক্ত ও দেবদেবী যাঁর অংশ, তাঁকে ঐ সকল রূপে ভাবনা করা বিজ্ঞতার কাজ নয়। সমস্ত ব্রহ্মান্ড যাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে তিনি সব জায়গায় আছেন, তাঁকে যে কোন পদার্থের মধ্যে বিবেচনা দোষণীয় নয় কিন্তু সেরূপ অধিকারী না হয়েও রূপ বিবেচনা করা ঠিক নয়। এ আলোচনা শেষে আচার্য গুরনাথ বলছেন যে, ঈশ্বরকে সাকার বললে যে সব দোষ হয় নিরাকার বললে সে সব হতে পারে না। বরং প্রকৃত বিষয়ের কিয়দংশ বর্ণনা

করা হয় সুতরাং জড় প্রকৃতিরা তাকে সাকার ভাবলেও জ্ঞানার্থিদিগের প্রথমাবস্থায় তাঁকে নিরাকার বোধ করাই উত্তম।

আচার্য গুরুনাথের মতের অনুকূলে অন্যান্য মনীষিদের মত ও শাস্ত্র প্রমাণ দেখা যায়।

বিবেকানন্দ বলছেন, আমরা মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি আনতে পারি না। ঈশ্বর তো নিরাকার, নিত্য, সর্বব্যাপী, তাঁকে সাকার বলে চিন্তা করা মহাপাপ। ঐ রকম চিন্তা করলে ঈশ্বর নিন্দা হয়।[১৩২] ঈশ্বরের কোন স্থূল আকার থাকতে পারে কিনা এ প্রসঙ্গে যোগসাধক নবীন চন্দ্রের (তিব্বতী বাবা) মত-

"অখন্ড মন্ডলাকার যে পরমসত্য সর্বচরাচরকে ব্যাপ্ত করে আছেন, তাঁর কোন লিঙ্গাভেদ থাকতে পারেনা, এবং কখনও তিনি কোন সংকীর্ণ মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তিনি পরম ঈশ্বর, সকলের কারণের কারণ, অগতির গতি, তিনি একাত্মভাবে নির্গুণ ও নিরবয়ব... মন্ত্র ও দেবদেবীর ধ্যানমূর্তিগুলোকে মানুষেরই কল্পনাপ্রসূত মনে হয়। এই সব দেবতা মানুষেরই সৃষ্টি।[১৩৩] অষ্টাবক্র সংহিতায় আছে-

ব্রহ্মান্ডস্থিত যাবতীয় সাকার পদার্থই মিথ্যা এবং নিরাকারই সত্য।[১৩৪]

কুলার্ণবতন্ত্রে আছে-

অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্মকান্ডরতানরাঃ

ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দপরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ।[১৩৫]

অর্থাৎ রূপহীন পরমাত্মাকে রূপবিশিষ্ট কল্পনা করে অজ্ঞান মনুষ্যেরা কর্মকান্ডে রত হয়।

অষ্টাবক্র সংহিতায় আছে-

কৃত্বামূর্তিপরে জ্ঞানং চেতনস্য ন কিং কুরু।

নির্ব্বেদমমতাযুক্ত্যা যস্তারয়তি সংসৃতেঃ।।[১৩৬]

অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মূর্তি কল্পনা করে কোন কার্য করো না।

বাজসেনোয়োপনিষদে আছে-

অসূর্য্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মাহনো জনাঃ।[১৩৭]

---

[১৩২] বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পরিকল্পনা ও সম্পাদনা, প্রসূন বসু, শচীন্দ্রনাথ ভট্টচার্য্য, প্রকাশক : প্রসূন বসু, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬৭

[১৩৩] দ্রষ্টব্য, সুধাংশ রঞ্জন ঘোষ, ভারতের সাধক-সাধিকা, তুলি-কলম, কলিকাতা ১৩৭১ বাং, পৃ. ৫৪

[১৩৪] অষ্টাবক্র সংহিতা, ১/১৮

[১৩৫] কুলার্ণবতন্ত্র, দ্রষ্টব্য,হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, জ্ঞানদর্পণ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৭১বাং,পৃ. ৫৪

[১৩৬] অষ্টাবক্র সংহিতা, ৮ম প্রকরণ, দ্রষ্টব্য হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

[১৩৭] বাজসেনেয়োপনিষদ,৩ শ্লোক

অর্থাৎ- যারা পরমাত্মার স্বরূপকে হনন করে (সাকারভাবে অর্চনা করে), তারা মরণোত্তর কালে অন্ধকারময় অজ্ঞানাবৃত অসূর্য নামক লোকে গমন করে।

যোগবাশিষ্টে আছে-

আস্তেঽনন্তামিতোভাস্বানজো দেবো নিরাময়ঃ।

সর্বদা সর্বহৃৎ সর্ব পরমাত্মা মহেশ্বর।।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে যৌ যুক্তে রধিগম্যতে।

যস্য চাত্মাদিকা সংজ্ঞা কল্পিতা না স্বভাবজা।।[১৩৮]

অর্থাৎ অনন্ত স্ব প্রকাশ, জন্মরহিত নিরাময়, সর্বহর্তা, পরমেশ্বর পরমাত্মারূপে সর্বত্র অবস্থিতি করেন। তিনি বাক্যের অগোচর এবং ধ্যানযোগ দ্বারা লভ্য। তাঁর পরমেশ্বরাদি নাম কেবল কল্পনামাত্র। ইহা স্বাভাবিক নয়। বিষ্ণুপুরাণ বলছে-

রূপ নামাদি-নির্দেশ-বিশেষ-বিবর্জিতঃ।

অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামাতির্জন্মভিঃ

বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং য সদাস্তীতি কেবলম্।[১৩৯]

অর্থাৎ পরমাত্মা নাম রূপাদি বিশেষণরহিত, অবিনাশী, অবস্থান্তরশূন্য, দুঃখ ও জন্মবিহীন। সুতরাং তিনি আছেন এই মাত্র তাঁর বিষয়ে বলা যায়। মহাভারতেও তাঁকে অজ, ইন্দ্রিয়াতীত, চৈতন্যরূপ, নিরাকার ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করে তাঁরই ভজনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪০]

মহানির্বাণতন্ত্রে আছে-

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পনম্।

বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্ত নাত্র সংশয়।[১৪১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কল্পনার সৃষ্টি সমুদয় নাম রূপাদি বালক্রীড়াবৎ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মনিষ্ঠ হয় সে মুক্তিলাভ করে, এতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু ধর্ম ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের আচার ব্যবহার এবং বিবেকের অনুমোদনের উপরই নির্ভর করে।হিন্দু ধর্মকে এক কথায় বৈদিক ধর্ম বলে বর্ণনা করা যায়। চতুর্বেদই হিন্দুধর্মের মূল। বেদ হিন্দুদের সিদ্ধশাস্ত্র। নিরাকার পরব্রহ্মকে হিন্দুধর্মের নানাশাস্ত্রে সাকার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে- যা শ্রুতিবিরুদ্ধ। স্মৃতি-শ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যহীন গ্রন্থকে শাস্ত্রের মর্যাদা দিতে অনেকেই ইচ্ছুক নন। এ সম্বন্ধে কূর্ম পুরাণে বলা হয়েছে-

---

[১৩৮] যোগবাশিষ্ট ৪ সর্গ ৭১-৭২ শ্লোক অনুবাদ, হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

[১৩৯] বিষ্ণুপুরাণ ১/২, ১৯/৭৯

[১৪০] মহাভারত-শান্তিপর্ব ৩৩৯, অধ্যায় ২১-২৫ শ্লোক

[১৪১] মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪ উঃ ১১৭ শ্লোক

"... এই লোকে বেদ বিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে নানাবিধ শাস্ত্র দেখা যায়, সে সমুদায়ের তামসীগতি; তদনুসারে চললে অন্তে অধোগতি হয়।"[১৪২]

কাজেই হিন্দু শাস্ত্রে নিরাকারবাদই স্মৃতি-শ্রুতির অনুমোদিত বলে এমতই গ্রহণযোগ্য।

আচার্য গুরুনাথ বলেন যে, সাকারবাদ ও নিরাকারবাদের মধ্যে একটি ক্রম দেখা যায় যে, নিরাকারবাদ প্রচারের জন্য অনেক চেষ্টা হলেও পরবর্তী সময়ে তা সাকারবাদে পরিণত হয়েছে। হিন্দুধর্মের প্রধান শাস্ত্রগুলোতে নিরাকারবাদ দেখা গেলেও পরবর্তীকালে অনেক হিন্দুরা সাকারবাদী হয়ে পড়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মসমূহেও এ ক্রম লক্ষ্য করা যায়।

যীশুখ্রীষ্ট উপদেশ দিলেন 'আমার স্বর্গস্থ পিতার ভজনা কর'। কিন্তু পরবর্তীতে খ্রীষ্টানগণ অনেকে যীশুখ্রীষ্টকেই ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করতে শুরু করলেন। গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করতে লাগলেন। ধর্মে ঈশ্বরকে নিরাকার বলা হলেও বিভিন্নভাবে সেখানে সাকারবাদ প্রভাব বিস্তার করেছে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও মত আলোচনা করলে এ মতের সমর্থন মেলে।

জরথুস্থ্র মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি সূক্ষ্ম এবং সেজন্য তিনি সাধারণ মানবীয় জ্ঞানের বিষয় নন। ঈশ্বর সূক্ষ্ম, সুতরাং তাকে কোন আকারে চিন্তা করা যায়না।[১৪৩] তবে জরথুস্থ্র মতে ঈশ্বরের প্রকাশ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে সাকারবাদী চিন্তাধারায় উদ্ভব ঘটেছে। ঈশ্বর নিজেকে ছয়জন শ্রেষ্ঠ দেবদূত এর মাধ্যমে প্রকাশিত করেন।[১৪৪] এতে দেখা যায় যে, ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকভাবে অর্থাৎ সাকারভাবে নিজকে প্রকাশিত করেন। সুতরাং এখানে সাকারবাদ এসে পড়েছে। বিশেষ মূর্ত্তিতে বা ব্যক্তিক সত্ত্বায় প্রকাশিত হলে সর্বব্যাপিত্ব ও নিরাকারত্বের ধারণা ক্ষুণ্ন হয়।

ইহুদী ধর্ম নিরাকারবাদী। কিন্তু ইহুদী ধর্মগ্রন্থে সদা প্রভু সম্বর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে দেহধারী এবং সাধারণ মানুষের মত ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি সম্পন্ন বলে মনে হয়। তিনি সাধারণ মানুষের মত হেঁটে বেড়ান, হাত-মুখ ধুয়ে রুটি মাংস প্রভৃতি খান। বাইবেলে (পুরাতন নিয়মে) আছে- "...পরে সদা প্রভু মম্রির এলোন বনের নিকটে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তিনি দিনের উত্তাপ সময়ে তাম্বুদ্বারে বসিয়াছিলেন। আর চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ; সম্মুখে তিনটি পুরুষ দন্ডায়মান। দেখিবা মাত্র তিনি তাম্বুদ্বার হইতে তাঁহাদের নিকট দৌঁড়িয়া গিয়ে ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "হে প্রভো বিনয় করি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তবে আপনার এই দাসের নিকট হইতে অগ্রসর হইবেন না। বিনয় করি, কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া দিই, আপনারা পা ধুইয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন এবং কিছু খাদ্য আনাইয়া দিই, তাহা দ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত করুন, পরে পথে অগ্রসর হইবেন...।

---

[১৪২] দ্রষ্টব্য, হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

[১৪৩] দ্রষ্টব্য, Dr. H.K. Mirza, Zoroastrianism, *Religions of India,* Clarion Books, New Delhi, ১৯৮৩, P.১৮৭

[১৪৪] ... He sometimes reveals himself to men through his archangels... Through six modes or archangels Supreme God or Ahura Majda reveals Himself. These are-Asha, Vohu Mano (through whom Ahura Mazda is reported to have revealed Himself to Zoroaster), Kshathra, Armaiti, Haurvataf and Ameretat. দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪

তখন তিনি দধি, দুগ্ধ ও পক্ক মাংস লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন এবং তাঁহারা ভোজন করিলেন।[১৪৫]

খ্রীষ্ট ধর্মকেও নিরাকারবাদী বলা হয়। কিন্তু ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ঈশ্বরের আকারের ইঙ্গিত রয়েছে। বাইবেলে আছে-

"ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষকে তৈরি করেছেন।[১৪৬] ঈশ্বরের মূর্তি না থাকলে তাঁর প্রতিমূর্তির কথা আসে না। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মানুষ যখন আকার বিশিষ্ট তখন ঈশ্বরও আকার বিশিষ্ট হয়ে পড়েন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গ্রীক দার্শনিক জেনোফিনিস এ মতের সমালোচনা করেছেন। তিনি ঈশ্বরে নরত্বারোপের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে মানুষ নিজেদের আকারে ঈশ্বরের রূপ দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এরূপ নন। এ ঈশ্বর মানুষের গড়া। ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষকে গড়েন নাই বরং মানুষ আপন প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বরকে গড়েছে। ঘোড়া যদি তাঁর ঈশ্বরের আকারের কথা বলে তবে সে আকার হবে একটি ঘোড়ার।[১৪৭]

এছাড়া বাইবেলে আছে যে,

"ঈশ্বরের আকার কেউ কখনো দেখেনি।[১৪৮]

এ থেকে ঈশ্বরের আকার আছে বলেও অনুমান করা যেতে পারে আবার নাই বলেও অনুমান করা যেতে পারে। ঈশ্বরের আকার না থাকলে সে সম্বন্ধে কোন কথা থাকতনা, আবার তাঁর আকার নাই, তাই কেউ দেখেনি- এ দুই অর্থেই উক্তিটিকে গ্রহণ করা যায়। বাইবেলের অন্যান্য উক্তিতে স্পষ্টতঃই ঈশ্বরকে বিশিষ্ট মূর্তিতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন-প্রভু যীশু উর্দ্ধে গৃহিত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন।[১৪৯] আমি গাব্রিয়েল ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকি।[১৫০] এসব জায়গায় ঈশ্বরের দক্ষিণ এবং সম্মুখ দিক আছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের দক্ষিণ বা সম্মুখ দিক থাকলে তার অবস্থান সীমিত হয় তিনি দেশকালের অধীন হয়ে পড়েন এবং এ থেকে তাঁর যে কোন ধরণের একটি আকার আছে বলে মনে করা যায়। আবার বাইবেলে এও আছে যে,

"সেই সিংহাসনের উপর এক ব্যক্তি বসে আছেন। যিনি বসে আছেন তিনি দেখতে সূর্য্যকান্ত ও সার্দ্দীয় মণির তুল্য। আর সেই সিংহাসনের চারিদিকে মেঘধনুক, তা দেখতে মরকত মণির তুল্য..."[১৫১] এখানে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' তিনি সিংহাসনে বসেন, তাঁকে পার্থিব রূপের অর্থাৎ সূর্যকান্ত ও সার্দ্দীয় মণির সাথে তুলনা করা হয়েছে। সিংহাসনে বসেন এর অর্থ বিশেষ রূপে বিশেষ স্থলে আবির্ভাব ধরা যেতে পারে আর দেখতে সূর্য্যকান্ত সার্দ্দীয় মণির তুল্য বলতে তাকে জ্যোতি: স্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বাইবেলে ঈশ্বরের যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে মনে হয় ঈশ্বর সর্বব্যাপী ; কাজেই কোন বিশেষ স্থানে বিশেষ

---

[১৪৫] বাইবেল, ধর্মপুস্তক অর্থাৎ নতুন ও পুরাতন নিয়ম, ব্যাঙ্গালোর, ভারতের বাইবেল, সোসাইটি, ১৯৬৬, ১৮/১-৮

[১৪৬] বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, আদিপুস্তক ৯/৬

[১৪৭] K. Ajdukiewicz, *Problems and Theories of Philosophy,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

[১৪৮] বাইবেল, নতুন নিয়ম, যোহন ১: ১৮

[১৪৯] ঐ, মার্ক ১৬ : ১৯

[১৫০] ঐ, লুক ১ : ১৯

[১৫১] ঐ, প্রকাশিত, ৪: ২-৩

আসনে তাঁর আবির্ভাব কল্পনা করা অযৌক্তিক। আর তাঁর জ্যোতি যখন পার্থিব কোন বস্তুর সাথে তুলনীয় হয়েছে তখন তাঁকে দৃশ্যমান মনে করা হয়েছে। ফলে তাঁর আকারের একটা ইঙ্গিত এখানে করা হয়েছে।

কিন্তু বাইবেলে আরও আছে-

"... পরে তিনি আসিয়া, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে সেই পুস্তক গ্রহণ করিলেন।[১৫২]

পরে সেই চব্বিশজন প্রাচীন যাহারা ঈশ্বরের সম্মুখে আপন আপন সিংহাসনে বসিয়া থাকেন তাঁহারা অধোমুখে প্রণিপাত করিয়া...।[১৫৩]

এখানে একেবারে জড় বর্ণনা দেখা যায়। পার্থিব মানুষের মত ঈশ্বরের হাত আছে, সে হাতে বই আছে, পৃথিবীর রাজাদের মত তাঁর দরবার আছে।

খ্রীষ্টধর্মে সাকারবাদের অন্য রূপটিও দেখা যায়।

যীশু বলছেন-

"আমার স্বর্গস্থ পিতার ভজনা কর।[১৫৪]

কিন্তু খ্রীষ্টানগণ যখন যীশুখ্রীষ্ট ও মাতা মেরীর আরাধনা শুরু করলেন তখন তারা সাকারবাদী হয়ে পড়লেন। যীশু খ্রীষ্টকে যীশুখ্রীষ্ট জ্ঞানে আরাধনা করলে সাকারবাদ ঘটতনা। যীশুখ্রীষ্ট দেহধারী মানুষ, তাকে পরমেশ্বর মনে করায় সাকারবাদ (de-i-fication) ঘটছে। এমত ঈশ্বরের অবতার বলে যীশু খ্রীষ্টকে স্বীকার করে, অনেকটা হিন্দু অবতারবাদীদের মত।[১৫৫]

অবশ্য বাইবেলে ঈশ্বর ও যীশু এক, এরূপ বলা আছে। যীশু বলেছেন-

"আমি ও পিতা এক"[১৫৬]

এই অভেদভাব খ্রীষ্টধর্মে গৃহিত হয়েছে। শুধু এই এক জায়গায়ই যীশু বলছেন আমি ও পিতা এক। আর কয়েক জায়গায় আছে-

"আমি পিতাতে আছি ও পিতা আমাতে আছেন।"[১৫৭] তবে এসব উক্তি দ্বারা যীশুই যে ঈশ্বর তা প্রমাণিত হয়না। 'আমি ও পিতা এক' এ উক্তিতে যীশু ঈশ্বর হন না বরং বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে যীশুর নিজ-সত্ত্বা পরমপিতাতে পূর্ণভাবে সমর্পিত হলে তিনি এরূপ বলতে পারেন। সুফী সাধক মনসুর

---

[১৫২] ঐ, ঐ, ৫ : ৭

[১৫৩] ঐ, ঐ, ১১ : ১৬

[১৫৪] ঐ, ঐ, ২২ : ৯

[১৫৫] খ্রীষ্টয় অবতারবাদ সম্পর্কে John Hick লিখেছেন-

"The doctrine of the Incarnation involves the claim that the moral (not the metaphysical) attributes of God have been embodied, so far as this is possible, in a finite human life, namely that of the Christ," দ্রষ্টব্য, John Hick, *Philosophy of Religion,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

[১৫৬] বাইবেল, নতুন নিয়ম, যোহন ১০ : ৩০

[১৫৭] ঐ, ঐ, ১০:৩৮, ১৪:১০

হাল্লাজও এরূপ কথা বলেছেন। আল্লাহর সত্ত্বায় অধিষ্ঠিত বাক্কা অবস্থায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'আনাল হক্ক'(আমিই পরমসত্য)। হিন্দু ধর্মেও এরূপ দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, কোন এক সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান। পরে আবার অর্জুন বিশ্বরূপ দেখতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ জানান তিনি ব্রহ্মে যোগযুক্ত নাই। সুতরাং দেখাতে পারবেন না। আগে যখন তিনি ব্রহ্মে যোগযুক্ত ছিলেন তখন বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন।[১৫৮]

সুতরাং ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে এরূপ যুক্ত অবস্থায় সাধকের ঐ অভেদভাব আসে। যীশু খ্রীষ্টও ঐরূপ অবস্থায় ঐরূপ কথা বলতে পারেন। এতে তিনিই যে ঈশ্বর এরূপ বোঝায় না। বাইবেলের সর্বত্রই পিতা (ঈশ্বর) ও পুত্রের (যীশুর) স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকৃত হয়েছে। যীশু বলেছেন,

"...পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য সকল করেন।"[১৫৯]

যীশু নিজে কিছুই করেন না, কেবল পিতা তাকে দিয়ে যা করান বা যা করতে বলেন তাই করেন। তিনি বলেছেন-

"...আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করি ও তাঁহার কার্য সাধন করি।"[১৬০]

"...পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেনা, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন তাহাই করেন।"[১৬১]

"...আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারিনা...আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিনা, কিন্তু আমার প্রেরণ কর্তার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি।"[১৬২]

"...আমি আপনা হইতে আসি নাই; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি সত্যময়..."[১৬৩]

যীশু অপূর্ণ আত্মা। বাইবেলে আছে-

"তিনি জ্ঞানে পূর্ণ হতে লাগলেন...ঈশ্বরের অনুগ্রহে বাড়তে লাগছেন।"[১৬৪]

এই অপূর্ণ আত্মার সাথে ঈশ্বরকে অভিন্ন করা যায় না কেননা ঈশ্বর পূর্ণ। যীশু অনেক জায়গায় বলেছেন-

"...আমাকে সৎ কেন বলছ, সৎ একজন মাত্র তিনি ঈশ্বর।"[১৬৫]

যীশু পিতা (ঈশ্বর) থেকে নিজেকে সবসময়ই আলাদা করেছেন। বাইবেলে আছে-

---

[১৫৮] মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব, ষোড়শ অধ্যায়, অনুগীতা পর্বাধ্যায়, অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৭২
[১৫৯] বাইবেল, যোহন, ১৪:১০
[১৬০] ঐ, ঐ, ৪:৩৪
[১৬১] ঐ, ঐ, ৫:১৯
[১৬২] ঐ, ঐ, ৫:৩০
[১৬৩] ঐ, ঐ, ৭:২৮-২৯
[১৬৪] ঐ, লুক, ২:৪০
[১৬৫] ঐ, মার্ক ১০:১৭-১৮

"...তোমাদের পিতা একজন তিনি সেই স্বর্গীয়, তোমাদের আচার্য একজন তিনি খ্রীষ্ট।"[১৬৬] পিতা ও পুত্র এক নন। পিতা পুত্র অপেক্ষা বড়। পুত্র যা জানেনা পিতা তা জানে।[১৬৭] যীশু বলেছেন যে, তিনি পিতা কর্তৃক প্রেরিত,[১৬৮] তিনি পিতার দাস[১৬৯] প্রেরণ কর্তা প্রেরিত অপেক্ষা বড়,[১৭০] প্রভু দাস অপেক্ষা বড়।[১৭১] যীশু ঈশ্বরের মহাযাজক[১৭২] বিশ্বাসীদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা[১৭৩] এছাড়া বইবেলে সর্বত্রই ঈশ্বর ও খ্রীষ্টকে আলাদা সম্ভাষণে আলাদাভাবে ধন্যবাদ দেয়া হয়েছে।[১৭৪] যীশু স্বর্গে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসেন; এখানেও যীশু ও ঈশ্বর আলাদা সত্ত্বা। বাইবেলে আছে- 'যীশু স্বর্গে ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি।[১৭৫]

ঈশ্বর স্রষ্টা। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক হতে পারেনা। অতএব এসব স্থলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, যীশু ও ঈশ্বর এক নন। তবে সাধারণভাবে যে বিশ্বাস খ্রীষ্টধর্মে আছে, তা হল, ঈশ্বরের সাথে মিলন বা জাগতিক দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির একমাত্র মাধ্যম হল যীশু। এ মতে যীশু ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন নন। মানুষের মুক্তির জন্য প্রেরিত পুরুষ যীশু।[১৭৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যীশু ও ঈশ্বর এক নন। যীশু ঈশ্বরের প্রেরিত, ঈশ্বরের সৃষ্ট, সবিশেষ শক্তিসম্পন্ন মানুষ। যীশু ঈশ্বর নন। কিন্তু বর্তমান খ্রীষ্টধর্মের অনেক সম্প্রদায় যীশুকে ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করে। এ কারণে খ্রীষ্টধর্ম সাকারবাদে উপনীত হয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে এবং কেবল তাঁরই আরাধনা করবে।"[১৭৭]অথচ, বাইবেল অনুসারীগণ যীশুকেই ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে তাঁর আরাধনা করছেন। ফলে খ্রীষ্টধর্মে সাকারবাদ চলে এসেছে। যীশুখ্রীষ্ট যখন সৃষ্ট আকার বিশিষ্ট মানুষ তখন তাকে স্রষ্টা বা ঈশ্বর বলে আরাধনা করলে, এমত সাকারবাদী হয়ে পড়ে।

বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করেন না। তাদের মতে পরিণতি কারণরূপে কোন

---

[১৬৬] ঐ, মথি ২৩ : ৯-১০
[১৬৭] ঐ, ঐ, ২৪ : ৩৬
[১৬৮] ঐ, যোহন ৫ : ৩৬, ৭ : ৩৬
[১৬৯] ঐ, মথি ১২ : ১৮, প্রেরিত ৩ : ১৩, ৪ : ২৭
[১৭০] ঐ, যোহন ১৩ : ১৬
[১৭১] ঐ, ঐ, ১৩ : ১৬
[১৭২] ঐ, ইব্রীয়, ৩ : ১, ৪ : ১৪
[১৭৩] ঐ, ঐ, ৩ : ১, ৪ : ১৪
[১৭৪] ঐ, প্রকাশিত, ৫ : ১৩, ৭ : ১০, ২ করিন্থীয়, ১ : ৩
[১৭৫] ঐ, ঐ, ৩ : ১৪
[১৭৬] Rev. James Shanks উল্লেখ করেন-
The Christian belief, therefore, that union with God or fellowship with God is possible only through Christ. … And the Apostle Paul wrote, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus : who gave himself a ransom for all (1 Timothy 2:5-6 দ্রষ্টব্য, Rev. James Shanks, *"Basic Christian Concepts"* Comparative Religion, Amarjit Singh Sethi and Reinhard Pummer (eds), New Delhi 1979, p.23
এ প্রসঙ্গে Saral Jhingran লিখেছেন "The God of the Christian religion cannot be understood without reference to His revealation in and through the son. Christianity is first and foremost a religion of redemption, a redemption from sin that possible only through Christ, দ্রষ্টব্য, Saral Jhingran, *The Roots of Worlds Religions,* New Delhi 1982, p.79
[১৭৭] বাইবেল, মথি ৪ : ১০

জগৎকর্তার অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নেই কেননা পরিণতি কারণ বলে কিছুই নেই। বৌদ্ধমতে কর্মের থেকে বড় কিছু নেই, কর্মের ফলেই জীবের উদ্ভব; জীবের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই।

জে.এন.উপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, গৌতমবুদ্ধের মতে, জড় বা অজড় কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হলে সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। এখানে উল্লেখ্য যে, যে যুগে বৌদ্ধ চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটে, সে সময় মানুষের মধ্যে এমন এক ঈশ্বরের ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর সব ধরনের জড়পদার্থ ও জীবজগতের একমাত্র স্রষ্টা, পালক ও সংহারক এবং ভালমন্দ যা কিছু ঘটে সবকিছুর কারণ। প্রাক্ বৌদ্ধ মত অনুসারে ঈশ্বরকে সবকিছুর মৌলিক উৎস বলে স্বীকার করা হত। কিন্তু বৌদ্ধ চিন্তাবিদদের ধারণা যে, এরূপ একজন সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায়না। সুতরাং এরূপ একটি অদৃষ্ট ও অজানা সত্ত্বায় বিশ্বাস সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। জে.এন. উপাধ্যায় আরও বলেন যে, বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা বিশ্বাস করেন কর্মে। গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বর ও আত্মার ধারণাকে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষ এবং তার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বৌদ্ধ মতে ধর্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয় বা পরাতাত্ত্বিক বিষয়ের কোন যুক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না।[১৭৮]

গৌতম বুদ্ধ[১৭৯] ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব ছিলেন।[১৮০] বৌদ্ধমতে জগতের কারণ জগৎ নিজেই, কোন পরিণতি কারণরূপে জগৎ স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা অযৌক্তিক। তাছাড়া ঈশ্বরের ধারণায় বলা হয় তিনি

---

[১৭৮] J. N. Upadhaya, "Irrelevance of God : A Budhist view, *BODHI-RAS'MI,* Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, 1984, p.99

[১৭৯] অনেকে শুধু বুদ্ধ লেখেন কিন্তু এতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। বুদ্ধ একজন নয়, অনেক বুদ্ধ আছেন। গৌতম বুদ্ধ নিজেই বলেছেন যে, আমার আগেও অনেক বুদ্ধ ছিলেন, পরেও অনেক বুদ্ধ আসবেন। মহাযানীরা আদি বা শাশ্বত বুদ্ধের কথা বলেন, তাছাড়া আছে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ। অমিতাভ বুদ্ধের অবতার মানুষ বুদ্ধ। বর্তমান বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন গৌতম বুদ্ধের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য 'গৌতম বুদ্ধ' ব্যবহার করা ঠিক বলে আমাদের ধারণা। অনেকে তাকে 'বুদ্ধদেব'ও বলেন। গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সাধনা সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক লিখেছেন। যেমন-

… he sat crosslegged under the Pipal tree (Bodhi) determined to enter perfect enlightenment sammasambodhi or perish : He said, 'Let my skin my nerves and bones waste away, let my blood dry up, I will not leave this posture until I have perfect enlightenment." More, the greatest tempter, the God of evil tried to entice him and dissuade him from his path by creating violent scenes with all power at his command, Mara tried to frighten the bodisattva, as Buddha was known before his Buddhahood, but he remained firm in his resolve.

It was on the night of a fullmoon of vaishakha the Gautama attained enlightenment or Bodhi and thense forward was called Bhagawan Buddha (Religions of India, Clarion Books, New Delhi, 1983, p.11)

See also, Davis S. and John B. Noss, *Man's Religions*, New York, 1984, p.110

[180] Theodore Stcherbatsky লিখেছেন-

"Buddha maintained a studied silence regarding some fundamental metaphysical questions e.g. Is the world beginingless or has it a beginning, is it finite or infinite; what is the condition of the saint after death or what is the nature of the Absolute? Budha either did not answer such questions at all or declared them as futile.

Schoalars like N. de la vallee Poussin and B. Keith interpret his silence as due to ignorance but the fact is that fundamental reality can not be explained in terms of the discussive intellect. Buddha maintained that the very effort of intellect to confine truth to a simple "either- or" to extremes is bound to prove futile, the truth lies in the middle path. It cannot be described in

পূর্ণ, কাজেই তিনি এই অপূর্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন না। জাগতিক সবকিছুর কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে স্বীকার করলে মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়; আর এজন্যই বৌদ্ধমতে ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই। কিন্তু, পরবর্তীকালের বৌদ্ধমতে ঈশ্বরের স্থান অপূর্ণ থাকে নি, মহাযানীরা গৌতমবুদ্ধকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে ঈশ্বরের অভাব পূরণ করেছেন ।তাদের মতে আদি বুদ্ধ শাশ্বত, মানুষ গৌতমবুদ্ধ তাঁর অবতার।

রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, প্রচলিত যুক্তি দ্বারাই প্রাচীন বৌদ্ধরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু গৌতমবুদ্ধ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।[১৮১] গৌতমবুদ্ধ জগতের স্রষ্টা ও আদিকারণ বা কর্মের নিয়ন্তা সম্বন্ধে কিছু না বললেও প্রচলিত কিছু বিশ্বাসকে নীরব সমর্থন জানিয়েছেন এবং মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে যোগাযোগের কথা বলেছেন।[১৮২] একদা কোন এক শিষ্যের প্রশ্নের জবাবে গৌতমবুদ্ধ বলেছেন, আমি সবসময় তোমাদের সাথে আছি। শিষ্যদের সাথে সবসময় থাকার অর্থ তিনি শাশ্বত বুদ্ধ। এখানে ঐতিহাসিক বুদ্ধ শাশ্বত বুদ্ধে পরিণত হলেন, যিনি বোধিসত্বের অবতাররূপে বিভিন্ন সময়ে আসেন তার দয়ার মাধ্যমে চেতন প্রাণীর মোক্ষপ্রদানের উদ্দেশ্যে। গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বরে বা তার দয়ায় যে মোক্ষলাভ হবে তা বলেননি কিন্তু লোটাস স্কুল বুদ্ধে এই বিশ্বাস আরোপ করে।[১৮৩] অশ্বঘোষ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বৌদ্ধধর্মে ঢুকিয়ে দেন। তার মতে বুদ্ধ হল পরমসত্ত্বা, অজ্ঞানতার দরুন যা এই দৃশ্যমান জগৎ বলে মনে হয়।[১৮৪]

থেরবাদ ঐতিহাসিক বুদ্ধে বিশ্বাস করে, যিনি এই জীবনেই বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। মহাযানীরা অপার্থিব ও অতীন্দ্রিয় বুদ্ধে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর ত্রিবিধ শরীরের কথা বলেন-

(১) ধর্ম কায় বা কারণ শরীর- সমস্ত কিছুর মধ্যে যে পরমসত্তা রয়েছে, (২) সম্ভোগকায় বা ঈশ্বর এবং (৩) নির্মাণকায় বা রূপান্তর শরীর যা স্বর্গীয় অবতরণ বা অবতার। ধর্মকায় হল অতীন্দ্রিয় পরমসত্ত্বা, নিত্য অবিভাজ্য, সর্বব্যাপী, সত্য এবং সমস্ত অস্তিত্বের আদর্শ।[১৮৫] অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা আদিবুদ্ধের অনেক অবতারের মধ্যে অন্যতম গৌতম বুদ্ধ।

সৃষ্টির মূল উৎস আদি বুদ্ধ, ইনি শূন্যস্বরূপ, ইনি বজ্ররূপেও কথিত। আদি বুদ্ধ থেকে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ উদ্ভুত হয়েছেন। প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধ থেকে বোধিসত্ব ও দেবদেবীগণ উদ্ভুত হয়েছেন। ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ থেকে উৎপন্ন বোধিসত্ত্ব হলেন অবলোকিতেশ্বর যিনি বর্তমান কল্পে পরম পালক।[১৮৬] এমত বৌদ্ধধর্মে সাকারবাদের প্রবর্তন করেছে।

---

terms of human language which is the product of analytical intellect. It is unspekable indefinable. Non duality is the product of analytical intellect. It is unspeakable indefinable : Non duality is above words" (Theodore Stcherbetsky, *The conception of Budhist Nirvan*, Motilal Baranasidas, Delhi 1977, p.64)

[১৮১] Radhakrishnan, *Indian Philosphy Vol. I,* Bombay 1977, p.455

[১৮২] ঐ, পৃ. ৪৬১-৪৬২

[১৮৩] দ্রষ্টব্য, J. N. Sinha, Unity of living faiths, *Humanism and World peace part-1,* Calcutta 1974, p.iv

[১৮৪] ঐ, p.v

[১৮৫] ঐ, পৃ. ৪২-৪৩

[১৮৬] দ্রষ্টব্য, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, *ভারতীয় দর্শন,* কলিকাতা ১৩৮২, পৃ. ৬৭

কে.এন. উপাধ্যায় লিখেছেন যে, বৌদ্ধদের সমালোচনা থেকে মনে হয় যে, ধর্মতত্ত্ব উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় বা পরাতাত্ত্বিক দিক থেকে তারা ঈশ্বরের ধারণার বিরোধী। ঈশ্বরকে যদি একজন ব্যক্তিরূপে ধারণা করা হয় যিনি স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক, নৈতিক পরিচালক এবং ন্যায়ের বিধানকারী বা আত্মারূপে মানুষের ভিতরে বসবাসকারী নীতি, তাহলে বৌদ্ধমতে এমন ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই। তবে এক বিশেষ দৃষ্টিতে, অর্থাৎ যদি ঈশ্বর অনির্বচনীয় এবং অসংজ্ঞায়িত পরমসত্ত্বা হন তবে বৌদ্ধ চিন্তাধারার সাথে এই ঈশ্বরের ধারণার সামঞ্জস্য আছে বলা যায়।[১৮৭]

এ আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আপাত দৃষ্টিতে ঈশ্বরের ধারণার বিরোধী মনে হলেও বৌদ্ধরা জড়বাদীদের (চার্বাক বা অন্যান্য) মত স্পষ্টভাবে নিরীশ্বরবাদী নন। তাঁরা নৈতিক নীতিমালা অস্বীকার করেন না বা অনবহিত জীবন যাপন করেন না। গৌতমবুদ্ধ মনে হয়, চরম বা পরম একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্ত্বার (যা ব্রহ্ম বলে পরিচিত) ধারণার প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন না, এই শর্তে যে, এ ধারণার উপর কোন পরাতাত্ত্বিক বা ধর্মতাত্ত্বিক প্রভাব থাকবে না, যা এ ধারণাকে শর্তাধীন বাস্তব জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে পারে। পরম সত্ত্বাকে যে কোন ধরণের সম্পর্কে সম্পর্কিত করার প্রচেষ্টাই পরমসত্ত্বাকে সম্পর্কযুক্ত করে ফেলে।

এই কারণেই গৌতমবুদ্ধ স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক ঈশ্বরের ধারণাকে বর্জন করেছেন এবং একই সাথে সবকিছুর মধ্যে বসবাসকারী ঈশ্বরকে(ব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক, স্বতন্ত্র বা সার্বিক) অস্বীকার করেন (জীবাত্মা বা সর্বভূতান্তরাত্মা)। ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরকে স্রষ্টা, পিতা, বন্ধু বা প্রেমিকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ তাঁকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।। এই সীমিত চিন্তাধারা, মানুষের চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতার সাথে ঈশ্বরের যথার্থ সত্তাকে বিশৃঙ্খল করে ফেলে। ঈশ্বর বা পরমসত্ত্বাকে অন্য কোন কিছুর সাথে কোন অবস্থাতেই সম্পর্কযুক্ত করা চলে না বা তুলনা করা চলে না। এ সত্ত্বা তাঁর নিজের মধ্যে যেমন ঠিক তেমন এবং একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের সত্ত্বা। কোন সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রকাশ করা যায়না। এতে তাঁর সত্ত্বার অসীমত্ব ক্ষুন্ন হয়ে যায়।

সেজন্য গৌতমবুদ্ধ পরম সত্ত্বা সম্পর্কে যাবতীয় সম্পর্কযুক্ত ধারণাকে, সেই নিরপেক্ষ সত্ত্বাকে শর্তাধীন করার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে এবং সেই অধার্য্য সত্ত্বাকে ধারণীয় করার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে বাঁধা দেন। গৌতমবুদ্ধ এই জাতীয় প্রার্থনা বা পূজার বিরোধিতা করেন, যেখানে ব্যক্তি স্বার্থের অভিমুখে প্রার্থনা করা হয় বা যেখানে ঈশ্বরকে জাগতিক সত্ত্বার আদর্শে তৈরী করা হয় এবং যা কেবল মানুষের পার্থিব সুবিধার জন্যই করা হয়। ঈশ্বরের এই সম্পর্কযুক্ত ধারণার দিকটা যদি বাদ দেয়া হয়, তাতে সমস্ত ঘটনা বাদ দিয়ে সত্য সত্ত্বা(পরম সত্ত্বা) প্রধানরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এটা সর্বোচ্চ সত্ত্বা বা নির্বাণ ছাড়া আর কিছুনা। এখানে ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদের পার্থক্যটা বোধ হয় লুপ্ত হয়ে যায়। এ সত্য বা সত্ত্বা বর্ণনা করা যায় না বা কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। এ সম্পর্কে বলতে গেলে বা চিন্তা করতে গেলে কেবল নঞর্থক রূপেই প্রকাশ করতে হয়।[১৮৮]

---

[১৮৭] K. N. Upadhaya, *Early Budhism and the Bhagavadgita*, Delhi 1983, p.392

[১৮৮] ঐ, পৃ. ৪০৫-৪০৬

বৌদ্ধমতে ঈশ্বরকে এভাবে প্রতিপন্ন করা হলে সে ঈশ্বর সাকারত্ব বা নিরাকারত্বের গণ্ডীতে আবদ্ধ হন না- এ ঈশ্বর সাকার-নিরাকারের অতীত। এই দৃষ্টিতে গৌতমবুদ্ধ ব্রহ্ম সেজন্যশব্দটির সাথে বিরোধিতা করেননি বরং এর সমার্থক শব্দ হিসেবে 'নির্বাণ' ব্যবহার করেছেন।[১৮৯]

সে জন্য বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি তাত্ত্বিক আলোচনা না করে মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে চিন্তা, দুঃখ বেদনা থেকে মানুষের মুক্তি লাভের উপায় নিয়ে চিন্তা, মানুষের কল্যানের চিন্তা পরম ধর্ম বলে গৃহীত হয়েছে। নৈতিক অগ্রগতির জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলে এ ধারণা মানুষকে নিস্ক্রিয় ও দায়িত্বহীন করে তোলে।

কে.এন. উপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, নির্বাণ হ'ল পরমসত্ত্বা এবং ধর্ম হ'ল পরমসত্য। যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন, স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান (ব্রহ্মভূত)[১৯০] বুদ্ধ নিজেই এভাবে বর্ণিত হয়েছেন, যিনি ব্রহ্ম লাভ করেছেন।[১৯১] তথাগতকে বলা হয়েছে যে, ধর্ম তার শরীর, ব্রহ্ম তার শরীর; তিনি ধর্মের সাথে এক, তিনি ব্রহ্মের সাথে এক (ধর্মকায়, ব্রহ্মকায়, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত)।[১৯২]

তবে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে ঈশ্বরের অভাব পূর্ণ করেছেন। তাদের মতে পরমসত্ত্বা আদিবুদ্ধ, গৌতমবুদ্ধ তাঁর অবতার। সুতরাং এরা ঈশ্বরবাদে ও অবতারবাদে বিশ্বাসী। অবতারবাদীরা সাকারবাদী আর সেজন্য বৌদ্ধ মহাযানীরা সাকারবাদী। আধুনিক বৌদ্ধধর্মের অনেক বৌদ্ধমঠ আছে যেখানে হিন্দু দেবতাদের মত বুদ্ধের প্রতিকৃতিতে পূজা করা হয়।[১৯৩]

গৌতমবুদ্ধকে ঈশ্বরের আসনে বসালে এমত সাকারবাদী হয়ে পড়ে। গৌতম বুদ্ধের উপর যেমন ঈশ্বরত্বের আরোপ করা হয়েছে তেমনই হিন্দু বৈষ্ণব বিশ্বাসে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ মহাত্মাগণ ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছেন। মানুষের উপর ঈশ্বরত্বের আরোপ খ্রীষ্টান ক্যাথলিক বিশ্বাসেও দেখা যায় যীশুখ্রীষ্টের ঐশীরূপ কল্পনায়। যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিবেচিত এবং তাঁর অবতার মানুষ যীশু। তবে অনেকের ধারণা যে, গৌতমবুদ্ধকে যে অর্থে ঈশ্বর বলা হয়েছে তা প্রচলিত অর্থের চেয়ে ভিন্নতর।[১৯৪]

---

[১৮৯] Theodore Stcherbatsky বলছেন যে, 'Nirvana may be said to be the equivalent of the Absolute' … Early Budhism and vaibhasikas regarded space and Nirvana as ultimate realities on the ground that the possessed a character (Dharma), a reality (Vastu), an individuality (Svalaksana), an existence of their own (Svabhava), দ্রষ্টব্য, Theodore Stcherbatsky, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪, ৭০-৭১

[১৯০] দিত্তে : বা ধম্মে নিচ্ছাতো নিব্বুতো... ব্রহ্মভূতেন অত্তনাবিহরতি (*Majjhima Nikaya* I. 344)

[১৯১] ব্রহ্মপত্ত (Majjhima Nikaya I. 386)

[১৯২] তথাগতস্য হি তং...অধিবচনং ধম্মকায় ইতি পি, ব্রহ্মকায় ইতি পি, ধম্মভূত ইতি পি, ব্রহ্মভূত ইতি পি (*Digha Nikaya* III 84 of *Majjhima Nikaya* III 195, 224)

[১৯৩] Kedarnath Tewary *Comparative Religion, New Delhi, 1983, p.50*

[১৯৪] এ প্রসঙ্গে কেদারনাথ তিওয়ারী বলছেন-

It is doubtful whether Budhists would take the Budha as God in the same theistic sense in which God is regarded as creator, the sustainer, the destroyer of the world. It seems that instead of taking him as the creator etc. the budhists for the most part worship him as an embodiment of holiness and commission and as a great spiritual leader and savior of mankind. দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, *Comparative Religion,* New Delhi, 1983, p.51

এ অর্থ ধরলে, গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বর হননা বরং তাঁকে মহাপুরুষ বলা যায়। কিন্তু যে কোন অর্থেই তাঁকে যদি ঈশ্বর বলা হয়, তবে সেমত সাকারবাদী হবে।

মহাযানীরা গৌতমবুদ্ধকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। গৌতমবুদ্ধকে গৌতমবুদ্ধ জ্ঞানে পূজা করলে সাকারবাদ ঘটত না। যে যা তাঁকে তাই বলে পূজা করলে সাকারবাদ আসেনা কিন্তু যে যা না তাঁকে তাই বলে পূজা করা সাকারবাদের লক্ষণ। গৌতমবুদ্ধ মানুষ, দেহধারী; তার পূজার সময় তাঁতে পরমেশ্বরের গুণাবলী আরোপ করা হয়ে থাকে। গৌতমবুদ্ধ নিজেকে কখনো ঈশ্বর বলেননি। গৌতমবুদ্ধের শক্তি বা সিদ্ধ অবস্থা দেখে সাধারণ লোকজন বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ

আপনি কি ঈশ্বর ?

না, বুদ্ধ উত্তর দিলেন।

: আপনি কি ঈশ্বরের দূত?

: না।

আপনি কি সাধু ?

না।

: তবে আপনি কি?

: আমি জাগরিত (awake)[১৯৫]

এর দ্বারা বোঝা যায়, গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত বা প্রকৃত চেতনা প্রাপ্ত। তিনি ঈশ্বর নন।

তবে বৌদ্ধ কোষকার অমর সিংহ স্বীয় গ্রন্থের প্রথমে লিখেছেন-

"...যস্য জ্ঞান দয়া-সিন্ধোরগাধস্যা নঘা গুণাঃ।

সেব্যতা মক্ষয়ো ধীরাঃ স শ্রিয়ৈ চামৃতায় চ।।

অর্থাৎ যিনি অগাধ জ্ঞানসিন্ধু ও দয়াসিন্ধু এবং যার অনঘ গুণসমূহ আছে, হে ধীরগণ, আপনারা সেই অক্ষয় (বুদ্ধ)কে শ্রী ও অমৃতের নিমিত্ত সেবা করুন।

আবার বৌদ্ধ দূর্গ সিংহ স্বকৃত 'কাতন্ত্রবৃত্তির' প্রথমে লিখেছেন-

"...দেবদেব প্রণাম্যাদৌ সর্বজ্ঞং সর্বদর্শীনম্।

অর্থাৎ, প্রথমে সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী দেবদেবকে প্রণাম করে।

এসব জায়গায় গৌতমবুদ্ধে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, অগাধ জ্ঞান সিন্ধু, দয়াসাগর, অক্ষয়, সকল দেবের দেব, ইত্যাদি পরমেশ্বরের গুণসমূহ আরোপ করা হয়েছে, তাকে পরমেশ্বর জ্ঞানে বন্দনা করা হয়েছে। গৌতমবুদ্ধ যখন পার্থিবভাবে দেহধারী ছিলেন তখন তাঁকে পরমেশ্বর জ্ঞান করলে সাকারবাদ এসে পড়ে।

[১৯৫] HUSTON SMITH, *The Religions of Man,* New York,1965, p.90

জৈনরা জগত কারণ রূপ কোন ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাদের যুক্তি হ'ল জগতের কারণ হিসাবে যদি ঈশ্বরকে থাকতে হয় তাহলে ঈশ্বরের কারণ রূপে অন্য কোন সত্ত্বা থাকতে হয়। জগতের সৃষ্টি পালন ও প্রলয়ের জন্য কোন ঈশ্বর জৈনরা স্বীকার করেন না। কোন ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণার বিরুদ্ধে জৈনরা অনেক আপত্তি তুলেছেন।[১৯৬]

জৈনদের যুক্তি থেকে অনুমিত হয় যে, এরাও যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে প্রমাণ না করতে পেরে প্রচলিত ঈশ্বরের অন্ধ-ধারণাকে পরিত্যাগ করেছেন। তবে পরবর্তী জৈনদের কেউ কেউ সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরকে[১৯৭] ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে ঈশ্বরের অভাব পূরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা সাকারবাদ টেনে এনেছেন। আবার অনেকে তাঁকে ধর্মীয় পরিচালক হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[১৯৮]

তবে বাস্তবে, যার কাছে প্রার্থনা করা হয় বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, নিজ কামনা-বাসনা, দুঃখ-দুর্দশার কথা জানানো হয়; সেক্ষেত্রে মনে মনে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, তাঁর ঐ বাসনা পূরণ করার বা দুঃখের অবসান ঘটানোর শক্তি আছে। যার কাছে প্রার্থনা করা হয় তিনি যদি সৃষ্ট মানুষ হন তাহলে এও এক ধরণের ঈশ্বরত্ব আরোপ এবং এক ধরণের সাকারবাদ।

সাকারবাদ ও নিরাকারবাদের এ ক্রম অনেক ধর্মে দেখা যায় না। যেমন-শিখ ধর্মমতে ঈশ্বর নিরাকার।শিখ ধর্মে ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা হয়।এ ধর্মমত ঈশ্বরের নিরাকারত্বের

---

[১৯৬] U.P.Shah লিখেছেন-, "Jainism does not recognize the need for existence of a personal God as an agency for creation, preservation or destruction of the world or for dispensing justice. According to Jainism the univers and all its elements and processes are regarded as uncreated and eternal sustained by its own inner inherent forces, দ্রষ্টব্য, U.P.Shah, Jainism, Karan Singh(ed.) *Religions of India,* Clarion Books, Delhi 1983, p.5

[১৯৭] Mahavira is an honorific title meaning "Great man" or "Hero". I has quite superseded Nataputta Vardhawana the name by which he was originally known… (Davis S. Noss andJohn B. Noss, *Mans Religions,* p.95)

এখানে তার কঠোর সন্যাস জীবনের বর্ণনা আছে- এই কঠোর সন্যাস ব্রত পালনের জন্যই তার নাম মহাবীর হয়। তার জন্ম ও জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অন্যত্র U.P.Shah লিখেছেন-

The Shvetambara believe that Mahavira was first conceived in the woumb of a Brahmin lady Devananda but the foetus was latter transferred to the woumb of a Kshatriya lady Trishala, by Hariengameshin the commander of God Indra. Since Indra realized that no Tirthankaras were born of Brahmin parents… Vardawana Mahavira performed rigorous austerities. At the age of thirty years he renounced worldly life and became a monk. For over a year he used one garment only but later he went about naked, kept no possessions, not even a boul for food or drinking water and performed rigorous austerities. He allowed insects to crawl on his body and even bite him…. He meditated day and night and lived various places … trying to avoid all sinful activities…

(Karan Singh (ed.)*Religions of India*, Clarion Books, New Delhi 1983, p.79-80

[১৯৮] এ সম্পর্কে কেদারনাথ তেওয়ারী লিখেছেন-

It is a fact that like Budha, lord Mahavira also is treated more or less, as God by the Jainas. There are Jaina temples at many places with the statue of Mahavira inside them and the Jainas pay their devotion and respect to it in many ways. But it is clear and certain that Mahavira is prayed and worshiped only as a great soul as a savior of mankind as a religious leader and guide and not as an omnipotent creator God. দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

ধারণা খুব সাবধানে বজায় রেখেছে যাতে কোন ধরনের সাকারবাদ এসে না যায়। ঈশ্বরকে সাকার প্রতিপন্ন করার সমস্ত প্রক্রিয়া এ ধর্মে বর্জন করা হয়।[১৯৯]

আচার্য গুরুনাথ ঈশ্বরের সাকারত্ব-নিরাকারত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন তিনি সত্যধর্ম গ্রন্থে ঈশ্বরকে নিরাকার নির্দেশ করেও বলেছেন যে, নিরাকার বললেও ঐশ্বরিক ভাব কিছুই বোঝা যায়না।[২০০] বিভিন্ন স্তবে বা গানে লিখেছেন- ... তুমি দেহধারী পুনঃ তুমি দেহহীন,তুমিই সাকার তুমি আকারবিহীন।[২০১] ...নিরাকার সাকারের অতীত সে কান্ত।[২০২] ...তুমি প্রভু নিরাকার অথচ হে সর্বাকার ,তবু তুমি নির্বিকার।[২০৩] ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়[২০৪] বা অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। ঈশ্বরের এই অনন্ত গুণের মধ্যে অব্যক্ত একটি গুণ যা অনন্ত সাকারত্ব ও অনন্ত নিরাকারত্ব এ দুইয়ের একত্বস্বরূপ।[২০৫]

এই অব্যক্ত থেকেই সাকার নিরাকারের সৃষ্টি। সুতরাং ঈশ্বরের উপর এর কোনটিই আরোপ করা যায়না। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোকে যাকে সাকার বা নিরাকার বিবেচনা করে, ঈশ্বর তার কোনটিই নন। অনন্ত সাকারত্ব ও অনন্ত নিরাকারত্ব এই উভয়ের অনন্তভাবে মিশ্রন বা একত্বই তাঁর একতম স্বরূপ।[২০৬] তাঁর স্বরূপের অনন্ত ভাবের মধ্যে একটি ভাব।

তাঁর মতে, নিরাকার শব্দের অর্থ সাধারণভাবে 'আকার নাই যার' এরূপ করা হ'লেও একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এর অর্থ আরও ব্যাপক। 'পরমেশ্বর নিরাকার' বললে পরমেশ্বর সাকার নন এরূপ বুঝায় না। নিরাকার শব্দটি সাকার শব্দটিকে তার অন্তর্ভুক্ত করে। নিরাকারবাদ সাকারবাদকে অস্বীকার করেনা বরং নিরাকার বললে সাকার-নিরাকার উভয়ই বুঝায়। কিন্তু সাকার বললে নিরাকারকে অগ্রাহ্য করা হয়। সাকার শব্দটির ব্যাপ্তি কম। সাকারকে বাদ দিয়েও 'নিরাকার' বোঝা যায়না,কেননা সাকার-নিরাকার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

পাণিনি ব্যাকরণের বার্তিককার মহর্ষি কাত্যায়ন বলেন যে, 'প্রাদির (প্র, পরা, নির, দূর ইত্যাদি) পরে অবস্থিত পূর্বপদের অন্তর্গত শেষ ভাগ 'যদি ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় তবে বহুব্রীহি সমাসে উহার বিকল্পে

---

[১৯৯] এ সম্পর্কে অমরজিত সিং সেথী ও সুতান্তর সিং বলছেন- Sikhism does not sanction worship of or reverences for or even symbolic offerings in thanks giving or to win divine favours to idols, graves, tombs, cows, bulls, mountains, rivers, snakes, trees, moon, sun and fire, there is no rain god, wealth god, thousand eyed god, snake god, blood thirsty goddess, animal sacrifice has no place in Sikhism. Sikhism rejects ancestor worship sects, egomindedness and complicated methods of worship.Sikhism accepts no other author of the Universe except God and does not believe in any separate power… দ্রষ্টব্য, Amarjit Singh Sethi and Sutantar Singh, "Sikhism and Interfaith Dialogue" *Comparative Religion* ed. by Amarjit Singh Sethi and Reinhard Pummer, New Delhi, 1979, p.105-106

[২০০] সত্যধর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ./ (মুখবন্ধ)

[২০১] আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, ঈশাষ্টকম, অনুবাদ- গৌরপ্রিয় সরকার, অনুবাদমালা, গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ, ১৩৭১, পৃ. ১

[২০২] ঐ, ব্রহ্ম স্তোত্র, অনুবাদ, ঐ, পৃ. ১৪

[২০৩] আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত, সত্যধর্ম মহামন্ডল, বাংলাদেশ, ১৩৫০, পৃ. ৪৯

[২০৪] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ১৫৭

[২০৫] ঐ, ঐ, পৃ. ১৮৮, তত্ত্বজ্ঞান সাধনা, পৃ. ৪৩

[২০৬] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ১৬১, টীকা (৪) দ্রষ্টব্য

লোপ হয়। যথা প্র-পতিতং পর্ণং যস্মাৎ সঃ প্রপতিতপর্ণঃ প্রপর্ণ বা। "অর্থাৎ প্রপতিত হয়েছে পর্ণ যা থেকে এ বাক্যে সাধারণ নিয়মানুসারে প্রপতিতপর্ণ পদ হল। এখন, প্রপতিত অংশে প্রাদির অন্তর্গত 'প্র' এ অব্যয়ের পরে যে 'পতিত' অংশ আছে তা ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই পতিত অংশের বিকল্পে লোপে প্রপর্ণ ও প্রপতিতপর্ণ পদ হয়। গুরুনাথ এই নিয়মানুসারে নিরাকার শব্দের অর্থ নির্বিদিতা: নির্বেদ্যা বা (নিরবধারিতা: নিরবধার্যা) আকার যার। অর্থাৎ যার আকার এ পর্যন্ত নির্ণীত বা অবধারিত হয় নাই, তিনি নিরাকার এ অর্থ করেন।[২০৭]

এই অনির্ণেয় আকারের বর্ণনা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে আছে। গীতায় আছে-

"...তাঁর হস্তও চরণ সর্বত্র তাঁর চক্ষু ও মুখ সর্বত্র এবং কর্ণও সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি সর্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করছেন।"[২০৮] মুন্ডকোপনিষদে আছে "...দ্যুলোক তাঁর মস্তক, চন্দ্র-সূর্য তাঁর চক্ষু, দিক তাঁর কর্ণ, বেদ তাঁর বাণী, বায়ু তাঁর প্রাণ, বিশ্ব তাঁর হৃদয়, পৃথিবী তাঁর চরণ।"[২০৯] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে আছে "...ইহার চক্ষু সর্বত্র, মুখ সর্বত্র, বাহু সর্বত্র, পদ সর্বত্র, ইহার সর্বত্র কর-চরণ, সর্বত্র চক্ষু কর্ণ, সর্বত্র শিরোমুখ।"[২১০] বাইবেলে আছে- স্বর্গের দিব্য করোনা কেননা তা ঈশ্বরের সিংহাসন, পৃথিবীর দিব্য ক'রোনা কেননা তা তাঁর পাদপীঠ, জেরুজালেমের দিব্য করোনা কেননা তা তাঁর নগরী।[২১১]

ঈশ্বর নিরাকার এরূপ বললে ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণলোকে হয়ত কিছুই বুঝতে পারেনা। যার আকার নাই তা কেমন করে ধারণা করা যায়, এটা তাদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞানের আকার নাই কিন্তু যাতে জ্ঞান আছে তার আকার আছে-এভাবে নিরাকার জ্ঞানের ধারণা করা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের যদি আকার না থাকে বা তিনি সাধারণের ধারণায় কোন সাকার পদার্থাশ্রিত না হন তবে তাঁকে ধারণা করা যায়না। এবং অধিকাংশ লোক যা ধারণা করতে পারেনা, তাঁর সত্ত্বায় বিশ্বাস রাখাও সহজ নয়। এজন্য সাকারবাদ স্বীকার্য হয়ে পড়ে।

এই বিষয়ের অবতারণা করে গুরুনাথ সেনগুপ্ত বলেছেন যে, "তবে ঈশ্বর নিরাকার, এরূপ বললে যে ঈশ্বর সম্পর্কে কেউই কিছু বোঝেননা এমন নয়। যাদের ধর্ম চিন্তা নাই, নিরন্তর দেহে আত্মবুদ্ধি বিদ্যমান তাদের পক্ষে ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝা অসম্ভব প্রায়। আর কেউ বুঝতে পারবেনা বলে তো ঈশ্বরে মিথ্যা সাকারত্বের আরোপ করা যায় না। অশিক্ষিত লোকে বুঝতে পারবেনা বলে সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা বন্ধ রাখা যায়না। অনেকেরই এ ধারণা আছে যে, স্থূলের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীরের বিসর্জনান্তেও আত্মা থাকতে পারে । সুতরাং জড়দ্রব্য আশ্রয় ব্যতিরেকেও ঈশ্বর থাকতে পারেন।[২১২]

সুতরাং আচার্য গুরুনাথের মতে ঈশ্বর সাকার নিরাকারের অতীত; ঈশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে অনন্ত সাকারত্ব ও অনন্ত নিরাকারত্বের একত্ব একটি গুণ অর্থাৎ তাঁর পূর্ণ স্বরূপের একটি অংশ। ভাষার দ্বারা বোধ হয় এইরূপ বলা যেতে পারে।

---

[২০৭] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ১৫৬

[২০৮] গীতা ১৩/১৩

[২০৯] মুন্ডকোপনিষদ ২/১/৪

[২১০] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৩/১৪-১৫

[২১১] বাইবেল, মথি ৫ : ৩৪-৩৫

[২১২] আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ১৫০

(৪)

ঈশ্বরতত্ত্ব : ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনায় আচার্য গুরুনাথ প্রথমেই বলছেন যে, এ বিষয়ের অবতারণা করা বড়ই সুকঠিন, এমনকি অসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয়না। কেননা তিনি যখন অনির্বচনীয়, তখন বাক্য দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায়না। আর এজন্য অনির্বাচ্যের বর্ণনা করতে গেলে তা অসম্পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। যিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন তিনিই জানেন যে, ঈশ্বর কিরূপ; কিন্তু অনির্বচনীয়তার কারণে তিনিও বলতে পারেন না। সুতরাং তিনি ভিন্ন অন্যের জানার সম্ভাবনাও নাই।

তিনি আরও বলছেন, কোন বিষয়ের স্বরূপ দু'ভাবে নির্দেশ করা যায়- একটি অন্বয়ী উপায় অন্যটি ব্যতিরেকী উপায়। কোন বস্তুর যে যে গুণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত ও সর্বজন স্বীকৃত, সে সকল গুণ দেখায়ে ঐ বস্তুর সত্ত্বা প্রমাণ করা অন্বয়ী উপায়। আর ঐ বস্তু না থাকলে যে অবস্থা হয় বা যা হবার ছিল তা হচ্ছে না- এটা দেখায়ে ঐ বস্তুর যে অভাব নাই অর্থাৎ ঐ বস্তু যে আছে; এ প্রমাণকে ব্যতিরেকী উপায় বলে। ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করলে কিছুই নির্দেশ করা হয়না কেননা ব্যতিরেকী উপায়ে বর্ণনার সময় বর্ণনীয় বিষয়ের সীমা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ঈশ্বর অসীম। কাজেই ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করা বিফল।

আচার্য গুরুনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। দুটি সরল রেখার মধ্যে একটি অন্যটির সমান কিংবা একটি অপরটি অপেক্ষা বড় বা ছোট হয়। এ অবস্থা তিনটির মধ্যে যদি প্রমাণ করা যায় যে, কখ সরলরেখা গঘ সরলরেখার চেয়ে ছোট বা বড় নয়। তা হলেই জানা গেল যে সরলরেখা দুটি সমান। এখানে সরলরেখা দুটির মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট অবস্থা আছে বলেই ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করা গেল। আবার, কোন গৃহস্থাশ্রমীকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কোন আশ্রমী? তাহলে সে অন্বয়ী উপায় অবলম্বন করে বলতে পারে আমি গৃহস্থাশ্রমী। আবার ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করে বলতে পারে আমি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নই। তাহলেও জানা গেল তিনি গৃহী। আশ্রম সংখ্যা চারটি। এর সীমা আছে বলেই এখানে ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করা গেল। কোন ব্যক্তির কাছে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে যদি অন্বয়ী পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজের নামটি বলে তবেই তার নাম জানা যায়, কিন্তু সে যদি ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করে বলে, আমার নাম কৃষ্ণ নয়, বিষ্ণু নয়, জন নয়, ক্যারি নয়, জালাল নয়, জাহানারা নয় ইত্যাদি, তাহলে তার নাম জানার কোন উপায় নাই। কেননা নামের সংখ্যার সীমা নাই। একারণে ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। কেননা তাঁর নামের বা গুণের কোন সীমা নাই। তিনি আকাশ নন, বাতাস নন, অন্ধকার নন ইত্যাদি ইত্যাদি যা যা নন সেগুলিও অসীম সুতরাং ব্যতিরেকি উপায়ে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বললে তাতে কিছু প্রকাশ পায় না,এভাবে অনন্তের অন্তলাভ সম্ভব নয়।

তবুও অনেক স্থলে শাস্ত্রকারগণ ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করেছেন। যেমন-

অশব্দ মস্পর্শ মরূপ মব্যয়ম্

তথাঽরসং নিত্য মগন্ধ বচ্চ যৎ।[২১৩]

অর্থাৎ তিনি শব্দ নন, স্পর্শ নন, রূপ নন, রস নন, গন্ধ নন...

"ছায়াহীন, অশরীরি, লোহিতাদি গুণ বর্জিত..."[২১৪]

"অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না) কারণহীন, রূপহীন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়বর্জিত, অবিনাশী..."[২১৫]

"তিনি ইন্দ্রিয়বর্জিত, অসক্ত অর্থাৎ সঙ্গাশূন্য, নির্গুণ, ... তাঁর হেতু কেহ নাই, তাঁর চেয়ে সারবস্তুও নাই।"[২১৬]

কোরআনে আছে- "আল্লাহ্ জাতক নন, জাত নন, তাঁর সমান কেউ নাই।"[২১৭]

"তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক করিওনা।[২১৮]

"বাইবেলে আছে- তিনি কারও থেকে দূরে নন"[২১৯]

"ঈশ্বরের মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই..."[২২০]

শিখ ধর্মমতে- "ঈশ্বর নিরাকার, কালের অতীত, অনির্বচনীয়, বর্ণহীন জন্মরহিত, মায়ার অতীত।"[২২১]

আবার কোথাও একই সাথে ব্যতিরেকী উপায়ের সাথে অন্বয়ী উপায়ও অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন-

অপানিপাদো জবনো গৃহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ

স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা

তমাহুরাদ্যাঃ পুরুষং মহান্তম্ ।।[২২২]

---

[২১৩] কঠোপনিষদ, ১/৩/১৫

[২১৪] প্রশ্নোপনিষদ ৫১

[২১৫] মুন্ডকোপনিষদ ১/১/৬

[২১৬] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩/১৪, যোগবাশিষ্ট ২৯/৮৯

[২১৭] আল কোরআন ১১২:৩-৫

[২১৮] ঐ ৪:৩৬

[২১৯] বাইবেল, প্রেরিত ১৭:২৮

[২২০] ঐ যোহন ১:৬

[২২১] Amarjit Singh Sethi & Sutantar Singh, "Sikhism and Interfaith Dialougue" *Comparative Religion,* Canada 1979, p.105-106

[২২২] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৫২

অর্থাৎ তাঁর হাত নাই কিন্তু গ্রহণ করতে পারেন, পা নাই কিন্তু গমন করতে পারেন। চক্ষু নাই কিন্তু দেখতে পারেন। কান নাই কিন্তু শুনতে পারেন। তিনি সকলই জানেন কিন্তু কেউ তাঁকে জানেনা। আদ্য পুরুষেরা তাঁকে মহান পুরুষ বলেন।

এখানে ব্যতিরেকী উপায়ে হাত পা চোখ কান বিহীন বলা হয়েছে আবার অন্বয়ী উপায়ে গমনকারী গ্রহণকারী দ্রষ্টা শ্রোতা সর্বজ্ঞ প্রভৃতি বলা হয়েছে।

যদিও ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করলে ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু বলা হয় না তবুও শাস্ত্রকারগণ এ উপায় অবলম্বন করেন। এ প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ মন্তব্য করেছেন যে, এর কারণ এই যে, ঈশ্বর যে কি তা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে না পারলেও সেরকম হানি নাই, কিন্তু কোন সসীম পদার্থকে তাঁর স্থানীয় রূপে বোধ করলে অনেক হানি হতে পারে।

শাস্ত্রকারেরা ব্যতিরেকী উপায় অবলম্বন করার সাথে অন্বয়ী উপায়েও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছেন। যেমন-

"ব্রহ্ম সৎ স্বরূপ, সর্বব্যাপী, সর্বদা একরূপ, চিন্মাত্র..."[২২৩]

"পালনকর্তা, উৎপাদক, মোক্ষসুখ বিধায়ক..."[২২৪]

"আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম..."[২২৫]

"সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ..."[২২৬]

কোরান, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রেও অন্বয়ী উপায়ে ঈশ্বরের স্বরূপ[২২৭] বর্ণিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত আলোচনা করে আচার্য গুরুনাথ মন্তব্য করেন যে, ব্যতিরেকী উপায়ে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করলে যারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানতে ইচ্ছুক তারা তৃপ্ত হতে পারেন না। সুতরাং অন্বয়ী উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক। আবার অন্যদিকে অন্বয়ী উপায়ে অনির্বচনীয়কে নির্বচনীয়রূপে প্রকাশ করার ত্রুটি অপরিহার্য্য। এতেও সীমাবদ্ধভাবে তাঁর সত্ত্বার গুণাবলী প্রকাশ করা হয়। তবুও অনন্যোপায় হয়ে তিনি এ উপায়ই অবলম্বন করেছেন।

---

[২২৩] মহানির্বানতন্ত্র ৪/২৭

[২২৪] যজুর্বেদ ১৭/২৭

[২২৫] কঠোপনিষদ ১০০/২/২, বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩/৯/৩৪

[২২৬] তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/১/১

[২২৭] কোরআনে আছে, তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময় (২/৫৪)
আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (২/১৪৮) ইত্যাদি
বাইবেলেও আছে, ঈশ্বর জ্যোতি (১ যোহন ১/৬) প্রভু, মঙ্গলময় (১ পিতর ২/৩)
ঈশ্বর প্রেম (১ যোহন ৪/৮)
জরথুস্থ্র মতে, ঈশ্বর আহুরা মাজদা-জ্ঞানময় প্রভু, একমাত্র স্রষ্টা, পরম শাসক, একমাত্র নিয়ন্তা, পরম ন্যায়বান, সর্বজ্ঞ...
দ্রষ্টব্য, H.K. Mirza, Zoroastrianism, *Religions of India*, Karan Sing(ed.) Clarion Books, New Delhi, ১৯৮৩, পৃ: ১৮৫-১৮৬
শিখ ধর্মমতে, ঈশ্বর সত্যের ধারক ও বাহক, স্রষ্টা, দয়াময়, সর্বব্যাপী, সৎ, শিব...
(দ্রষ্টব্য Amarjit Sing Sethi, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫-১০৬)

জগতে একটি মত আছে যে, "ঈশ্বর নিরাকার 'চৈতন্যস্বরূপ'- এ রকম বললে আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারিনা। কারণ যাঁর আকার নাই তাঁর কি আছে? যদি বলা হয় জ্ঞানের আকার নাই কিন্তু জ্ঞান যে আছে তাতে তো সন্দেহ হয়না। এর উত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞানীতে জ্ঞান আছে। জ্ঞানী যিনি তাঁর আকার আছে। জ্ঞানের আকার না থাকলেও জ্ঞান যাতে আছে তাঁর আকার আছে। এ জন্যই আমরা নিরাকার জ্ঞানের ধারণা করতে পারি। কিন্তু যদি ঈশ্বরের আকার না থাকে এবং তিনি সাধারণের ধারণায় কোন সাকার পদার্থাশ্রিত না হন তবে কখনই আমরা তাঁকে ধারণা করতে পারিনা। আর অধিকাংশ লোকে যা ধারণা করতে পারেনা, তার সত্তায় বিশ্বাস স্থির রাখাও সহজ নয়। এ কারণে সাকারবাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে।"[২২৮]

এ বক্তব্য প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ বলছেন যে, যাঁরা ঈশ্বরদর্শী তাঁদের কথা দূরে থাকুক, যাঁরা ধর্মরাজ্যে সমুন্নত হয়ে মুমুক্ষু হয়েছেন, অথবা যাঁরা কায়মনোবাক্যে নিশিদিন ধর্মসাধনে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সকলেই যে, 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ'-বললে ঈশ্বরীয়ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না- এ রকম বলা বোধ হয় ঠিক নয়। তবে যাদের ধর্মচিন্তা নাই, নিরন্তর দেহে আত্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন, তারা হয়তো ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝতে পারবেনা। তবে কেউ বুঝতে পারেনা বলে তো ঈশ্বরে মিথ্যা সাকারত্বের আরোপ করা যায় না। অশিক্ষিত লোক বুঝতে পারেনা বলে সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্বসমূহের উল্লেখে বিরত থাকা যায়না। অত্যুন্নত সাধকদের কথা দূরে থাক, যাঁরা এ স্থূলদেহ থেকে বাইরে যাবার শক্তি বা ক্ষমতা লাভ করেছেন, তাঁরাও বুঝতে পারেন যে, স্থূলের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীরের বিসর্জনের পরেও আত্মা থাকতে পারে। সুতরাং জড়বস্তু-আশ্রয় ব্যতিরেকেও ঈশ্বর থাকতে পারেন।[২২৯]

এবার ঈশ্বরের স্বরূপ প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ যেমন বর্ণনা করেছেন আমরা সেভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। "এই দৃশ্যমান জগতের দিকে বা এর কোন অংশের দিকে তাকিয়ে দেখে যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যায় যে, যা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায় ইত্যাদি অথবা যে সব পদার্থকে আমরা দ্রব্য বলে মনে করি, সেগুলি আর কিছু নয় কেবল কতগুলি গুণসমষ্টি মাত্র। এই যে, 'কাগজ' নামক দ্রব্য পদার্থ, বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এর শুভ্রত্ব, আয়তন, আকৃতি, কাঠিন্য প্রভৃতি কতগুলি গুণই কেবল জানা যায় এবং ঐ গুণগুলি ও আরও কিছু গুণের সমষ্টিই ঐ পদার্থ। অনন্তশক্তি অনাদি অনন্ত পরমপিতা, যিনি নিখিল ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা তাঁর বিষয় বিবেচনা করলেও দেখা যায়, তিনি অনন্ত সংখ্যক গুণ সমষ্টিমাত্র। বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তুমি, আমি, ইনি, উনি, তিনি প্রভৃতি এবং ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি প্রভৃতি সকলই কেবল অনন্ত সংখ্যক বা কতগুলি গুণসমষ্টি মাত্র। কেননা যা ধারণা করা যায় অথবা যা প্রত্যক্ষ অনুমানাদি দ্বারা জানা যায় তাই যখন পদার্থ এবং পূর্বোল্লিখিত কাগজ প্রভৃতির যখন কেবল গুণই ধারণা করা যায়, তখন গুণ ব্যতীত দ্রব্য-পদার্থের অস্তিত্ব হতে পারে না অর্থাৎ গুণাতিরিক্ত দ্রব্য নামক যে অন্য পদার্থ আছে, তা অসম্ভব।

এ আলোচনায় পূর্বপক্ষ হতে পারে যে, যদি গুণাতিরিক্ত কোন দ্রব্য-পদার্থ না থাকে তবে কাঠের গুণ, জলের গুণ, আগুনের গুণ, আত্মার গুণ ইত্যাদি কথা সকলেই কেন বলেন ? তাদের পক্ষে কাঠ-গুণ,

---

[২২৮] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ১৪৯

[২২৯] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১৪৯-১৫০ , পাদটীকা

জল-গুণ, আগুন-গুণ, আত্মা-গুণ ইত্যাদি কথা প্রচলিত করা উচিত ছিল। সুতরাং দেখা যায় দ্রব্য ও গুণ এক পদার্থ নয়। এর উত্তর এই যে, দ্রব্য ও গুণ বাস্তবিক একই পদার্থ। পার্থক্য এই যে, গুণ ব্যষ্টিভাব জ্ঞাপক এবং দ্রব্য গুণের সমষ্টি প্রকাশক। দ্রব্য বললে ক,খ,গ,ঘ ইত্যাদি গুণসমষ্টি বোঝায়। আর গুণ বললে হয় ক না হয় খ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বা ভিন্ন অভিপ্রায় অনুসারে উচ্চারিত গুণ বা গুণগুলি বোঝায়। আবার দ্রব্য মাত্রেই যে গুণের আধার, তাতেও সন্দেহ নাই। কেননা ঐ গুণসমষ্টিই প্রত্যেক গুণের আধার। যেমন 'দড়ির তাল' 'ইটের স্তুপ' ইত্যাদি বললে অন্য কোন পদার্থ বুঝায় না (তাল বা স্তুপ অন্য কোন পদার্থ নয়) কেবল কতগুলি দড়ি বা ইটের সমষ্টি বোঝায়। সে রকম দ্রব্য বললেও গুণ ছাড়া আর কিছু বুঝায় না কেবল কতগুলি গুণের সমষ্টি বোঝায়। আবার যেমন উল্লিখিত 'দড়ির তাল'ই তার প্রত্যেক অংশের আধার। সেরকম দ্রব্য বা গুণ সমষ্টি প্রত্যেক গুণের আধার। এ পর্যন্ত আলোচনায় জানা যাচ্ছে যে, এ জগতে যা কিছু আছে সবই গুণ ও গুণময়। গুণ ছাড়া দ্রব্য নাই, গুণ ছাড়া ক্রিয়া হতে পারেনা। কেননা, যে দ্রব্যের ক্রিয়া হবে, তা গুণসমষ্টি । দ্রব্যত্বাদি জাতি ও গুণসাপেক্ষ, সম্বন্ধ ও গুণ ছাড়া অসম্ভব এবং অভাবও গুণ বা গুণসমষ্টি ছাড়া অন্যের হবার সম্ভাবনা নাই। যেদিকেই দেখা যাক্ কেবল গুণ ও সে সংক্রান্ত কার্যাদিই দেখা যাবে। কি জড় পদার্থ, কি আত্মা সকলই কেবল গুণসমষ্টি। কি সৃষ্ট, কি স্রষ্টা, যার বিষয়েই ভাবা যায়, সকলেই গুণময়। অতএব ঈশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময় এবং তাঁর সৃষ্টিও গুণময়ী।"[২৩০]

শাস্ত্রেও আছে- নির্গুণায় গুণাত্মনে, সমস্ত-জগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।

অর্থাৎ নির্গুণ, গুণাত্মা, সমস্ত জগদাধার-মূর্ত্তি ব্রহ্মকে প্রণাম করি। এখানেও ব্রহ্মকে গুণাত্মা বলা হয়েছে। পাতঞ্জলে ভাষ্যে ও শাংকর-ভাষ্যেও নির্গুণ ও সগুণ বলে ব্রহ্মের বিশেষণ দেখা যায়। তবে প্রশ্ন হতে পারে প্রথমে নির্গুণ বলে পরে গুণাত্মা বলার অর্থ কি?

এর উত্তর এই যে, নির্গুণ শব্দের অর্থ গুণহীন নয়। যাঁর অনন্ত গুণের সম্যক জ্ঞান বা অবধারণ এ পর্যন্ত হয় নাই এবং হতেও পারেনা, তিনিই নির্গুণ অর্থাৎ ঈশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়।[২৩১]

ঈশ্বরকে আচার্য গুরুনাথ কখনও অনন্ত গুণময়, কখনও অনন্ত অনন্ত গুণময় আবার কখনও অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময় বলেছেন। এর তাৎপর্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রথমতঃ গুণের সংখ্যা অনন্ত, দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি গুণের অনন্ত ভাব, তৃতীয়তঃ প্রতিটি গুণের প্রতিটি ভাবের অনন্তত্ব-এই সমুদয়ের একত্ব বা একীভবন হলেন ঈশ্বর। ভাষার সাহায্যে তাঁকে অনন্ত উন্নত অনন্ত গুণের অনন্ত ভাবের অনন্ত নিধান বলে নির্দেশ করেছেন।[২৩২]

ঈশ্বরের স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনায় যে দ্রব্য ও গুণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, কোন কোন ইউরোপীয় পন্ডিতের মতে কেবল বস্তুর গুণই প্রত্যক্ষ হয়, বস্তু প্রত্যক্ষ হয়না। বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের মতে- বস্তুও প্রত্যক্ষ হয়।[২৩৩] আমরা জানি জন লকের মতে- বস্তুর কেবল গুণ প্রত্যক্ষ হয়। তিনি মুখ্য ও গৌণ গুণের কথা বলেছেন এবং বস্তু এ সকল গুণের আধার। তাঁর পরবর্তী

---

[২৩০] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১৫০-১৫৩

[২৩১] দ্রষ্টব্য ঐ, পৃ: ১৫৬ (সগুণ-নির্গুণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

[২৩২] দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ: ২৭২

[২৩৩] দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ: ১৫৭ (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

দার্শনিক বিশপ বার্কলে তাঁর মতের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে দেখালেন সব গুণই গৌণ এবং দ্রব্য গুণের সমষ্টি মাত্র এবং সব গুণ মনের ধারণা কাজেই বস্তুও মনের ধারণা। তাঁর পরবর্তী দার্শনিক ডেভিড হিউমের মতে দ্রব্য যদি গুণসমষ্টি হয় তাহলে এ সমষ্টি তৈরি করে কে? বার্কলের দর্শনে এটি একটি সমস্যা।

এ প্রসঙ্গে আমরা গুরুনাথ যা বলেছেন তার উল্লেখ করছি। তাঁর মতে গুণ মাত্রেই মনের ধারণা নয়। যা দ্রব্যে অবস্থিতি করে দ্রব্যের পরিচয় দেয়, কিন্তু স্বয়ং দ্রব্য বা ক্রিয়া নয় এবং যার হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় (অপূর্ণে ও অপূর্ণাবস্থায়) তাকে গুণ বলে। গুণের মধ্যে কতগুলি নিত্য ও অনন্তকাল স্থায়ী কিন্তু সব গুণেরই হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। যে গুণগুলি নশ্বর দ্রব্য অবলম্বন করে থাকে তাদের লয় হতে পারে। গুণ অনন্ত অর্থাৎ জগতে যে কতগুণ আছে তা নির্ণয় করা মানবীয় শক্তির অসাধ্য বলে বোধ হয়। অবলম্ব দ্রব্য ভেদে গুণ প্রধানত দু'প্রকার- ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। যে সব গুণ মূলভূত পদার্থ বা ভৌতিক পদার্থনিষ্ঠ তাদেরকে ভৌতিক গুণ বলে। ভৌতিক পদার্থের গুণগুলি তাকে বিশেষ করে এজন্য এদেরকে বিশেষণ গুণ বলে। আত্মার গুণকে আধ্যাত্মিক গুণ বলে। এদের পরিচয়ের জন্য আধারের অপেক্ষা করেনা। এজন্য এদেরকে বিশেষ্য গুণ বলে।[২৩৪] আগেই বলা হয়েছে, গুণসমষ্টিই দ্রব্য এবং শক্তি দ্রব্যনিষ্ট, কাজেই শক্তিমাত্রই গুণসমষ্টিতে আছে। শক্তি যেমন গুণসমষ্টিতে আছে সেরকম প্রত্যেক গুণেও আছে। কেননা গুণসমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি থাকলেও যখন এক একটি গুণ দ্বারা গুণসমষ্টির ঐ এক একটি শক্তি প্রকাশিত হয়, তখন ঐ শক্তিটি ঐ গুণেরই বলতে হবে। ধরা যাক্ আমাদের দেহের খাদ্যদ্রব্য চর্বন করার শক্তি থাকে। ঐ শক্তি দাঁত দ্বারা সূচিত হয় কাজেই দাঁতের যে চর্বনশক্তি আছে তা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যদি চোয়ালের উপর ও নীচের স্নায়ু ও পেশী প্রভৃতি অকর্মণ্য হয় তবে যেমন দাঁত থাকা সত্ত্বেও চর্বন হতে পারেনা অথবা যেমন কতগুলি দাঁত একটি পাত্রে রেখে দিলে তার চর্বনক্ষমতা থাকেনা, সেরকম কোন একটি গুণ গুণসমষ্টির আশ্রয় ব্যতীত কার্যকর হতে পারেনা। যেমন মুখে দাঁতগুলি চর্বনের মুখ্যভাবে ও নিকট সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বলে চর্বনশক্তি দন্তনিষ্ঠ- সকলে এরকম বলেন;সেরকম গুণসমষ্টির সাহায্যে কার্যকর হলেও, যে গুণ প্রধানভাবে যে শক্তির প্রকাশক, সে গুণেরই সে শক্তি আছে বলতে হবে। অতএব প্রমাণ হ'ল গুণমাত্রেই শক্তিসম্পন্ন।[২৩৫] কাজেই গুণসমষ্টি কে বাঁধে- এ প্রশ্ন আর থাকে না।

ঈশ্বরের স্বরূপ এভাবে আলোচনার পর আচার্য গুরুনাথ 'পরমেশ্বর কিংস্বরূপ' তা বর্ণনা করেছেন।[২৩৬] সাধারণভাবে ঈশ্বর ও পরমেশ্বর একই অর্থে ব্যবহার হলেও আচার্য গুরুনাথ ঈশ্বরের স্বরূপ লেখার পর পরমেশ্বরের স্বরূপ লিখেছেন। ঈশ্বর ও পরমেশ্বর একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও ভাব ভিন্ন, তাঁর লেখনীতে এটা সুস্পষ্ট।

এ আলোচনায় তিনি বলছেন যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর অব্যক্ত, তাঁর স্বরূপ কেউ ব্যক্ত করতে পারে না। যদিও কোন সৌভাগ্যবান পুরুষ পরমপিতার করুণাগুণে ও কোন মহাত্মার আশীর্বাদে বা সাহায্যে কখনও পরমাত্মার দেখা পান তবু তিনি তা ব্যক্ত করতে পারেননা। কারণ ভাষার এমন শক্তি নাই ও আমাদের এমন ক্ষমতা নাই যে আমরা অপূর্ণ হয়ে অপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে সেই পূর্ণস্বরূপের বর্ণনা করতে পারি। বিশেষতঃ যখন পরমাত্মার গুণ অনন্ত তখন তাঁর সে অরূপ-রূপও অনন্ত। সুতরাং সে অনন্ত-রূপ-দর্শন

---

[২৩৪] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম,পৃ: ৩৭

[২৩৫] ঐ, ঐ, পৃ: ১৩৫

[২৩৬] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১৫৭-১৬২

একজনের ভাগ্যে ঘটতে পারেনা। একারণে তাঁকে পূর্ণভাবে দেখা অসম্ভব ও অসাধ্য। তবুও পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেয়া যায়।

পরিদৃশ্যমান জগতের দিকে তাকালে পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বিবিধ সত্ত্বাত্মক ধর্ম দেখা যায়। এখন বুঝতে হবে পরমাত্মা তাদের কোনটির স্বরূপ অর্থাৎ তিনি সুখ-স্বরূপ না দুঃখস্বরূপ, তিনি ধর্মস্বরূপ না অধর্মস্বরূপ, তিনি রমনীস্বরূপ না পুরুষস্বরূপ অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি না পুরুষ? ইত্যাদি। এসব বিচার করতে গেলে প্রথমেই দেখা যায় যে, মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখ পর্যায়ক্রমে অনন্তকাল (যার অন্ত সাধারণ মানুষে পায়না) থাকতে পারে। কেননা যখন দুঃখের অভাব হয় তখনও দুঃখাভাবে দুঃখ থাকে। দুঃখাভাবে দুঃখ বুঝাতে বেশী ক্লেশ স্বীকার করতে হবেনা। অনেকেই জানেন যে কতগুলি সুখ দুঃখের অবস্থা ছাড়া উপলব্ধি হয়না। যেমন- দারিদ্র্যাবস্থায় পরিবারবর্গের প্রতি যেরকম সম্প্রীতি ও সেজন্য যেরকম সুখ জন্মে, ধনশালী অবস্থায় সে সুখ কখনই লাভ করা যায় না। সুতরাং ঐ জাতীয় সুখ উল্লিখিত দুঃখের সহচর। এজন্য দুঃখের অবসানে ঐ সুখেরও অবসান হয়। একারণে ওরকম সুখ যাঁরা চান তাঁরা জানেন যে, উল্লিখিত দুঃখের অভাবেই উক্ত সুখের অভাবজনিত দুঃখ উপস্থিত হয়। এজন্যই বলা যায় যে, দুঃখাভাবেও দুঃখ হয়। গাঢ় অন্ধকারে যেমন দীপ দেখে সুখ হয় সেরকম দুঃখানুভবকারীর নিকটেই সুখ শোভা পায়।

এ অসীম অনন্তভাবে পর্যায়ক্রমে সুখ দুঃখের গতি চিন্তা করলে বোঝা যায় তারা সরলরেখাক্রমে ধাবিত হয়ে কেন্দ্রাকর্ষিণী শক্তির বা পরমাত্মার আশ্রয় প্রভাবে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করবে। ঐ দুঃখ ও সুখ অসীমভাবে মানবাত্মার ভোগ্য হলেও কখনও একসাথে ভোগ্য হবেনা, কারণ সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন ভাব পদার্থ, কোনটি অন্যটির অভাব পদার্থ নয়-উভয়ের আলাদা ধর্ম আছে।[২৩৭]

উভয়ের আধার এক সুতরাং স্থান অবরোধকতা ধর্মবশতঃ একসময়ে সুখ ও দুঃখ উভয়ই এক আধারে থাকতে পারেনা। এজন্য তারা পর্যায়ক্রমে ভিন্ন কখনও একসাথে উপস্থিত বা অনুভূত হতে পারেনা। কিন্তু যদি অনন্ত পরিভ্রমণে কদাচিৎ সুখ দুঃখের সংঘাত হয় তবে ঐ সংঘাত বলোৎপন্ন অবস্থায় অবস্থিত মিশ্র পদার্থ কেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হবে, উহাই পরমাত্মার অনন্ত স্বরূপের একতম স্বরূপ। অর্থাৎ সুখ-দুঃখের একত্বই ঈশ্বরের একতম স্বরূপ। সে স্বরূপ যে কিরূপ, তা ব্যক্ত করা দূরে থাকুক সাধারণতঃ কেউই অনুভব করতে পারেনা। কেননা তা না সুখ না দুঃখ অথবা সুখ-দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্তভাবে একত্ব। যদি কেউ অনন্তকালের মধ্যেও কখনও ঐ অবস্থায় পড়েন তবে তিনি অনুভব করতে পারেন বটে কিন্তু কখনও প্রকাশ করতে পারেন না। অতএব বলা যেতে পারে, পরমাত্মা অব্যক্ত, আর কিছু বলা যায় না। (অনন্ত সুখ-দুঃখের মিশ্রণে কেমন অবস্থা হয় তা যুক্তি দ্বারা বুঝানো যায়না, ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের নিকট জানা যায় যে, তাতে পার্থিব সুখ বা পার্থিব দুঃখ এর কোনটি থাকেনা। কেবল সচ্চিদানন্দ স্বরূপই অনুভূত হয়)।

এরূপ প্রণালীক্রমে পরমাত্মা ধর্ম-স্বরূপ না অধর্ম স্বরূপ-এর উত্তরে বলা যেতে পারে, লোকে যাকে ধর্ম বা অধর্ম বলে, তিনি এর কোনটির মত নন অথবা তিনি ঐ উভয়ের অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্ত একত্ব। আবার যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি চৈতন্যস্বরূপ না অচেতন-স্বরূপ এর উত্তরে বলা যায় সাধারণভাবে

---

[২৩৬]দ্রষ্টব্য,১।বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন,ভাষা পরিচ্ছেদ,কারিকা-৪,৫; উদ্ধৃত, শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত,ধর্ম ও ধর্ম সমন্বয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ,দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত,কলিকাতা,২০০১,পৃ,৯২। ২।গুরুনাথ সেনগুপ্ত,তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা,পূর্বোক্ত,পৃ,১১৫-১১৬।

চেতন বা অচেতন বলতে যা বোঝায়, তিনি তার কোনটার মত নন অথবা ঐ উভয়ের অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্ত একত্ব। যদি প্রশ্ন হয় যে, তিনি রমণীস্বরূপ না পুরুষস্বরূপ- এর উত্তরেও বলা যায় যে, তিনি এর কোনটির মত নন অথবা তিনি অনন্ত প্রকৃতি-পুরুষাত্মক। পূর্ব অধ্যায়ে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার এ প্রসঙ্গেও দেখা গেছে নিরাকার সত্য হলেও সাকার না মেনে পারা যায় না। আবার দেখা গেছে, নিরাকারবাদই সত্য। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোকে যাকে সাকার বা নিরাকার বিবেচনা করে ঈশ্বর তার মধ্যে কোনটিই নন অথবা অনন্ত সাকারত্ব ও অনন্ত নিরাকারত্ব -এ উভয়ের অনন্তভাবে মিশ্রণ বা অনন্ত একত্বই তার একতম স্বরূপ। মূলকথা সাধারণ লোকে তাঁকে যেভাবে ভাবে, তিনি তা নন তিনি ইন্দ্রিয়ানুভুতি ও মনের অগোচর। এ বিষয়ে কেনোপনিষদ বলছে-

যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনোমতম্।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদ মুপাসতে।।[২৩৮]

অর্থাৎ- মনের দ্বারা যাঁকে মনন করা যায় না, মন যা দ্বারা ব্যাপ্ত বা প্রকাশিত, তাঁকে ব্রহ্ম বলে জানবে। "ইহাই ব্রহ্ম" বলে লোকে যে সকল অনাত্মবস্তুর উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়।

এভাবে অনন্তভাবে সুখ ও দুঃখের একত্ব, ধর্ম ও অধর্মের একত্ব, চেতন ও অচেতনের একত্ব, দয়া ও ন্যায়পরতার একত্ব, জ্ঞান ও প্রেমের একত্ব এবং প্রকৃতি ও পুরুষের একত্ব প্রভৃতি অনন্ত একত্বের একত্বই ঈশ্বরের স্বরূপ। আচার্য গুরুনাথ তত্ত্বজ্ঞান সাধনা বইয়ে লিখেছেন, জগদীশ্বরের যে অনন্ত গুণ, তার প্রত্যেকটি কোমল-কঠিনাত্বক। আমরা সহজে বুঝতে পারব বলে ঐ সকল গুণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে নেই। জগদীশ্বরের অনন্ত দয়া ও অনন্ত ন্যায়পরতা আছে অর্থাৎ অনন্ত ন্যায়পরতা ও অনন্ত দয়ার একত্বে যে গুণ হয় তা-ই আছে। নতুবা ন্যায়পরতা শূন্য দয়া বা দয়া শূন্য ন্যায়পরতা তাতে নাই।[২৩৯]

জগদীশ্বরের প্রত্যেকটি গুণ সম্বন্ধেই ঐরূপ ধারণা প্রযোজ্য। এভাবে অনন্ত গুণের অনন্ত একত্বই তাঁর স্বরূপ।সীমাবদ্ধ বা অন্ত বিশিষ্ট জীব সুখ ও দুঃখ, ধর্ম ও অধর্ম, চেতন ও অচেতন, পুরুষ ও রমণী অথবা প্রকৃতি ও পুরুষ- এদের এক একটির বিষয়ে মনোযোগপূর্বক নানা প্রকার চিন্তা ও চর্চ্চা করতে এবং বহুবিধ জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে বটে কিন্তু উল্লিখিত যুগ্মের একতর না হয়ে যে কিরূপ হতে পারে, তা বুঝতে পারেনা এবং উক্ত যুগ্মসমূহের মধ্যে কোনটির মিশ্রণে বা একত্বে যে কি রকম অবস্থা হয় তা-ই যখন ধারণা করতে সমর্থ হয়না তখন অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্ত একত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য মাত্র। শাস্ত্রকারেরা হর-গৌরীর একত্ব, পুরুষ-প্রকৃতির বা চেতন-অচেতনের মিলনের দ্বারা জগৎ কার্য সম্পাদনের উল্লেখ করে এ বিষয়ের আভাষ দিয়েছেন। পূর্বোক্তরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করে গুরুনাথ মন্তব্য করছেন যে, এরূপভাবে যে নির্দেশ করা হ'ল তা নির্দিষ্ট না হলেও সাধারণ পাঠকগণ যা বুঝতেন নির্দিষ্ট হওয়াতে তার চেয়ে যে বেশীকিছু ফল হ'ল এরকম মনে হয়না। এসব কারণেই বলা হয় যে ঈশ্বর অনির্বচনীয়। যাঁরা ভক্ত এবং সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় রত, সেরকম চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মূল লিখিত বিষয় পাঠ করে যে কোন ফল লাভ করতে পারবেন না-এরকম নয়।

---

[২৩৮] কেনোপনিষদ-৬

[২৩৯] দ্রষ্টব্য, শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান সাধনা, পৃ: ১২২

এই শ্রেণীর লোকদের জন্য মূল নির্দিষ্ট এ অংশ সবিশেষ উপকারক হবে। আর যাঁরা এখনও সবিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারেন নাই তাঁরা জগদীশ্বরের স্বরূপ যে দুই প্রকারে নির্দিষ্ট হয়েছে তারমধ্যে প্রথম প্রকারের মাত্র অনুশীলন করবেন।ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে আচার্য গুরুনাথ দুই অংশে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে প্রথম অংশ সগুণ পক্ষে এবং শেষ অংশ নির্গুণ পক্ষে। শেষোক্ত অংশ সাধারণের পক্ষে বোঝা অসম্ভব, অসাধারণ মানুষের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক সিদ্ধ ব্যক্তিই হয়ত তা বুঝতে পারেন।

পর্যালোচনা:

ঈশ্বরবিশ্বাসীগণ প্রায় সকলেই একমত যে, ঈশ্বর অনির্বচনীয়, বাক্যের অতীত, মনের অতীত এবং চিন্তারও অতীত; কেননা, ঈশ্বর সম্বন্ধে যতকিছুই বলা হোক না কেন, আরও কিছু বলার আছে বলে মনে হয়; তাঁর সম্পর্কে যতই চিন্তা করা যায় ততই আরো অধিক চিন্তনীয় বিষয় রয়ে যায়। দর্শনে অনুমান বা চিন্তার সাহায্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব দেয়া হয়েছে। ঈশ্বর যদি চিন্তার অতীত হন তবে চিন্তা বা অনুমানের সাহায্যে তাঁর যথাযথ বা পূর্ণ স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। যিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন, তিনিই জানেন ঈশ্বর কিরূপ। কিন্তু যেহেতু অনির্বচনীয় সেজন্য তিনিও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করতে সমর্থ হন না; সুতরাং অন্যকে জানাতেও পারেন না। তাই যিনি ঈশ্বরকে জানেন না তাঁর কাছে ঈশ্বরের স্বরূপ এক দুরূহ ও দুর্বোধ্য বিষয়। তবুও অনুমানের উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন চিন্তাবিদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আনুষঙ্গিকভাবে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করেছেন।যদিও তাঁরা জানেন যে, অনুমাননির্ভর সবকিছু ঠিক নয়।

প্রত্যেক ধর্মই কোন না কোন শক্তি বা আদর্শে বিশ্বাস করে। এ শক্তির ধারণা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম দেখা যায়। অধিকাংশ ধর্ম এ শক্তিকে সমস্ত সদর্থকগুণের উৎকর্ষস্থল বলে মনে করে। যেমন, পরমশক্তি, পরমজ্ঞান, পরম-ন্যায়বান ইত্যাদি। বহুত্ববাদী ধর্মগুলো বিভিন্ন পরম শক্তির ক্ষেত্রে এক একজন দেবতার কথা বলে। যেমন, গ্রীক ধর্মে জিউস সবচেয়ে শক্তিশালী, এ্যাথেনা সবচেয়ে জ্ঞানী, আফ্রোদিতি সবচেয়ে সুন্দরী ইত্যাদি। একেশ্বরবাদী ধর্মে এ সমস্ত ক্ষমতা এক শক্তিতে কেন্দ্রীভূত বলে মনে করা হয়; অর্থাৎ ঈশ্বরই সব শক্তির আধার। আর কিছু কিছু ধর্মমত অনুসারে ঈশ্বরের গুণ- ক্ষমতা মানুষের ধারণার বাইরে।[২৪০] তবে এসব মতে ঈশ্বরকে গুণক্ষমতাসম্পন্ন বলেই মনে করা হয়। বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়, তাতে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা পাওয়া যায় না।[২৪১]

ধর্মে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বশুভকর, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে নির্দেশ করা হয়েছে। অনেকের ধারণা যে, এ বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা ঈশ্বরে নরত্বারোপ করা হয়।[২৪২] রাতের

---

[২৪০] K. Ajdukiewicz, *Problems and theories of Philosophy* , Tr. By H. Skolimowski & A. Quinton, Cambridge University, 1975, পৃ: ১৫১-১৫২

[২৪১] যেমন, বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আছে- When Moses asked God after his talks with Him as to what he would say to his people, when they would ask him about the nature of their God, Jehovah replied, 'Tel' I am what I am.দ্রষ্টব্য Kedarnath Tiwary, Comparative Religion, পৃ: ১১০

[২৪২] J.P.Thiroux, Philosophy- Theory and Practice, পৃ: ৩৪৯

অন্ধকারে মুড়োগাছকে শিশু ভূত, প্রেমিক তার প্রেমিকা এবং চোর পাহারাওলার কথা মনে করতে পারে; এই মুড়োগাছের উদাহরণ দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন-

"স্বয়ং ঈশ্বরই কেবল আছেন। আমরাই আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁকে মানুষ, ধূলো, বোবা, দুঃখী ইত্যাদি রূপে দেখে থাকি...।[২৪৩]

প্রসঙ্গক্রমে আচার্য গুরুনাথ একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব এই জগতের জ্ঞানের ভিত্তিতেই ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে। জগৎ স্রষ্টার সৃষ্টি- সুতরাং সান্ত; অনন্ত নয়। স্রষ্টা অনন্ত, সৃষ্টি সান্ত। সুতরাং এই সৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ সান্ত পদার্থ দ্বারা অনন্তের উপমা সম্পূর্ণরূপে দেয়া যায় না। সৃষ্টিতে কঠিন পদার্থের চেয়ে তরল পদার্থ পরিমাণে বেশী। কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার আছে কিন্তু তা ব্যাপ্তিশীল নয়। একখন্ড পাথর এখন যেমন আছে একটু পরেও তেমনই থাকবে। যত বড় পাত্রে রাখা হোক না কেন ঐ পাথরখন্ড আর আয়তনে বড় হবে না। কিন্তু কোন বড় পাত্রে জল রাখলে তা পাশের দিকে ব্যাপ্তিশীল হবে এবং তার আকারের পরিবর্তন হবে; কেননা জলের নির্দিষ্ট আকার নাই। আর কোন পাত্রের একপাশে বায়ু রাখলে তা সবদিকে ব্যাপ্তিশীল হয়ে ঐ পাত্রের সব জায়গা দখল করবে; এটা বায়ুর ব্যাপ্তিশীলতা ধর্মের জন্য হয়। আর ঐ পাত্র যদি আবদ্ধ না হয়, তবে ঐ বায়ু ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্তিশীল হতে থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সূক্ষ্মতা বাড়তে থাকলে অনন্তভাবের দিকে ক্রমশঃ ব্যাপ্তিশীলতা জন্মে। এজন্য কঠিন পদার্থের চেয়ে তরল পদার্থ এবং তরল পদার্থের চেয়ে বায়বীয় পদার্থ ক্রমশঃ যেমন "সূক্ষ্ম" তেমনই ব্যাপ্তিশীল এবং অনন্ত অভিমুখে ধাবিত। সুতরাং যিনি অনন্ত, তাঁর সত্ত্বা সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপ্ত হয়ে সৃষ্টির বাইরেও ব্যাপ্তিশীল। হাত, পা বা অন্য কোন একটি অঙ্গ দ্বারা যেমন সম্পূর্ণ শরীরের উপমা দেয়া যায় না, তেমনি যিনি অনন্ত ও অসীমভাবে ব্যাপ্ত তাঁর উপমা তাঁর কোন অংশদ্বারা অর্থাৎ সান্ত পদার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দেয়া যায় না। পূর্ণভাবে উপমা দেয়া না গেলেও আংশিক সাদৃশ্যের জন্য উপমা দেয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। যেমন, কবিরা সুন্দরীর মুখকে 'চন্দ্রমুখ' বলেন, যদিও ঐ মুখ চাঁদের মত বিশাল গোলাকার নয়, চাঁদের কলঙ্কও ঐ মুখে নাই। তথাপি চাঁদ দেখলে মনে যে রকম আনন্দ হয়, সুন্দরীর মুখ দেখলেও ঐ রকম আনন্দ হয় বলেই কবিরা এরূপ বলে থাকেন। সান্ত পদার্থ দ্বারা অনন্তের যে সাদৃশ্য নির্দেশ করা হয় তা কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। মাত্র কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য বুঝাতে ঐ জাতীয় উপমা দেয়া হয়।

আলাদাভাবে সান্ত পদার্থের দু'একটি ধারণা করতে পারলেও অনন্তের ধারণা করা সম্ভব নয়। সান্ত পদার্থগুলোও সমষ্টিভাবে একসাথে ধারণা করা সম্ভব নয়। যেমন, এক টুকরা কাগজ বা একখন্ড পাথরের ভাব হয়ত কিছুটা ধারণা করা যায়। ঐগুলো যে জায়গায় আছে আলাদাভাবে তার কিছু ধারণা করতে পারলেও এক সাথে সমষ্টিভাবে তাদের ধারণা করা সম্ভব নয়। আবার ঐ জায়গা যে প্রদেশে, ঐ প্রদেশ যে দেশে, ঐ দেশ যে মহাদেশে, ঐ মহাদেশ যে গ্রহে, ঐ গ্রহ যে সৌরজগতে একসাথে এসবের ধারণা করা একান্তই অসাধ্য। সুতরাং যিনি অনাদি-অনন্ত, তাঁর ধারণা করাও একান্ত অসাধ্য।

---

[২৪৩] বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃ: ৫৩৭

অনেক ক্ষেত্রে ব্যষ্টিভাবের ধারণা সমষ্টিভাবের মত হয় না। পারদ ও গন্ধক পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা করে তাদের যে সব গুণ উপলব্ধি করা যায়; সমষ্টিভাবে কিন্তু ঐ রূপ হয় না। হিঙ্গুল ও কজ্জলী-এ দু'টি পদার্থই পারদ ও গন্ধকের যোগে উৎপন্ন; কিন্তু এদের রং পারদের মত সাদা বা গন্ধকের মত হলুদ না হ'য়ে যথাক্রমে লাল ও কালো হয়। স্ত্রীলোকের ধর্ম বা পুরুষের ধর্ম আলাদাভাবে কতকটা বুঝতে পারলেও ঐ উভয়ের যোগে বা ঐ উভয়ের একত্বে কি হয় তা সাধারণভাবে বোঝা যায় না। সমুদ্রের জলরাশির কয়েক ফোঁটা দেখে তার প্রবল ঢেউয়ের কথা, তার বিশালতা, গভীরতা প্রভৃতি গুণের কথা জানা যায় না। তবে সমুদ্রের জলের লবণাক্ততা প্রভৃতি কয়েকটা গুণ মাত্র জানা যায়। কিন্তু ঐ জলকে যদি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত করে কারো সামনে আনা হয়, তবে সে তা দেখে সমুদ্রের অস্তিত্ব ভিন্ন কিছুই জানতে পারবে না। এরকম, স্ত্রী-পুরুষের একজনকে দেখে অথবা জগতের বিপরীত পদার্থদ্বয়ের একটিকে দেখে তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত ভাব কিছুই বোঝা যাবে না।[২৪৪]

বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতযুগে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মে শক্তি বেশী। একখন্ড বিরাট পদার্থের চেয়ে ঐ পদার্থের একটি অণুর শক্তি বেশী। ঐ অণুর চেয়ে তার একটি পরমাণুর শক্তি বেশী। ঐ পরমাণুর চেয়ে তার একটি ইলেক্ট্রনের বা নিউক্লিয়াসের শক্তি বেশী। ইউরেনিয়াম পরমাণু ভাঙলে যে বিপুল পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয় তা পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। দু'টি হালকা পরমাণু সংযোজিত হয়ে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে হাইড্রোজেন বোমা বলা যেতে পারে। এর ধ্বংস ক্ষমতা পরমাণু বোমার চেয়েও ১০০ গুণ বেশী। যে নিউক্লিয়াসে নিউক্লীয় বল খুব দৃঢ় নয় সে নিউক্লিয়াসে নিউক্লীয় কণাগুলো নিউক্লিয়াস থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে এবং নিউক্লিয়াসটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে যাবার সময় আলফা ও বিটা কণা এবং গামা রশ্মি নির্গত হয়। আলফা ও বিটার ভর আছে তাই এরা কণা কিন্তু গামার ভর নাই এজন্য এটা কণার চেয়েও সূক্ষ্ম। নির্গমনের সময় এদেরকে আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি ও গামা রশ্মি বলা হয়। বিটা রশ্মি আলফা রশ্মির চেয়ে সূক্ষ্ম। তাই বিটা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা আলফা রশ্মির চেয়ে বেশী। গামা রশ্মির ভর নেই, এটা আলফা ও বিটার চেয়ে সূক্ষ্ম; এবং ভেদন ক্ষমতা আরো বেশী। এ রশ্মিটি এক্স রশ্মির সমগোত্রীয়। এক্স-রশ্মিরও ভর নাই। এর ভেদনক্ষমতা আলফা ও বিটা রশ্মির চেয়ে বেশী।

এ ছাড়া নভোমন্ডল থেকে আগত নভোরশ্মি বা মহাজাগতিক রশ্মি এ রশ্মিগুলির চেয়ে আরও সূক্ষ্ম । এ রশ্মির ভেদন ক্ষমতা তীক্ষ-এক্স-রে ও গামা রশ্মির চেয়ে আরও বেশী। এ রশ্মি বায়ুমন্ডল দ্বারা শোষিত হয় অর্থাৎ বায়ুতে লীন হয়ে যায়।[২৪৫]

সুতরাং, দেখা যায় যে, ক্রমশঃ সূক্ষ্মতার দিকে শক্তি বেশী। আর এখানে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে,জড়ের সূক্ষ্মতা বাড়তে থাকলে এক সময় তা ভরহীন হয় ওতেজে পরিণত হয় ও তার শক্তি বেশী হয়। যেমন, গামা রশ্মি বা এক্স-রশ্মি ভরহীন, তেজ আকারেই এদের প্রকাশ দেখা যায়। আলফা ও বিটার চেয়ে এদের শক্তি বেশী। এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, তেজঃ কণা সূক্ষ্ম হ'তে হ'তে তা বায়ু

[২৪৪] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান সাধনা, পৃ: ৩৭-৪০

[২৪৫] দ্রষ্টব্য, ALAN H. CROMER, *physics for the life sciences*, Mc Graw Hill Book Company, New York, 1974, P.455-456

কণায় পরিণত হয় এবং বায়ু কণাও সূক্ষ্ম হ'তে হ'তে ব্যোম কণায় পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ এদের শক্তি বেশী হ'তে থাকে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁতে সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি, সুতরাং তিনি সূক্ষ্মতার দিক থেকে ঐ ইলেকট্রন বা নিউক্লিয়াস প্রভৃতির চেয়ে আরও সূক্ষ্ম; ভূতপদার্থগুলির চেয়েও অনেক অনেক গুণে সূক্ষ্ম, সুতরাং সৃষ্টির এই জড় পদার্থ দেখে অনন্ত শক্তিধর সৃষ্টিকর্তার ভাব কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু এ পর্যন্ত বুঝেই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি। তারা বুঝেছে যে, কোন বিষয়ের মর্ম জানতে হলে রীতিমত তাঁর অনুশীলন করা দরকার। এ জন্য বহুসংখ্যক মহামনীষী জগদীশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হলেন এবং তাঁর গুণরাশির কিছু কিছু লাভ করতে লাগলেন। বিভিন্ন যুগে এ সমস্ত মনীষী স্রষ্টা সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছেন তা দ্বারাই তারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝতে ও বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বিভিন্নজনে স্রষ্টাকে যেভাবে জেনেছেন; ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে তা-ই সঞ্চিত দেখা যায়।

দর্শন ও ধর্মে ঈশ্বরের স্বরূপ একটি সমস্যা। দর্শন চায় ঈশ্বর সম্পর্কে যৌক্তিক বা বৌদ্ধিক জ্ঞান আর ধর্ম চায় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি। একটি সন্ধান করে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত জ্ঞান, অন্যটি চায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা। ধর্মে মানুষ ঈশ্বরের দিব্যদর্শন চায়, দর্শন চায় ঈশ্বর সম্পর্কে একটি বৌদ্ধিক ধারণা। অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, স্বরূপ ও গুণাবলী সম্পর্কে একটি সংগতিপূর্ণ ধারণা। কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে হলেই তার ভিত্তি স্বরূপ সে সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা দরকার। ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান যুক্তিসিদ্ধ বা সর্বজন গ্রাহ্য হতে হলে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সমূহের যৌক্তিক আলোচনা প্রয়োজন।[২৪৬]

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

উপনিষদে ব্রহ্মের দু'রকম ধারণার কথা পাওয়া যায়- নির্বিশেষ (নেতিবাচক) এবং সবিশেষ; অমূর্ত ও মূর্ত। এ দু'রকম ধারণা নানা বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে- নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরুপাধি, নির্বিকল্প; আর সগুণ সবিশেষ, সোপাধি, সবিকল্প। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা চলেনা- তিনি অনির্দ্দেশ্য, অবাঙ্‌মনসোগোচর; বিভিন্ন উপনিষদে এরূপ বলা আছে।[২৪৭] এ হ'ল ব্রহ্মের নির্বিশেষ ধারণা বা ভাব। ব্রহ্মের আর একটি ধারণা হ'ল তাঁর সগুণ বা সবিশেষ ভাব। উপনিষদে এই সবিশেষ ভাবকে ঈশ, ঈশ্বর, ঈশান, মহেশ্বর ইত্যাদি বলা হয়েছে।[২৪৮] উপনিষদে ব্রহ্মের এই যে দ্বিবিধ ভাব- এ ভাব গুণের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, গুরুনাথের মতে, ঈশ্বর গুণময়; ঈশ্বরের যত নাম আছে সবই তাঁর বিভিন্ন গুণের নাম। তাঁর অনন্ত গুণের যে সব গুণ সম্বন্ধে মানুষ জেনেছে, সেই সব গুণের নামে তাঁকে বিভূষিত করেছে। সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্বিশেষ ভাবকে উপনিষদে সগুণ ও নির্গুণ বললে ও প্রকৃতপক্ষে এ দুটো ভাবই সগুণ ব্রহ্মের পরিচায়ক। কোন গুণে বিশেষিত করা আর কোন গুণে বিশেষিত না করা উভয়ই সগুণত্বের অন্তর্গত। নির্গুণ ব্রহ্ম হ'ল গুণের অধার্য্যভাব অর্থাৎ অনির্ণেয় গুণ যার। এক সাথে অনন্ত গুণের কথা যেখানে তা-ই নির্গুণ ব্রহ্ম। বিশেষ বিশেষ গুণ স্বীকার বা অস্বীকারের কথা যেখানে, তা সগুণ ব্রহ্মের পরিচায়ক।

---

[২৪৬] S.C. Chatterjee, *Fundamentals of Hinduism,* পৃ: ১২

[২৪৭] তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৯/১, কেনোপনিষদ ১/৩, কঠোপনিষদ ৬/১২, বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২/৩/৬।

[২৪৮] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫/৬/১, মাণ্ডুক্য উপনিষদ ৬, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৩/১৭, ৬/৭।

হিন্দু শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বেদান্তকে বলা হয় ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপক শাস্ত্র। উপনিষদ ভাগকে (বেদের শেষভাগ) বেদান্ত বলে। অনেকের মতে উপনিষদ বেদজ্ঞানের নিষ্কাষিত সার। হিন্দুধর্মে ক্রিয়াকান্ডের প্রতিষ্ঠা সংহিতা ও ব্রাহ্মণে, আর অধ্যাত্ম সাধনার প্রতিষ্ঠা উপনিষদে। উপনিষদে ব্রহ্ম তত্ত্বই প্রধান বিষয়। এ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে মহানির্বানতন্ত্র, বিভিন্ন সংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঈশ্বরের ধারণার কথা অনুমিত হয়েছে হিন্দুধর্মে। হিন্দুধর্মে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাথে দার্শনিক আলোচনার সমন্বয় দেখা যায়। এ ধর্ম যৌক্তিক ভিত্তিহীন অন্ধভাবে অনুসরণীয় কতগুলো নিয়ম-কানুনের সমাহার নয়। এর মূলনীতি সমূহের তাৎপর্য্য গভীরভাবে অনুধাবনীয়। এটি একটি জীবন ধারা, যার ব্যবহারিক দিক ও সামগ্রিক জীবন দর্শন রয়েছে। এখানে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরম সত্ত্বা সম্পর্কীয় তত্ত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[২৪৯] হিন্দু দর্শনের ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সমস্ত সৃষ্টির মূলাধার।[২৫০] ঋগ্বেদ বলছে, ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, তিনি সব কিছুর মূল, তিনি তার জ্ঞানশক্তি বা তপস্যা দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন।[২৫১]

ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের নামগুলো গুণবাচক

সব ধর্মেই ঈশ্বরের গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। আমরা যে "ঈশ্বর" শব্দটি ব্যবহার করছি- এটিও গুণ প্রকাশক শব্দ বা গুণবাচক নাম, "ঈশ্বর" অর্থ প্রধান, অধিপতি, অবলম্বন। এটি সগুণ ঈশ্বরের একটি অবস্থা- অনন্ত গুণের একটি গুণময় অবস্থা।[২৫২]

বৃহ্ ধাতু থেকে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি- এর অর্থ বৃহত্তম, বিরাটতম, বিশালতম ইত্যাদি। হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের যে সমস্ত নামের উল্লেখ আছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রত্যেকটি এক একটি গুণের নাম বা কোন গুণময় ভাব। যেমন-

নারায়ণ- নার=জন+অয়ন=স্থান (সব কিছুর আশ্রয়)।

---

[২৪৯] ঐ, পৃ: ১২-১৩

[২৫০] হিন্দু দর্শনে ঈশ্বরের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী দয়ানন্দ বলেন-Earth, water, air, fire etc. each of which is a product of matter, are all unintelligent; none of these can function independently. Earth for instance, cannot bear fruit of various kinds of its own accord, water cannot pour on earth by itself, winds cannot blow by themselves and fire cannot discharge its manifold functions of its own initiative. There must be an undercurrent of all-pervasive intelligence running through them all, under whose directions these insentient substances discharge their respective functions. That all-pervasive intelligent power which controls everything and guides matter is God দ্রষ্টব্য, Swami Dayananda, Conception of God in Hindu Philosophy, *Kalyan-Kalpataru,* পৃ: ১২৮-১২৯

[২৫১] The Regveda tells us that darkness prevailed everywhere the creation of the universe. In the midst of that darkness and even beyond it subsisted all by Himself, one glorious being, God, consisted by nothing but intelligence and having no origin other than Himself. He evolved Himself out of darkness and created the universe by dint of His Tapas i.e.His knowledge power. দ্রষ্টব্য,Pandit Madan Mohan Malaviya, God and Sanatana Dharma, *Kalyan-Kalpataru,* পৃ: ২৭।

[২৫২] Vaman Shivram Apte, তাঁর *The Students Sanskrit-English Dictionary.* তে 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থে Powerful, Lord, Able, Capable of Master, Ruler প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ভগবান- ষড়ৈশ্বর্যশালী

কৃষ্ণ- কৃষ্=উৎকৃষ্ট+ন=সুখ, সম্পত্তি; কৃষ্=আকর্ষণ+ন; কৃষ্=সংসার+ন=মুক্তি; যিনি আকর্ষণ করেন বা আত্মাকে কর্ষণ করেন।

বিষ্ণু- শুদ্ধ, বিষ্+নু, যিনি সর্বব্যাপি।

হরি- যিনি জীবের পাপভার হরণ করেন, (সকল মানুষের) হৃদয় হরণ করা, সংহার করা)

রাম- যিনি হৃদয়কে রমন করেন, রমনীয়, মনোহর

শিব- নিষ্পাপদিগের শুভ বিধাতা

গণেশ বা গণপতি- জনগণের অবলম্বন বা পতি।[২৫৩]

এভাবে আরও যত নাম আছে, অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সবই পরমেশ্বরের বিভিন্ন গুণের নাম। বিভিন্ন সময়ে এ নামকে ব্যক্তি বিশেষের নাম মনে করা হয়েছে এবং ঐসব নামের সাথে একজন স্থূল দেহধারী ব্যক্তিকে কল্পনা করে তাকে পরমেশ্বরের আসনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ জন্যই দেখা যায় যে, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে একমত বা সঙ্গতি নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে বলার সময় 'তুমি' 'তিনি' 'যে' 'যিনি' ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানবীয় অর্থে তাঁকে ব্যক্তি মনে হতে পারে। এ ধারণা নিতান্তই স্থূল। গুণসমষ্টি বুঝাতে ঐ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। তাঁকে ব্যক্তি মনে করলেও সাধারণ মানবীয় ধারণায় ব্যক্তি মনে করা ঠিক হবেনা; উচ্চতম ধারণায় ব্যক্তি মনে করা যেতে পারে; ভাষার অপূর্ণতার জন্য তা প্রকাশ করা যায়না। যেমন 'ভাল' এর ক্রম আছে শ্রেয়, শ্রেয়তর, শ্রেষ্ঠ; এরূপ প্রতিটি ধারণারই ক্রম আছে; এই ক্রমের চরমোৎকর্ষ ঈশ্বরে আরোপ করা যায়। ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে 'তুমি' 'আপনি' এভাবে সম্বোধন করলেও সাধারণ মানবীয় ব্যক্তিত্বে তাঁকে ভাবা যায় না। তুমি বা আপনি এর ক্রম উচ্চভাব ভাষায় নাই তাই এই শব্দগুলিই ব্যবহার করা হয়। তবে ব্যবহারের সময় সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, ঈশ্বরে সে অর্থে ব্যবহার করা হয় না। ভাষা এক হ'লেও ভাবের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, বিভিন্ন লোকের ধারণা শক্তির বিভিন্নতার জন্যও জনে জনে ঐ ভাব ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়।রব।

দর্শনে ঈশ্বরকে বিভিন্ন ব্যক্তিক নামের পরিবর্তে গুণের নামে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা দেখা যায় কেননাগুণের নাম সাধারণ; সমস্ত ধর্মের লোকেরা তা ব্যবহার করতে পারে। এক এক ধর্মে ঈশ্বরের এক এক গন্ডীবদ্ধ নাম। যেমন- ব্রহ্ম, আল্লাহ্, যীশু আহুরা-মাজদা ইত্যাদি। তবে এগুলোও প্রকৃত পক্ষে গুণের নাম; কিন্তু সাম্প্রদায়িকভাবে চিন্তা করার ফলে এগুলো বিশেষ বিশেষ ধর্মের লোকেরা ব্যবহার করেন, এক ধর্মের লোকেরা অন্যদের শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু যদি গুণের দিক থেকে চিন্তা করা হয়, তাহলে সবাই সমস্ত নাম গ্রহণ করতে পারেন। দর্শনবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদরা ঈশ্বরের যে নামগুলো ব্যবহার করেছেন সেগুলো সম্বন্ধে এত গন্ডীবদ্ধতা নাই। যেমন, প্লেটোর শুভ, এ্যারিস্টটলের আদিচালক, হেগেলের পরম মন ইত্যাদি। এগুলোকে প্রথমাবধি গুণের নামে চিন্তা করা হয়েছে বলেই এগুলো- ব্যক্তিক নামে পরিণত হয়ে

[২৫৩] এ শব্দগুলোর অর্থ আশুতোষ দেব, প্রকৃতিবোধ অভিধান কলিকাতা ১৩১৬ বাং থেকে সংকলিত।

সাম্প্রদায়িকতার গন্ডীতে আবদ্ধ হয়নি। ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনার সুবিধার জন্য কোন কোন দার্শনিক বিভিন্ন ধর্মে ব্যবহৃত নামের পরিবর্তে ঈশ্বরের একটা সাধারণ গুণের নাম ব্যবহার করেছেন।[২৫৪]

তবে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের আরও কিছু নাম আছে যেগুলোকে ব্যক্তিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি বা ব্যক্তিক মনে করা হয়নি। এগুলো সবসময়েই গুণের নাম হিসেবে রয়ে গেছে। যেমন,

করুণাময়- যিনি পাপ থেকে মুক্ত করেন।

কৃপাময়- যিনি শান্তি দেন।

দয়াময়- যিনি যাবতীয় দুঃখ হরণ করেন।

মঙ্গালময়- পাপীদিগের শুভ কর।

বিভু- সর্বব্যাপী।

প্রভু- অনুগ্রহ ও নিগ্রহে সমর্থ ইত্যাদি।[২৫৫]

ঈশ্বরের এরকম আরও বহু গুণের নাম আছে; কিন্তু তিনি বহু ব্যক্তি নন। তাঁর গুণ অনন্ত তাই তাঁর নামও অনন্ত। বাইবেলে আছে- "ক্রিয়া সাধক গুণ নানা প্রকার কিন্তু ঈশ্বর এক"[২৫৬] । ঈশ্বরের এরূপ যত নাম পাওয়া যাবে, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সবই তাঁর গুণের নাম- কোন ব্যক্তিক ঈশ্বরের নাম নয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে মানুষ যতগুলির পরিচয় পেয়েছে তত নামে তাঁকে অভিহিত করেছে। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় গুণের দিক থেকে ব্যাখ্যা না করে এই গুণের নামকে বিভিন্ন ব্যক্তিক নাম মনে করে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

সুতরাং আমরা ব্রহ্ম বলি বা ঈশ্বর বলি বা স্রষ্টা, পরমেশ্বর, পরমাত্মা যত কিছুই বলি, সবই সেই অনির্বাচ্যের গুণের নাম বা গুণ প্রকাশক শব্দ। এই বিভিন্ন নাম সেই এককেই প্রকাশ করে। কোরানেও স্রষ্টার যে নামসমূহ আছে- সবই গুণের নাম। যেমন-

রহমান- না চাইতেও দানকারী

রহিম- চাইলে দানকারী

মালেক- কর্তা

মুছাব্বের- আকৃতি দাতা

রব-প্রতিপালক

---

[২৫৪] যেমন J.P.Thiroux লিখেছেন-"Ultimate reality is a phrase that I plan to use especially in general religious discussion to refer to central core of any religion or religious view point because the other terms Jahweh, Jesus Christ, Allah, Brahman, Tao, Zeus, the good., Nirvana are so different in character and yet ultimate to those who believe in them that a more neutral term is needed. দ্রষ্টব্য, Jacques P.Thiroux, *Philosophy Theory - and Practice*, পৃ: ৩০০-৩০১।

[২৫৫] এ শব্দগুলোর অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ২২৭-২৮৭।

[২৫৫] বাইবেল, ১ করিন্থীয় ১২:৬।

হাফিজ- রক্ষাকর্তা ইত্যাদি।[২৫৭]

এ ছাড়াও তাঁর আরও বহু নাম আছে যার ঈঙ্গিত কোরআনে রয়েছে।[২৫৮] বাইবেলেও ঈশ্বরকে প্রভু, মঙ্গলময়, প্রেম, জ্যোতি ইত্যাদি গুণের নামে বিভূষিত করা হয়েছে। ঈশ্বরের যে যে গুণের কথা মানুষ উপলব্ধি বা চিন্তা করতে পেরেছে সেগুলিরই উল্লেখ করেছে। পরিপূর্ণভাবে সমস্ত গুণের কথা জানা হয়েছে বলে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের যে বিভিন্ন নাম আছে, সবই গুণের নাম।

ভারতীয় দর্শন , ধর্ম, ও সংস্কৃতির আকর-গ্রন্থ হল উপনিষদ। বৈদিক যুগের শেষভাগে বেদকে আশ্রয় করে উপনিষদগুলি গড়ে উঠেছিল। উপনিষদের বিভিন্ন উপাখ্যানে বা শ্রুতি বাক্য সমূহে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তবে সকল উপনিষদের মূলতত্ত্ব হল যে, ব্রহ্ম এই দৃশ্যমান জগতের মূল কারণ; তিনি চৈতন্য-স্বরূপ, স্বয়ং প্রকাশ, নিত্য, শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, বুদ্ধির অগম্য, অবাঙ্‌মনসোগোচর।তাই তাঁর স্বরূপ নির্দেশ করা যায় না।উপনিষদ তাঁর সম্পর্কে আভাষ দিয়েছে মাত্র। কিন্তু তা যথার্থ স্বরূপ লক্ষণ নয়। এ জন্য উপনিষদ তাঁকে নেতিবাচক সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করেছে। উপনিষদে ব্রহ্মের লক্ষণ মোটামুটি দুরকমভাবে দেয়া হয়েছে- স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যেমন-

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্।

যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্[২৫৯]

বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম।[২৬০]

এ জাতীয় যে লক্ষণগুলি স্বরূপাভিব্যঞ্জক তা স্বরূপ লক্ষণ। আর যা বিশেষণাদি- বোধক উপলক্ষণ মাত্র, তা তটস্থ- লক্ষণ। যেমন, পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিলয়ের মূল কারণ ব্রহ্ম। মূলতঃ উপনিষদে তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হয়েছে। ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ- এরূপ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের সত্ত্বা নির্দেশ করা গেলেও তাঁর স্বরূপাবধারণ হয় না। এ ধরণের লক্ষণ থেকে মূল কারণের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকতে পারে। যেমন, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ কি ব্রহ্ম, না কাল, না প্রকৃতি, না নিয়তি, ইত্যাদি।[২৬১] এ জাতীয় লক্ষণে আবার অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

এর সমাধানের জন্য প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূল কারণ এক অদ্বিতীয় চেতন অধিষ্ঠাতা-সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু হতে পারে না।[২৬২] ব্রহ্ম অপ্রমেয় (সর্ব প্রমাণের অগম্য), ধ্রুব (নিত্য)। শ্রুতি বলে, তাঁকে জ্ঞান স্বরূপে উপলব্ধি করতে হবে, তিনি বিরজ (পাপ

[২৫৭] এ শব্দগুলোর অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ থেকে সংকলিত।
[২৫৮] কোরআন ১৭:১১০
[২৫৯] তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/১/২
[২৬০] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩/৯/৩৪
[২৬১] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ১/১-২
[২৬২] তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩/১/১, তুলনীয় ব্রহ্মসূত্র ১/১/২

পুণ্যাদি মল রহিত), সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরম মহৎ।[২৬৩] ব্রহ্মে ভেদ নাই। তিনি ভূমাসংজ্ঞক, আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত অথচ কোথাও প্রতিষ্ঠিত নন।[২৬৪] আবার যা কিছু সবই তিনি, সর্বতোভাবে সর্বাত্মক।[২৬৫]

বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্রহ্মকে সুখ-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, সত্য-স্বরূপ, সৎ-স্বরূপ ইত্যাদি নির্দেশের সাথে সাথে তাঁকে স্রষ্টা, পালক, সর্বব্যাপী, এক, ইত্যাদি গুণবাচক শব্দে ভূষিত করা হয়েছে। সাধকরা তাঁকে যখন যে ভাবে জেনেছেন, সেভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে তাঁর স্বরূপ এ থেকে বোঝা যায় না। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে কিরূপ তাঁর স্বরূপ কি, তা জানা যায় না। সৃষ্টিতে তাঁর গুণের প্রকাশ দেখে তাঁকে ঐ সব গুণের নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, এতে তাঁর গুণ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর স্ব-স্বরূপ, পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়নি। তাঁকে দয়াময়, করুণাময়, স্রষ্টা, প্রেমময় ইত্যাদি যে বিবিধ গুণবাচক নামে ভূষিত করা হয়েছে, এগুলো সৃষ্টিতে ঐসব গুণের কাজ দেখে বা সাধকের উপলব্ধি দ্বারা অনুমান করা হয়েছে। যেমন সাধক তাঁর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে জ্ঞান লাভ করে তাঁকে জ্ঞান-স্বরূপ বলেছেন, তাঁর ধ্যানে আনন্দলাভ করে তাঁকে আনন্দ-স্বরূপ বলেছেন ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাঁর থেকে এই জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম, সুখ, দয়া, লাভ হয়, তিনি কি বা তাঁর স্বরূপ কি, এ প্রশ্নের উত্তর এসব শাস্ত্রবাক্য থেকে পাওয়া যাচ্ছেনা। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বত্র আছেন, তাঁতে সব শক্তি আছে, কিন্তু তিনি কি; তা এ কথায় বোঝা যায়না। ঈশ্বর প্রেম, জ্ঞান, জ্যোতি ইত্যাদি। এর যে কোন একটা বললে একটা কিছু ধরে নেয়া যায় কিন্তু জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণের আধার যিনি, তিনি কিরূপ, বা এসব মিলে কি হয় তা এসব শাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায় না।

আরও কিছু কিছু ধর্মমতে ঈশ্বরের ধারণা একটু ভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। যেমন, বৌদ্ধমতের নির্বান সম্বন্ধে কেদারনাথ তেওয়ারী মনে করেন যে, যদি নির্বান একটি পূর্ণতার অবস্থা হয় তাহলে যে নির্বান লাভ করে,যে ঈশ্বরত্ব লাভ করে। এদিক থেকে প্রত্যেক মানুষই প্রচ্ছন্ন ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরত্ব প্রদত্ত নয়, অর্জিত সত্ত্বা।[২৬৬]

আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে মরমীবাদী দার্শনিক শেখ আহমেদ সিরহিন্দির (সুফী মুজাদ্দিস) মত সম্বন্ধে আমিনুল ইসলাম লিখেছেন-

" আল্লাহ মানব প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞার নাগালের বাইরে ও উর্ধে। তাঁর সত্ত্বা বা তাঁর গুণাবলী ,কোনটিই প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞেয় নয়।আল্লাহ্র গুণাবলী সদর্থক ও নঞর্থক এ দু প্রকারের। নঞর্থক গুণাবলীর কিছু কিছু আল্লাহ্র অপূর্ণতাকে সম্পুর্ণভাবে অস্বীকার করে, আর অন্য কিছু কিছু তাঁর উর্দ্ধতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ তাঁকে মানবীয় প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার অগোচর বলে মনে করা হয়। সদর্থক গুণাবলীর কিছু কিছুকে তাঁর উপর আরোপ করা হয় এজন্য যে, তাদের বিপরীতগুলো অপূর্ণতার নির্দেশ দেয়, কিন্তু তারা নিজে আল্লাহ্র স্বরূপ

---

[২৬৩] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪/৪/২০ ,শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ১/১২

[২৬৪] ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭/২৪/১

[২৬৫] ঐ, ৭/২৫/২, ৩/১৪/১

[২৬৬] If Nirvana is taken as a state of perfection as it must perhaps be taken everyone who attains Nirvana becomes a God. Eachmen, therefore is a potential God, God, in this sense not a given reality, rather Godhood is a status which is to be attained. দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, *Comparative Religion* p.50

ব্যাখ্যা করেনা। অন্যান্য সদর্থক গুণাবলী আল্লাহ্‌র স্বরূপ ব্যাখ্যা করে এবং এজন্য এগুলো তাঁর সারধর্মের অংশ স্বরূপ। আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সারধর্মের সমার্থক নয়। গুণাবলী সারধর্মের চেয়ে স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত।[২৬৭]

মুজাদ্দিদের এমতে একবার গুণাবলীকে সারধর্মের অংশ বলা হয়েছে আবার তাকে সারধর্মের চেয়ে স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত বলা হয়েছে। এতে সারধর্ম ও গুণ কোনটিই পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়নি এবং আল্লাহ্‌র স্বরূপ বা সারধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণাও পাওয়া যায়না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অন্বয়ী বা ব্যতিরেকী যে উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন, শাস্ত্রকারেরা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশে তেমন সফল হননি। তাঁর কিছু কিছু গুণ-ক্ষমতা প্রকাশ করলেও ঈশ্বর কিরূপ বা কি, তা পূর্ণভাবে সম্ভবতঃ শাস্ত্রে ব্যক্ত হয়নি। এজন্যই বোধহয় শাস্ত্রে (কোনও কোনও) তাঁকে অনির্বচনীয় রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। কোন কোন দার্শনিক তাকে অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় রূপে নির্দেশ করেন; সাধকবর্গ তাঁকে মনের অতীত, চিন্তার অতীত ও বাক্যের অতীত বলে নির্দেশ করেন।

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কিত বক্তব্যের অসংগতি

হিন্দুধর্মের প্রামাণ্য শাস্ত্রগুলোতে আছে যে, ঈশ্বর জন্ম গ্রহণ করেননা, তিনি অশরীরি ও ইন্দ্রিয়বর্জিত। কিন্তু হিন্দুধর্মে যে সম্প্রদায়গুলো রয়েছে, তাঁরা ঈশ্বর বলে যাঁকে নির্দেশ করেছেন, তাঁর জন্মগ্রহণ স্বীকার করেন এবং তাঁকে শরীরধারী ও ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট বলে মনে করেন। ফলে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে এদের বর্ণনা শ্রুতিবিরোধী। এদের বর্ণনায় যৌক্তিক সংগতিও বজায় থাকেনি। কোন কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরকে জন্মরহিত বলেছেন আবার তাঁর স্থূল রূপেরও বর্ণনা দিয়েছেন। এঁরা নিজেরা আরো যে সব বর্ণনা দিয়েছেন সেখানেও ঈশ্বর সম্পর্কে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, রামাষ্টক স্তোত্রে রামকে নিরাকৃতি নিস্প্রপঞ্চ বলে তাঁকে আবার জটা-কলাপ-শোভিত বলা হয়েছে অর্থাৎ তাঁর স্থূল রূপের উল্লেখ করা হয়েছে। শৈব মতে শিব অজ (জন্ম-রহিত); কিন্তু তাদের স্তব-স্তুতিতে শিবের জড় রূপের বর্ণনা আছে। গাণপত্যেরা গণপতিকে সব কিছুর উৎপত্তির কারণ বলে নির্দেশ করেন এবং তাঁকে শৈল সুতাসুত (হিমালয় রাজার কন্যা পার্বতীর পুত্র) বলে তাঁর স্থূল রূপের বর্ণনা দিয়েছেন ইত্যাদি।[২৬৮]

হিন্দুধর্মের প্রামাণ্যগ্রন্থ বলতে সাধারণভাবে শ্রুতিকে বুঝায় । শ্রুতি দুই প্রকার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। বৈদিকী শ্রুতি বলতে উপনিষদসমূহ নির্দেশ করা হয়। উপনিষদে ব্রহ্ম ও আত্মা সম্পর্কে পরস্পর বিপরীত উক্তি দেখা যায়।

উপনিষদে আত্মাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে।[২৬৯] শ্রুতির "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[২৭০] "তত্ত্বমসি"[২৭১] "অহং ব্রহ্মাস্মি"[২৭২] "সোঽহমস্মি"[২৭৩]এ চারটি বাক্য ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদভাব তথা ব্রহ্ম ও জীবাত্মার অভেদভাব

---

[২৬৭] দ্রষ্টব্য, আমিনুল ইসলাম (রুপান্তর ও সম্পাদনা), মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ: ৩০৯-৩১০

[২৬৮] দ্রষ্টব্য, স্তব-কবচমালা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), রামাষ্টকম্, শিবস্তোত্র, গণেশ স্তোত্র

[২৬৯] মান্ডুক্য উপনিষদ ২

[২৭০] বৃহদারণ্যক উপনিষদ -৪/৪/৫

[২৭১] ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/৮/৭

[২৭২] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৪/১০

[২৭৩] ঈশোপনিষদ ১৬

নির্দেশ করে। শংকরের মতে, আত্মা ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন এটাই উপনিষদের সারকথা। আত্মা ও ব্রহ্মের অদ্বৈত ধারণার কথা বাজসেনেয় সংহিতায়ও আছে "সেই যে আত্মা, আমিই সেই।" বিভিন্ন শ্রুতি প্রমাণ থেকে আচার্য শংকর সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই তত্ত্ব। অপরদিকে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকরা স্ব স্ব মতের অনুকূলেও শ্রুতি প্রমাণ উল্লেখ করেন।[২৭৪]

কিন্তু উপনিষদে আবার ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ভেদসূচক অর্থাৎ ব্রহ্ম আত্মার ভেদসূচক বাক্য আছে। যেমন-

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরণ্যং পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যোঽভিচাকশীতি।[২৭৫]

অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা নামক দুই পাখী সমান বৃক্ষ আশ্রয় করে রয়েছে। এদের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) কর্মফল ভোগ করে, অন্যজন ভোগ না করে কেবল দর্শন করে।

মুন্ডকোপনিষদে আছে যে,

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।[২৭৬]

এখানে বলা হয়েছে যে, "ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মের সাথে পরমসাম্য লাভ করেন- তাঁর পাপ পূণ্য বিধৌত হয়ে যায়।" এ শ্রুতিতে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে ভেদ বুঝায়। বাস্তবে ভেদ না থাকলে সাম্য, সাধর্ম বা সাদৃশ্য বলা যায়না। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে আছে-

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে

তস্মিন্ হংসোভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে,

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা

---

[২৭৪] উপনিষদসমূহ বিভিন্ন সময়ে রচিত হয় এজন্য এখানে দুটি পৃথক চিন্তাধারা পাওয়া যায়। এক ধারা অনুসারে ব্রহ্ম, জীব ও জগত অভিন্ন, অন্য ধারা মতে এ তিন তত্ত্ব পরস্পর বিভিন্ন। উপনিষদ বহুযুগের সঞ্চিত ভাবসম্পদের সমাহার। মহর্ষি বাদ্‌রায়ন উপনিষদীয় দর্শনের মূল সূত্রগুলির সুসঙ্গত ও সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। এ সূত্রগুলি খুব সংক্ষিপ্ত; ভাষ্যকারগণ বিভিন্নভাবে এগুলোর ব্যাখ্যা দেন এবং নিজেদের ব্যাখ্যার অনুকূলে উপনিষদের সারতত্ত্ব তুলে ধরেন; ফলে নানা মতবাদ গড়ে ওঠে। বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে গৌড়পাদ ও শংকরের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্যের শুদ্ধ দ্বৈতবাদ এবং শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ উল্লেখযোগ্য।

দ্বৈতবাদী মধ্বের মতে ভেদই সত্য; চেতন-আত্মা ও জীবাত্মার সাথে ঈশ্বরের ভেদ (জীবেশ্বর ভেদ), জড়ের সাথে ঈশ্বরের ভেদ (জড়েশ্বর ভেদ), জীবাত্মার সাথে জীবাত্মার ভেদ (জীবভেদ), জড়ের সঙ্গে জীবাত্মার ভেদ (জড়জীবভেদ) ও জড়ের সাথে জড়ের ভেদ (জড়ভেদ)-এ পাঁচ প্রকার ভেদ অনাদি এবং সত্য।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কের মতে, ব্রহ্ম ও জগত উভয়ই-নিত্য এবং সত্য। ব্রহ্ম তাঁর অচিন্ত্যশক্তি প্রকৃতি দ্বারা এ জগত সৃষ্টি করে এ সৃষ্টিতে বিদ্যমান আছেন এবং সৃষ্টি অতিক্রম করে একটি অতিক্রান্ত পরমসত্ত্বা হিসাবে বিশ্বাতীত আছেন। নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। সগুণ ব্রহ্ম কল্পিত নয়। ব্রহ্ম পূর্ণ, সুতরাং গুণ ও গুণী অর্থে তাঁতে কোন ভেদ নাই। তিনি সর্বশক্তিমান, নিজের ইচ্ছা ও শক্তিতে অনন্তরূপে প্রকট করে উহার আস্বাদন করেন, অদ্বৈত হয়েও দ্বৈত হন। এ-ই তাঁর সগুণত্ব এবং দ্বৈতত্ব। (দ্রষ্টব্য, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ: ৫৮৩, ৫৮৫)।

[২৭৫] মুন্ডকোপনিষদ ৩/১/১, আরও দ্রষ্টব্য, 'ঋগ্বেদ' সংহিতা ১/১৬৪/২০

[২৭৬] মুন্ডকোপনিষদ ৩/১/৩

জুষ্টস্ততস্তেনা মৃতত্বমেত্তি।[২৭৭]

অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক স্বরূপ উপলব্ধি করে জীব অমৃতত্ব লাভ করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আত্মা-স্বরূপ ও জীবাত্মার সাথে অভেদ বলে আবার জীবাত্মা ও ব্রহ্মের (পরমাত্মার) পৃথক সত্ত্বা নির্দেশ করা হয়েছে। কঠোপনিষদে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তাঁকে ব্রহ্মের সাথে এক করা হয়েছে।[২৭৮]

কিন্তু ঐ একই উপনিষদে আত্মা থেকেও পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যেমন-

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরংমনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।।

মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষ পরঃ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।[২৭৯]

অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়গণ থেকে তাদের বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয়সমূহ থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, মহান আত্মা বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ, মহান আত্মা বা মহৎ থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, তিনিই শ্রেষ্ঠ গতি।" এখানে সবচেয়ে বড় হল পুরুষ, আত্মা তাঁর চেয়ে অনেক ছোট, সুতরাং ব্রহ্মও আত্মা এক নয়। এখানে ব্রহ্ম ও আত্মাকে এক বলা হয়নি, সুতরাং এখানেও সংগতি বজায় থাকেনি। কেননা এ শ্রুতিতে পুরুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে এবং এ পুরুষকে ব্রহ্মের সাথে এক করা হয়েছে; এ পুরুষ ও আত্মা এক নয়। আবার কঠোপনিষদে আরও আছে-

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ

ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ এতদ্বৈতৎ।[২৮০]

অর্থাৎ "অঙ্গুষ্ঠ পরিমান পুরুষ নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় প্রকাশবান। তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, তিনি আজও বর্তমান আছেন, কালও তিনি থাকবেন, ইনিই সেই আত্মা" এখানে আবার পুরুষ ও আত্মাকে এক বলা হয়েছে। তদুপরি এখানে পুরুষকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বলা হয়েছে। শব্দটি লক্ষার্থে বা বাচ্যার্থে যে কোন অর্থে ব্যবহৃত হোক, কোন অবস্থায়ই এ পুরুষকে ব্রহ্মের সাথে এক বলা যাবেনা। আবার, একেই আত্মা বলা হয়েছে অথচ পূর্বশ্রুতিতে আত্মাকে পুরুষ অপেক্ষা অনেক ছোট হিসাবে দেখানো হয়েছে। বস্তুতঃ আত্মা পুরুষ ও ব্রহ্ম এ তিনটি শব্দ উপনিষদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণায় জটিলতার সৃষ্টি করেছে। সাধক ঠিক ব্রহ্ম হননা ,ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন;কঠোপনিষদে এ প্রসংগে বলা হয়েছে-

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।

---

[২৭৭] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ১/৬

[২৭৮] দ্রষ্টব্য, কঠোপনিষদ ১/২/১৮, ১/২/২২

[২৭৯] কঠোপনিষদ, ১/৩/১০-১১

[২৮০] ঐ, ২/১/১৩

এবং মুনেবিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।[২৮১]

অর্থাৎ- হে গৌতম, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল প্রক্ষিপ্ত হলে তা শুদ্ধ জলই থাকে। জ্ঞানবান মননশীল ব্যাক্তির আত্মাও ঐ প্রকার হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

এখানে বলা হয়েছে যে, "জ্ঞানবান মননশীল ব্যক্তির আত্মা ব্রহ্মের সাথে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হয়।" এখানে স্পষ্টতই ব্রহ্ম ও আত্মার ভেদ দেখানো হয়েছে, আত্মা ব্রহ্মের সাথে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাব লাভ করে, ব্রহ্ম হয়ে যায়না। আত্মা যতই উন্নতি লাভ করুক কখনও ব্রহ্ম হয়না, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় মাত্র।

শংকরের মতে, ব্রহ্ম ব্যতীত জীব এবং জগতের অপর কোন সত্ত্বা নাই (ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈর নাপরঃ)। শংকরের মতে জ্ঞান দ্বিবিধঃ পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক। পারমার্থিক জ্ঞানে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। জীব (ব্যাষ্টি আত্মা) এবং জগতের, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ এবং কর্মানুগ মূল্যমান অনুযায়ী ব্যবহারিক সত্যতা থাকতে পারে- পারমার্থিক সত্যতা নেই। জীব এবং জগত ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র এই অর্থে মিথ্যা। তাঁর মতে, অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের নাম জীব।[২৮২]

শংকর যে দৃষ্টি দিয়ে ব্রহ্ম ও জীবকে এক বলেছেন তা সাধারণ নয় কিন্তু ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্রহ্ম ও জীব ভিন্ন, কারণ এদের মাঝে অবিদ্যা আছে। আমরা মনে করি, ব্রহ্মের দিক থেকে "ব্রহ্ম জীব" একথা বলা গেলেও জীবের দিক থেকে 'জীব ব্রহ্ম' এ কথা বলা যায় না। যেমন, বৃক্ষ বলতে পারে যে, আমি ফুল, আমি পাতা, আমি ডাল ইত্যাদি। কিন্তু ফুল, পাতা, ডাল এরা কেউই 'আমি বৃক্ষ' একথা বলতে পারেনা। সর্বত্র এক চৈতন্য সত্ত্বা বিরাজমান। ঐ সত্ত্বা ভিন্ন আর কিছুই নাই- এ উন্নত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা সাধারণভাবে হবার নয়।

তবে ইসলাম ধর্মে আত্মাকে ঈশ্বরের সাথে সম্পূর্ণ এক বলা হয়নি। সেখানে আছে যে, "আল্লাহ্ মাটি ও পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করে নিজের তরফ থেকে রুহ্ ফুকিয়া দেন।[২৮৩] এখানে রুহকে সৃষ্টির অন্যান্য উপাদান থেকেও আলাদা করা হয়েছে- এটা আল্লাহ্র নিজের তরফ থেকে আসে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বর ও আত্মাকে এক বলা হয়েছে। বাইবেলে আছে ঈশ্বর আত্মা (God is spirit) এবং যারা তাঁর ভজনা করে তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করতে হবে।[২৮৪] অন্যত্র আছে- "ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেউ জানেনা কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানে।"[২৮৫] ঈশ্বরের আত্মা (God's spirit) তোমাদের অন্তরে বাস করে।[২৮৬] সুতরাং বাইবেলে ঈশ্বর আত্মা; আবার ঈশ্বরের আত্মা অর্থাৎ আত্মার আত্মা আছে।ফলে এই আত্মার আত্মা ঈশ্বর থেকেও বড় হয়ে পড়েন।

ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কিত বক্তব্যে এ ধরনের জটিলতা থাকার কারণে ধর্মে বিশ্বাস করেনা, এমন লোকের কাছে ঈশ্বরের কথা যুক্তিযুক্তভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয় না। মনে হয় এর ফলেই

---

[২৮১] ঐ, ২/১/১৫

[২৮২] দ্রষ্টব্য, রমেন্দ্র নাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, পৃ: ৪৬১

[২৮৩] কোরআন, ৩২/৭-৯

[২৮৪] বাইবেল, যোহন ৪:২৪

[২৮৫] ঐ, ১ করিন্থীয় ২:১১

[২৮৬] ঐ, ঐ, ৩:১৬

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ নাস্তিকতার আবির্ভাব ঘটেছে।[২৮৭] হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যে এ জাতীয় ঘটনা ঘটে নাই তা বোধ হয় নিশ্চিত করে বলা যায় না। হিন্দু ধর্মের সাথে অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলোর পার্থক্য এই যে, এটা যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিদের ধ্যানলব্ধ বা চিন্তালব্ধ জিনিষ। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের জ্ঞানের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন কথা থাকা স্বাভাবিক এবং সেগুলো পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণও হতে পারে। কিন্তু যে ধর্মগুলো প্রত্যাদিষ্ট অর্থাৎ প্রত্যাদেশ যার ভিত্তি, সেখানে প্রত্যাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিলে তা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। ঈশ্বরের বাণী বা দৈববাণীর মধ্যে কোন অসংগতি থাকা স্বাভাবিক নয়। পরিশেষে ঈশ্বর সম্বন্ধেই সন্দেহ এসে যায় যে, এরূপ ঈশ্বর থাকতে পারেন কি-না,[২৮৮] থাকলেও সে সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস, ভক্তি বা আগ্রহ থাকে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরের স্বরূপ যথার্থভাবে ব্যক্ত করতে না পারলে, শুধু ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাসের সাহায্যে মানুষকে ঈশ্বরের ধারণা দিতে গেলে তা মানুষ গ্রহণ করবেনা। যৌক্তিকভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন। জগতে ধর্মের কারণে মানুষের মধ্যে যে ভেদ দেখা যায় তা সম্ভবতঃ ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনার জন্যই। বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে এক ধর্মের লোকদের পক্ষে অন্য ধর্মের ঈশ্বরের ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা এবং এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের ঈশ্বরকে এক ভিন্ন ঈশ্বর বলে ভাবছে, নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবতে পারছেনা। কিন্তু ধর্মে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, ঈশ্বর যেমন ঈশ্বর ঠিক তেমন, ধর্ম শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বর রূপান্তরিত হবেননা। ঈশ্বর এক, তাঁর যথাযথ স্বরূপ ও এক; তা মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হলে ধর্মের সমস্ত গন্ডী ছিন্ন হবে বলে আমরা মনে করি এবং এক ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসাবে সমস্ত মানুষ পরস্পরের কাছে আসবার অনুপ্রেরণা পাবে। এখন যতই ধর্মকে সার্বজনীন বলা হোক বা ধর্মে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলা হোক, ঈশ্বরের স্বরূপ যথাযথ নির্দেশ না করতে পারলে অর্থাৎ সবাই গ্রহণ করতে পারে এমন ধারণা দিতে না পারলে, সার্বজনীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব এসব শব্দ কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে যাবে, এর প্রকৃতার্থ মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হবেনা।

ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশে অসুবিধা

John G. Saxe-এর একটি কবিতা “The blind men and the Elephant” এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, ছয়জন অন্ধ লোকের প্রত্যেকে হাতীর এক এক দিক দেখে হাতীকে তাদের নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাতী তাদের বর্ণনার কোনটির মত নয়। প্রথম ব্যক্তি হাতীর পাশের দিকটায় হাত দিয়ে দেখে হাতীকে একটি দেয়ালের মত বলল। দ্বিতীয়জন হাতীর

---

[২৮৭] ধর্মে অযৌক্তিক ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে Pandit Bhawani Shanker বলেছেন- Such erroneous belief in the past led to unfortunate strife between the followers of the two, which led many to lose faith in Good altogether.”(Pandit Bhawani Shanker, unity of Godhead, *Kalyan-kalpataru*,পৃ: ৭১)

[২৮৮] সম্ভবত: এসব কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদ ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক বা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। যেমন, মার্কস ঈশ্বরকে বলেছেন- “অতীত দুর্দশার ভূত ও বর্তমান দুর্দশার কারণ” (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এ্যাঙ্গেলস, ধর্ম-প্রসঙ্গে, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮১, পৃ: ৮)।

ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন- ধর্ম হল যে সব বহি: শক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রন করে, মানুষের মনে সেগুলোর উদ্ভট প্রতিচ্ছায়া যে প্রতিচ্ছায়ায় পার্থিব শক্তিগুলো ধারণ করে অতি-প্রাকৃতিক শক্তির রূপ (ঐ পৃ: ১৩৪) ধর্ম এবং ঈশ্বরের কথা বলে সাধারণ মানুষকে নিপীড়িত করা হত বলেই সম্ভবত তিনি এরকম মন্তব্য করেছিলেন। দোষ মানুষের, সেজন্য ধর্ম বা ঈশ্বরে দোষারোপ করা ঠিক না।

দাঁত স্পর্শ করে হাতীকে বল্লমের মত বলে বর্ণনা করল, তৃতীয়জন হাতীর শুড় ধরে একে সাপের মত মনে করল। চতুর্থজন হাতীর পায়ের দিকটায় হাত দিয়ে তাকে থামের মত ভাবল ইত্যাদি। কবিতার শেষে কবি মন্তব্য করেছেন-

And so these men of Hindustan,
Disputed loud and long
Each in his own opinion,
Was very stiff and strong
Though each was partly in the right
And all were in the wrongs.

এ লোকগুলি প্রত্যেকে তাদের মত সম্পর্কে নিশ্চিত থেকে পরস্পর বিতন্ডায় লিপ্ত হ'ল। কিন্তু হাতী যে কেমন তা তারা জানল না উপরন্তু তারা নিজমতকে অভ্রান্ত মনে ক'রে অন্যের সাথে বিবাদ শুরু করল। এরা সকলেই আংশিক সত্য জেনেছে, আংশিক সত্য কখনো সত্য নয়, তা মিথ্যা। ঈশ্বর সম্বন্ধেও আংশিক জ্ঞান সত্য নয়। যিনি পরিপূর্ণভাবে তাকে জেনেছেন তিনিই জানেন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ। বর্তমান প্রচলিত ধর্মসমূহে যে ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তাতে এই উদাহরণটি মনে এসে যায়। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ঈশ্বরকে তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যক্ত করেছেন। নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী তাঁরা ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী সময়ে তাদের অনুসারীগণ ঐ মতকেই যথার্থ ভেবে নিয়ে অন্যদের সাথে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়েছেন এবং নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি যোজনা করেছেন। যাঁরা ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করেছেন তাঁরাও ঈশ্বরের কোন বিশেষ গুণ ক্ষমতার প্রকাশ লক্ষ্য করে তাঁকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বিভিন্ন পার্থিব উপমার সাহায্যে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে, তাদের ঈশ্বরকে ঐ "কোন কিছুর মত করে" বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে ঈশ্বর কেমন অর্থাৎ তাঁর স্ব-স্বরূপ প্রকাশ পায়নি।

ঈশ্বর বা স্রষ্টা যিনি তিনি এক, তাঁর স্বরূপ যদি ধর্মশাস্ত্রে যথার্থভাবে নির্দিষ্ট হয় তবে তাও সব জায়গায় একরূপ হবে, কোন বিভিন্নতা থাকবেনা। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে তাঁর স্বরূপের বিভিন্নতা থেকে সন্দেহ জাগে যে, এর কোনটি তাঁর যথার্থ স্বরূপ কি-না। কোথাও ঈশ্বর সাকার কোথাও নিরাকার, কোথাও এক, কোথাও বহু, কোথাও তিনি ব্যক্তি, কোথাও নৈর্ব্যক্তিক ইত্যাদি। এ ধরণের ভিন্ন ভিন্ন মত তাঁর স্বরূপ বোঝার পক্ষে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না দিয়ে বরং জটিলতার সৃষ্টি করে।

আমরা ঐ প্রচেষ্টাগুলোকে অভিনন্দন জানাতে পারি বটে কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে এর কোন মতকেই যথার্থ জ্ঞানে গ্রহণ করতে পারিনা। বস্তুতঃ ঈশ্বর অনন্তশক্তিধর হলে তাঁকে যিনি যথার্থভাবে জানবেন তাঁকেও অনন্তপ্রায় গুণসম্পন্ন হতে হবে নতুবা তাঁকে জানতে পারবেন না। কেননা বাস্তবেই আমরা দেখি গুণী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ সম্যকভাবে গুণী ব্যক্তিকে জানতে বা বুঝতে পারেন না, বা তাঁর মর্যাদা দিতে পারেন না সুতরাং ঐরূপ শক্তি সম্পন্ন সাধকই ঈশ্বরকে জানতে পারেন। ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে অসংগতি থাকলে তা কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। ঈশ্বরের স্বরূপ অবশ্যই

যুক্তিসিদ্ধ ও সমস্ত বিদ্যার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। একথা শুধু ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কেই বলা যাবেনা বরং ধর্মের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বলা যাবে- সেগুলো অন্য কোন বিদ্যার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবেনা। যদি হয়, তাহলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা।

এ প্রসঙ্গে আমরা আচার্য গুরুনাথের মত দেখেছি। তার মতে, জগতে যা কিছু আছে সমস্তই গুণ ও গুণময়, গুণ ভিন্ন দ্রব্য নাই, গুণ-ব্যতীত ক্রিয়া হতে পারেনা।[২৮৯] ঈশ্বর অনন্ত-অনন্ত গুণময় এবং তাঁর সৃষ্টিও গুণময়ী।[২৯০] ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, ঈশ্বর অনন্ত, অনন্ত, অনন্ত গুণময়।[২৯১] গুণের সংখ্যার সীমা নাই উহা অনন্ত। পরব্রহ্ম অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ।[২৯২]আচার্য গুরুনাথ কখনও ঈশ্বরকে 'অনন্ত গুণময়' কখনও 'অনন্ত অনন্ত গুণময়' আবার কোথাও 'অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়' বলেছেন। সুতরাং গুণের এই অনন্তত্ব একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। গুণ অনন্ত, প্রতিটি গুণেরই শেষ সীমা, নিরতিশয়ত্ব, অনন্তত্ব বা একত্ব আছে। যেমন- মানুষের জ্ঞান আছে, জ্ঞানের তারতম্য আছে। মুর্খের চেয়ে পন্ডিতের জ্ঞান বেশী, পন্ডিতদের মধ্যে একের জ্ঞান অন্যের চেয়ে বশী। এভাবে ক্রমশঃ বেশী হ'তে হ'তে জ্ঞানের নিরতিশয়ত্ব বা শেষ সীমা স্বীকার করতে হয়- যেখানে অনন্ত জ্ঞান, তিনি অনন্ত জ্ঞান সম্পন্ন। এরূপে মহত্ব, দয়া, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি অনন্ত গুণের প্রতিটি গুণেরই নিরতিশয়ত্ব বা শেষ সীমা আছে- তিনি অনন্ত মহান, অনন্ত দয়াময়, অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত পবিত্র... ইত্যাদি। এভাবে যাঁতে সমস্ত গুণের (অনন্ত গুণের) অনন্তত্ব, নিরতিশয়ত্ব বা শেষসীমা- তিনি ঈশ্বর।

যোগীরা আপত্তি করেন যে, ক্রমশঃ অধিক হ'তে হ'তে সর্বাপেক্ষা মহৎ না হ'য়ে শূন্যওতো হ'তে পারে। এর উত্তরে সহজভাবে বলা যায় যে, যার প্রথম আছে তার শেষ আছে। কোন পদার্থ বর্ধিত হ'তে থাকলে তা কমেনা; সুতরাং মহত্বের ও সর্বজ্ঞত্ব বীজের নিরতিশয়ত্ব অবশ্যই আছে।

গণিত শাস্ত্র অনুসারে এ বিষয়টি সহজে প্রমাণ করা যায়। ধরা যাক্ 'ক' নামক কোন লোকের যে জ্ঞান আছে তা বেশী হোক বা কম হোক তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ঐ জ্ঞানকে 'অ' দিয়ে প্রতীগায়িত করা হ'ল। এখন 'খ' নামক অন্য একজন লোকের জ্ঞান 'ক' এর চেয়ে বেশী, তা 'অ×ই' এভাবে প্রতিগায়িত করা গেল। গুণানুসারে না ধরে যোগানুসারে ধরলেও একই রূপ হবে। একজাতীয় রাশিদ্বয়ের যোগফলও যা, প্রথম রাশি ও উক্ত রাশিদ্বয়ের সম্বন্ধ বাচক-এদুয়ের গুণফলও তাই। যেমন, ৫+১=৬ এবং ৫×(৬/৫)=৬। এ প্রণালী গণিত শাস্ত্রের শ্রেঢ়ী ব্যবহারের (Rules of Progression) অনুরূপ। এখন, জ্ঞান এভাবে অ×ই×উ×..... অনন্ত হ'ল। 'অ' 'ক' এর জ্ঞান স্বরূপ এবং 'ক' এর যে কিছু না কিছু জ্ঞান আছে তা আগেই জানা গেছে এবং ই, উ, অনন্ত; প্রভৃতি সকলই একাধিক ধনাত্মক ও সত্ত্বাত্মক রাশি। সুতরাং শেষ জ্ঞানস্থান অনন্ত জ্ঞানময়। যদি শেষস্থান শূন্য জ্ঞানময় হয়, (ই,উ, অনন্ত প্রভৃতি সত্ত্বাত্মক ও ধনাত্মক হ'য়েও যদি শেষ গুণফল শূন্য হয়) তাহ'লে প্রথমটিও শূন্য হ'তে হয়। কিন্তু তা যে নয় তা আগেই দেখা গেছে, সুতরাং শেষ জ্ঞানস্থান অনন্ত জ্ঞানময়।

---

[২৮৯] সত্যধর্ম, পৃ: ১৩৪, আরও দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১৫০-১৫৪।

[২৯০] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১৫০-১৫৪।

[২৯১] ঐ, পৃ: ১৫৭।

[২৯২] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান সাধনা, পৃ: ২০১।

এভাবে অনন্ত গুণের নিরতিশয়ত্ব বা অনন্তত্ব যিনি; তিনি ঈশ্বর। অনন্তগুণের নিরতিশয়ত্ব বা অনন্তত্বের একত্ব স্বরূপ হ'লেন ঈশ্বর। গুণগুলির প্রতিটি গুণের অনন্তভাব আছে। যেমন, প্রেম গুণের অনন্তভাব- মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে প্রেম (ভক্তি, স্নেহ), স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, বন্ধুদের পারস্পরিক প্রেম, প্রভু ভৃত্যের প্রেম, গৃহপালিত পশুর প্রতি প্রেম,... ইত্যাদি। এই প্রতিটিগুণের প্রতিটি ভাবের নিরতিশয়ত্ব বা অনন্তত্ব আছে; এর সমস্ত ভাবের নিরতিশয়ত্বের যে একত্ব তা একটি গুণের অনন্তত্ব বা নিরতিশয়ত্ব। এরূপ অনন্তগুণের অনন্তত্বের যে অনন্তভাবে মিশ্রণ বা একত্ব তা-ই ঈশ্বর। এজন্যই বলা হয় যে, ঈশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়। যখন অনন্ত গুণময় বা অনন্ত অনন্ত গুণময় বলা হয় তখন পর্যন্ত একটা সগুণ ভাব থাকে। কিন্তু অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময় বললে নির্গুণত্বের ভাব এসে যায়।

এর পরে গুরুনাথ পরমেশ্বর কিং স্বরূপ,[২৯৩] নিবন্ধে পরমেশ্বরের যে স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, সেখানে লক্ষ্যণীয় যে, ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনার পর, "পরমেশ্বর কিং স্বরূপ" এর বর্ণনা আছে। সুতরাং এখানে ঈশ্বর ও পরমেশ্বর এদুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এদুটো শব্দের একটি গুণময় অবস্থার অন্যটি নির্গুণ অবস্থার প্রতীক। 'পরমেশ্বরের স্বরূপ' অংশই নির্গুণ ভাবের বর্ণনা। এ বর্ণনা দেবার আগেই গুরুনাথ বলেছেন যে, তা সাধারণের পক্ষে অতি দুর্বোধ। আরও বলা হয়েছে যে, ভাষার এরূপ শক্তি নাই ও আমাদের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, আমরা অপূর্ণ হয়ে ও অপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে সেই পূর্ণ স্বরূপের বর্ণনা করতে পারি। পরমাত্মার গুণ অনন্ত, সুতরাং তাঁর অ-রূপ রূপ ও অনন্ত। সেজন্য পরমাত্মা পরমেশ্বর অব্যক্ত। ভাষার এমন শক্তি নাই যে অপূর্ণ ভাষা দ্বারা সেই পূর্ণস্বরূপের বর্ণনা দেয়া যায়। তবুও পরমাত্মা কিরূপ তার কিঞ্চিৎ আভাস সেখানে দেয়া হয়েছে।

দৃশ্যমান জগতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মী দুইরকম সত্ত্বা-সম্পন্ন পদার্থ দেখা যায়। এখন, পরমাত্মা তাদের মধ্যে কোনটির স্বরূপ অর্থাৎ তিনি সুখ স্বরূপ না দুঃখ স্বরূপ? ধর্মস্বরূপ না অধর্ম স্বরূপ? চৈতন্যস্বরূপ না অচেতনস্বরূপ? তিনি পুরুষস্বরূপ কি রমনী স্বরূপ?

মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে অনন্তকাল (অর্থাৎ সাধারণভাবে যার অন্ত পাওয়া যায়না) থাকতে পারে। কেননা দুঃখের অভাব হ'লে তখনও দুঃখের অভাবের জন্য দুঃখ হয়। এই অসীম অনন্তভাবে পর্য্যায়ক্রমে দুঃখ ও সুখের গতি চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, তারা সরলরেখা- ক্রমে অনন্তাভিমুখে গতিশীল হয়ে কেন্দ্রাকর্ষিণী শক্তির বা পরমাত্মার আশ্রয় প্রভাবে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করবে। ঐ সুখ ও দুঃখ অসীমভাবে মানুষের ভোগ্য হলেও কখনও এক সঙ্গে ভোগ্য হবেনা, কারণ সুখ ও দুঃখ উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ভাব পদার্থ; একটি অন্যটির অভাব পদার্থ নয়। উভয়েরই আধার এক, এজন্য স্থান অবরোধ করার বিষয়ে (ভাবলে দেখা যায়), উভয়ে এক আধারে থাকতে পারেনা। এজন্য এরা পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আসে, কখনও একসাথে উপস্থিত বা অনুভূত হতে পারে না, পর্যায় ক্রমে আসাই এদের স্বাভাবিক ধর্ম।

কিন্তু যদি অনন্ত পরিভ্রমণে কদাচিৎ সুখ ও দুঃখের সংঘাত হয় তবে ঐ সংঘাত- বলোৎপন্ন অবস্থায় অবস্থিত মিশ্রপদার্থ কেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হবে। উহা পরমাত্মার অনন্তস্বরূপের একতম স্বরূপ। অর্থাৎ সুখ-দুঃখের একত্বই ঈশ্বরের একতম স্বরূপ (পূর্ণ স্বরূপ নয়)। সে স্বরূপ যে কেমন তা প্রকাশ করা

[২৯৩] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১৫৭।

দূরে থাকুক সাধারণত কেউ অনুভবও করতে পারে না। উহা না সুখ, না দুঃখ বা সুখ দুঃখের অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্তভাবে একত্ব।

এরূপ প্রণালী অনুসারে, লোকে যাকে ধর্মস্বরূপ বা অধর্মস্বরূপ বলে পরমাত্মা তার কোনটি নন । তিনি ঐ উভয়ের অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্ত একত্ব। তিনি চৈতন্য ও অচৈতন্য- এ উভয়ের অনন্ত একত্ব, তিনি রমণী ও পুরুষ এ উভয়ের অনন্ত একত্ব। এরূপে, অনন্তভাবে সুখ-দুঃখের একত্ব, ধর্ম-অধর্মের একত্ব, চেতন অচেতনের একত্ব, দয়া ও ন্যায়পরতার একত্ব, জ্ঞান ও প্রেমের একত্ব প্রভৃতি অনন্ত একত্বের একত্বই ঈশ্বরের স্বরূপ।

সীমাবদ্ধ বা অন্তবিশিষ্ট জীব সুখ ও দুঃখ, ধর্ম ও অধর্ম , চেতন ও অচেতন, পুরুষ ও রমণী অথবা প্রকৃতি ও পুরুষ ,ইহাদের এক একটির বিষয়ে, অভিনিবেশ-পূর্বক নানা প্রকার চিন্তা ও চর্চা করে জ্ঞান সম্পন্ন হতে পারে কিন্তু উল্লিখিত যুগ্মের একতর না হইয়া যে কিরূপ হইতে পারে,তা বুঝতে পারেনা এবং উক্ত যুগ্মসমূহের কোনটার মিশ্রণে বা একত্বে যে কি হয় তাও ধারণা করতে পারেনা, তখন অনন্ত মিশ্রন এবং অনন্ত একত্বের একত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আর সে জন্য অনন্ত মিশ্রণ বা অনন্ত একত্বের একত্ব সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা চলেনা। এজন্যই সাধারণভাবে বলা হয় যে, ঈশ্বর অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়।

(৫)

ঈশ্বরতত্ত্ব : ঈশ্বর সগুণ না নির্গুণ

ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে কোথাও সগুণ কোথাও নির্গুণ বলে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে দয়াময়, করুণাময়, প্রেমময় প্রভৃতি রূপে প্রকাশ করা হয়েছে আবার কোথাও তাঁকে নির্গুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে নির্গুণ বলতে গুণহীন বোঝায়। গুণযুক্ত বলার পরে আবার নির্গুণ বলার তাৎপর্য কি? এ প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ বলেন যে, নির্গুণ অর্থ গুণহীন নয় বরং অনবধারিত গুণরাশিসম্পন্ন অর্থাৎ অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণবিশিষ্ট বুঝায়। সুতরাং ঈশ্বরকে সগুণ ও নির্গুণ বলায় কোন স্ববিরোধিতা ঘটেনা বরং একই ভাবের যথাক্রমে ধারণীয় অনন্ত ভাব ও অধারণীয় অনন্তত্ব প্রকাশ পায়।[২৯৪] তিনি এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপভাবে দিয়েছেন :

এ জগতে বস্তুমাত্রেরই দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ আছে। কোন দ্রব্যই কেবল দৈর্ঘ্য বা বিস্তার বা বেধসম্পন্ন নয়। অথবা কেবল দৈর্ঘ্য-বিস্তার বিশিষ্ট বা বিস্তার-বেধ বিশিষ্ট নয়। কিন্তু জ্যামিতি শাস্ত্রে বুঝাবার জন্য কেবল দৈর্ঘ্য-বিস্তার বিশিষ্ট তল ক্ষেত্র অথবা কেবল দৈর্ঘ বিশিষ্ট রেখা স্বীকার করা হয়।

---

[২৯৪] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, *তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা,* পৃ: ১৬৩-১৬৮

এতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনায়াসে বুঝতে ও বুঝাতে পারা যায়। এজন্য ইউক্লিড ও অন্যান্য জ্যামিতি শাস্ত্রকারগণ এ উপায় অবলম্বন করেছেন। এতে কাজে তাদের কোন ভুল হয় নাই। সেরকম নির্গুণ জ্ঞান প্রথমে ধারণা করা যায় না বলে প্রথমে সগুণভাব অবলম্বন করলে কোন প্রকার ভুল হয় বলেও মনে করা যায়না। বহু গুণসম্পন্ন কোন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণ অবলম্বন করে কাজ করা মানুষের স্বভাব – এতে কোন দোষ দেখা যায়না।

এ প্রসঙ্গে গুরুনাথ প্রাচ্যবিদ গোল্ডষ্টুকারের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, পুস্প মাত্রেরই দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, রূপ ও গন্ধ প্রভৃতি গুণ আছে। কিন্তু আমরা যখন দুটি ফুলের সুগন্ধের তুলনা করি তখন অন্য গুণগুলির উল্লেখ করিনা, এতে অন্য গুণগুলিকে অস্বীকারও করা হয়না[২৯৫]। এতে গন্ধগুণের বিচার বিষয়ে কোন ত্রুটিও হয়না। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গুরুনাথ মনে করেন যে, অনন্ত গুণ বিশিষ্ট ব্রহ্মের অধার্য্য গুণ চিন্তা করতে না গিয়ে ধারণীয় গুণ সম্বন্ধে চিন্তা করলে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ভুল হতে পারেনা। এক্ষেত্রে গুরুনাথ পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যের উল্লেখ করেন। সেখানে আছে-

"নির্গুণে প্রথমং চিত্তপ্রবেশাসম্ভবেন

সগুণে এব মনোঽভিনিবেশ্যম।

ততো নিবিষ্ট-মনসঃ চিত্তৈকাগ্র্যম্

তত উপাসিতেশ্বরানুগ্রহাদেব সমাধিযোগসিদ্ধিঃ।"

অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে প্রথমে চিত্ত প্রবেশের অসম্ভাবনাহেতু প্রথমে সগুণেই মনোনিবেশ করবে। অনন্তর, নিবিষ্টমনার চিত্তের একাগ্রতা হবে। এরপরে উপাসিত ঈশ্বরের অনুগ্রহ হেতুই সমাধিযোগসিদ্ধি হবে।[২]

সুতরাং পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার অস্থির চিত্ত মানুষের জন্য সগুণ ঈশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম শিক্ষার্থী সগুণভাব ছাড়া নির্গুণ ভাব বুঝতে পারেনা। অতএব সগুণ ও নির্গুণ বলে দুই ব্রহ্ম নাই বটে কিন্তু উপাসকের ধারণা অনুযায়ী একই ব্রহ্মের দু'রকম ভাব নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

ভারতবাসী কালীদাস লিখেছেন-

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

হিমালয় নাম নগাধিরাজঃ।

অর্থাৎ উত্তর দিকে হিমালয় নামে নগাধিরাজ আছেন। কিন্তু তিব্বতবাসী কোন কবি যদি লিখতেন, তাহলে এরূপ হত-

হিমালয়াখ্যো মহতো মহীয়ান

স্থিতো নগেন্দ্র দিশি দক্ষিণস্যাম্।

---

[২৯৫] দ্রষ্টব্য, D.M. Dutta, S.C. Chatterjee, *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta, 1960. P.305

অর্থাৎ মহৎ থেকে মহীয়ান হিমালয় নামক নগরাজ দক্ষিণদিকে আছেন।

উভয় কবি যা লিখেছেন তা তাঁর দিক থেকে সত্য। কিন্তু ভূগোল জ্ঞানশূন্য পাঠক লেখা দুটিকে পরস্পর বিরোধী ভাবতে পারেন। কিন্তু পর্যালোচনা করলে বিরোধ দূর হবে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও যিনি নির্গুণ (নিরবধারিত গুণবিশিষ্ট) বলেছেন এবং যিনি সগুণ (অনন্ত গুণবিশিষ্ট) বলেছেন তাঁরা উভয়েই যথার্থ নির্দেশ করেছেন। তবে যে পর্যন্ত নির্গুণ জ্ঞান না হয় সে পর্যন্ত এ দুই নির্দেশকে পূর্বোক্ত ভূগোল জ্ঞান বিহীনের মত কেউ পরস্পর বিরোধী মনে করতে পারেন। কিন্তু পরিশেষে যখন বিরোধ দূর হয়, তখন নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই যে একরকম ভাব প্রকাশ করে, তিনি তা বুঝতে সমর্থ হন।

এ ক্ষেত্রে গুরুনাথ মহামতি শংকরাচার্য শারীরভাষ্যে যা লিখেছেন তার উল্লেখ করেছেন-

"তত্রাবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্বো ব্যবহারঃ।

তত্র কানিচিৎ ব্রহ্মণ উপাসনান্যভ্যুদয়ার্থানি,

কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎ কর্মসমৃদ্ধার্থানি।

তেষাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন ভেদঃ।

এক এব তু পরমাত্মেশ্বর

স্তৈ স্তৈ র্গুণবিশেষৈর্বিশিষ্ট উপাস্যো যদ্যপি ভবতি

তথাপি গুণোপাসনমেব ফলানি ভিদ্যন্তে।"

অর্থাৎ অবিদ্যা অবস্থায় ব্রহ্মের উপাস্য-উপাসকাদি-লক্ষণ সমুদয় ব্যবহার।[২৯৬] তার মধ্যে ব্রহ্মের কয়েক প্রকার উপাসনা অভ্যুদয়ার্থক, কতিপয় ক্রমমুক্ত্যর্থক এবং কতগুলি কর্মসমৃদ্ধ্যর্থক। তাদের ভেদ কেবল গুণ বিশেষ ও উপাধিভেদেই হয়। কিন্তু একই পরমাত্মা ঈশ্বর সেই সেই গুণবিশেষে বিশিষ্ট হয়ে যদিও উপাস্য হন। তথাপি গুণোপাসনা অনুসারেই ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়। অর্থাৎ যে যেমন গুণের উপাসনা করে সে তেমন ফল পায়। শ্রুতিতে আছে-

"তং যথা যথোপাসতে, তদেব ভবতি।"

অর্থাৎ পরমাত্মাকে যে যেমনভাবে উপাসনা করে সেরকমই হয়। এ আলোচনার শেষে গুরুনাথ বলছেন, গুণোপাসনা অনুসারেই যখন ফল হয় এবং যথা ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশের পূর্বে সগুণ উপাসনাই কর্তব্য, তখন ধর্মরাজ্যে প্রবেশার্থী মাত্রেরই সগুণ উপাসনা করা বিধেয়। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের নানাবিধ গুণের উল্লেখ দেখা যায়। গুণ কি, ঈশ্বরের গুণগুলি কিভাবে আছে, গুণগুলি কি বিশেষ্য না বিশেষণ, ঈশ্বর গুণের আধার কি-না, গুণগুলি ঈশ্বরের বিশেষণ হলে ঈশ্বর কেমন এসব বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা ছাড়া ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝা যায় না। আবার দেখা যায়,ঈশ্বরের সগুণত্ব, নির্গুণত্ব থেকে অনেকে ঈশ্বরের সাকারত্ব নিরাকারত্বের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন।[২৯৭]

---

[২৯৬] দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ. ৩৯০-৩৯১

[২৯৭] দ্রষ্টব্য, যতীন্দ্র মোহন সিংহ, *সাকার নিরাকার তত্ত্ব বিচার,* ভট্টাচার্য্য এন্ড সন, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৩০ বাং, পৃ. ২৫; আরও দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ১২৫-১২৬

তবে আচার্য গুরুনাথের মতে ঈশ্বর সগুণ হ'লেই যে কেবল সাকার হবেন, এরূপ বোধ হয় বলা যায়না।সগুণ হ'লে সাকারও হ'তে পারেন, নিরাকারও হ'তে পারেন কেননা সাকারত্ব একটি গুণ, নিরাকারত্বও একটি গুণ এবং অনন্ত সাকারত্ব ও অনন্ত নিরাকারত্ব এ দু'য়ের একত্ব (চরম মিলিত অবস্থা) ঈশ্বরের পর্ণ স্বরূপের একটা দিক, তাঁর অনন্ত গুণের একটি গুণ; এগুণের নাম অব্যক্ত।[২৯৮] 'সগুণ' শব্দে গুণযুক্ত বুঝায় অর্থাৎ যার গুণ আছে। ঈশ্বরকে এই অর্থে সগুণ ভাবলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, যাঁর এতগুণ আছে, তিনি কেমন। এতে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের গুণ দুটি আলাদা সত্তা হ'য়ে যায়।

'নির্গুণ' শব্দের সাধারণ অর্থ গুণ নাই যার। এ অর্থে ঈশ্বর নির্গুণ হ'লে তাঁর কোন গুণ নাই। সৃষ্টিতে আমরা দেখি কেবল গুণেরই শক্তি আছে, গুণ না থাকলে সেখানে কোন শক্তি নাই, গুণ না থাকলে তা কিছুই না। নির্গুণ-এর এই অর্থে নির্গুণ ঈশ্বর শক্তিহীন হ'য়ে পড়েন এবং তাঁর অস্তিত্বই থাকেনা। কোন গুণ নাই যার, আর কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এর কোনটি দ্বারা নির্গুণত্ব বোঝানো যায় না। আমরা সাকার-নিরাকার অধ্যায়ে দেখেছি যে, নিরাকার বললে সাকার তার অন্তর্গত হয়; এ দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই একই নিয়মে নির্গুণ বললে সগুন তার অন্তর্গত হয়। মূলতঃ এ দু'টি এক ঈশ্বরের ধারণীয় ও অধার্য্য ভাব।

দ্রব্য ও গুণ

দর্শনশাস্ত্র মতে, যে সব বস্তু জ্ঞানের বিষয় ব'লে জানা যায়, সেগুলো দ্রব্য নামে পরিচিত। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা মনে করেন যে, বস্তুর জ্ঞান হ'তে হ'লে দ্রব্যত্বকে তার একটি পূর্বতঃ সিদ্ধ আকার হিসাবে ধরে নিতে হয়। যে সব বস্তু জ্ঞানের বিষয় তাদেরকে অবশ্যই গুণ সম্পন্ন বস্তু হ'তে হবে। যে দ্রব্যগুলি দিয়ে জগৎ গঠিত সাধারণ মানুষ সেগুলোকে নানা প্রকার গুণের ও ক্রিয়ার আশ্রয় ব'লে মনে করে। বস্তুবাদী ন্যায় দর্শন এমত অনুসরণ করে দ্রব্যকে গুণাশ্রয় ও কর্মাশ্রয় ব'লে মনে করে।[২৯৯] বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা দ্রব্য ও দ্রব্যাশ্রিত গুণকে ভিন্ন মনে করেন। যেমন, চিনি দ্রব্য, মিষ্টতা তার গুণ। চিনি ও মিষ্টতা এক নয়। কিন্তু এখানে সমস্যা হ'ল দ্রব্য নানা গুণের অধিষ্ঠান আর গুণ দ্রব্য থেকে ভিন্ন হ'লে এদের মধ্যে সম্বন্ধ কি করে হয়। অথচ গুণহীন দ্রব্য ব'লে কিছু নাই। গুণের আশ্রয় যদি গুণ ছাড়া অন্য কিছু হয় তবে তা গুণহীন হবে। আর গুণহীন কোন কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব।

বিশপ বার্কলে, ডেভিড হিউম, এ.জে. এয়ার প্রমুখ আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকবৃন্দ দ্রব্য বলতে কেবল গুণসমষ্টিকে বুঝিয়েছেন; গুণের আশ্রয়রূপে কোন দ্রব্য তাঁরা স্বীকার করেন নাই। অবশ্য অভিজ্ঞতাবাদী লক গুণের আশ্রয়রূপে দ্রব্যকে স্বীকার করেন। তিনি মনে করেন, কেবল গুণ দিয়ে বস্তু জগতের ব্যাখ্যা হয় না। বিশপ বার্কলে গুণের আশ্রয়কে অস্বীকার করেন এবং দ্রব্যকে গুণসমষ্টি ভিন্ন আর কিছু বলতে স্বীকৃত হননি। তাঁর মতে কোন এক সমাবেশের মধ্যে বিভিন্ন গুণ পরস্পর সংবদ্ধ হ'য়ে এক সমষ্টি তৈরী করতে পারে, কোন আশ্রয় বা অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। ডেভিড হিউমও দ্রব্য সম্পর্কে এই মত পোষণ করেন। এদের এ মতের একটি অসুবিধা হ'ল যে বিভিন্ন গুণ এক সমাবেশে কিভাবে

---

[২৯৮] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, *তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা,* পৃ. ৪৩, ১৮৮

[২৯৯] দ্রষ্টব্য, রমাপ্রসাদ দাস ও শিব প্রসাদ চক্রবর্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ২৫৯

সংবদ্ধ হয়; কে সংবদ্ধ করে? এর কোন ভাল ব্যাখ্যা তারা দিতে পারছেন ব'লে মনে হয় না। এ.জে. এয়ারের মতে বাস্তব জগতের গুণ দ্রব্যকে নির্দেশ করেনা। কেবল গুণের নাম সাধারণ ভাষায় দ্রব্যের নামকে নির্দেশ করে। এ ক্ষেত্রে দ্রব্যের নাম হ'ল বিশেষ্য আর গুণের নাম হ'ল বিশেষণ। যেমন, 'চিনি মিষ্টি' এখানে প্রত্যক্ষ মিষ্টতাকে ভাষায় বলতে গিয়ে কোন দ্রব্যের নাম বলতেই হয় (চিনি)। কিন্তু ভাষায় গুণ ভিন্ন দ্রব্য থাকলেও ঐ দ্রব্য- নামের অনুরূপ কিছু জগতে নাই, কেবল গুণ সমষ্টিই আছে। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ হ'ল এক সমাবেশে উপস্থিত বিভিন্ন গুণের মধ্যেকার সম্বন্ধ।[৩০০]

এয়ারের এমতের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে যে, দ্রব্য নামে জগতে যদি কিছু না থাকে তাহলে গুণসমষ্টি মিলে যা হয়, তা কি এবং এগুণ সমাবেশ সৃষ্টি হয় কিভাবে? কে এই সমাবেশ তৈরি করে? এসব প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা মনে করেন, গুণ কখনো দ্রব্যকে আশ্রয় না ক'রে দাড়াতে পারেনা। দ্রব্যকে প্রত্যক্ষে না পাওয়া গেলেও তাকে পূর্বতঃ সিদ্ধ ধারণারূপে বুদ্ধিগ্রাহ্য হ'তে হবে। বুদ্ধিবাদীরা দ্রব্য ও গুণের পার্থক্য করেছেন। তাঁদের মতে দ্রব্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র আর গুণ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধিবাদীদের এমতে দ্রব্য ও গুণ এক নয়। কিন্তু গুণীবস্তু ছাড়া জগতে কিছু জানা যায়না। দ্রব্য যদি গুণ ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে তাকে জানা যাবেনা বা তা কিছুই না। গুণ ছাড়া বস্তুকে জানা যায়না বা গুণ না থাকলে তা কিছুই না। দ্রব্য গুণ ছাড়া অন্য কিছু হ'লে তা জ্ঞানের বিষয় নয়; তা হ'লে এদের মধ্যে সম্বন্ধ কিভাবে নির্ণীত হয়?

কান্টের মতে, বস্তুর গুণাবলীরই কেবল প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু কোন কিছু বর্ণনার সময় দ্রব্য ও গুণ উভয়েরই নির্দেশ থাকে। বাক্যের উদ্দেশ্য দ্রব্যকে ও বিধেয় গুণকে নির্দেশ করে। এই দ্রব্য গুণ ধারণা ও তাদের সম্বন্ধ অবশ্যই পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা কেননা দ্রব্য প্রত্যক্ষে পাওয়া যায়না।[৩০১] কিন্তু কান্টের এমত সর্বাংশে আমাদের মনঃপুত নয়। দ্রব্য- গুণ ধারণা ও তাদের সম্বন্ধ পূর্বতঃসিদ্ধ না হ'য়ে বস্তুনিষ্ঠ (বিষয়-নিষ্ঠ) হ'তে দোষ কি।

গুণহীন কোন দ্রব্যের কথা যখন জানা যায়না তখন তাকে বুদ্ধির পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা রূপে গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতা আছে ব'লে মনে হয়না। গুণহীন দ্রব্য আর দ্রব্যহীন গুণ উভয়ই অসম্ভব। এক বা একাধিক গুণ দ্রব্যকেই আশ্রয় করে, এর অর্থ এই নয় যে, গুণ কোন গুণহীন অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করে; এর অর্থ হ'ল গুণ কোন গুণবান মূর্ত দ্রব্যকে আশ্রয় করে। দ্রব্য সর্বদাই গুণ-সমন্বিত। আর কোন এক গুণ অন্য গুণ-সমাবেশে দ্রব্যাশ্রিত ব'লে বুঝতে হবে। এমতকে মূর্ত দ্রব্যবাদ বলে। এমতে গুণ ছাড়া দ্রব্য নাই, দ্রব্য ছাড়া গুণ নাই। এমত বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় সাধন করেছে। কিন্তু দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সম্বন্ধ কি, কিভাবে বিভিন্ন গুণ সমাবেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য হয়, এই সমাবেশ কে ঘটায় এসব প্রশ্ন রয়েই যায়। এর মীমাংসা এ মতেও পাওয়া যায়না।

দ্রব্য ও গুণ সম্বন্ধে এসব সমস্যার মূলে যে সব বিষয় রয়েছে তা হ'ল, দ্রব্য ও গুণ সম্পর্কে এ যাবৎ যে সব দার্শনিক আলোচনা করেছেন, তাঁরা গুণকে কেবল বিশেষণ রূপে ভেবেছেন, গুণকে বিশেষ্য হিসাবে

---

[৩০০] দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ২৬১

[৩০১] দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ২৬১

ভাবেননি, এছাড়া গুণের যে শক্তিআছে একথাও তারা চিন্তা করেননি। গুণের দ্বারা জগতে সব কিছু হয়, গুণ ছাড়া কাজ হ'তে পারেনা-এসব দিকে তারা আলোচনা করেননি।

দ্রব্য- গুণ সম্পর্কিত বিষয়ে আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত বলেন, দ্রব্য ও গুণ বাস্তবিক একই পদার্থ, গুণ ব্যাষ্টি ভাব জ্ঞাপক আর দ্রব্য গুণের সমষ্টি প্রকাশক। তাঁর মতে গুণের শক্তি আছে, গুণের শক্তিতেই গুণসমূহ পরস্পর সংবদ্ধ হয়; গুণের দ্বারা জগতে সব কিছু হয়, গুণ ছাড়া কোন কাজ হয়না। গুণেরও শক্তিআছে, গুণসমষ্টিরও শক্তি আছে, এজন্য শক্তি দ্রব্যনিষ্ট ও গুণ-নিষ্ঠ। গুণ বিশেষ্য-বিশেষণ দু'রকমই আছে।[৩০২] তাঁর মতে, দ্রব্য বলতে কতগুলি গুণের সমষ্টি বোঝায় আর ঐ গুণ সমষ্টিই গুণেরআধার। গুণের অতিরিক্ত দ্রব্য সত্ত্বা নাই। যেমন ইটের স্তুপ বলতে কতগুলি ইটের সমষ্টি বোঝায়, স্তুপ নামে আলাদা কিছু নাই। কতগুলি ইট একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়ে ইটের স্তুপ হয় আর এই ইটের স্তুপই প্রতিটি ইটের আধার। বিভিন্ন গুণের সমাবেশ কিভাবে ঘটে বা কে ঘটায়- এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হ'ল গুণেরই এই শক্তি আছে।[৩০৩] গুণ ব্যতীত ক্রিয়া হ'তে পারেনা। তাঁর মতে জগতের সব কিছুই গুণ ও গুণসমষ্টি। গুণের আধার থাকা দরকার, আধার ছাড়া গুণ কিভাবে থাকবে। কিন্তু আধার বলতে যা বোঝায় তাও গুণ ব্যতীত আর কিছু না; অন্ততঃ আধারত্ব নামক গুণটি ছাড়া আধার হ'তে পারেনা। সুতরাং এ জগতে যত কিছু আছে সবই গুণ ও গুণময়। গুণ ভিন্ন দ্রব্য নাই, সব কিছুই গুণ সমষ্টি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জগতে জীব বা জড় বলতে যা কিছু, সকলই কেবল কতগুলি গুণসমষ্টিমাত্র। যা ধারণা করা যায় বা যা জ্ঞানের বিষয় সবই গুণসমষ্টি মাত্র। অতএব দেখা যাছে, গুণ বাদ দিয়ে কোন কিছু বোঝা যায়না। গুণ না থাকলে তা কিছুই না। সুতরাং ঈশ্বরও গুণহীন নন। নির্গুণ শব্দে যদি গুণহীন বা গুণ নাই যার বোঝায় তবে ঈশ্বর তা হ'তে পারেন না।

গুণের জন্যই জগতে ভাল মন্দের বিচার হয়। কেউ ভাল বা কেউ মন্দ, এ পার্থক্য কেবল গুণের পার্থক্যের জন্যই হয়। গুণের জন্যই মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ। গুণ বাদ দিয়ে বিচার করলে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকেনা। মানুষ যে বিমল কাব্যরসে সুখলাভ করে, সুমধুর সংগীত রসে শোক দুঃখ নিবারণ করে, চারু-কারু কলার সৌন্দর্যে আনন্দ লাভ করে, গুণবানকে আদর ও গুণহীনকে তাচ্ছিল্য করে, গুণহীনের বিষয় বৈভব ত্যাগ করে গুণীর পর্ণ কুটিরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে- এ সবকিছু গুণের গৌরব প্রকাশ করে।[৩০৪]

গুণের সংজ্ঞায় গুরুনাথ বলেছেন, যা দ্রব্যে অবস্থিত থেকে দ্রব্যের পরিচয় দেয় কিন্তু নিজে দ্রব্য বা ক্রিয়া নয় এবং যার হ্রাস বৃদ্ধি আছে (অপূর্ণে ও অপূর্ণাবস্থায়) তাকে গুণ বলে। গুণের মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও অনন্তকাল স্থায়ী, কিন্তু সকল গুণেরই হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।[৩০৫] জগতে যে কত গুণ আছে তা নির্ণয় করা মানুষের শক্তির বাইরে অর্থাৎ গুণ অনন্ত। ভৌতিক পদার্থ-নিষ্ঠ গুণগুলিকে ভৌতিক গুণ বলে। যথাঃ কৃষ্ণত্ব, শুভ্রত্ব, সুস্বাদ, বিস্বাদ, ত্রিকোণত্ব ইত্যাদি। এ গুণগুলি বাদ দিয়ে পদার্থকে জানা যায়না আবার পদার্থকে বাদ দিয়েও এ গুণগুলি জানা যায় না; এ জন্য এদের বিশেষণ গুণ বলে। আত্মার গুণকে

---

[৩০২] দ্রষ্টব্য, *সত্যধর্ম,* পৃ. ১৩২

[৩০৩] দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ. ১৩৪ (১৩১-১৩৪)

[৩০৪] ঐ, ঐ, পৃ. ২৯

[৩০৫] ঐ, ঐ, পৃ. ৩৩

আধ্যাত্মিক গুণ বলে। এদের পরিচয়ের জন্য আধারের অপেক্ষা করেনা, এজন্য এগুণগুলিকে বিশেষ্য গুণ বলে।[৩০৬]

পূর্ববর্তী দার্শনিকরা গুণকে কেবলমাত্র বিশেষণ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু গুরুনাথ গুণকে বিশেষ্য ও বিশেষণ এ উভয় প্রকার বলেছেন। তাঁর এ মতে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। দ্রব্য ও গুণ একই, শুধু পার্থক্য হ'ল যে, এদের একটি সমষ্টিভাব অন্যটি ব্যষ্টিভাব। এরূপ বিভিন্ন গুণসমষ্টি দ্বারাই জগতের সবকিছু (জড় ও আধ্যাত্মিক) সৃষ্টি হয়েছে। গুণসমূহ নিজেদের শক্তি বলেই এই সমষ্টি সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন সমাবেশে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করে। গুণেরই শক্তি আছে, গুণের শক্তিতেই জগতের সকল কাজ হয়।

গুণ সমাবেশ কে ঘটায় বা কিভাবে ঘটে এর উত্তরও এখানে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং এমত অনুসরণ করে বলা যায়, গুণই জগতের একমাত্র সত্ত্বা। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ জগতে যত কিছু আছে সবই গুণ ও গুণময়। গুণ ভিন্ন দ্রব্য নাই, সব কিছুই গুণসমষ্টি সুতরাং ঈশ্বরও গুণময়।[৩০৭]

সগুণ ঈশ্বর

ঈশ্বরের এই সগুণ বা গুণময় অবস্থায় বর্ণনা নানা ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ের লোকেরা উপাস্যের গুণকীর্তন করে আসছে। আর এজন্যই বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের সগুণ অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব বর্ণনায় গুণগুলি আধ্যাত্মিক ও জড়ীয়- এ উভয় প্রকারই দেখা যায়। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষ।[৩০৮] আদিত্যবর্ণ বললে জড়ের সাথে তুলনীয় বুঝায় এবং কম বেশী জড়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হ'য়ে পড়ে। রূপকার্থে জ্যোতির্ময় বা তেজোময় বুঝাতে এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'মহান' গুণ আধ্যাত্মিক ভাবের পরিচায়ক। আর পুরুষ শব্দ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে।ঈশ্বর পুরুষ কি অ-পুরুষ এ নিয়ে ধর্ম ও দর্শনে অনেক পরস্পর বিরোধী মত পাওয়া যায়। তবে আমরা মনে করি ঈশ্বর পুরুষ বা অ-পুরুষ যা-ই হোন না কেন, সে বর্ণনা পার্থিব পুরুষের ধারণা অনুযায়ী হওয়া উচিত নয়। বেদে পুরুষ অর্থ সমস্ত সদগুণের ও বলবীর্যের প্রতীক।[৩০৯] ঈশ্বর পরম পুরুষ সুতরাং তাতে সমস্ত গুণের উৎকর্ষ বিদ্যমান। সগুণ ঈশ্বরের এসব গুণ ছাড়া আরও অনেক গুণের কথা শাস্ত্রে আছে। যেমন, তিনি সমুদয় ভূতের অধিপতি, অণু অপেক্ষাও অণু, জ্যোতিঃ স্বরূপ, ইন্দ্রিয়াতীত, শ্রেষ্ঠ পুরুষ।[৩১০]

সগুণ ঈশ্বরে পুরুষত্ব আরোপ

সগুণ ঈশ্বরে বিভিন্ন গুণের চিন্তা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মে ও দার্শনিক ধারণায় ঈশ্বরকে পুরুষ

---

[৩০৬] ঐ, ঐ, পৃ. ৩৫

[৩০৭] অনেকে ঈশ্বরকে কেবলমাত্র গুণসমষ্টি বলে স্বীকার করেননা। যেমন- ড. মতীন উল্লেখ করেছেন- "God is a substance, not a mere cluster of qualities, Abdul Matin, *An outline of philosophy*, Dhaka 1968, p.31

[৩০৮] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৩/৮ (আদিত্য বর্ণং পুরুষ মহান্তম)।

[৩০৯] দ্রষ্টব্য, যজ্ঞেশ্বর মিত্র, *স্বর্গলোক ও দেব সভ্যতা,* কলিকাতা ১৯৭৭, পৃ. ৩০।

[৩১০] মনুস্মৃতি ১২/১২২, উদ্ধৃতি ও অনুবাদ, হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

বলা হয়েছে এবং এ পুরুষ মানবীয় গুণের এক উন্নত রূপ। আবার, কোথাও কোথাও এ পুরুষের ধারণায় ঈশ্বরকে ব্যক্তিসত্ত্বায় বা ব্যক্তিক ধারণায় চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে এ জাতীয় ধারণায় ঈশ্বরে নরত্বারোপ জনিত সাকারবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

সগুণ ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব আরোপের ফলে ঈশ্বরে মানবীয় গুণের সাথে সাথে সাধারণ অনুভূতি ও সীমিত অবস্থান আরোপিত হয়েছে। ফলে সগুণ ঈশ্বর সাকার ঈশ্বরে পরিণত হয়েছেন। ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করলে অসীম সত্ত্বাকে সীমিত করা হয় এবং কোন কোন মতে এটা করা হয় ঈশ্বরের ধারণা করার জন্য। কিন্তু এতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশে জটিলতা ও ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এ ধরণের ব্যক্তিত্ব আরোপ অর্থাৎ মানবীয় ধারণার ব্যক্তিত্ব আরোপে ঈশ্বরে নরত্বারোপ করা হয়।[৩১১] এ ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি; প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর কিরূপ, এ ধারণা থেকে তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর কোথাও ব্যক্তিক, কোথাও নৈর্ব্যক্তিক। উপনিষদের পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু দেববাদ বা অবতারবাদে উপাস্যকে ব্যক্তিক মনে করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিকদের ধারণায় ঈশ্বরকে ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয়ভাবেই দেখা যায়। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর ব্যক্তিক।[৩১২] ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব (মানবীয়) আরোপ করলে পরমসত্ত্বা ব্যক্তিসত্ত্বায় সীমিত হয়ে পড়েন; যদিও বলা হয়, এই ব্যক্তিত্ব সাধারণ মানবীয় ব্যক্তিত্ব নয়। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিত্ব আরোপের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষের মত অনুভূতি সম্পন্ন মনে করা হয়।[৩১৩] এরূপ গুণারোপ ঈশ্বরকে সাকার ঈশ্বরে পরিণত করার দিকে টেনে নিয়ে যায়। হিন্দু ধর্মে ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ, নির্গুণ কিন্তু তাঁকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দেবতাদের মাধ্যমে জানা যায় বলেও কোন কোন মত মনে করে।[৩১৪] সাধারণভাবে সাংখ্যমতকে নিরীশ্বরবাদী বলা হলেও জে.এইচ. মজুমদার, সি.ডি. শর্মা প্রমুখ পন্ডিতগণ সাংখ্যমতে ঈশ্বরের স্বীকৃতি আছে বলে মনে করেন এবং তাঁরা সাংখ্য ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করেন।[৩১৫]

---

[৩১১] দ্রষ্টব্য, J. p.Thiroux, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

[৩১২] (i) "In Judaism God is definitely a person and also relates to human beings on a personal level" (J.P.Thiroux, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭)

(ii) In the old Testament God speaks in personal terms as "I am the God of your Father (Exod 3; 6) Most theologians speak of god as personal, rather than as a person, the latter phrase suggests the picture of a magnified human individual (Thinking of the divine in this way is called anthropomorphism). The statement that God is personal is accordingly intended to signify that God is at least personal that whatever God may be beyond our conceiving, he is not less than personal, not a mere It in relation to man, but always the higher and transcendental 'Thou' (John Hick, *Philosophy of Religion*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০)

(iii)"The Christian god is a personal god"(James Rev. Shanks, Basic Christian concepts, Comparative Religion,Amarjit Singh Sethi and Reinhard Pummer (eds.),New Delhi,1919,p.20)

(iv)The Quran sees men and women as religious being, "I created… humankind only that they might worship me" the Muslims hears God say in the Quran. Each individual is an adb of God, (i.e. both worshipper and servant) [David Kerr, the worship of Islam, The World Religions, R. Pierce Beaver & other (eds.) England 1984, p.317]

[৩১৩] দ্রষ্টব্য, J. p.Thiroux, *Philosophy-Theory & Practice*, পৃ. ৩১২

[৩১৪] দ্রষ্টব্য, Raymond Hammer, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

[৩১৫] J. H. Mazumder, লিখেছেন Isvara as understood by the Sankhya is like a person, or rather a Super man… the ultimate source of all activity or effort may be property designated a person,

নির্বিশেষ ও সবিশেষ গুণ

ঈশ্বরে যে সব গুণ আরোপ করা হয়েছে, সেগুলিকে নির্বিশেষ ও সবিশেষ- এ দুভাবে চিন্তা করা হয়েছে। কিছু কিছু গুণ সদর্থকভাবে ঈশ্বরকে বিশেষিত করেনা। যেমন-মুন্ডকোপনিষদে আছে-

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে না পি বাচা নান্যৈদেবৈস্তপসা কর্মণা বা

জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিস্কলং ধ্যায়মানঃ।[৩১৬]

অর্থাৎ, 'চক্ষু, বাক্য অন্যান্য ইন্দ্রিয় তপস্যা বা যজ্ঞাদি কার্যকলাপের দ্বারা এই পরমাত্মাকে গ্রহণ করা যায়না।'

উপনিষদের অনেক জায়গায় এরূপ নির্বিশেষ বর্ণনা দেখা যায়। তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, কর্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্ম-রহিত, রূপ-রহিত, চক্ষু-শ্রোত্র-বিহীন, হস্তপদশূন্য ইত্যাদি। এ বিষয়ে শংকরাচার্য্যের মত হল ব্রহ্ম সম্পর্কে কোন বিশেষণ মানুষের সসীম বুদ্ধির দ্বারা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।[৩১৭] স্পিনোজা মনে করেন যে, ব্রহ্ম সীমাহীনভাবে গুণসম্পন্ন বলে তাঁকে সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণের দ্বারা উপহিত করা যায়না।[৩১৮]

এ ছাড়া আর কিছু কিছু গুণ ঈশ্বরে সদর্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সবিশেষ বর্ণনাও ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়। যেমন, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বগত, অতিসূক্ষ্ম স্বভাব, সর্বভূতের কারণ ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে আছে-

ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং

ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতিনাং পরমং পরস্তাদ্

বিদাম্ দেবং ভুবনেশমীড্যম্।[৩১৯]

অর্থাৎ সকল ঈশ্বরের তুমি পরম মহেশ্বর সকল দেবতার পরম দেবতা, সকল পতির পতি, পরাৎপর, ভুবেনশ্বর।বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের এই দু'রকম গুণ একই সাথেও প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে আছে-

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তিলোকে

ন চেশিতা নৈব তস্য লিঙ্গাম্।

---

but being a perfect unity. He should more appropriately be called super personal দ্রষ্টব্য, J. H. Mazumder, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১, ১৫৬

[৩১৬] দ্রষ্টব্য, মুন্ডকোপনিষদ ৫২

[৩১৭] দ্রষ্টব্য, রমেন্দ্র নাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৪৪২

[৩১৮] দ্রষ্টব্য, Benedict de Spinoza, "Ethics" Great Books of the western world, vol 31, Robert Maynard Hutchins (editor in chief), William Benton, Publisher *Encyclopaedea Britanica* Inc. 1952, p.355 (Tr. by W.H. White, Revised by A.H. Striling)

[৩১৯] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৫/৭, অনুবাদ হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

স কারণং করণাধিপাধিপো

ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতান চাধিপঃ।।[৩২০]

অর্থাৎ, জগতে তাঁর কোন পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই, তাঁর কোন অবসরও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; তাঁর কোন জনকও নাই, অধিপতিও নাই।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদে ব্রহ্মকে নৈর্ব্যক্তিক, নির্বিশেষ বলেও তাঁকে সৎ চিৎ আনন্দ গুণে ভূষিত করা হয়েছে।[৩২১]

যজুর্বেদে আছে-

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধীমানি বেদ

ভুবনানি বিশ্বা যো দেবানাং নামধা এক এব।[৩২২]

অর্থাৎ, তিনি পালনকর্তা, উৎপাদক, মোক্ষসুখ বিধায়ক, বিশ্বব্রহ্মান্ডের জ্ঞাতা, যিনি সূর্যাদিলোক, ইন্দ্রিয়াদি ও বিদ্বানগণের ব্যবস্থাপক, তিনি এক অদ্বিতীয় ও স্বজাতীয় বিজাতীয় বিহীন।

এ ছাড়া ব্রহ্মকে অপরিণামী, অবিকারী, হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত, সর্বদা একরূপ, এরকমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, মহানির্বানতন্ত্রে আছে-

সদ্রূপং সর্বতোব্যাপী সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ববস্তুষু।[৩২৩]

অর্থাৎ, সেই ব্রহ্ম সৎস্বরূপ ও সর্বব্যাপী, সমুদয় জগতকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি সর্বদা একরূপ, পরিণাম রহিত, চিন্মাত্র; সর্ববস্তুতে নির্লিপ্তভাবে আছেন।

সেখানে আরও আছে-

স এক এব সদ্রূপ সত্যেহদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।

স্বপ্রকাশঃসদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ।।[৩২৪]

অর্থাৎ পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। সত্য, সদ্রুপ, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সদাপূর্ণ এবং তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

---

[৩২০] ঐ, ৫/৯

[৩২১] রোমন্ড হ্যামার বেদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেন-In the Veda the ultimate or Absolute is Brahman, defying all attempt of definition.The Absolute- Brahman is neutral and impersonal-the Origin, the cause and the basis of all existence. In it are to be found: Pure being (Sat) Pure intelligent (Cit) Pure delight (Ananda), দ্রষ্টব্য, Raymond Hammer, Concept of Hinduism, *The Worlds Religions*, পৃ. ১৮৫

[৩২২] যজুর্বেদ ১৭/২৭, অনুবাদ, হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[৩২৩] মহানির্বানতন্ত্র ৪/২৭, অনুবাদ, ঐ, পৃ. ৫৪

[৩২৪] ঐ ২/৩৪, অনুবাদ, ঐ পৃ. ৫২

উপনিষদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ ভাব দেখা যায়- নির্বিশেষ-লিঙ্গ-শ্রুতি(নেতি নেতি বাচক) এবং সবিশেষ শ্রুতি। এই দ্বিবিধভাব নানা বিশেষণে বিভূষিত- নির্গুণ, নির্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্বিশেষ আর সগুণ, সবিশেষ, সোপাধি, সবিকল্প। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা চলেনা, তিনি অনির্দ্দেশ্য, অবাঙ্‌মনসোগোচর, উপনিষদের অনেক জায়গায় এরূপ নির্দেশ করা হয়েছে।[৩২৫]মুন্ডকোপনিষদে ব্রহ্মকে অক্ষর (অবিকারী) বলা হয়েছে।[৩২৬] উল্লেখ্য যে, ভারতীয় দর্শনের পরিণামবাদ[৩২৭] এসব শ্রুতিবাক্যের বিরোধী হয়ে পড়ে।

আবার শ্রুতিতে বহু জায়গায় সগুণ ব্রহ্মের উল্লেখ আছে। সগুণ ব্রহ্মকে ঈশ, ঈশান, মহেশ্বর ইত্যাদি সংজ্ঞায় চিত্রিত করা হয়েছে।[৩২৮] বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি ভাবকে বলা হয়েছে মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত, স্থিত ও যৎ, সৎ ও তৎ (সবিশেষ ও নির্বিশেষ)।[৩২৯] পৃথিব্যাদি ভূত ও জীব জগৎ ব্রহ্মের মূর্তরূপ, অমূর্তরূপ নির্বিশেষ, নির্বিকার ব্রহ্ম, নেতি নেতি।[৩৩০] জীবজগতকে ব্রহ্মের মূর্তরূপ বললে পরিণামবাদ এসে পড়ে। তবে ঈশ্বরের সগুণ অবস্থার কথা বলতে গিয়ে এরূপ বলা হয়েছে- কেননা সৃষ্টির মাধ্যমেই আমরা তাঁর গুণের পরিচয় পাই।

ধর্ম ও দর্শনে সগুণ ঈশ্বর ও সৃষ্টি

ধর্ম ও দর্শনে বিভিন্ন মনীষী ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব গুণের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি সৃষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় ঈশ্বরের ধারণা থেকে তাঁরা পেয়েছেন বলে অনুমান করা হয়। সগুণ ঈশ্বর হল যে ঈশ্বরকে সৃষ্টিতে থেকে ধারণা করা যায়। আবার বর্ণনার সময় সৃষ্টির কোন কিছুর সাথে ঈশ্বরের তুলনা

---

[৩২৫] যতো বাচা নিবর্তন্তেহ প্রাপ্য মনসা সহ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৯/১) ন বাক্ গচ্ছতি (কেনোপনিষদ ১/৩) নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুসা (কঠোপনিষদ ৬/১২) সএষ নেতিনেতি আত্মা ন হ্যেতসাদন্যাৎ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২/৩/৬)

[৩২৬] যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।। (মুন্ডকোপনিষদ, ১/১/৭)

[৩২৭] পরিণামবাদের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়ে কার্যরূপে পরিণত হয়। এমতে ঈশ্বর জগদরূপে পরিণত হন। রামানুজের বিশিষ্টদ্বৈতবাদে এ মত দেখা যায়। রামানুজের মতে ব্রহ্ম একটি বিশিষ্ট ঐক্য- একটি বিশিষ্ট সমগ্র; ব্রহ্ম বিশেষণ- যুক্ত, গুণ- যুক্ত। জীব-চৈতন্যের মূল সূক্ষ্ম সত্ত্বার নাম 'চিৎ'। জড়-জগতের মূল সূক্ষ্ম সত্ত্বার নাম 'অচিৎ'। স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে চিৎ ও অচিৎ দ্বিবিধ। ব্রহ্ম চিৎ এবং 'অচিৎ' বিশেষণ-যুক্ত। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম চিদচিৎ কার্যাবস্থায় জীব এবং জগদ্‌রূপে পরিণত হয়। (অতঃ স্থূল সূক্ষ্ম–চিদচিৎ প্রকারক ব্রহ্মৈব কার্য্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদনং জগৎ। সূক্ষ্ম চিদচিৎ বস্তু শরীরং ব্রহ্মৈব কারণামিতি- রামানুজ শ্রীভাষ্য) এই কারণ ব্রহ্ম এবং কার্য ব্রহ্মের ধারণা স্পিনোজার দর্শনেও দেখা যায়। স্পিনোজা এই দুইটি ধারণার নাম দেন Natura Naturans এবং Natura Naturata. স্পিনোজার মতে, আপেলের লাল রং এবং দুধের সাদা রং-কে যেমন আপেল এবং দুধ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি কারণ ব্রহ্ম ও কার্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। তবে রামানুজও স্পিনোজার মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। রামানুজ একেশ্বরবাদী আর স্পিনোজা সর্বেশ্বরবাদী [দ্রষ্টব্য, রমেন্দ্র নাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৫৫৬-৫৫৭]। রামানুজ স্পিনোজার মত ঈশ্বর=জগত, ঈশ্বর ও জগতের অভিন্নতার সমীকরণ দেননি। তাঁর মতে জগৎ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম অচিৎ শক্তির পরিণাম। তিনি জগতের সত্যতা স্বীকার করেন তবে তাঁর মতে ঈশ্বরই পরমতত্ত্ব। প্রকৃতি ব্রহ্মের সূক্ষ্ম জড়শক্তি। ইহা ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তি। জগত এই প্রকৃতির সৃষ্টি (দ্রষ্টব্য, ঐ পৃ. ৫৮৪) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শংকর ঈশ্বর ও ব্রহ্মের ভেদ করেন- অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম। শংকরের অপর ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্মই রামানুজের মতে পরম সৎ। ঈশ্বর বিশেষ্য, চিৎ ও অচিৎ তাঁর বিশেষণ। ঈশ্বর মূল দ্রব্য, ঈশ্বরের চিৎ ও অচিৎ গুণ থেকে উদ্ভুত জীব এবং জগৎ ঈশ্বরের প্রকার (Modes)।তবে শংকরের মতে, ব্রহ্ম সরাসরিভাবে জীব ও জগতের কারণ নয়। ব্রহ্মের দ্বারা কিছু সৃষ্টি সম্ভব না। শংকর বিশ্বাস করেননা যে, জীব এবং জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের মধ্যে বর্তমান ছিল। ব্রহ্ম এতই সম্পূর্ণ যে তিনি সৃষ্টির অভাব বোধ করতে পারেননা (ঐ, পৃ. ৪৪১)।

[৩২৮] স এব সর্বেস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতি সর্বমিদং প্রশান্তি যদিদং কিঞ্চ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫/৬/১)

[৩২৯] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২/৩/১

[৩৩০] ঐ ২/৩/৩

করতে না পেরে তাঁকে 'ইহা নয়' 'ইহা নয়' এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সগুণ ঈশ্বরের একটি গুণ সর্বব্যাপীত্ব। সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে তিনি আছেন- একথায় সৃষ্টি দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ হ'ন, এজন্য সৃষ্টির বাইরেও তাঁর সত্ত্বা অনুমিত হয়েছে। তবে সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির মানুষ তাকে বুঝতে পারেনা। তিনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু, সর্বকারণের কারণ, ইত্যাদি গুণসমূহ সৃষ্টি বাদ দিয়ে সাধারণভাবে বোঝা যায়না; সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিতভাবে ঈশ্বরের ধারণা সহজ হয়।

সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক কিরূপ- এ নিয়ে চিন্তাবিদরা অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ গুলি থেকে ধর্মদর্শনে চারটি প্রধান মত দেখা যায়ঃ (১) অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ, (২) সর্বেশ্বরবাদ, (৩) ঈশ্বরবাদ, (৪) সর্বধরেশ্বরবাদ। এগুলি মানুষের চিন্তা অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। মানুষ চেষ্টা করেছে ঈশ্বরের ধারণা দেবার কিন্তু পুরোপুরি সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তিযুক্ত ধারণা দিতে পারেনি।[৩৩১] সামগ্রিকভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান না হলে এ বিষয়ের সমাধান হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়না। ঈশ্বরের স্বরূপ যথাযথ জানলে তাঁর সাথে জগতের সম্পর্ক এবং এরূপ অন্যান্য প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হয়।

পরমেশ্বর সর্বব্যাপী। বিভিন্ন শাস্ত্রে এই সর্বব্যাপীত্ব নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঈশোপনিষদে আছে- 'এ ব্রহ্মান্ডের অন্তর্গত সকল পদার্থেই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত হয়েছেন।'[৩৩২] মহানির্বানতন্ত্রে আছে- 'সর্বব্যাপক প্রভু'[৩৩৩] ব্রহ্ম সৎ স্বরূপ ও সর্বব্যাপী।[৩৩৪]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে-

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।[৩৩৫]

অর্থাৎ,তাঁর হাত পা সর্বত্র, তাঁর চক্ষু- মুখ সর্বত্র, কর্ণও সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি সর্বলোক ব্যাপী অবস্থান করছেন।

ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যেও আছেন, বাইরেও আছেন। সৃষ্টির সবাই তাঁর থেকে আসছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে- যা কিছু সবই তিনি, সর্বতোভাবে সর্বাত্মক।[৩৩৬]

সমস্ত জগত ব্যাপিয়া তিনি আছেন। জগতে জড় ও চেতন এই উভয়বিধ বস্তু আছে। তিনি সৃষ্টিব্যাপী অবস্থান করলে, তিনি কি জড়ভাবে না চেতনভাবে আছেন। আর এর কোনভাবে না থাকলে কিভাবে আছেন- এ সব সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে ধর্ম ও দর্শনে নানা মত সৃষ্টি হলেও সমস্যা রয়েই গেছে। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করে এর থেকে বিভিন্ন রয়েছেন। সৃষ্টির বাইরে থেকে তিনি একে নিয়ন্ত্রণ করেন অথবা সৃষ্টির সময়ে তিনি প্রকৃতিতে কিছু নিয়ম কানুন সৃষ্টি করেছেন

---

[৩৩১] দ্রষ্টব্য, A. Matin, *An outline of Philosophy*, ৩১২-৩১৮

[৩৩২] ঈশোপনিষদ ১

[৩৩৩] মহানির্বানতন্ত্র ২/৩৫

[৩৩৪] ঐ, ৪/২৭

[৩৩৫] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩/১৩; শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৩/১৬

[৩৩৬] ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭/২৪/১

যার দ্বারা সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়। আর সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বরকে সৃষ্টির সাথে এক মনে করে।[৩৩৭] ঈশ্বরের অতিবর্তিতার অন্যরকম ব্যাখ্যাও আছে। তাঁকে অতিবর্তী বলা হয় এজন্য যে সৃষ্টি দ্বারা তাঁর সত্ত্বা সীমাবদ্ধ নয়, তিনি মানুষের বোধের অতীত; এবং এ অর্থে তিনি একই সাথে অন্তর্বর্তী ও অতিবর্তী।[৩৩৮] সৃষ্টির সবকিছু ব্যপ্ত হয়ে ঈশ্বর আছেন।[৩৩৯] অষ্টাবক্র সংহিতায় আছে-

একং সর্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।

নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা।[৩৪০]

অর্থাৎ, সর্বগত আকাশ যেমন ঘটের অন্তরে ও বাইরে বর্তমান তেমনি ব্রহ্মও সমস্ত ভূতের অন্তরে বাইরে স্থিত।

শিব সংহিতায় উল্লেখ আছে-

অসংলগ্নং যথাকাশং মিথ্যাভূতেষু পঞ্চষু।

অসংলগ্নস্তথা হ্যাত্মা কার্য্যবর্গেষু নান্যথা।।[৩৪১]

অর্থাৎ, যেমন আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের মধ্যগত হয়েও পঞ্চভূত থেকে অসংলগ্নভাবে অবস্থিত, সেরূপ পরমাত্মা ও বিশ্ব কার্য্যের সর্বত্র বিদ্যমান থেকেও তা থেকে অসংলগ্নভাবে বিরাজমান।

ঈশ্বর জগতের সবকিছু হলেও সব কিছুতে তিনি নির্লিপ্তভাবে বিদ্যমান। তিনি পরিণাম রহিত সর্বদা একরূপ, চিন্মাত্র।

তিনি সৃষ্টির মধ্যে যেমন, তেমনই বাইরেও বিদ্যমান। সৃষ্টি দ্বারা তাঁর সত্ত্বা সীমাবদ্ধ নয়।[৩৪২]

চিৎ স্বরূপ অবিকারী ব্রহ্ম থেকে কিভাবে জগত সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে উপনিষদ বলছে-

---

[৩৩৭] দ্রষ্টব্য, (i) K. Ajdukiewicz, *Problems & theories of Philosophy*, Tr. by H. Skolimowski & A. Quinton, Cambridge, 1975, p.155-156

(ii) H.K. Mirza, Zoroasthrianism, *Religions of India*, p.185-186

[৩৩৮] দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, *Comparative Religion*, p.109-110

[৩৩৯] সৃষ্টিতে ঈশ্বরের সর্বব্যাপীত্বের ধারণা স্বামী দয়ানন্দ এভাবে দিয়েছেন-

"…Earth, water, air, fire, etc. each of which is a product of matter, are all unintelligent: none of these can function independently. Earth for instance, cannot bear fruits of various kinds of its own accord, water cannot pour on earth by itself, winds cannot blow by themselves and fire cannot discharge its manifold functions of its own initiative. There must be an undercurrent of all- pervasive, intelligence, running through them all, under whose directions these insentient substances discharge their respective functions. That all pervasive, intelligent power which controls everything and guides matter is god, Swami Dayanada, "Conception of God in Hindu philosophy", *Kalyan-, Kalpataru*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯

[৩৪০] অষ্টাবক্র সংহিতা ১/১৮, অনুবাদ, হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

[৩৪১] শিবসংহিতা ১/৫৩, অনুবাদ, ঐ, ঐ

[৩৪২] God as the creator of the world is regarded as transcendent to it but as its inner sustainer and controller he is also regarded immanent into. Even if God created, creats the world of the material of his own being, he is not fully exhausted in this world, দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

"যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) নিজের শরীর থেকে নির্গত সূত্র দ্বারা উর্দ্ধে গমন করে এবং অগ্নি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। তেমন সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম থেকে সর্বপ্রাণ, সর্বদেব, সর্বলোক সর্বভূত উত্থিত হয়।"[৩৪৩] "...যেমন ঊর্ণনাভি সূত্র সৃষ্টি ও সূত্র গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হতে ওষধি উৎপন্ন হয়, যেমন জীবিত ব্যক্তির কেশ লোমাদি হয় সেরূপ সেই অক্ষর (অবিকারী) ব্রহ্ম থেকে এই বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়।"[৩৪৪]

জগত ঈশ্বরেই অবস্থিত। এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ট বলেছে-

সত্যং সর্বগতং শান্তমস্ত্যনন্তং মনোময়ম্।

তস্য শক্তি সমুল্লাসমাত্রং জগদিদং স্থিতি।।[৩৪৫]

অর্থাৎ, পরমাত্মা অনন্ত, মনোময় সর্বগামী, শান্ত এবং সত্যস্বরূপ। তাঁর শক্তির সমুল্লাসে এ জগত স্থিতি করছে।

তদ্ধেতু সর্বভূতানাং তস্য হেতুর্ন বিদ্যতে।

স সারঃ সর্বভূতানাং তস্মাৎ সারো ন বিদ্যতে।।[৩৪৬]

অর্থাৎ, তিনি সকলের হেতুভূত, তাঁর হেতু কেহ নাই, তিনি সকল বস্তুর সার, তাঁর চেয়ে সারবস্তু আর নাই।

সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্ক ইব বাসরঃ।

সতি পুষ্প ইবামোদশ্চিতি সত্যং জগত্তথা।[৩৪৭]

অর্থাৎ, যেরূপ দীপ প্রকাশে আলোক, দিবাকর প্রকাশে দিন, এক কুসুম বিকাশে সৌরভ প্রকাশিত হয়, সেরূপ সত্যব্রহ্ম পদার্থের সত্ত্বাতেই এই জগত সত্যরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সমুদয় জগতকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি চিন্মাত্র, সর্ববস্তুতে নির্লিপ্তভাবে আছেন।[৩৪৮] ব্রহ্ম অবিকারী, তিনি যেমন তেমনই আছেন। জগতের সাথে সম্পর্কে তার কোন পরিবর্তন হয়না। তিনি সৃষ্টির জড় বা চেতন এর কোনটির মত নন। তিনি সব কিছুতে নির্লিপ্তভাবে আছেন। এ প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত বলেন-

পরম পিতার ইচ্ছাশক্তি এই সৃষ্টির প্রকৃতি। তিনি অনন্ত গুণময়। অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্ব এই উভয়ের একত্ব হল অব্যক্ত। এই অব্যক্ত থেকে ক্রমশঃ ব্যোম, বায়ু, তেজ, জল ও ভুমি উৎপন্ন হয়। এই ব্যোমই জড় জগতের প্রকৃতি।[৩৪৯] এমতে দেখা যাচ্ছে যে, পরমেশ্বরের অনন্ত গুণের একটি

---

[৩৪৩] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২/১/২০

[৩৪৪] মুন্ডকোপনিষদ, ১/১/১৭

[৩৪৫] যোগবাশিষ্ট, ১৫/৮৫

[৩৪৬] ঐ, ২৯/৮৯

[৩৪৭] ঐ, ১৭/২৯, অনু. হরিশ্চন্দ্র সান্যাল,পুর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

[৩৪৮] মহানির্বানতন্ত্র ৪/২৭

[৩৪৯] আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ৪৩ ও তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ. ১৮৮

মাত্র গুণের বিকারে এই সৃষ্টি সম্পাদিত হয়েছে। মানুষের ঘাম থেকে কীটাদির উৎপত্তি হলে মানুষের যেমন কোন হানি হয়না, তেমনি এই সৃষ্টি দিয়েও স্রষ্টাকে বিকৃত পরিণামী বা সীমিত করা যায়না। (উদাহরণস্থলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অনন্তের উপমা কখনও সান্ত পদার্থ দিয়ে হয়না)।

ঈশ্বরের সগুণ অবস্থার পাশাপাশি শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হয়েছে। কোথাও আবার একই সাথে গুণাতীত ও গুণাত্মা বলা হয়েছে। যেমন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে- "...তিনি ইন্দ্রিয় সকল ও তাদের সমস্ত গুণের প্রকাশক অথচ তিনি ইন্দ্রিয় বর্জিত, তিনি অসক্ত অর্থাৎ সঙ্গ শূন্য এবং সকলের আধার। তিনি নির্গুণ ও গুণভোক্তা অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের পালক।"[৩৫০]

মহানির্বানতন্ত্র বলছে- "... তিনি নির্বিকার, নিরাধার, নির্বিশেষ, নিরাকুল। তিনি গুণাতীত, সর্বপ্রকার শুভাশুভ কর্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, সকলের আত্মার আত্মা, সর্বত্র ব্যাপক বিভু।"[৩৫১]

হিন্দু ধর্মের পঞ্চ সম্প্রদায়

প্রাচীন কালে ভারতে প্রধানতঃ ৬টি ধর্মসম্প্রদায় দেখা যায় ,যথা- তান্ত্রিক বা শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব,গাণপত্য এবং বৌদ্ধ। বর্তমানে বৌদ্ধগণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলে স্বীকৃত হওয়ায় হিন্দু ধর্মে শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব ও গাণপত্য এ পাঁচটি সম্প্রদায় দেখা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উপাস্যকে জগতের মূল কারণ জ্ঞানে উপাসনা করেন। এঁরা সকলেই তাদের উপাস্যের গুণকীর্তন করেন। এদের স্তব বা ধ্যানমন্ত্রে উপাস্যের সগুণ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কেউ আবার উপাস্যকে নির্গুণ বলেও নির্দেশ করেছেন।

শাক্ত মতের উপাস্য শক্তিদেবীকে অপরাধ-ক্ষমাকারিণী, কলি-কলুষ-হরা, ভোগ-মোক্ষ-প্রদাত্রী ইত্যাদি গুণে ভূষিতা করা হয়েছে।[৩৫২] বৈষ্ণব মতে নারায়ণ অভীষ্টদাতা, প্রণতের পালক, সংসার সাগরের তরণী, ভৃত্যবর্গের ক্লেশ-নিবারক।[৩৫৩] এমতের দশাবতার স্তোত্র, রামাষ্টক স্তোত্র প্রভৃতিতেও উপাস্যের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। দশাবতার স্তোত্রে কেশবের নানা গুণের উল্লেখের সাথে তার দশটি শরীর ধারণের কথা আছে।[৩৫৪] রামাস্টক স্তোত্রে রামের জড় রূপের বর্ণনা আছে এবং তাতে পরমগুণসমূহ আরোপ করা হয়েছে। যেমন- চিৎ, এক, কৃপাকর, শিব, নিরঞ্জন, পাপ নাশন, চিত্তরঞ্জন, ভীতি ভঞ্জন ইত্যাদি আবার তাকে নিরাকৃতি, নিরাময়, নিস্প্রপঞ্চ, নির্বিকল্প ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৫৫] আচার্য গুরুনাথের মতে এসব স্তোত্রের গুণ সমাবেশে সংগতি বজায় থাকেনি। যেমন, রামের স্থূল রূপের বর্ণনা দিয়ে তাকে আবার নিরাকৃতি নিস্প্রপঞ্চ ইত্যাদি বলা হয়েছে। সৌরমতে সূর্যের স্তব বা ধ্যানমন্ত্রে জড় সূর্যের বর্ণনার সাথে চেতন সূর্যের বর্ণনা যোগ করে সেখানে পরমগুণসমূহ আরোপ করা হয়েছে।[৩৫৬] শৈব সম্প্রদায়ের স্তব-

---

[৩৫০] দ্রষ্টব্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩/১৪

[৩৫১] দ্রষ্টব্য, মহানির্বানতন্ত্র ২/৩৫

[৩৫২] অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্র, দ্রষ্টব্য, স্তব-কবচ মালা, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, উদ্ধৃত, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ ১৭

[৩৫৩] নারায়ণ স্তব, দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ২১

[৩৫৪] ঐ, ঐ, পৃ. ২১-২৪

[৩৫৫] দ্রষ্টব্য, স্তব কবচ মালা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

[৩৫৬] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ. ২৪-২৫

স্তোত্রে শিবের স্থূল রূপের বর্ণনার সাথে শিবকে পরমেশ্বরের গুণে ভূষিত করা হয়েছে।[৩৫৭] গাণপত্যেরা গণেশকে অনন্ত শক্তিরূপে বর্ণনা করেন। গণপতির স্তব বা ধ্যান মন্ত্রে তাঁর গুণের বর্ণনা আছে।[৩৫৮] গণেশাষ্টকম-এ বর্ণনা আছে যে, গণেশ থেকেই সব কিছুরই সৃষ্টি, তাঁর দ্বারাই কার্যসিদ্ধি ও মোক্ষলাভ। এখানে তাঁকে নির্গুণ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু গণপতির ধ্যানমন্ত্রে তাঁর জড়ীয় রূপের বর্ণনা আছে এবং তাঁকে শৈল-সুতাসুত (হিমালয় রাজার কন্যা পার্বতীর পুত্র) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব সম্প্রদায় তাঁদের উপাস্যকে সগুণ বলে বর্ণনা করেছেন; কেউ আবার নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই বলেছেন।

ঈশ্বরের সগুণত্ব-নির্গুণত্ব প্রসঙ্গে দর্শন সম্প্রদায়

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়সমূহ ঈশ্বরকে এককভাবে সগুণ বা নির্গুণ বলেছেন। ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর জীবাত্মা থেকে ভিন্ন; তিনি গুণ বিশিষ্ট, তাঁর অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য রয়েছে। তিনি স্রষ্টা, বোদ্ধা ও সর্বজ্ঞ। ঈশ্বর এক, বিভু পরিমান ও নিত্য। জ্ঞান ঈশ্বরের গুণ, ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ নন। ঈশ্বর স্বরূপত সগুণ, কোন প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের নির্গুণত্ব প্রমাণ করা যায়না। বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। পরবর্তী ভাষ্যকারেরা ঈশ্বরের কথা বলেছেন। বৈশেষিক মতে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, অনন্ত, শাশ্বত পুরুষ। বেদ তাঁরই রচনা, ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। এখানেও ঈশ্বর সগুণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ন্যায় বৈশেষিক মতে ঈশ্বর সগুণ। ঈশ্বরকে তারা নির্গুণ বলেননি এবং ঈশ্বরের নির্গুণত্ব প্রমাণ করা যায়না বলেই তাদের ধারণা। সুতরাং এঁরা সগুণ ও নির্গুণকে পৃথক করে দেখেছেন এবং তাদের মতে ঈশ্বর নির্গুণ হতে পারেননা- কিন্তু সগুণ ও নির্গুণ কেন বা কিভাবে পৃথক এবং ঈশ্বর কেন নির্গুণ হতে পারেননা। এসব বিষয় তাদের আলোচনায় পাওয়া যায়না।

যোগ দর্শনের প্রণেতা পতঞ্জলির মতে, ব্রহ্ম নির্গুণ হলেও প্রথমে সগুণ ব্রহ্মের গুণরাশি ধ্যান করা কর্তব্য। এমতে সগুণ ও নির্গুণ উভয় ব্রহ্মের কথা আছে। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, প্রথমে নির্গুণে চিত্ত প্রবেশ করতে পারেনা। একারণে সগুণে মনোনিবেশ করবে।[৩৫৯] সাংখ্য মত পর্যালোচনা করে বিজ্ঞান ভিক্ষু সগুণ ঈশ্বরের কথা বলেছেন।[৩৬০] জে. এইচ. মজুমদার সাংখ্য পুরুষকেই ঈশ্বরের গুণে ভূষিত করেছেন।[৩৬১] এঁদের মতে সাংখ্য ঈশ্বর সগুণ। কেননা সাংখ্য পুরুষকে যে সব গুণে

---

[৩৫৭] স্তব কবচ মালা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮

[৩৫৮] ঐ, পৃ. ৩২৯, ৩৩৫

[৩৫৯] নির্গুণে প্রথমং চিত্ত প্রবেশাসম্ভবেন সগুণে এব মনোহভিনিবেশ্যম্। উদ্ধৃত, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

[৩৬০] বিজ্ঞান ভিক্ষু ঈশ্বরকে আদি পুরুষ রূপে গ্রহণ করেছেন। তার মতে, ঈশ্বর নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। দ্রষ্টব্য, প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, ১ম খন্ড ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৯৫-৯৬ (১৪শ সংস্করণ), পৃ. ২৭৫

[৩৬১] জে. এইচ. মজুমদারের মতে-"We may, conclude, then by holding that the sankhya teaches that there is one Abslute Purusa... One Absolute self concious self or Isvara, who includes Prakriti as one of His constituent elements, and uses her as the means to differentiate or emobody Himself into muberless objects, which constitute the world; and that He being thus a self conscions 'System' or 'world' and also the ultimate source of all activity or effect... in verses 10 and 11 of the Sankhya-karika. From these two verses we may gather the attritutes of Purusa ; He is uncaused, eternal, all- pervading, unchanging, one, independent, irresolvable, uncombined and self-governed. [also verse 19, the attributes are eternal, all-pervading (ibid, aphorism 12), free from all association (ibid, aphorism 15), internally pure or unchangeable, eternally enlightened and eternally released (ibid, aphorism 19)].

ভূষিত করা হয়েছে সে সব গুণ বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে। বেদান্ত দর্শন মতে, ব্রহ্মের কোন কোন উপাসনা দ্বারা গুণের উন্মেষ ঘটে, কোন কোন উপাসনা ক্রমে মুক্তি দান করে, কোন কোনটি ক্রমে সমৃদ্ধি দান করে। বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ গুণের দ্বারা বিশিষ্ট করে পরমেশ্বরের নাম ভিন্ন ভিন্ন করা হয়। মূলতঃ নাম দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন হন না। একই পরমাত্মা ঈশ্বর, সেই সকল গুণ বিশেষে বিশিষ্ট হয়ে উপাস্য হন কিন্তু গুণোপানুসারে ফল ভিন্ন ভিন্ন হয় অর্থাৎ উপাস্য ঈশ্বর এক হলেও যে তাঁর যেমন গুণের উপাসনা করে সে তেমন ফল পায়।[৩৬২]

এখানেও উপাসনাকালে ব্রহ্মের সগুণ ভাব অবলম্বনীয় বলে নির্দেশ করা হয়েছে। শংকরের অদ্বৈতবেদান্ত মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা বা ব্রহ্মই সত্য। আত্মা বা ব্রহ্ম উপাধিবর্জিত, প্রপঞ্চবর্জিত, পরমসত্ত্বা। ব্রহ্ম নির্গুণ। মায়া উপাধির দ্বারা উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। সগুণ ব্রহ্ম হচ্ছে ঈশ্বর। রামানুজ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরকে এক বলেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম নির্গুণ বা নির্বিশেষ নয়। তাঁর মতে এক ও বহু উভয়ই সত্য। বহুর দ্বারা এক ব্রহ্ম বিশিষ্ট, একের ভিতরে বহু অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে ঈশ্বর প্রভু বিভু, নিয়ন্তা সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, সেই একটিই সচ্চিদানন্দ প্রেমময় ভগবান, একই সঙ্গে তিনি সগুণ ও নির্গুণ। সবসময় মনে রাখতে হবে ভক্তের সগুণ ঈশ্বর ব্রহ্ম থেকে আলাদা নন। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তবে নির্গুণ পরব্রহ্মের এই নির্গুণ ভাব খুবই সূক্ষ্ম। সেজন্য তিনি প্রেমের কিংবা উপাসনার পাত্র হতে পারেননা। এজন্যই ভক্ত বেছে নেন ব্রহ্মের সগুণ ভাবকে অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা ঈশ্বরকে।[৩৬৩]

হিন্দুধর্মে ঈশ্বর কোথাও সগুণ কোথাও নির্গুণ; অর্থাৎ কোথাও ঈশ্বরকে বিভিন্ন পরম গুণে ভূষিত করা হয়েছে আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, তাঁকে গুণে বা বিশেষণে ভূষিত করা যায়না। আবার কোথাও একই সাথে ঈশ্বরকে নির্গুণ ও সগুণ বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে সগুণ ঈশ্বর ও নির্গুণ ঈশ্বর এক কি-না, এমন কোন পরিষ্কার কথা পাওয়া যায়না। 'সগুণ ঈশ্বর' ও 'নির্গুণ ঈশ্বর' দুটি ভিন্ন ধারণা হিসেবেই হিন্দুধর্মে পাওয়া যায়। ঈশ্বর সগুণ না নির্গুণ এর কোন কথা সঠিকভাবে হিন্দুধর্মে দেখা যায়না। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও রামানুজের মতে ঈশ্বর সগুণ। পাতঞ্জল ও অদ্বৈত বেদান্ত মতে ঈশ্বর নির্গুণ, কিন্তু উপাসনায় সগুণভাব অবলম্বনীয়। ঈশ্বর নির্গুণ হলে অর্থাৎ তাঁকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা না গেলে তাঁর সগুণ ভাব কিভাবে অবলম্বন করা যায় এর কোন ব্যাখ্যা এঁরা করেননি। 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ সাধারণভাবে গুণহীন করা হয়। ঈশ্বর গুণহীন হলে তাঁকে করুণাময়, দয়াময়, প্রেমময়, কৃপাময়, সৎ, চিৎ, আনন্দ ইত্যাদি গুণে ভূষিত করার তাৎপর্য কি? ঈশ্বর নির্গুণ হলে তাঁর গুণ কিভাবে চিন্তা করা যায়- এর কোন ব্যাখ্যা হিন্দুধর্ম বা দর্শনে পাওয়া যায় না।

Let us now carefully examine the above attributes... purusa (the absolute self) is rational, intelligent, eternally enlightened. He is therefore a self-concious being." J.H. Mazumder, Isvara in Sankhya Philosophy, Kalyan-Kalpataru পৃ. ১৫১-১৫২। C.D. Sharma তাঁর *A Critical Survey of Indian Philosophy*-তে সাংখ্য পুরুষ সম্পর্কে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

[৩৬২] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ১৬৭

[৩৬৩] বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, পরিকল্পনা ও সম্পাদনা প্রসূনবসু, শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রকাশক প্রসূন বসু, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা ১৩৮১ বাং, পৃ. ৪০০

স্বামী বিবেকানন্দের মতে ঈশ্বরের নির্গুণভাব খুবই সূক্ষ্ম, এজন্য তিনি প্রেমের বা উপাসনার পাত্র হতে পারেননা। এখানে স্পষ্টভাবে সগুণ ঈশ্বর ও নির্গুণ ঈশ্বরকে আলাদা করা হয়েছে; একজন উপাসনার ও প্রেমের পাত্র, অন্যজন উপাসনার ও প্রেমের পাত্র নন। সূক্ষ্ম হলে ঈশ্বর কেন উপাসনার বা প্রেমের পাত্র হতে পারবেননা-এর কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি। সুতরাং, সগুণত্ব-নির্গুণত্ব, ঈশ্বর সগুণ না নির্গুণ, সগুণ ঈশ্বর ও নির্গুণ ঈশ্বর দুটি ভিন্ন সত্ত্বা না এক, এসব বিষয়ে কোন পরিষ্কার ধারণা হিন্দুধর্ম ও দর্শনে দেখা যায়না। অর্থাৎ বলা যায়, ঈশ্বরের সগুণত্ব ও নির্গুণত্বের এ জটিলতা, হিন্দুধর্মে একটি সমস্যা হিসেবেই দাঁড়িয়ে গেছে। 'নির্গুণ' শব্দের ব্যাখ্যা যথাযথ না থাকার কারণে এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। নির্গুণ শব্দের অর্থ 'গুণ নাই যার' বা 'যাকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায়না' এরূপ করার ফলেই সমস্যাটি প্রকট হয়েছে বলে মনে হয়। তবে সগুণত্ব নির্গুণত্বের সমাধান না থাকলেও ঈশ্বরের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হিন্দুধর্ম ও দর্শনে দেখা যায়। প্রচলিত অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বরের সগুণত্ব-নির্গুণত্ব সম্পর্কে সরাসরি এরকম কোন আলোচনা দেখা যায় না।

আচার্য গুরুনাথের মতে, যাঁর অনন্ত গুণের সম্যক জ্ঞান বা অবধারণ এ পর্যন্ত হয় নাই এবং হতেও পারেনা, তিনি নির্গুণ।[৩৬৪] পাণিনি ব্যাকরণের, বার্তিককার মহর্ষি কাত্যায়নের মতে, কোন পদের প্রথম অংশ যদি প্রাদি (প্র, পরা, নির, দূর প্রভৃতি) হয় এবং শেষ অংশ যদি ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, তবে বহুব্রীহি সমাসে ঐ শেষ অংশের বিকল্পে লোপ হয়। যেমন, প্রপতিত হয়েছে পর্ণ যা থেকে, এ বাক্যে সাধারণ নিয়মানুসারে 'প্রপতিত-পর্ণ' পদ হয়। প্রপতিত অংশে প্রাদির অন্তর্গত 'প্র' এই অব্যয়ের পরে যে 'পতিত' অংশ আছে তা ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কেননা 'পত্' ধাতুর সাথে 'ক্ত' প্রত্যয়ে 'পতিত' হয়। পূর্বপদ 'প্রপতিত' এর শেষ অংশ 'পতিত'; এই 'পতিত' অংশের বিকল্পে লোপে, 'প্রপর্ণ' ও প্রপতিতপর্ণ পদ হয়েছে।[৩৬৫] এই নিয়ম অনুসরণ করে আচার্য গুরুনাথ 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ করেন, নির্বিদিত বা নির্বেদ্য অর্থাৎ অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় (নিরবধারিত বা নিরবধার্য্য হয়েছে) গুণ যার। যার গুণ রাশি এ পর্যন্ত ইয়ত্তায় বা সংখ্যায় অবধারিত বা অবধার্য্য হয় নাই, তিনি নির্গুণ।[৩৬৬] এতে নির্গুণ শব্দে গুণহীন না বুঝিয়ে অনবধার্য গুণরাশিময় বুঝায়। সুতরাং নির্গুণ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বরকে গুণময় বুঝায় অর্থাৎ ঈশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়।[৩৬৭]

ঈশ্বরকে সগুণ ও নির্গুণ বলায় কোন বাধ্যবাধকতা ঘটেনা কেননা নির্গুণ শব্দে গুণহীন না বুঝিয়ে অনবধারিত গুণ রাশি সম্পন্ন অর্থাৎ অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণ বিশিষ্ট বুঝায়। সগুণ ও নির্গুণ বলায় একই ভাবের যথাক্রমে ধারণীয় অনন্তত্ব ও অধারণীয় অনন্তত্ব প্রকাশ করে। ঈশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়। তাঁর যে গুণ আছে তা সংখ্যার দিক দিয়ে অনন্ত। এই প্রতিটি গুণের অনন্ত ভাব আছে। প্রতিটি গুণের প্রতিটি ভাবের আবার অনন্তত্ব আছে। অনন্ত ভাব সম্বলিত অনন্তগুণের যে অনন্তভাবে মিশ্রণ বা একত্ব তাই ঈশ্বরের নির্গুণ ভাব। এভাবে বিশেষ কোন গুণ আলাদাভাবে চিন্তা করা যায় না; অনন্ত গুণের একীভাব। এজন্যই

---

[৩৬৪] আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ. ১৫৫

[৩৬৫] 'পূর্ব-পদান্তর্গতস্য প্রাদিভ্য: পরস্য উত্তর ভাগস্য ধাতুজস্য বা লোপ' দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ.; ১৫৬

[৩৬৬] নির্বিদিতা : নির্বেদ্যা: বা (নিরবধারিতা : নিরবধার্য্য: বা ইয়ত্তয়া সংখ্যায়া বা) গুণাযস্য তৎ নির্গুণং তস্মৈ নির্গুণায়, দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ. ১৫৬

[৩৬৭] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ. ১৫৭, সত্যধর্ম, পৃ. ১৩৩

ধর্মশাস্ত্রে প্রথমে সগুণভাব অর্থাৎ ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণ অবলম্বন করে তাঁর উপাসনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাকে দয়াময় করুণাময় ইত্যাদিভাবে উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে।

স্পিনোজা ও শংকরাচার্য মনে করেন যে, ঈশ্বরকে কোন বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না কেননা একটি বিশেষণ ব্যবহার করলে এর বিরুদ্ধ বা বিপরীত বিশেষণ গুণগুলিকে অস্বীকার করা হয়। স্পিনোজা মনে করেন যে, ঈশ্বর সীমাহীনভাবে গুণসম্পন্ন বলে তাঁকে সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণের দ্বারা উপহিত করা যায় না। শংকরের মতে, ব্রহ্ম সম্পর্কে কোন বিশেষণ মানুষের সসীম বুদ্ধির দ্বারা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তবে পরমসৎ, পরমচিৎ ও পরম আনন্দ এই অর্থে তাঁকে সচ্চিদানন্দ বলা যায় বলে শংকরাচার্য মনে করেন। তিনি ব্রহ্মকে নির্গুণ বলেও তাঁকে এসব গুণে ভূষিত করেছেন। এর কারণ হিসেবে মনে করা যায় যে, তিনি যে ব্রহ্ম সম্পর্কে বহু নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার করেছেন, এতে কেউ ভাবতে পারে যে ব্রহ্ম একটা বিরাট শূন্যতা মাত্র। সচ্চিদানন্দ বললে ব্রহ্ম যে পরম ভাব বস্তু তা পরিষ্কার হয়। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরকে নির্গুণ বললেও কেউ তার গুণের উল্লেখ না করে পারেনি। শংকরাচার্য যে ব্রহ্ম, পরমসত্য, পরমতত্ত্ব এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, এগুলোও গুণবাচক শব্দ। সুতরাং তাঁর নিজের মত অর্থাৎ 'ঈশ্বরকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায়না'- তিনি নিজেও এ মত মেনে চলতে পারেননি।অর্থাৎ, তিনি নিজে ই ঈশ্বর কে বিশেষণে বিশেষিত করেছেন।

স্পিনোজার মতে কোন গুণ দ্বারা দ্রব্যকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ দ্রব্যকে অস্বীকার করা। যদি বলা হয় ফুলটি লাল তবে তাতে লাল রং ছাড়া অন্য রংসমূহ অস্বীকার করা হয়।[৩৬৮] তবে আচার্য গুরুনাথের মত অনুসারে বলা যায় যে, একটি ফুল লাল বললে ঐ ফুলে লালের বিরুদ্ধ রংগুলি অস্বীকার করা হয়, কিন্তু ফুলের অন্যান্য গুণগুলি অস্বীকার করা হয়না। এ হল ভৌতিক গুণের কথা। কিন্তু আধ্যাত্মিক গুণের সময়ে এরূপ কথাও বলা যায়না। ঈশ্বরে দয়া ও ন্যায়পরতা এরূপ বিপরীত গুণসমূহ আছে। ঈশ্বরকে 'এক' বললে তিনি যে 'বহু নন' তা বুঝায় না, কেননা 'বহু' একের অন্তর্গত। ঈশ্বর প্রভু অর্থাৎ তাতে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ এই উভয় শক্তিই রয়েছে। ইহুদী-খ্রীষ্টিয় মতেও ঈশ্বরকে একই সাথে পিতা ও শাসক, করুণাময় ও ন্যায়পর, প্রেমময় ও শান্তি বিধানকারী বলা হয়েছে।[৩৬৯] অর্থাৎ পরস্পর বিপরীত গুণের সমাবেশ তাতে আছে।

পৃথিবীতে আমরা বহুগুণ সম্পন্ন কোন পদার্থের একটি গুণের কথা বলার সময় অন্য কোন গুণ অস্বীকার করি না। ফুলের গন্ধ বিষয়ে আলোচনার সময় ফুলের অন্যান্য গুণের উল্লেখ থাকে না- এতে অন্য গুণগুলি অস্বীকার করা হয় না। কোন পদার্থের দৈর্ঘ ৫ ইঞ্চি একথা বললে তার যে প্রস্থ নাই এরূপ বোঝায় না। এভাবে, ঈশ্বরের বহুগুণের মধ্যে একটি গুণের উল্লেখে কোন অসুবিধা হয় না। এতে অন্যান্য গুণ অস্বীকার করা হয় না।

তাছাড়া, ঈশ্বরকে যদি এমন কোন বিশেষণে বিশেষিত করা হয় যে বিশেষণে তাঁর সবগুণ প্রকাশ পাবে- তাহলে ঐ বিশেষণে ঈশ্বরকে বিশেষিত করা যায়। ইসলাম ধর্মে 'আল্লাহ' শব্দটি সৃষ্টিকর্তার সত্তা প্রকাশ করে, এটিকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করলে তাঁর সব বিশেষণ প্রকাশ পায়। হিন্দু শাস্ত্রের

---

[৩৬৮] দ্রষ্টব্য, রমেন্দ্র নাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৪৪২

[৩৬৯] দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

পঞ্চম প্রণব (ওঁং)[৩৭০] দ্বারা ঈশ্বরের সবগুণ প্রকাশ পায়, কোন কিছুই বাকী থাকে না। সমস্ত পরস্পর বিপরীত গুণের একত্ব ও প্রকাশ পায়।

ঈশ্বরের সগুণত্ব-নিগুর্ণত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য ধর্মমত পর্যালোচনা

অন্যান্য ধর্মসমূহের মধ্যে শিখধর্মে ঈশ্বরকে সরাসরি সগুণ ও নির্গুণ বলা হয়েছে। এ ধর্মে ঈশ্বরের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব ঈশ্বরের স্বরূপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বরের সগুণত্ব বা নির্গুণত্ব সম্ভবতঃ কোন বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়নি কেননা এ শব্দগুলো সেখানে দেখা যায় না। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব তথ্য আছে তা থেকে তাঁর সগুণ অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়; আবার নির্গুণ অবস্থার ইঙ্গিতও কোথাও কোথাও আছে। আমরা এখন আচার্য গুরুনাথের সগুণত্ব-নির্গুণত্বের ধারণার আলোকে এসব ধর্মমতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে ঈশ্বরের সগুণত্ব-নির্গুণত্ব বিচারের চেষ্টা করব।

জরথুস্থ্র ধর্ম

জরথুস্থ্র ধর্মমতে আহুরা মাজদা স্রষ্টা, পালক। আবেস্তায় তাঁর নানা গুণের উল্লেখ আছে। আহুরা মাজদা-এর অর্থ সর্বজ্ঞ, এটিও একটি গুণবাচক শব্দ। এ ছাড়া আহুরা-মাজদার আরও কিছু গুণের উল্লেখ আছে; যেমন, তিনি এক, মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান, সূক্ষ্ম ইত্যাদি।[৩৭১] সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্বন্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে জড় ও আধ্যাত্মিক জগৎ এবং এর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা হলেন আহুরা মাজদা, তিনি প্রকৃতির নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং সমস্ত সৃষ্টি ঐ নিয়মানুসারে কাজ করছে।[৩৭২]

সুতরাং এমতে ঈশ্বর গুণময় যদিও এমতে ঈশ্বরকে অতিবর্তী হিসেবে মনে করা হয়েছে। আধুনিক ধর্মমতে ঈশ্বরের অতিবর্তিতা গ্রহণযোগ্য নয় কেননা এমত দ্বারা ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব ক্ষুণ্ন হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধধর্ম প্রথম পর্যায়ে হীনযান ও মহাযান –এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন। এঁরা গৌতম বুদ্ধে পরমেশ্বরের গুণাবলী আরোপ করেন। তবে সাধারণত যে ঈশ্বরের ধারণা ঈশ্বরবাদী মতগুলোতে আছে গৌতম বুদ্ধ সে অর্থে ঈশ্বর নন বলে অনেকের ধারণা।[৩৭৩] তবে যে কোন অর্থেই গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বর বলা

---

[৩৭০] প্রণব পাঁচটি- ও, ওঁ ,ওং , বম্ ও ওঁং । অ উ ম্ বা অ আ উ ঊ ম্ এই অক্ষরসমূহ সহযোগে এই প্রণব সমূহের উৎপত্তি। 'অ' অর্থ পালনকর্তা 'আ' অর্থ সৃষ্টিকর্তা 'উ' অর্থ প্রলয়কর্তা 'ঊ' অর্থ রক্ষক, ম্ (বা s) অর্থ গুণাতীত ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম (নির্গুণ ব্রহ্ম)। প্রণবের u কোন পৃথক বর্ণ নয়। অ আ উ যখন অননুনাসিক তখন 'ও' হয় আর এই তিনটি যখন অনুনাসিক তখন ওঁ প্রণবের উৎপত্তি হয়। 'ও' তমোগুণাত্মক প্রণব বলে শাস্ত্রে এর ব্যবহার দেখা যায়না। ওঁ, ওং এ দুটি প্রণবের অধিক ব্যবহার দেখা যায়। 'বম্' প্রণবের ব্যবহারও দেখা যায়। ওঁs প্রণবের ব্যবহার প্রচলিত গ্রন্থসমূহে অধিক দেখা যায়না। তন্ত্র শাস্ত্রের কোথাও কোথাও এই প্রণবের ব্যবহার আছে। অধিকারী ভেদের কারণেই ভিন্ন ভিন্ন প্রণবের ব্যবহার দেখা যায়। দ্রষ্টব্য : আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-নিত্যকর্ম, সত্যধর্ম মহামন্ডল, বাংলাদেশ ১৩৮৯ বাং (৭ম সং) পৃ. ৪৭-৬৩।

[৩৭১] দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, *Comparative Religion*, পৃ. ৯২

[৩৭২] দ্রষ্টব্য, Dr. H.K. Mirza, Zoroasthrianism, Religions of India, Clarion Books, Delhi, 1983, p.185-186

[৩৭৩] It is doubtful whether the Budhists would take the Budha as God in the same theistic sense in which God is regarded as creator, the sustainer, the destroyer of the world. It seems that instead of taking him as the creator etc. the Budhists for the most part worship him as an

হোক, তাঁকে যখন অর্চনা করা হয়, যখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়, তখন তাঁকে ঈশ্বরের গুণে গুণান্বিত করা হয়। আর, এরকম বিশেষ অর্থে তাঁকে ঈশ্বর মনে করলে সাকারবাদ ও দেববাদ এসে পড়ে। বৌদ্ধ কোষকার অমর সিংহ তাঁর গ্রন্থের প্রথমে লিখেছেন যে, 'যিনি অগাধ জ্ঞানসিন্ধু ও দয়াসিন্ধ এবং যার অনঘ গুণসমূহে আছে, হে ধীরগণ- আপনারা সেই অক্ষয় (বুদ্ধ)কে শ্রী ও অমৃতের নিমিত্ত সেবা করুন। 'বৌদ্ধ দূর্গ সিংহ তাঁর' কাতন্ত্র- বৃত্তির প্রথমে বুদ্ধকে সর্বজ্ঞ সর্বদশী ইত্যাদি রূপে নির্দেশ করেছেন। এসব জায়গায় গৌতম বুদ্ধে পরমেশ্বরের গুণাবলী আরোপ করা হয়েছে।সুতরাং এমতে ঈশ্বর গুণময়; যদিও এঁরা দেহধারী মানুষ গৌতম বুদ্ধে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন।

ইহুদী খ্রীষ্টিয় ধর্ম

বাইবেলে ঈশ্বরের সগুণ অবস্থার বর্ণনা দেখা যায়। বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় ঈশ্বরের নানা গুণের বর্ণনা আছে। যেমন, ঈশ্বর প্রেম,[৩৭৪] ঈশ্বর জ্যোতি,[৩৭৫] ঈশ্বর আদি ও অন্ত,[৩৭৬] ঈশ্বর প্রভু ও মঙ্গালময়,[৩৭৭] বিচারকর্তা সর্বশক্তিমান,[৩৭৮] সৎ,[৩৭৯] সিদ্ধ[৩৮০] ইত্যাদি। ইহুদীধর্মে ঈশ্বরের ধারণায় যে গুণগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি হচ্ছে, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, শাসক, নিয়ন্তা, পবিত্র, ন্যায়পর ইত্যাদি। [৩৮১]

জন হিক ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনায় তার অনেক গুণের উল্লেখ করেন; যেমন ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, অনন্ত, পবিত্র, প্রেমময় ইত্যাদি।[৩৮২] ইহুদীধর্মে ঈশ্বরের পবিত্রতা (Holiness) গুণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।[৩৮৩] খ্রীষ্টিয় ধর্মের ঈশ্বর শাশ্বত, স্বয়ম্ভু, অসীম, ভুল-ভ্রান্তি-অন্যায়ের উর্দ্ধে, তিনি কারো উপর নির্ভরশীল নন।[৩৮৪] কিন্তু এসকল গুণ ঈশ্বরে কি রকমভাবে আছে, তা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। ঈশ্বরের গুণগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে- (১) পরাতাত্ত্বিক, (২) নৈতিক। বস্তুতঃ সৃষ্টিতে গুণের কাজ দেখেই এরকম বিভাগ করা হয়। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, ইত্যাদি গুণগুলো পরাতাত্ত্বিক আর ন্যায় বিচারক, দয়াময়, প্রেমময়, করুণাময় ইত্যাদি গুণগুলো নৈতিক।[৩৮৫]

এভাবে গুণ আরোপের ফলে ঈশ্বরকে মানবীয় উচ্চতর ধারণায় নিয়ে যাওয়া হয়; তাঁতে ব্যক্তিত্ব

---

embodiment of holiness and compassion and as a great spiritual leader and savior of mankind. দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

[৩৭৪] বাইবেল ১ যোহন ৪:৮

[৩৭৫] ঐ ঐ ১ : ৬

[৩৭৬] ঐ প্রকাশিত ১ : ৮

[৩৭৭] ঐ ১, পিতর ২ : ৩

[৩৭৮] ঐ প্রকাশিত ১৮ : ৮

[৩৭৯] ঐ মথি ১৯ : ১৭, মার্ক ১০ : ১৭-১৮

[৩৮০] ঐ ঐ ৫ : ৪৮

[৩৮১] "God is (i) creator of all (ii) All-knowing, All-powerful and Eternal (iii) The ruller of History (iv) Sacred and Holy (v) Religious and Just (vi) Merciful and caring toward human beings (vii) The Ultimate good" দ্রষ্টব্য, J.P.Thiroux, *Philosophy-theory and practice*, p.৩৩৬

[৩৮২] John Hick, *Philosophy of Religion,* পৃ. ৭-১০

[৩৮৩] Kedarnath Tewary, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

[৩৮৪] দ্রষ্টব্য, Rev. James Shanks, *Basic Christian Concepts*, পৃ. ২০

[৩৮৫] Kedarnath Tewary, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

আরোপ করা হয়। ফলে অসীম সত্ত্বাকে সীমাবদ্ধ করা হয় এবং এতে ঈশ্বরে নরত্বারোপ এসে পড়ে।[৩৮৬] তবুও সৃষ্টির মানুষ যখন যেমন বুঝেছে, সেভাবেই ঈশ্বরের গুণ বর্ণনা করেছে।

অতএব বলা যায়, বাইবেলে ঈশ্বর সগুণ, বাইবেলে ঈশ্বরের নির্গুণত্ব কোথাও প্রতিপন্ন হয়নি। কিন্তু সেখানে যে বিভিন্ন গুণের উল্লেখ আছে তাতে তাঁর অনন্ত গুণরাশির পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরের যে মাত্র ঐ কয়টি গুণ আছে তাও কোথাও বলা হয়নি। আরও উল্লেখ আছে আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তিনি সব কিছুর নির্মাণকর্তা।[৩৮৭] এই সৃষ্টিতে অনন্ত গুণ দেখে তাঁর অনন্ত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বাইবেলের ঈশ্বর গুণময়; এখানে ঈশ্বর সগুণ।

ইসলাম

ইসলামে আল্লাহর নানা গুণের উল্লেখ আছে। কোরআনে আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ এই নামগুলি তাঁর গুণ প্রকাশক শব্দ। ঐ নিরানব্বইটি ছাড়া কোরআনে আরও ছয়টি নামের উল্লেখ আছে- ঐ সমস্তই আল্লাহ্‌র গুণের নাম। ইসলামের বিশ্বাস অনুসারে 'আল্লাহ্' সৃষ্টিকর্তার সত্ত্বাবাচক বিশেষ্য। এছাড়া আল্লাহ্‌র অন্যান্য যে গুণবাচক ও কর্মবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে সমস্তই আল্লাহ্ নামের মধ্যে নিহিত আছে। আল্লাহ্ নামের দ্বারা একমাত্র সেই অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকেই বুঝায়। আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলিকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র সত্ত্বা-পরিচায়ক নাম আদি, অন্ত, প্রকাশ্য, গোপন, চিরস্থায়ী, মহাশক্তিশালী, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত নাম দ্বারা সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক প্রকাশ করে। যেমন- সৃষ্টিকর্তা, রূপদাতা, জীবনদাতা, করূণাময়, দয়ালু, ক্ষমাশীল ইত্যাদি।[৩৮৮]

আল্লাহ্‌র গুণ সম্বন্ধে ইসলামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য আছে যেমন- মুতাজিলা চিন্তাবিদরা আল্লাহ্‌র সত্তা থেকে পৃথক কোন গুণ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সত্তা থেকে পৃথক নয়, এসব গুণ দ্বারা যা বুঝায় তা আল্লাহ্‌র সত্তারই নামান্তর। বস্তুত; বিচার করলে এমতকেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কেননা যত গুণ আছে সবই আল্লাহ্‌র। সবগুণই আল্লাহ্‌র; আল্লাহ থেকে পৃথক কিছু নাই। সৃষ্টিতে যত গুণ দেখা যায় তাও সব আল্লাহ্‌র সত্তাই প্রকাশ করে। এই গুণগুলিকে বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌কে বোঝা যাবে না। যত দ্রব্য আছে সবই গুণ সমষ্টি। গুণ ছাড়া দ্রব্য নাই। আল্লাহ্‌ও গুণময়। গুণছাড়া আল্লাহ্‌কে বোঝা যায় না সুতরাং গুণগুলি আল্লাহ্‌র সত্তা প্রকাশক। বিভিন্ন মুতাজিলা চিন্তাবিদ এ বিষয়টিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। ওয়াসিল বিল আতার মতে, আল্লাহ্ বিভিন্ন গুণের এক অস্পষ্ট ঐক্য। এখানে অস্পষ্ট ঐক্য বলার কোন সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন গুণের ঐক্য বললেই বিষয়টি অধিকতর পরিষ্কার হতে বলে মনে হয়। আবুল হুদায়েল আল্লাফ-এর মতে আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও তাঁর সত্তা এক ও অভিন্ন। আবু হিসামের মতে, আল্লাহ্‌র গুণাবলী কতগুলি অবস্থা, যা তাঁর সত্তা থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু সত্তার বাইরে অবস্থিত নয়। মোয়াম্মারের মতে, আল্লাহ্‌তে কোন সদর্থক গুণ আরোপ করলে আল্লাহ্‌র অসীম সত্ত্বাকে সীমিত করা হয়। মোয়াম্মারের এমত স্বীকার করা যায় না। বস্তুর অনেক গুণের

---

[৩৮৬] দ্রষ্টব্য, K. Ajdukiewicz, *Problems & theories of Philosophy*, p.151-152

[৩৮৭] বাইবেল, প্রেরিত ৪ : ২৪

[৩৮৮] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮২

মধ্যে একটি কথা বললে অন্যগুলোকে অস্বীকার করা হয় না। বস্তুর কোন গুণ বিচারের সময় অন্যগুলির উল্লেখ করা হয় না বটে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেগুলি বাদ দেয়া হয়।

আশারীয়াপন্থীরা আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে, আল্লাহ্ সমস্ত গুণের আধার। মানুষের ক্ষেত্রে গুণসমূহ যেরূপ, আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সেরূপ নয়। আল্লাহ্ ও সৃষ্ট জীবের গুণাবলীর পার্থক্য গুণগত ও প্রকৃতিগত। আশারীয়াদের এমতও সত্য বলে ধরা যায়। প্রকৃতই মানুষের গুণাবলী ও আল্লাহ্‌র গুণাবলী একরূপ হবার নয়। আল্লাহ্ পূর্ণ মানুষ অপূর্ণ; অপূর্ণে গুণ ধারণারও অপূর্ণতা থাকবে। আল্লাহ্‌তে গুণ পরিপূর্ণভাবে আছে কিন্তু মানুষের গুণ অপূর্ণ। আল্লাহ্ যদি সমস্ত গুণের আধার হন তবে তাঁর গুণ থাকতে পারে এবং আলাদাভাবে তাঁর গুণ চিহ্নিত করা যেতে পারে।বস্তুতঃ মুতাজিলা ও আশারীয়াদের মতের মধ্যে অনৈক্য নাই। আপাততঃ বিরুদ্ধবাদী বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই। হিন্দুশাস্ত্রের সগুণ ও নির্গুণ অবস্থার মত আপাত বিরুদ্ধবৎ বোধ হয়। এঁরা উভয়েই কোরানের আয়াতকে তাঁদের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতের মধ্যে পার্থক্য ধরলে কোরানের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যেকার অসংগতি ধরে নিতে হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্যে কোরানকে দোষ দেয়া চলে না। সুফীগণ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সত্ত্বা স্বীকার করেন না। সুতরাং তাদের চিন্তাধারায় আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে কোন বিতর্ক নাই। আল্লাহ্ থেকে আলাদাভাবে কোন গুণ বোঝা যায় না বা গুণ বাদ দিলে আল্লাহ্ কিছুই হননা। গুণ দ্রব্যের পরিচয় দেয় গুণ ছাড়া দ্রব্য বোঝা যায়না। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর গুণ একই। শুধু সমষ্টিবাচক ও ব্যষ্টি ভাবজ্ঞাপক।

কোরআনে আল্লাহ্‌র নির্গুণত্ব

আল্লাহ্‌র নির্গুণ অবস্থার বর্ণনাও কোরানে আছে, আল্লাহ্‌র মহিমা ভাষার অতীত। কোরানে আছে- ‘সমগ্র জমিনের মধ্যে যত বৃক্ষ আছে তা যদি কলম হয় আর এই সমুদ্রসমূহ ছাড়া আরও যদি সাতটি সমুদ্র কালি হয় তবুও আল্লাহ্‌র প্রশংসা শেষ হবে না।’[৩৮৯] এতে আল্লাহ্‌র অনবধার্য গুণরাশিই বুঝায়। তাছাড়া আরও আছে- যে কোন নামেই তাঁকে ডাকতে থাক, কেননা তাঁর বহু ভাল ভাল নাম আছে।[৩৯০] কোরানে বর্ণিত নাম ছাড়াও আল্লাহ্‌র আরও বহু নাম থাকা সম্ভব। রক্ষণশীল সুন্নীরা কুরাআনের নাম ছাড়া আল্লাহ্‌র আর কোন নাম ব্যবহার করতে নারাজ।

কিন্তু ডঃ আহমদ্ ফুয়াদ আল এহওয়ানী বলেন যে, ‘চিন্তার বিভিন্ন পরিসরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র কতগুলো নতুন নামবাচক বিশেষণের উন্মেষ ঘটেছে।’ দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, দার্শনিকরা আল্লাহ্‌কে আবশ্যকীয় বা অপরিহার্য কিংবা অপরিহার্য সত্তা বা শুধু আদি বলে অভিহিত করে থাকেন। লক্ষণীয় যে, সর্বশেষ বিশেষণটি মহাগ্রন্থ কোরআনে বর্ণিত তাঁর নামগুলিরই একটি। ধর্মবেত্তাগণ আল্লাহ্‌কে আরেকটি বিশেষণে অভিহিত করেন। গুণবাচক এই বিশেষণটি শাশ্বত বা আল ক্বদীম। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দার্শনিক ও ধর্মবেত্তাগণ আল্লাহ্‌কে বিশেষ গুণাবলী সম্পন্ন এক মৌল উপাদান বা শক্তি বলে কল্পনা করেছেন। দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌কে আদি সত্তা, অকৃত্রিম সত্তা ইত্যাদি বিশেষণেও

---

[৩৮৯] কোরআন ১৯/২৭

[৩৯০] ঐ, ১৭/১১০

বিশেষিত করেন।[৩৯১] খ্রীষ্টান ধর্মেও দার্শনিকরা ঈশ্বরে এ জাতীয় বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন।[৩৯২]কোরআনের অধিকাংশ সুরার প্রথমে যে অক্ষরসমষ্টি আছে, সেগুলোকে কোন অর্থহীন অক্ষরসমষ্টি বলে নেয়া ঠিক হবেনা। সম্ভবতঃ এগুলোও আল্লাহ্‌র গুণ প্রকাশক শব্দ। এগুলো সাধারণের বোধের অতীত তাই এগুলোর অর্থ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। হিন্দুধর্মেও এ জাতীয় শব্দ আছে যার অর্থ সাধারণে জানেনা, সাধকরাই কেবল ধ্যান যোগে জেনেছেন।[৩৯৩] সুতরাং কোরআনে আল্লাহ্‌র সগুণ অবস্থার বর্ণনা আছে এবং নির্গুণ অবস্থার ইঙ্গিতও সেখানে পাওয়া যায়।

শিখ ধর্ম

শিখ ধর্মমতে ঈশ্বর সগুণ ও নির্গুণ। গুরু নানক ও অন্যান্য গুরুদের বর্ণনায় ঈশ্বরের সগুণত্ব ও নির্গুণত্বের বর্ণনা দেয়া আছে। কিন্তু সেখানে সগুণ-নির্গুণের মধ্যকার প্রশ্নের মীমাংসা নাই। নির্গুণ (Unattributed) ও সগুণ ঈশ্বর কি একই, যদি তাই হয়, তাহলে কিভাবে সম্ভব- এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাদের বর্ণনায় সমস্যা সমাধানের ঈঙ্গিত নাই। সগুণ ঈশ্বরে তাঁরা যেসব গুণ আরোপ করেছেন সেগুলি হল ঈশ্বর সত্য স্বরূপ, স্রষ্টা, নিরাকার, কাল ও মৃত্যুর অতীত। তিনি এক, দয়াময়, সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী জন্মহীন, বর্ণহীন, স্বয়ম্ভু, মায়ার অতীত।[৩৯৪] এমতে সবিশেষ ও নির্বিশেষ এ দুভাবেই ঈশ্বরের সগুণভাব বর্ণিত হয়েছে। শিখধর্মে ঈশ্বরের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব একইসাথে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।[৩৯৫]

---

[৩৯১] ড. আহ্‌মদ ফুয়াদ আল এহওয়ানী, "ইসলামী দর্শনে পরমসত্ত্বা ও মৌল উপাদানের সংজ্ঞা" ইসলামী দর্শনের রূপরেখা, নূরুল ইসলাম মানিক (সম্পা) ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ১৫-১৬

[৩৯২] এ প্রসঙ্গে, K. Ajdukiewicz বলেন Christian scholastic philosophy makes the concept of God explicit with the aid of the conceptual apparatus taken from the philosophy of Aristotle, describing god as an entity possessing self subsistent being and therefore substantial being and at the same time, as a being distinct from other substances in that, whereas others require a cause in order to exist, it exists by itself without having any cause of its own existence prior to its existence. God is thus ens per et a se existence. দ্রষ্টব্য, K. Ajdukiewicz, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪

[৩৯৩] কোরআনে সুরা ২,৩,২৯,৩০,৩১,৩২ এর প্রথমে আলিম-লাম-মীম, ৪১-৪৬ সুরার প্রথমে হা-মীম ৬৮ সুরার প্রথমে নুন ইত্যাদি, বাইবেলের প্রার্থনার শেষে আমেন, হিন্দু ধর্মে ওঁ ওং ক্লীং হ্রীং ইত্যাদি।

[৩৯৪]"He is father, mother, brother, husband; Ram, Madhu and all names of Hindu scriptures are attributed to Him;He is Rahim, Karim, Pak, Allah Khuda (all Muslim names). He is Sukh-sagar, garib-ul paraste, Sada-and-Sang and so on", দ্রষ্টব্য, Amarjit Singh Sethi & Sutantar Singh, Sikhism and Interfaith Dialogue, Comparative Religion ed. by Amarjit Singh Sethi & Reinhard Pummer, New Delhi 1979, p.105-106

[৩৯৫] "Its conception of the Supreme Being embraces both aspects conceived in Indian philosophy- the Unattributed, Nirguna, and the Attributed, Saguna or Sagun. In its unattributed aspect, which is unknowable and inaccessible by the human mind, the Supreme Being is called par- Brahma to emphasize its inscrutable and mystic character. This Brahma is known in more orthodox Sanskrit terminology as Brahman and is different from the deity Brahma, the creative aspect of the Indian trinity. Guru Nanak preferred to designated the Unattributed Supreme Being by the, Ek Onkar; দ্রষ্টব্য, Gurucharan Singh Talib, Sikhism, Religions of India, Clarion Books, Delhi, 1983, p.154

কেদারনাথ তিওয়ারী লিখেছেন-When god is not related to world through creation, he is Nirguna, in the sense that he is unconditioned, devoid of ordinary attributes and completely beyond the range of human comprehension. He then by his own will becomes Saguna by revealing himself in the form of the world. দ্রষ্টব্য, Kedarnath Tewary, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবাত্মা সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথের মত

আচার্য গুরুনাথ প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব অনুসারে, পরমপিতা স্বীয় অংশ জড়জগতের সাথে সংযুক্ত করেছেন, এই সংযুক্ত অংশই জীবাত্মা নামে অভিহিত।[১] আরও বলা হয়েছে যে, উপাসনা না করলে আত্মা নিস্তেজভাবে থাকে।[২] সুতরাং আত্মা বা জীবাত্মা উপাসনা করে।[৩]আচার্য গুরুনাথ তাঁর তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে উপাসনা কি-এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।দ্বিতীয় অধ্যায়ে কার উপাসনা করতে হবে অর্থাৎ উপাস্য কে, তা নির্ণয় করেছেন। সেখানে তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, জগদীশ্বর একমাত্র উপাস্য। জগদীশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মত তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব অধ্যায়ে সে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে কে উপাসনা করবে অর্থাৎ উপাসক কে-তিনি এ আলোচনা করেছেন।সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, জীবাত্মাই উপাসক; জীবাত্মা পরমাত্মা বা জগদীশ্বরের উপাসনা করে। তিনি উপাসক জীবাত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন,এ অধ্যায়ে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

তাঁর মতে, জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, চৈতন্যবান পদার্থের মত যখন জীবের ক্রিয়া দেখা যায়, তখন স্বীকার করতে হয় যে, দেহের মধ্যে কোন চেতন পদার্থ আছে। এ কথার পূর্বপক্ষ হতে পারে যে, চেতনের মত ক্রিয়া দেখলেই তাকে চেতন বলা যায়না। ঘড়ির কাঁটার গতি চেতনের মত; আর কোনও ঘড়ি কয়েকদিন পর, কোনও ঘড়ি আরও কিছুদিন পর ক্রিয়াশূন্য হয়। সেরকম মানবদেহে যে ক্রিয়া দেখা যায়, সে ক্রিয়াও কিছুদিন পর বন্ধ হয়। অতএব যদি ঘড়ির চৈতন্য স্বীকার না করা যায় তবে মানুষের চৈতন্য স্বীকার করা যায়না। ঘড়ির চেতনের মত ক্রিয়া যেমন মানুষের দ্বারা হয়, সেরকম মানুষের চেতনের মত ক্রিয়া জগদীশ্বর দ্বারা হয়। কাজেই চেতনের মত ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের চৈতন্যের প্রমাণ হয়না।এজন্য আচার্য গুরুনাথ প্রথমে জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে এবং পরে জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

---

[১] সত্যধর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১।

[২] ঐ, ঐ, পৃ: ১১।

[৩] স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- সময় আসিতেছে- যখন মহামানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশু শিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মার দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন। (দ্রষ্টব্য, স্বামী বিবেকানন্দ, বেদান্তের আলোকে, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ১৯৮৩ (৩য় সং), পৃ: ৯৬। এখানেও প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মা উপাসনা করে।

জীবাত্মার অস্তিত্ব নির্ণয়

জীবাত্মার অস্তিত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের প্রমাণগুলি গ্রহণ করেছেন এবং পরে তাঁর নিজস্ব যুক্তি বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত: ন্যায়দর্শন মতে :

যেসব বিষয়ের সান্নিধ্যে পূর্বে সুখের অনুভব হয়েছিল সেরকম বিষয় পরে প্রত্যক্ষ হলে তার উপাদান বিষয়ে ইচ্ছা হয়। যিনি পূর্বে কোনও প্রকার পদার্থের সান্নিধ্যে সুখ অনুভব করেছিলেন তিনিই অন্য সময়ে সেই জাতীয় অন্য পদার্থ প্রত্যক্ষ করে তার উপাদান বিষয়ে ইচ্ছা করে থাকেন। এজন্য বলা যেতে পারে, যিনি পূর্বোক্ত ব্যাপারকালে আগে ও পরে ছিলেন এবং যিনি সুখ অনুভবের ও সুখ সাধন পদার্থ বিষয়ের ইচ্ছার কর্তা, এরকম কোন পদার্থ অবশ্যই আছেন। সে জাতীয় পদার্থই দেহী বা জীবাত্মা।

যে জাতীয় পদার্থের সান্নিধ্যে পূর্বে দুঃখের অনুভব হয়েছিল, সে জাতীয় বিষয় প্রত্যক্ষ হলে অর্থাৎ দৃষ্ট,শ্রুত, ঘ্রাত, আস্বাদিত বা স্পৃষ্ট হলে তার উপাদান বিষয়ে দ্বেষ হয়ে থাকে। যে পূর্বে কোন জাতীয় পদার্থের সান্নিধ্যে দুঃখের অনুভব করেছিল, তারই অন্য সময়ে ঐ জাতীয় অন্য পদার্থ প্রত্যক্ষ হলে তার উপাদান বিষয়ে দ্বেষ হয়ে থাকে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, যিনি উক্ত ব্যাপারে আগে-পরে ছিলেন এবং যিনি দুঃখ অনুভবের ও দুঃখ-সাধন পদার্থ-বিষয়ক দ্বেষের কর্তা, তিনিই দেহী বা জীবাত্মা।

এভাবে, পূর্বাপর কাল স্থায়ী এবং সুখ উপলব্ধির ও সুখ-সাধন পদার্থ বিষয়ক প্রযত্নের কর্তা হিসাবে জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আবার পূর্বাপর কাল স্থায়ী এবং সুখাদি অনুভবের ও সুখ সাধন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের কর্তা হিসাবে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। এ কারণে নৈয়ায়িকেরা ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান এ ছয়টিকে আত্মার অনুমাপক বলেন।[৪]

দ্বিতীয়ত: বৈশেষিক দর্শন মতে :

জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্মা। আত্মা দুই প্রকার- পরমাত্মা বা ঈশ্বর ও জীবাত্মা। ক্ষিতি ও অঙ্কুরাদির কর্তারূপে ঈশ্বর অনুমেয়। জীবাত্মা মানস প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। 'আমি জানি', 'আমি সুখী' ইত্যাদি রূপ জ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি বিশেষ গুণযোগে জীবাত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়।[৫]

তৃতীয়ত: সাংখ্য দর্শন মতে :

ভোজ্য, শয্যা, ভবন, আসন প্রভৃতি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সাধন করে। এরূপ প্রকৃতি অবধি চরমকার্য পর্যন্ত সমস্ত জড়ই সংহত বা মিলিত গুণত্রয়স্বরূপ বলে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ও পরার্থ। এসব পদার্থ যার প্রয়োজন সাধন করে সেই পরই পুরুষ বা জীবাত্মা। পুরুষ সংঘাতাত্মক হলে সেও পরার্থ হবে, এতে অনবস্থা দোষ ঘটে। ত্রিগুণাত্মক রথাদি সারথী প্রভৃতি চেতন

---

[৪] গুরুনাথ সেনগুপ্ত ,তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা,পৃ,১৭০; দ্রষ্টব্য, S.C. Chatterjee, Indian Philosophy, Calcutta University, 1960, P. 205; রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সং ২০০৪, পৃ: ২৭৬-২৭৭।

[৫] গুরুনাথ সেনগুপ্ত ,তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা,পৃ ১৭২; দ্রষ্টব্য,S.C. Chatterjee, Indian Philosophy,P.229,রমেন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত,পৃ:২৭৭, জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, কলিকাতা ১৯৯৯, পৃ: ১৩৭।

কর্তৃক অধিষ্ঠিত। বুদ্ধি প্রভৃতিও ত্রিগুণাত্মক। অতএব সে সব ও অপর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হবে এবং সেই অপর অবশ্যই চেতন হবে কারণ চেতনের আশ্রয় ছাড়া অচেতন কাজ করতে পারেনা। সেই অপর বা চেতনই আত্মা। দ্রষ্টার অভাবে দৃশ্য হতে পারেনা। কাজেই বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্যের দ্রষ্টা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সেই দ্রষ্টাই জীবাত্মা।

সকলেই সুখ চায়- কেউই দুঃখ চায়না। বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় কার্যই সুখ-দুঃখাত্মক; এজন্য এদের সুখে প্রযত্ন ও দুঃখে দ্বেষ হতে পারেনা কারণ তা হলে স্বক্রিয়াবিরোধ হয়ে পড়ে। অতএব এমন অন্য কোন পদার্থ আছে যার সুখে প্রযত্ন ও দুঃখে দ্বেষ আছে; সেই পদার্থই জীবাত্মা।[৬] আগুন সংযোগে লৌহপিন্ড আগুনের মত মনে হয়, সেরকম পুরুষযোগে বুদ্ধি প্রভৃতিও চেতনের মত মনে হয়। বাস্তবিক, তারা অচেতন ও সুখ-দুঃখাত্মক। একারণ সুখে প্রযত্ন ও দুঃখে দ্বেষ বুদ্ধি প্রভৃতির হতে পারেনা। যদি হয় তবে সুখময়ত্ব ও দুঃময়ত্ব যার ধর্ম তাকে সুখে প্রযত্নকারী ও দুঃখে দ্বেষকারী কিরূপে বলা যাবে। এজন্য স্বক্রিয়া-বিরোধী নামক দোষ হয়।[৭]

চতুর্থত: পাতঞ্জল দর্শন মতে

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক(পরিণাম), আশয়(ইচ্ছা) এ চার বিষয়ে যিনি অপরামৃষ্ট (অনভিভূত) সেই পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর। আর জগতে দেখা যায় যে, প্রায় যাবতীয় পুরুষেই ঐ চারটি থাকে। চেতন ছাড়া অন্যে ঐ চারটির সত্ত্বা থাকতে পারে না। অতএব যে পুরুষ ঐ চার বিষয়ে পরামৃষ্ট(অভিভূত) তিনিই জীবাত্মা।[৮]

ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন মতে প্রমাণ দেবার পর তিনি অন্য একটি প্রমাণ দিয়েছেন। জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ বলছেন- ইন্দ্রিয়ার্থে (ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন যে সব বিষয়) সন্দেহ হতেও পারে কিন্তু সেই সন্দেহকারী অহং বাচ্য পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ হতে পারেনা।[৯] কেননা অহংবাচ্য পদার্থের অভাবে কে সন্দেহ করবে? এই জীব-সংজ্ঞক আত্মা ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রাহক ও চৈতন্যবিশিষ্ট, জীবত্ব ধ্বংস হলে এ আত্মা পরমাত্মত্ব প্রাপ্ত হয়। কারণ সাধনা প্রভাবে ভিন্ন রাশির অর্থাৎ ভগ্নাংশের অখন্ড আকারে পরিণতি হয়ে থাকে।[১০]

ইন্দ্রিয়, কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এ পাঁচটি জ্ঞান সাধন বহিরিন্দ্রিয়। এদের অর্থ অর্থাৎ

---

[৬] গুরুনাথ সেনগুপ্ত ,তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা,পৃ,১৭৩; দ্রষ্টব্য, S.C. Chatterjee, *Indian Philosophy*, P. 265, ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা-১৭, রমেন্দ্র নাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, পৃ: ১৪৯।

[৭] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ১৭৪ পাদটীকা।

[৮] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা,পৃ ১৭৪; দ্রষ্টব্য,S.C. Chatterjee, p, *Indian Philosophy*. 308, সাংখ্য কারিকা-২০, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৮।

[৯] শংকরাচার্য শারীরক ভাষ্যে এ রকম একটি যুক্তি দিয়েছেন(শংকরভাষ্য ১/১/১)। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দর্শনে ডেকার্ট অনুরূপ একটি যুক্তি দিয়েছেন। Rene Descartes, তাঁর বিখ্যাত উক্তি (I Think Therefore I exist) "Cogito ergo sum" দ্বারা সন্দেহকারীর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, তাঁর Methodical doubt এর মাধ্যমে। (দ্রষ্টব্য, Frank Thilly, *A History of Philosophy*, N. York, 1956, P. 304-305) তবে গুরুনাথের এই যুক্তির সাথে Descartes-এর যুক্তির কিছু পার্থক্য আছে। এখানে আত্মা (অহং)ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রাহক, চৈতন্যবিশিষ্ট। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য Descartes মনকে চৈতন্যবিশিষ্ট বলেছেন। অর্থাৎ মন ও আত্মা এক। কিন্তু এ যুক্তিতে মন ও আত্মা এক নয়; চৈতন্য মনের ধর্ম নয় ,আত্মার ধর্ম। মনের ধর্ম সংশয়।

[১০] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ১৭৫।

বিষয় যথাক্রমে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। এখন ইন্দ্রিয়ার্থে কিভাবে সন্দেহ হতে পারে আচার্য গুরুনাথ তার বর্ণনা করেছেন যেমন-

আমি যা শুনছি অন্যে হয়ত তা শুনছেনা অথবা অন্যে যা শুনছে হয়ত আমি তা শুনছিনা বা অন্যরূপ শুনছি। কাজেই অন্যের শ্রুত শব্দ সম্পর্কে আমার সন্দেহ হতে পারে। এরকম অন্যে যা দেখছে আমি হয়ত তার কিছুই দেখছিনা বা অন্যরূপ দেখছি। অথবা আমরা যা দেখছি যুক্তি দিয়ে তা যে সেরকম নয় তা প্রমাণ করা যাচ্ছে। এরূপ অবস্থায় দৃষ্ট বিষয়ে সন্দেহ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু দ্রষ্টা যে আমি, আমার অস্তিত্বে সন্দেহ হওয়া অসম্ভব কারণ এই অহং-বাচ্য পদার্থের অভাবে কে সন্দেহ করবে? অতএব জানা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রাহক এক পদার্থ অবশ্যই আছে, তা-ই জীবাত্মা। এ জীবাত্মার যখন জীবত্ব-ধ্বংস হবে তখন সে পরমাত্মত্ব প্রাপ্ত হবে এবং সাধনা দ্বারা ঐ ভগ্নাংশ অখন্ড আকারে পরিণত হতে থাকবে। এ আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ, এর চৈতন্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এ আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, মস্তিস্ক বা প্রাণ (জীবনীশক্তি) নয়।[১১] গুরুনাথ ক্রমশঃ এ বিষয়গুলিরও প্রমাণ দিয়েছেন।[১২]

আত্মা শরীর বা ইন্দ্রিয় নয়। কারণ শরীরে আঘাত লাগলেও বিষয় ইন্দ্রিয়-প্রবিষ্ট হলেও যদি অন্যমনস্ক থাকা যায় তবে ঐ উভয়ের অনুভব হয়না। প্রাচীনদের মতে চৌদ্দ বৎসর এবং নব্যদিগের মতে সাত বছর গত হলে শরীর ও মস্তিস্কের সব উপাদানের পরিবর্তন হয় কিন্তু স্মৃতি প্রভৃতি ভাব পরিবর্তিত হয়না। অতএব স্মৃতি প্রভৃতি ভাব যাতে থাকে সে আত্মা শরীর বা মস্তিস্ক নয়। কিন্তু তা চৈতন্যবিশিষ্ট। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ করণ, আত্মা কর্তা। অতএব আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মস্তিস্ক থেকে ভিন্ন চৈতন্যবিশিষ্ট এক সত্ত্বা।

জীবনীশক্তি বা প্রাণ আত্মা থেকে ভিন্ন। কেননা আত্মার ধর্ম চৈতন্য, তা প্রাণের ধর্ম নয়। কারণ প্রাণ-ধর্ম চৈতন্য হলে শ্বাস প্রভৃতি প্রাণ-কার্যগুলি চৈতন্যের অভাবে হতে পারতোনা। অতএব বলা যেতে পারে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মস্তিস্ক ও প্রাণ থেকে পৃথক কোন চৈতন্যময় পদার্থ এ দেহের মধ্যে আছে, যা জীবাত্মা। জীবাত্মা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ-রসাদির অনুভব করে অর্থাৎ জীবাত্মা বহিরিন্দ্রিয়ে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে তন্ময় হয়ে রূপাদি বিষয়ের অনুভব করে আবার সেরকম অন্তকরণের সাথে তন্ময় হয়ে সংশয়, নিশ্চয় স্মরণাদি বিষয়ও সংসাধন করে থাকে।

অন্তকরণ চারভাবে বিভক্ত। যথা- মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। এদের বিষয় যথাক্রমে সংশয় নিশ্চয়, গর্ব ও স্মরণ। অন্তকরণ আত্মার কার্যক্ষেত্র। আত্মা ও অন্তকরণের ভেদ জ্ঞানীগণ অনুভব করে থাকেন।[১৩] যখন কোন ব্যক্তি কিছু জপ করতে করতে অন্যমনস্ক হন তখনও জপকাজ চলতে থাকে, কিন্তু

---

[১১] ন্যায়দর্শনে এরকম যুক্তি আছে তবে ন্যায় দর্শনমতে আত্মার স্বরূপগত গুণ চৈতন্য নয়। চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। আত্মা মুক্ত হলে চৈতন্য থাকেনা। দ্রষ্টব্য, S.C. Chatterjee, *Indian Philosophy*, P. 204.

[১২] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১৭৭-১৭৯।

[১৩] বেদান্ত কারিকায় আছে-

মনোবুদ্ধি রহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।

সংশয়া নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়াইমে।

অন্তকরণ মাত্মন কার্যক্ষেত্রম্। আত্মান্তঃকরণয়ো ভেদে জ্ঞানহীনানা

মপ্রতীতেহপি বহুষু বিষয়েষু জ্ঞানিভিস্তু স ভেদঃ প্রতীয়তে।

কতবার জপ করা হল তা ঠিক করা যায়না। এর দ্বারা আত্মা ও অন্তকরণের কাজের ভেদ লক্ষ্য করা যায়। ইচ্ছা আত্মার কাজ ও প্রবৃত্তি অন্তকরণের কাজ। আত্মা যখন অন্তকরণের সাথে তন্ময় অবস্থায় থাকে তখন তারও প্রবৃত্তি থাকে। জীবাত্মার সব কাজ তিনকরম- জ্ঞান, ভোগ ও কর্ম; এ কারণে জীব জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্তা। আত্মা চৈতন্যাত্মক, শরীর জড়াত্মক। এ উভয়ের যোগ কি করে হয়- সে বিষয়ে আচার্য গুরুনাথ সৃষ্টি-প্রকরণে আলোচনা করেছেন।

জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথ

জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথ বলছেন- অনাদি অনন্ত অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময় পরমেশ্বরের যে অংশ, কারণ-সূক্ষ্ম-স্থূল নামক ত্রিবিধ দেহত্রয় সম্পন্ন এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে দেহে বদ্ধ, তাই 'জীবাত্মা' বলিয়া অভিহিত। জীবাত্মা বিবিধ পাশে বদ্ধ বলিয়া সে যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তাহা বিস্মৃত অধিকন্তু দেহেই আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন। পাশমুক্ত ও গুণাতীত হইয়া আত্মস্বরূপ লাভ করাই জীবাত্মার চরম কার্য।[১৪]

তাঁর মতে, আত্মস্বরূপ লাভ বা মুক্তি, কাজ না করে কেবল চিন্তামাত্রে লাভ করা যায়না। এজন্য বিবিধ গুণ লাভ ও শক্তি লাভ করা দরকার। উপাসনা ও সাধনা দ্বারা এই শক্তি লাভ হয়। জীব সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণে দেহে বদ্ধ। কিন্তু এ তিন গুণ সবদেহে সমান নয়। বৃক্ষ লতা গুল্ম, পর্বত নদী প্রভৃতির দেহ তমঃ প্রধান, কীট পতঙ্গ পক্ষী ও পশু প্রভৃতির দেহ রজস্তমঃ প্রধান এবং মানুষের দেহ রজঃ প্রধান। রজোগুণ চঞ্চল ও চালক বলে সে অনুসারে কাজ করতে করতে যখন সত্ত্বগুণের সবিশেষ উদ্রেক হয়, তখনই মুক্তি লাভের ইচ্ছা জন্মে। চৈতন্যাংশ দেহে বদ্ধ হয়ে নিজের জ্ঞানময়ত্ব হারিয়ে ফেলে। তখন তার বোধ বুদ্ধিতে পরিণত হয়। বুদ্ধির উৎপত্তির সাথে সংশয়াত্মক মনের উৎপত্তি হয়। তখন এটি কর্তব্য কিনা এরকম ভাব আসে। অমনই অহংকার উৎপন্ন হয়ে লুপ্ত স্মৃতির আভাস যোগে আমি করতে পারি ইত্যাদি অভিমানের সঞ্চার করে। এ বুদ্ধি, মন, অহংকার ও চিত্ত ত্রিগুণময়, কাজেই এরা জড়বর্গের অন্তর্গত। ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধিকে সত্ত্বময়ী করতে পারলে, মনকে স্থির ও একাগ্র করতে পারলে এবং অহংকারের অসারতা ধারণা করতে পারলে সত্ত্বময়ী স্বচ্ছ বুদ্ধিতে আত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হবে। তখনই স্বরূপ অবস্থা লাভ করার জন্য যত্ন উপস্থিত হবে এবং অসার পদার্থ ত্যাগ করে সারাৎসারের প্রতি প্রযত্ন হবে। এ অবস্থায় উপনীত হতে পারলে অচিরে মুক্তিলাভ হবে।

তাঁর মতে, জীবের সমস্ত কাজ জ্ঞান কর্ম ও ভোগ-এর কোন না কোনটার অন্তর্গত। এ কারণে বলা যায় জীব জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা। জীবের এ জ্ঞান, কর্ম ও ভোগ চৈতন্যের সাহায্যে সম্পন্ন হয় এজন্য বলা যায়, জীব চৈতন্যস্বরূপ। কাজেই জীব নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপের অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের অংশ। অতএব জীবের পক্ষে ঐ অংশের পূর্ণতা সাধনই শেষ উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জীবত্ব-ধ্বংস অর্থাৎ জীবভাবের লয় অবশ্য কর্তব্য। আবার মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদিত না হলে জীবভাবের লয় হয়না। অতএব মানুষের প্রথম কর্তব্য তার জন্মের সার্থকতা সম্পাদন, দ্বিতীয় কর্তব্য জীবত্ব ধ্বংস বা পরমাত্মত্ব লাভ এবং তৃতীয় কর্তব্য ভগ্নাংশের অখন্ড আকারে পরিবর্তন সাধন অর্থাৎ ঐ অংশভূত পরমাত্মার পূর্ণ

---

[১৪] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ২৫৬-২৫৭।

পরমাত্মার সাথে সোঽহং জ্ঞান।[১৫] এ তিনটি কাজ কি কি উপায়ে এবং কি কি প্রকারে সম্পন্ন হতে পারে, সে বিষয়ে আচার্য গুরুনাথ তাঁর তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে (উপাসনা)এবং তত্ত্বজ্ঞান সাধনা বইয়ে বিভিন্ন সাধনার কথা বলেছেন।

জীবাত্মা পরমেশ্বরের অংশ :

এ বিষয়টি আচার্য গুরুনাথ সৃষ্টিপ্রকরণে আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ করলেও তত্ত্বজ্ঞান সাধনা খন্ডে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পরমাত্মার বিবংহয়িষা অর্থাৎ নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করার ইচ্ছা অথবা পরীচিক্ষিষা অর্থাৎ তাঁর অনন্ত গুণের মধ্যে কোন গুণ প্রধান তা পরীক্ষা করার যে ইচ্ছা[১৬]- এ ইচ্ছাই তাঁর সৃষ্টির প্রকৃতি।

পরমাত্মার প্রেম, জ্ঞান প্রভৃতি যে অনন্ত গুণ আছে, তার মধ্যে প্রেম প্রধান, না জ্ঞান প্রধান না অন্য কোন গুণ প্রধান তা পরীক্ষাই এ সৃষ্টি। এ জন্য তিনি প্রত্যেক জীবাত্মাকে এক একটি প্রধান গুণ দিয়েছেন অর্থাৎ কোন একটি গুণ খুব বেশী পরিমাণে দিয়েছেন কিন্তু গড়ে সকলকে তুল্যগুণবিশিষ্ট করেছেন।[১৭] বর্তমানে যাঁরা উন্নত তাঁরা প্রথম জন্মে যেরূপ গুণবিশিষ্ট হয়ে জন্মেছিলেন বর্তমানে যাঁরা অবনত তাঁরাও প্রথম জন্মে গড়ে সেরকম গুণ বিশিষ্ট হয়েই জন্মেছেন।পৃথিবীতে যে সকল ধর্মসংস্কারক ও পন্ডিতদের কথা জানা যায়, তাঁরা প্রথম জীবনে গড়ে যেরূপ গুণবিশিষ্ট হয়ে সৃষ্টি হয়েছেন, গারো সাঁওতাল প্রভৃতি জাতীয়গণও প্রথমে গড়ে সেরকম গুণবিশিষ্ট হয়েই সৃষ্ট হয়েছে।

সুতরাং প্রথম সৃষ্টিতে ব্যতিক্রম জন্য পরম পুরুষে পক্ষপাতিত্বের কোন আশংকা থাকছেনা। কেননা ঐ সব গুণের মধ্যে কোন একটি গুণের অনন্তাভিমুখী উন্নতি হলেই সাধক একত্বপ্রাপ্ত[১৮] ও মুক্ত হতে পারেন। এভাবে একটি একত্ব প্রাপ্ত হলে অন্যান্য গুণে একত্ব প্রাপ্তি সহজ হয়। পরম পুরুষের পূর্বোক্ত ইচ্ছা থেকে অব্যক্তের উৎপত্তি হয়।জগতের নির্বিশেষ মূল উপাদানের নাম প্রকৃতি বা প্রধান। এর অন্য নাম অব্যক্ত। সৃষ্টির পূর্বে জগত অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে লীন থাকে, সৃষ্টিকালে নামরূপাদি প্রাপ্ত হয়ে ব্যক্ত হয়। সাংখ্যের মূল প্রকৃতিকেও অব্যক্ত বলা হয়। আচার্য গুরুনাথের মতে, অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত

---

[১৫] দ্রষ্টব্য, ঐ ঐ, পৃ: ২৬০। এ বিষয়ে পাদটীকায় আচার্য গুরুনাথ বলেছেন যে, দেহবদ্ধ চৈতন্যাংশ পূর্ণ পরম চৈতন্যস্বরূপকে অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান করতে পারে কিন্তু সমর্ণ অভেদ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ সোঽহং জ্ঞান নিজ চেষ্টায় কখনও করতে পারেনা। এ বিষয়ে তিনি তত্ত্বজ্ঞান সাধনা বইয়ের 'অভেদ জ্ঞান' অংশে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ২৯৪)

[১৬] আচার্য গুরুনাথ এ স্থলে মন্তব্য করেন যে, যে সব মহাত্মারা নানাগুণে উন্নত তাঁরাও সময়ে সময়ে নিজের কোন গুণ প্রধান সে পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষা যে পরম আনন্দ দেয় তা ঐ অবস্থাপন্ন সাধকগণ জানেন (তত্ত্বজ্ঞান সাধনা, পৃ: ৪২)

[১৭] পরমাত্মা তাঁর সমস্ত অংশেই অনন্তগুণ অতি অল্প পরিমাণে এবং কেবল কোন একটি গুণ বেশী পরিমাণে দিয়েছেন। যেমন কেউকে প্রেম, কেউকে নির্ভরতা, কেউকে জ্ঞান ইত্যাদি বেশীভাবে দিয়েছেন। এরূপ গুণসম্পন্ন ঐ অংশের মধ্যে কে কিরূপ তাতে তন্ময় হতে পারে- এই-ই পরীক্ষা, এ জন্যই সৃষ্টি। মূলকথা এ পরীক্ষা বা সৃষ্টি লীলাময়ের লীলা মাত্র। (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২৬২)

[১৮] আচার্য গুরুনাথের মতে, একত্ব এক প্রকার মুক্তি। জগদীশ্বরের যে অনন্ত গুণ আছে, তার মধ্যে কোন গুণে অনন্তত্ব লাভ করাকে একত্ব বলে। কেননা ঐ গুণে সে জগদীশ্বরের সাথে এক হল। আর্যশাস্ত্রে এরকম পুরুষ 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু একত্বপ্রাপ্ত সাধক দেখে তাকে জগদীশ্বরের তুল্য মনে করা ঠিক নয়। কেননা অনন্ত গুণনিধি জগৎপতির অনন্ত গুণের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কোটি কোটি গুণেও একত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহলেও ঐ কোটি কোটি গুণে একত্বও অনন্ত একত্বের কণামাত্র ছাড়া আর কিছু না। বিশেষতঃ পরমেশ্বর অনন্ত একত্বের একত্বস্বরূপ। মানব অনন্ত একত্ব প্রাপ্ত হলেও তাঁর তুল্য হতে পারেনা। কেননা সেই অনন্ত একত্বের যে একীভবন, তা-ই জগদীশ্বরের স্বরূপ। জীবের পক্ষে স্বপ্রযত্নে অনন্ত একত্ব লাভই অসম্ভব, তাতে আবার অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ যে একান্ত অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য (দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৫৯-৬০)।

সাকারত্ব গুণের একত্বে যে গুণ হয় তা-ই অব্যক্ত। অব্যক্ত থেকে ক্রমশঃ ব্যোম, বায়ু, তেজঃ জল ও ভূমি উৎপন্ন হয় এবং এ পাঁচটি পঞ্চীকৃত হলে তা দ্বারা ভোগায়তন শরীর জন্মে।[১৯]

উল্লেখিত শরীরসমূহে চৈতন্যাংশের এরূপ গুণান্বিতভাবে প্রকাশ হলেই বর্তমান সৃষ্টির বিকাশ ঘটে। সুতরাং বলা যেতে পারে জীবাত্মা পরামাত্মার অংশ। এ অংশ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় অথচ সেভাবেই প্রকাশ পায়। যেমন দেহের অঙ্গ হাত, পা, এরা দেহ থেকে আলাদা নয় অথচ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। এরা সকলেই এক জীবেচ্ছা সম্পাদক। সেরকম জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে বা অন্য জীবাত্মা থেকে আলাদা না হয়েও আলাদাভাবেই আভাসমান মাত্র। যেমন বিভিন্ন দেশ একই পৃথিবীর অংশ অথচ ভিন্ন ভিন্ন সীমায় এরূপ বদ্ধ যে ভিন্ন বলে মনে হয়। সেরকমই পরমাত্মার অংশসমূহের প্রভেদ। গুরুনাথ এ উদাহরণ দিয়ে আবার বলছেন যে, সান্ত পদার্থ দ্বারা অনন্তের সম্পূর্ণ উপমা হতে পারেনা।[২০]

জীবদেহ/জীব শরীর

গুরুনাথের মতে, জীবাত্মার শরীর[২১] তিন প্রকার- স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। প্রথমে কারণ শরীরের উৎপত্তি, তারপর তা থেকে সূক্ষ্ম শরীর এবং তারপর সূক্ষ্ম শরীর থেকে স্থূল শরীরের উৎপত্তি হয়েছে ও হচ্ছে। আবার স্থূলের লয়ে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মের লয়ে কারণ এবং কারণ শরীরের লয়ে পূর্ণভাবে মুক্তি। স্থূলে কার্যসম্পাদনী শক্তি সবচেয়ে বেশী। সূক্ষ্মে তার চেয়ে কম। এমনকি এমন অনেক কাজ আছে যা কেবল স্থূলেই সম্পন্ন হতে পারে। সূক্ষ্মে বা কারণে হতে পারে না। আবার সূক্ষ্মের চেয়ে কারণে কার্যসম্পাদনী শক্তি আরও কম। আবার অন্যদিকে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে বহু রকমের শক্তি বেশী এবং সূক্ষ্ম অপেক্ষা কারণে আরও বেশী। জীব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এ তিন প্রকার দেহই ধারণ করে আছে। অর্থাৎ জীব একই সাথে তিন প্রকারের তিনটি দেহ ধারণ করে আছে।

স্থূলে অবস্থান করে যতদূর কাজ করতে হবে তা সম্পাদন করতে করতে যখন সে দেহ অকর্মণ্য হয় তখন মঙ্গলময়ের নিয়ম অনুসারে আপনিই জীব তা হতে বের হয়ে যায়। একেই লয় বলে। আত্মহত্যা দ্বারা সূক্ষ্মদেহ লাভ হয় বটে কিন্তু কর্তব্য কাজ সম্পাদনের অভাবের জন্য সূক্ষ্মদেহে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হয় যা কবিরা নানা রূপকে বর্ণনা করেছেন। এ জন্যই আত্মহত্যা মহাপাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শরীর তিন প্রকার কিন্তু তিনটি নয়। এক এক প্রকার শরীর আবার বহু সংখ্যক। যেমন- স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম... ইত্যাদি এবং সূক্ষ্ম সূক্ষতর.. ইত্যাদি। আচার্য গুরুনাথ উল্লেখ করেছেন যে, স্থূল শরীরের সংখ্যা ৩৯৯। সূক্ষ্মশরীরের সংখ্যা পরার্ধ থেকে ৩৯৯ কম এবং কারণ দেহের সংখ্যা অনন্ত।[২২]

---

[১৯] পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হয়ে সমস্ত চেতন অংশের শরীর উৎপাদন করে। প্রতি শরীরে পরমাত্মার চৈতন্যাংশের সংযোগে বৃক্ষ-লতা গুল্মাদি কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষ্যাদি এবং সর্বশেষে নরজাতি উৎপন্ন হয়। এরূপেই দৃশ্যমান সৃষ্টি হয়েছে (দ্রষ্টব্য,গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬১)।

[২০] আচার্য গুরুনাথ তত্ত্বজ্ঞান সাধনা বইয়ে সাধনাসমূহ বর্ণনা করার আগে কিছু অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন। তার প্রথমটি হল অনন্তের উপমা সান্ত পদার্থে সম্পূর্ণ হতে পারেনা। (দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৩৭)।

[২১] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২০৪, (২) ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৪৪-৪৬

[২২] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৪৬

শরীর মাত্রই ত্রিগুণাত্মক হলেও কারণশরীর সত্ত্বগুণ প্রধান, সূক্ষ্মশরীর রজ: প্রধান এবং স্থূল শরীর তমঃ প্রধান। স্থূল দেহে অবস্থান করে কেবল স্থূল দেহের কাজই সম্পন্ন হবে এমন নয়। মহাত্মা সাধকগণ স্থূলদেহে অবস্থান করে স্থূলদেহের যাবতীয় কাজ শেষ করে সূক্ষ্মদেহের কতগুলি কাজও কেউ কেউ সম্পাদন করেন, কেউ কেউ আবার সূক্ষ্মদেহের সব কাজ শেষ করে কারণ দেহের কাজও করতে শুরু করেন। এরাই 'জীবন্মুক্ত' শব্দের প্রকৃত বাচ্য।

আচার্য গুরুনাথের মতে, পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হয়ে সমস্ত চেতন অংশের শরীর উৎপাদন করে।[২৩] তিন প্রকার শরীরই পঞ্চভূতোদ্ভূত। পঞ্চভূতের উপর জ্ঞানশক্তির সঞ্চালনে কারণশরীর, ক্রিয়াশক্তির সঞ্চালনে সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয়েছে। জীবের সমস্ত ব্যাপার জ্ঞান কর্ম ও ভোগ এ তিনভাগে বিভক্ত। জ্ঞানযোগে কারণ শরীর, কর্মযোগে সূক্ষ্ম শরীর এবং ভোগের জন্য স্থূল শরীর। এ জন্যই বলা হয় কারণ শরীর সাধ্য ও সূক্ষ্মশরীর সাধক। কারণ ও সূক্ষ্মশরীরে ভোগ হয় বটে কিন্তু স্থূল শরীরে ভোগের পরাকাষ্ঠা হয়।[২৪] এ তিন প্রকার শরীর পঞ্চভৌতিক হলেও কারণশরীর আকাশ প্রধান সূক্ষ্মশরীর মরুত্তেজ: প্রধান এবং স্থূলশরীর অপ-ক্ষিতি প্রধান।[২৫]

তাঁর মতে জীব সত্ত্ব, রজ: ও তমোগুণে দেহে বদ্ধ কিন্তু এ তিনগুণ সব দেহে সমান নয়। বৃক্ষলতা গুল্ম পর্বত নদী প্রভৃতির দেহ তম: প্রধান, কীট পতঙ্গ পক্ষী পশু প্রভৃতির দেহ রজস্তম: প্রধান এবং মানুষের দেহ রজ: প্রধান। রজ:গুণ চঞ্চল ও চালক বলে সে অনুসারে কাজ করতে করতে যখন সত্ত্ব গুণের সবিশেষ উদ্রেক হয় তখনই মুমুক্ষুত্ব জন্মে।[২৬] 'দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অসীমত্ব' (অর্থাৎ যে গুণ দ্বারা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা একসময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত হতে পারেন, তাহাকে দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অসীমত্ব বলে)[২৭] প্রবন্ধে আচার্য গুরুনাথ এভাবে দেহের বর্ণনা দিয়েছেনঃ

"যা পূর্ণ-পরমাত্মার অংশের আবরণস্বরূপ হয়ে তাঁর অনন্ত অসীমত্বকে অন্তবিশিষ্ট অসীমত্বে উপস্থাপিত করে এবং যার সাথে সংযোগের প্রকার বিশেষ অনুসারে, সৃষ্ট আত্মায় স্থিত পূর্ণ পরমাত্মার সরলগুণের অঙ্কুর নিচয় হতে বিবিধ মিশ্র ও জাতগুণ উৎপন্ন হয়, ফলত: যার সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর বা স্থূলতম অবস্থা আশ্রয় ব্যতীত অংশের অবস্থান অসম্ভব, তাকেই দেহ বলে।[২৮] এখানেই তিনি দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা সম্পর্কে বলছেন, যে আত্মা সরল মিশ্র ও জাত এ ত্রিবিধ বা সরল ও মিশ্র এই দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন অথবা যে আত্মা যে কোনও প্রকার দেহধারী তাকে দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা বলে।[২৯]

এখানে দেহের সংখ্যা বিষয়ে তিনি বলছেন, প্রত্যেক সৃষ্ট আত্মারই দেহের সংখ্যা অনন্ত কিন্তু অনন্ত হলেও ক্রিয়া অনুসারে তিন প্রকার- স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এ তিন প্রকার দেহ প্রেমোৎপন্ন তিন প্রকার গুণের অর্থাৎ তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব -এই তিনগুণের প্রধান আধার। আবার উল্লিখিত তিনটি গুণ মিশ্রাবস্থা

---

[২৩] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২৬১
[২৪] " ঐ, ঐ, পৃ: ২০৫
[২৫] " ঐ, ঐ, পৃ: ২৪৩
[২৬] " ঐ, ঐ, পৃ: ২৫৮, তুলনীয়, শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পৃ: ২৪৭
[২৭] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন, সত্যামৃত, দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অসীমত্ব, পৃ: ৯৯
[২৮] " ঐ, ঐ, পৃ: ৯৪
[২৯] " ঐ, ঐ, পৃ: ৯৬

সমন্বিত হয়ে পাঁচ রকম হয়; যথা- তম:, রজোস্তমমিশ্র, রজ:, সত্ত্বরজোমিশ্র ও সত্ত্ব। অন্যদিকে দেখা যায় দেহের উপাদান কারণ ভূতপদার্থও পাঁচটি এবং দেহও তিন প্রকার হলেও পাঁচ প্রকার যথা- স্থূল, স্থূল-সূক্ষ্মমিশ্র, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মকারণমিশ্র, কারণ। এখন বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত পাঁচ রকম দেহে পাঁচ রকম গুণের বিদ্যমানতা, উৎপত্তির উপাদান কারণ পাঁচ রকম ভৌতিক পদার্থের অনুপাতের বা অভাবের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যেমন, স্থূল দেহের প্রধান উপাদান ক্ষিতি, আর চারটি অপেক্ষাকৃত কম। অন্যান্য দেহের পক্ষেও এরূপ হবে। সুতরাং কারণ দেহের প্রধান (বা একমাত্র উপাদান) ব্যোম, অন্যান্যগুলি অপেক্ষাকৃত ন্যূনতরভাবে থাকে ও পরিশেষে থাকে না। আবার অন্যদিকে দেখা যায়, স্থূলদেহের প্রধান গুণ তমঃ এবং কারণ দেহের প্রধান গুণ বা একমাত্র গুণ সত্ত্ব। উল্লিখিত দেহের মধ্যে স্থূল দেহের সংখ্যা ৯৯, স্থূল-সূক্ষ্মের সংখ্যা ৩০০, সূক্ষ্মদেহের সংখ্যা চতুঃশতোনকোটি, সূক্ষ্ম-কারণ দেহের সংখ্যা কোটি কম পরার্ধ এবং কারণ দেহের সংখ্যা অনন্ত।[৩০]

মানুষ মাত্রেই জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অংশ নয়

গুরুনাথের মতে, সমস্ত ব্রহ্মান্ডই জগদীশ্বরের অংশ। এর মধ্যে কতগুলি সাক্ষাৎ অংশ আর কতগুলি পরম্পরা সম্বন্ধে অংশ, কেননা যাহারা অংশের অংশ ,তাহারাই পরম্পরা-সম্বন্ধে অংশ। । ইহার চৈতন্যাংশ তাঁহার সাক্ষাৎ অংশ, এবং সমস্ত জড় তার অসাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধে অংশ, কারণ জগদীশ্বর হতে যে অব্যক্তের উৎপত্তি হয়েছে, তা হতে সমস্ত জড়ের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর মতে, যাঁরা জীবন্মুক্ত মহাত্মা তাঁরা সকলে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অংশ। কিন্তু সব মানুষ[৩১] তাঁর পরম্পরা সম্বন্ধে অংশ হলেও সাক্ষাৎ অংশ নয়।

জগদীশ্বরের যে অনন্ত গুণ তার প্রত্যেকটি কোমল-কঠিনাত্মক (কঠোর)। সহজে বুঝতে পারব বলে আমরা ঐ গুণগুলিকে দুই দুই ভাগে ভাগ করে নিই। জগদীশ্বরে অনন্ত দয়া (দয়ার পরাকাষ্ঠা) ও অনন্ত ন্যায়পরতা আছে অর্থাৎ অনন্ত দয়া ও অনন্ত ন্যায়পরতার একত্বে যে গুণ হয় তাই আছে; দয়াশূন্য ন্যায়পরতা বা ন্যায়পরতা শূন্য দয়া তাতে নাই। এরকম অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের একত্বে যেগুণ হয় তা তাতে আছে। এরূপ অনন্ত গুণের অনন্ত একত্ব তাঁতে আছে। কিন্ত আমরা দয়া, ন্যায়পরতা,প্রেম, জ্ঞান প্রভৃতি গুণকে জগদীশ্বরের গুণ বলে মনে করি।

এরূপ এক একটি গুণকে যেমন দুই দুই নামে (অর্থাৎ কোমল অংশকে একটি নামে কঠোর অংশকে আর একটি নামে) আখ্যাত করা হয়। সৃষ্টি ক্রিয়াও সেভাবে হয়েছে। কোমল গুণাংশে রমণী

---

[৩০] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যামৃত, পৃ: ৯৪-৯৫

[৩১] গুরুনাথ মানুষকে জীবশ্রেষ্ঠ বলেছেন ((দ্রষ্টব্য, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২৪৪) মানুষ ও অন্য জীবের মধ্যে পার্থক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অন্য জীবগণ তমঃ প্রধান বা রজস্তম প্রধান কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মানুষ সত্বপ্রধান বা রজঃসত্ত্ব প্রধান (দ্রষ্টব্য, ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২৫৩)। মানুষের দেহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জীব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে দেহে বদ্ধ। কিন্তু এই তিনগুণ সব দেহে সমান নয়। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পর্বত, নদী প্রভৃতির দেহ তমঃ প্রধান, কীট পতঙ্গ পক্ষী ও পশু প্রভৃতির দেহ রজস্তমঃ প্রধান এবং মানুষের দেহ রজঃ প্রধান (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ: ২৫৮)। এখানে তিনি বৃক্ষাদিকেও চেতন বলেছেন। তাঁর মতে অনেকে এদেরকে চেতনাশূন্য বলেন। কিন্তু বাস্তবে এদের চেতনা আছে তবে এদের চৈতন্য তমোগুণে এরূপ বদ্ধ যে সাধারণ দৃষ্টিতে অনুভব করা যায় না। আত্মোন্নতি সহকারে সবিশেষ দৃষ্টি দিলে এদের চৈতন্য অনুভব করা যায়। এরাও সুখ, দুঃখ বিশিষ্ট একথা মনুও স্বীকার করেছেন (দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ: ২৫৮)।

জাতির ও কঠোর গুণাংশে পুরুষ জাতির সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে যে পর্যন্ত পুরুষ স্ত্রী জাতীয় কোমল গুণে গুণবান হতে না পারেন বা যে পর্যন্ত স্ত্রী (রমণী) পুরুষ জাতীয় কঠোর গুণে ভূষিত হতে না পারেন সে পর্যন্ত ঐ পুরুষ বা ঐ স্ত্রী জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অংশ বলে পরিচিত হতে পারেন না। বরং সাক্ষাৎ অংশের অংশ বা পরম্পরা সম্বন্ধে অংশরূপে পরিণত হন।

স্ত্রী বা পুরুষ কেউই সাধনা ব্যতিরেকে উক্ত দুই প্রকার গুণ সম্পন্ন (কোমল ও কঠোর) হতে পারেনা। সাধারণত: স্ত্রীজাতিতে কোমল গুণের ও পুরুষ জাতিতে কঠোর গুণের সত্ত্বা দেখা যায়। পরে সাধনা দ্বারা ঈশ্বর-প্রেমের অঙ্কুর প্রকৃত প্রেমে বিগলিত হয়ে যখন স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ গুণের উন্নতি সহকারে অন্যের গুণে বিভূষিত হয় তখন তারা এক অভিনব অবস্থাপন্ন হয়ে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অংশে পরিণত হয়। যেমন, মহাসাগরের একবিন্দু জল। ঐ অংশীভূত জলে মহাসাগরের মত অসীমত্ব ও শক্তিমত্তা প্রভৃতি না থাকলেও তাতে যে তরলতা, স্থান-অবরোধকতা, লবণাক্ততা প্রভৃতি গুণ আছে, সেগুলো মহাসাগরের সমান না হলেও তার সদৃশ, তা বলা যায়। কিন্তু ঐ জল যদি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয় তবে তাতে জলত্ব ধর্ম আর থাকে না। এ কারণে মহাসাগরের একবিন্দু জলকে তার সাক্ষাৎ অংশ বলা গেলেও ঐ বায়ু দুটির একটিকেও তার সাক্ষাৎ অংশ বলা যায় না বরং তার পরম্পরা অংশ বলা যায়।

যদি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে মহাসাগরের অংশরূপে পরিণত করতে হয় তবে একটিকে উপযুক্তভাবে অন্যটির সাথে অভিন্নভাবে মিলাতে হবে তবেই তা জলরূপে মহাসাগরের অংশে পরিণত হবে। এভাবে যেসব নর-নারী এখনও জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অংশে পরিণত হতে পারে নাই, তাদের পক্ষে প্রকৃত প্রেম ও অভেদ জ্ঞান সাধনা দ্বারা অন্যের সাথে একীভূত হয়ে পরম্পরা-সম্বন্ধীয় অংশকে সাক্ষাৎ অংশে পরিণত করতে হবে।[৩২]

জীবাত্মা, জীব, দেহ ও মুক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য দর্শনের মত:

আত্মা সম্পর্কে:

পাশ্চাত্য দর্শনের অনেক ক্ষেত্রে আত্মা ও মনকে সমার্থক বলে গণ্য করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে আচার্য গুরুনাথের সমসাময়িক বৃটিশ ভাববাদী দার্শনিক এফ, এইচ, ব্র্যাডলি(১৮৪৬-১৯২৪) অভিজ্ঞতার জগতের অন্যান্য সবকিছুর ন্যায় অহং বা আত্মসত্তাকে অবভাস বলে প্রমাণ করার প্রয়াস পান।তাঁর মতে,বহুত্ব ও পরিবর্তনের যে সসীম জগৎ তা বিরোধ ও বৈপরীত্যে ভরপুর,এবং স্ববিরোধিতার কারণেই এজগতের কোন কিছুকে আমরা বাস্তব বলতে পারিনা, বাস্তবসত্তার অবভাস বলি।তবে সব অবভাসই বাস্তবসত্তারই অংশ;সুতরাং তাদের অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়া যায়না।তাঁর মতে,সম্বন্ধের জগতের অসংখ্য বস্তুর মধ্যে যে জিনিষটি চিন্তার আধার হিসাবে ব্যাপকভাবে গৃহীত তা হল আত্মসত্তা।কিন্তু চিন্তার আধার ও কর্তা হিসাবে স্থায়ী আত্মসত্তার ধারণা ভ্রমাত্মক;কারণ সম্বন্ধের বেলায় যেসব দোষত্রুটি প্রযোজ্য আত্মসত্তা সেগুলো থেকে মুক্ত নয়।সুতরাং এটিও একটি অবভাস।

---

[৩২] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ১২২-১২৪। এ সব সাধনা বিবরণ আচার্য গুরুনাথ সত্যধর্ম গুণ প্রকরণ ও সাধনা বইয়ে লিখেছেন, দ্র. সত্যধর্ম (গুণ প্রকরণ), প্রেম (পৃ: ৩৯-৭২) ও অভেদজ্ঞান : তত্ত্বজ্ঞান সাধনা, পৃ: ২৫৪-৯৫)।

ব্রাডলির মতে ,সব অবভাসের ধারক বাহক পরমসত্তা; সংহতি ও সামঞ্জস্য পরমসত্তার বৈশিষ্ট। পরমসত্তা বিরোধমুক্ত ও সংহত ; এ কারণেই পরমসত্তা এক এবং কখনও সম্বন্ধধর্মী নয়। পরমসত্তা একটি সুসংহত ও সর্বব্যাপক সত্তা যার মধ্যে অভিজ্ঞতার জগতের সব বস্তু ও ঘটনার সর্বাত্মক সমন্বয় খুজে পাওয়া যায়।পরমসত্তা একটি 'সমগ্র' হিসাবে একত্বের অধিকারী ,বহুত্বের মধ্যে একত্ব।এদিক থেকে পরমসত্তা সব সম্বন্ধের অতীত, এক অনুত্তর(absolute)।ব্র্যাডলির মতে, ধর্মের ঈশ্বর absolute এর অংশ বিশেষ, absolute এর অবভাস মাত্র। উপাসনার বস্তু হিসাবে ঈশ্বরকে অবশ্যই উপাসনাকারী অপেক্ষা স্বতন্ত্র হতে হবে। সুতরাং ঈশ্বর সর্বব্যাপক পরমসত্তা নন, পরমসত্তার অংশ, অবভাস। ব্র্যাডলি তাঁর নৈতিক মতবাদে শুধু খন্ডিত অহমের সিদ্ধির কথা বলেননি,বরং একটি সমগ্র হিসাবে অহমের উপলব্ধি লাভই মানুষের নৈতিক লক্ষ্য বলে মনে করেন। একথা ঠিক যে,সসীম ব্যক্তি কখনো অসীম হতে পারেনা কিন্তু অধিক থেকে অধিকতর ব্যাপক লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করে যেতে পারে। এ চেষ্টার মধ্যেই নৈতিক প্রগতি নিহিত।[৩৩]ব্র্যাডলির এই আত্মসত্তা ও পরম সত্তার সাথে আচার্য গুরুনাথের জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনেক মিল খুজে পাওয়া যায়। তবে আচার্য গুরুনাথের পরমসত্তা সর্বব্যাপী হয়েও উপাসনার বস্তু। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর অংশ, তিনি সৃষ্টি থেকে ভিন্ন নন, সৃষ্টি তাঁর অন্তর্গত। আচার্য গুরুনাথের মতে, পরমসত্তা অনন্ত গুণের অনন্ত একত্ব। জীবাত্মাও গুণময় কিন্তু তার গুণগুলি অসীম নয়।সে সাধনা ও উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ এক একটি গুণে অসীমত্ব (একত্ব) লাভ করে ক্রমশঃ পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু কখনও পরমেশ্বরের সমান হয় না কারণ তিনি অনন্ত একত্বের একত্ব।

ভারতীয় দর্শন:

ভারতীয় দর্শনে অন্তকরণের চারটি বৃত্তির কথা বলা হয়েছে। সেই চারটি হল মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। এরা জড়বর্গের অন্তর্গত। কিন্তু আত্মা অজড়, আধ্যাত্মিক সত্ত্বা। কাজেই জড় মনকে আত্মার সাথে এক করা যায়না। ভারতীয় দর্শনে চার্বাক দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন ছাড়া অন্য সম্প্রদায়গুলো আত্মাকে দেহ মন প্রাণ থেকে আলাদা আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্র সত্ত্বা বলে মত দিয়েছে।

চার্বাক দর্শনে দেহই আত্মা, ইন্দ্রিয়-ই আত্মা, মন-ই আত্মা, প্রাণ-ই আত্মা, ধাপে ধাপে এ সকল মত প্রচলিত ছিল। বস্তুত: দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ এদের অতিরিক্ত কোন সূক্ষ্ম আত্মার ধারণা চার্বাক দর্শনে নাই। অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ কোন আত্মার অনুসন্ধান তাঁরা করেননি।

বৌদ্ধদর্শনে কোন শাশ্বত আত্মার কথা নাই। তাঁদের মতে, আত্মা হল মানসিক প্রক্রিয়ার অবিরাম প্রবাহ। এমতটিকে পাশ্চাত্য মতের সাথে তুলনা করা যায়। বিশেষত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম পরবর্তীকালে অনুরূপ একটি মত দিয়েছিলেন।

জৈনদর্শনে জীব ও আত্মা অভিন্ন। যার চেতনা বা জ্ঞান আছে তাকে জীব বলে। তবে জীব ও দেহ অভিন্ন নয়। জীব দেহাতিরিক্ত। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আত্মা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়সূচক। সাধারণত: আত্মা বলতে জীবাত্মাকে বুঝায়। জীবাত্মা বহু, পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক। প্রত্যেক জীবাত্মার একটি পৃথক

---

[৩৩]দ্রষ্টব্য, ডঃ আমিনুল ইসলাম,পাশ্চাত্য দর্শন আধুনিক ও সাম্প্রতিক কাল, ঢাকা,১৯৯৯,পৃ,২১৮-২২০

পৃথক ধর্ম আছে যা তাকে অন্য আত্মা থেকে পৃথক করে। আত্মা অভৌতিক দ্রব্য। এক একটি আত্মা এক একটি দেহ আশ্রয় করে আছে। আত্মা শাশ্বত ও সর্বব্যাপী। আত্মা দেশ-কাল দ্বারা সীমিত নয়। চৈতন্য আত্মার আগন্তক গুণ। স্বরূপত: আত্মা অচেতন দ্রব্য, মোক্ষ অবস্থায় নিজ স্বরূপে অবস্থান করে।

সাংখ্যদর্শনে আত্মাকে পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় বা জড় জগতের কোন বস্তু নয়।[৩৪] পুরুষ স্ব-প্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যবিশিষ্ট দ্রব্য নয়। পুরুষ চিত্তস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। সাংখ্যমতে পুরুষ চিৎস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ নন।[৩৫] পুরুষ নিত্য বিকারহীন, অপরিণামী, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব।[৩৬] পুরুষ বিভু, সর্বব্যাপী। সাংখ্যের পুরুষ বহু কিন্তু সব পুরুষ অসংগ, কারো সাথে কারো কোন সম্বন্ধ নাই। সাংখ্য ও যোগ দর্শনে আত্মা শুধু চৈতন্যস্বরূপ। স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীরের সঙ্গেই আত্মা স্বরূপত সম্বন্ধযুক্ত নয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট মুক্ত আত্মাই হল জীব। আত্মা স্বরূপত: মুক্ত ও বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্ত্বা হলেও অবিদ্যাবশত: চিত্তের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিনের একীভূত অবস্থাই হল চিত্ত।

মীমাংসা দর্শনে আত্মা নিত্য ও বিভু- দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত সত্ত্বা। আত্মা বহু। প্রতিটি দেহ আশ্রয় করে একটি স্বতন্ত্র আত্মা বর্তমান। দেহের বিনাশের সাথে আত্মার বিনাশ ঘটেনা। কর্মফল ভোগের জন্য আত্মা একটির পর একটি দেহ ধারণ করে। আত্মার শক্তির দ্বারা দেহ চালিত হয়। প্রাভাকরের মতে আত্মা স্বরূপত: নিস্ক্রিয়, চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, আগন্তক ধর্ম। কুমারিলের মতে আত্মা এক চেতন দ্রব্য আত্মা অশরীরি, সর্বগত, নিত্য ও অজড়। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ, আত্মা নিত্য, বিভু ও বহু।

অদ্বৈতবেদান্তি শংকরাচার্যের মতে আত্মাই ব্রহ্ম। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। আত্মার অস্তিত্বে সংশয় করা চলে না। কারণ সংশয়ই আত্মার দ্বারা সিদ্ধ হয়।

সর্ব্বোহ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমস্মীতি।

যদি হি নাস্তাস্তিত্ব প্রসিদ্ধি স্যাৎ সর্ব্বলোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ।

আত্মা চ ব্রহ্ম।[৩৭]

আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ। অধ্যাসবশত: দেহ মন ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করা হয়। আত্মা এর কোনটি নয়। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা নির্বিশেষ, নিত্য, নিষ্ক্রিয়, অখন্ড এবং অনাদি।

জীব সম্পর্কে :

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্যের মতে জীব দেহবিশিষ্ট আত্মা। আত্মা ব্রহ্মের অংশ। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক নিত্য গুণ। আত্মা নিত্য অজ অমর। ঈশ্বরের অচিৎ অংশ থেকে দেহের সৃষ্টি এবং চিৎ

---

[৩৪] সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৬/২

[৩৫] ঐ, ৫/৬৬

[৩৬] ঐ, ১/১৯

[৩৭] ব্রহ্মসূত্রের শংকর ভাষ্য, ১/১/১

অংশ থেকে জীবের সৃষ্টি। সাংখ্য মতে শুদ্ধ পুরুষকে পুরুষ বা আত্মা আর ব্যবহারিক পুরুষকে জীব বলা হয়েছে। পুরুষ নিত্য, বিভু নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। পুরুষ কর্তা ভোক্তা নয় জীবই কর্তা ভোক্তা। দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ পুরুষই জীব। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে অহংকার আশ্রিত পুরুষই জীব।

শংকরাচার্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত: অভিন্ন। নানা স্মৃতি, অনুষঙ্গ, পছন্দ, অপছন্দ ও উদ্দেশ্যের সুসংহত সমাহার হল জীব। জীব হল বিজ্ঞানাত্মন, যার পরিবর্তন আছে। পরমাত্মার কোন পরিবর্তন নাই। ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপর। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবই ব্রহ্ম। জীবের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীব স্বরূপত: ব্রহ্ম হলেও বাহ্য দৃষ্টিতে জীব আত্মা ও দেহের সমষ্টি।[৩৮] সাংখ্যের পুরুষ ও জীবের পার্থক্যের সাথে অদ্বৈত বেদান্তের জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্যের তুলনা করা যায়। সাংখ্যমতে বহু আত্মার অস্তিত্ব আছে কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা এক। অবিদ্যা হেতু মায়াশক্তির প্রভাবে এক আত্মা বহু বলে প্রতিভাত হয়।

শংকরাচার্যের মতে ঈশ্বর স্বরূপত: ব্রহ্ম, জীব ও স্বরূপত: ব্রহ্ম। সেক্ষেত্রে ঈশ্বর ও জীবের পার্থক্য না থাকারই কথা। তবু শংকরাচার্য ঈশ্বর ও জীবের কিছু পার্থক্যের কথা বলেছেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী আর জীব অল্প শক্তি, অল্প জ্ঞানী ও সূক্ষ্ম। ঈশ্বর অবিদ্যা থেকে সদা মুক্ত মায়া ঈশ্বরের উপাধি আর অবিদ্যা জীবের উপাধি। ঈশ্বর মায়াধীশ হলেও মায়ার দ্বারা আবৃত হন না।[৩৯]

দেহ সম্পর্কে :

অধিকাংশ ভারতীয় মতে জীব দেহবিশিষ্ট আত্মা। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতভেদ যেমন আছে শরীর সম্বন্ধেও তেমনি নানা মত আছে।

চার্বাক মতে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ এ চারটি ভূত সমন্বয়ে দেহ গঠিত। আত্মা চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ, চৈতন্য জড়দেহের গুণ। দেহ ও আত্মা অভিন্ন। বৌদ্ধমতে মানুষ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পাঁচটি স্কন্দের সমষ্টি। রূপ বলতে জড়দেহকে বুঝায়। ক্ষিতি অপ তেজ ও মরুৎ এ চারটি উপাদান দিয়ে জড়দেহ গঠিত। দেহ ও মন একটি নিয়ত প্রবাহ মাত্র।সাংখ্য মতে জীব যে স্থূল শরীরের মধ্যে অবস্থান করে সেই স্থূল শরীরের মধ্যে আবার একটি সূক্ষ্ম শরীর আছে যা বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র দিয়ে গঠিত। এই সূক্ষ্ম শরীরে অতীত কর্মের ফল সংস্কার রূপে সঞ্চিত থাকে। কর্মের পার্থক্যের জন্য সূক্ষ্ম শরীরও পৃথক পৃথক হয়। সূক্ষ্ম শরীর যতদিন থাকবে ততদিন জীবের জন্ম ও মৃত্যু চলতে থাকবে। সূক্ষ্মশরীরের মাধ্যমেই পাপ-পূণ্য প্রভৃতিকে আত্মা ভুল করে নিজের পাপ পুণ্য বলে মনে করে। যতদিন সূক্ষ্মশরীর থাকবে ততদিন এ ভ্রম থাকবে। যখন বিবেক জ্ঞান জাগ্রত হয় তখন আত্মাও অনাত্মবস্তুর প্রভেদ বুঝা যায় এবং পাপ-পুণ্যের ধ্বংস হয় ও সূক্ষ্মশরীরের বিনাশ ঘটে এবং জীবের ব্যবহারিক সত্তার বিনাশ ঘটে এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়।[৪০] স্থূল শরীর মাতা-পিতার কাছ থেকে পাওয়া বলে একে মাতৃ-পিতৃজ শরীর বলে। এ শরীর অস্থি-মাংস-মজ্জা-মেদ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। স্থূল

---

[৩৮] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, ২য় খন্ড, পৃ: ১৬৬

[৩৯] জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, পৃ: ২০৩

[৪০] জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, পৃ: ৩৫৭

শরীরের বিনাশ আছে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ নাই। এই সূক্ষ্ম শরীর দেহ থেকে দেহান্তরে সঞ্চারিত হয়। বিবেক জ্ঞান দ্বারা পুরুষের মোক্ষ লাভ ঘটে। পুরুষের চিত্তবৃত্তির উপরাগ হল অবিবেক- একে দূর করতে হলে উপরাগের নিরোধ প্রয়োজন। ধ্যান-ধারণা-অভ্যাস-বৈরাগ্য প্রভৃতি দ্বারা উপরাগের নিরোধ হয়। এর মধ্যে ধ্যানই মুখ্য। ধ্যানের দ্বারা জীবের জড় আবরণ বিনষ্ট হয় এবং জীব পুরুষের সঙ্গে তদাত্ম লাভ করে।[৪১]

শংকরাচার্যের মতে পঞ্চসূক্ষ্মভূত থেকে জীবের সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মশরীরের ১৭টি অবয়ব- পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি। আর পঞ্চস্থূলভূত থেকে জীবের স্থূলশরীরের উৎপত্তি। স্থূলশরীর জরায়ুজ, অন্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ এ চার প্রকার। জীবের পক্ষে সূক্ষ্মশরীরের জন্যই জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়।[৪২] জীবের কারণশরীর হ'ল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণ। এ হ'ল অজ্ঞানতা, যা ব্রহ্মজ্ঞানের সাথে লোপ পায়।[৪৩]

মুক্তি বা মোক্ষ সম্পর্কে :

ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ছাড়া অন্য সব দর্শন সম্প্রদায় আত্মার মুক্তি বা মোক্ষের কথা বলছেন এবংমোক্ষের বিধান দিয়েছেন। জীবের বন্ধন বলতে ভববন্ধন। ভবন্ধন হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু ও জন্মান্তরের অনাদি প্রবাহ। এর নাম সংসার। এ সংসারে আগমন নিরোধ করার নাম মোক্ষ বা মুক্তি। অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, অবিবেক এই বন্ধের কারণ। সুতরাং অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা তথা অবিবেক এর আত্যন্তিক বিনাশ করতে পারলে মুক্তিলাভ সম্ভব। মোক্ষ বা মুক্তি বলতে সকলে মোটামুটি দু:খ নিবৃত্তির অবস্থা বলেছেন। কেউ কেউ একে আনন্দময় পরম শান্তির অবস্থার কথা বলেছেন। কেউ বা সুখ-দু:খের অতীত অবস্থার কথা বলেছেন।

চার্বাক দর্শনে যেহেতু আত্মার স্বতন্ত্র শাশ্বত সত্ত্বা স্বীকৃত হয়নি সে কারণে মুক্তির প্রশ্ন অবান্তর ও নিরর্থক।

জৈনমতে আত্মা স্বরূপত: অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত দর্শন ও অনন্ত আনন্দময়। কিন্তু কামনা বাসনাজনিত কর্মশক্তির প্রভাবে জড় পরমাণুর সংশ্রবে এসে বন্ধনদশা লাভ করে এবং দু:খ ভোগ করে। এ অবস্থায় আত্মার স্বরূপ অজ্ঞানতা ও মোহ দ্বারা আবৃত থাকে। সম্যক জ্ঞান, সম্যক দর্শন ও সম্যক চরিত্রের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষ লাভ অবস্থায় কেবল দু:খ থেকে নিষ্কৃতি নয়, আত্মা অনাবিল সুখও লাভ করে।

বৌদ্ধমতে মোক্ষকে নির্বাণ বলা হয়েছে। দু:খের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই নির্বাণ। অষ্টমার্গ অবলম্বনে নির্বাণ লাভ হয়। ন্যায় বৈশেষিক মতে অজ্ঞানতাবশত: মুক্ত স্বভাব আত্মা দেহ মন ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এসে বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতা দূরীভূত হলে আত্মা দেহবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। দেহবিচ্ছেদে আত্মার কোন চৈতন্য থাকে না বলে মোক্ষে দু:খ সুখ আনন্দ কিছুরই উদ্ভব হতে পারে না। জীব শরীর

---

[৪১] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, ১ম খন্ড, পৃ: ৩০৭

[৪২] জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, পৃ: ১৯১

[৪৩] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, ২য় খন্ড,পৃ: ১৬২

প্রভৃতি থেকে নিজের পার্থক্য বুঝতে পেরে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করে। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া জীব আত্মদর্শন লাভ করতে পারেনা। তাই উপাসনারও প্রয়োজন আছে।[৪৪]

সাংখ্য ও যোগদর্শন মতে আত্মা স্বরূপত: বিশুদ্ধ চৈতন্য ও নিত্যমুক্ত। অবিদ্যাবশে আত্মা নিজেকে প্রকৃতিজাত বুদ্ধির বৃত্তির সাথে অভিন্ন করে দেখার জন্য সুখ দু:খ প্রভৃতি বুদ্ধির গুণগুলোকে নিজের গুণ বলে মনে করে। এ অবস্থার নাম আত্মার বন্ধন। অবিবেক হেতু প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞানই বন্ধন। বিবেক জ্ঞানের সাথে অবিবেক দূর হলে আত্মা স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। পুরুষ বা আত্মার বুদ্ধিবৃত্তির উপরাগই হ'ল অবিবেক। সুতরাং অবিবেক দূর করতে হলে উপরাগের নিরোধ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষ থেকে অপগত হওয়া প্রয়োজন।[৪৫] ধ্যান,ধারণা, অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহায়তায় ঐ উপরাগের নিরোধ হতে পারে।[৪৬] বস্তুত: দীর্ঘ ও সুকঠিন যোগ সাধনের মাধ্যমেই এই তত্ত্বজ্ঞান আসতে পারে।[৪৭]

মীমাংসকগণ জীবের বন্ধন মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলেছেন। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মার মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষাবস্থায় আত্মা সুখ-দুঃখের অতীত এক অচেতন সত্ত্বা হিসাবে বিরাজ করে।

অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয়েছে আত্মজ্ঞানের অভাবে বদ্ধাবস্থা ও তজ্জনিত দুঃখভোগ হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভে মুক্তি হয়। আত্মা স্বরূপত: মুক্ত। এই মুক্তির অবস্থা সৎ চিৎ আনন্দের অবস্থা। শংকরাচার্যের মতে মুক্তিতে আত্মা নতুন কিছু লাভ করেনা, আত্মা স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থা শুধু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়। এ এক পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা। শংকরাচার্যের মতে, উপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভ হয়না কেননা উপাস্য উপাসকের ভেদ না থাকলে উপাসনা হয় না। ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের জন্য হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই।

আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতা দূর হয় এবং তখন জীব উপলব্ধি করে যে, জীব স্বরূপত: ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ নাই; তখনই জীবের মুক্তি হয়। পরব্রহ্ম উপাস্য নন। জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলে পরমাত্মার কোন ভোগমূলক ব্যবহার থাকেনা।[৪৮] এ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শংকরাচার্য চারটি সাধনের কথা বলেছেন- (১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করা, (২) ইহমূত্রার্থ ভোগ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে উদাসীনতা, (৩) শমদমাদি সাধন সম্পদ অর্থাৎ শম (ইন্দ্রিয় সংযম) দম (মন সংযম) তিতিক্ষা (ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা) উপরতি (ভোগ বিমুখতা) ও শ্রদ্ধা (শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস)- এ পাঁচটি গুণবিশিষ্ট হওয়া (৪) মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ। এ চারটি সাধন সম্পাদনার পর সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অধিকারী হন। এভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে মুক্তিকামী সাধক গুরুর নিকট থেকে শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করবেন। এর নাম শ্রবণ,

---

[৪৪] জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, পৃ: ১৬৮

[৪৫] সাংখ্য প্রবচন সূত্র , ৬/২৬

[৪৬] ঐ, ৬/২৯

[৪৭] যোগ দর্শনে এ সব সাধনার বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে। যোগের অষ্ট অঙ্গ হচ্ছে- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এ পাঁচটি সাধন হ'ল যম। শৌচ, সন্তোষ, তপ:, সাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এ পাঁচটিকে নিয়ম বলে।স্থির ও সুখজনক অবস্থিতির নাম আসন। অন্যগুলির বিবরণ ৭ম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

[৪৮] ব্রহ্মসূত্র শংকর ভাষ্য,২/২/৭

এরপর গুরুর উপদিষ্ট তত্ত্বের চিন্তন বিচার ও নির্ধারণ করবেন এর নাম মনন। সর্বশেষ সেই তত্ত্বে নিবিষ্ট হয়ে ধ্যান করবেন। এর নাম নিদিধ্যাসন। এরফলে ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হবে। এরই নাম মুক্তি বা মোক্ষ। জীবিত অবস্থায় যে মুক্তি তার নাম জীবন্মুক্তি। মৃত্যুর পর পার্থিব ও স্থূলদেহ বিনাশের পর যে মুক্তি,তা বিদেহী মুক্তি।[৪৯]

রামানুজাচার্যের মতে, কর্মের জন্যই আত্মার বন্ধন। কর্ম অনুসারে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে। দেহের সাথে সংযুক্ত হলে আত্মার চৈতন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও দেহের দ্বারা সীমিত হয়। ফলে আত্মা নিজেকে দেহের সাথে অভিন্ন বলে মনে করে; এ ধরণের একীকরণকে অহংকার বলে। অজ্ঞানের জন্যই অহং-মম বোধ জাগে। অজ্ঞানতাবশত: জীব নিজেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মনে করে। এই অস্তিত্বের গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে সকাম কর্মের ফল হিসাবে পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করে। নিষ্কাম কর্ম জন্ম জন্মান্তরের কারণ নয়। সেজন্য মুক্তিকামী সাধককে সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। আর এর জন্য সাধককে সপ্তসাধন পালন করতে হবে। সপ্তসাধন হ'ল- (১) বিবেক বা অশুদ্ধ পানাহার বর্জন, (২) বিমোক বা কামনার অভাব, (৩) অভ্যাস বা দুঃসাধ্য সাধনের জন্য বার বার অনুশীলন, (৪) ক্রিয়া বা যজ্ঞানুষ্ঠান, (৫) কল্যাণ, (৬) অনবসাদ বা মানসিক দৈন্য ও দুর্বলতার অভাব, (৭) অনুদ্ধর্ষ বা অতিসন্তোষ ও অতিবিশ্বাসের অভাব।

মুক্তির জন্য রামানুজাচার্য জ্ঞানের কথা বললেও একথাও বলছেন যে, শুধু জ্ঞানে মুক্তি নেই, ভক্তিও আবশ্যক। রামানুজের মতে ভক্তি মানে ধ্যান বা উপাসনা। কিন্তু কেবল ধ্যানেও মুক্তি নাই। ব্রহ্মের অনুগ্রহ না হলে সবই বৃথা। সাধকের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রীত হয়ে ব্রহ্ম ভক্তের কাছে আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং সাধকের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার মুক্তি। ব্রহ্মের কৃপা ছাড়া ক্ষুদ্রজীবের পক্ষে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। রামানুজ প্রপত্তিকেও স্বতন্ত্র সাধন বলে গণ্য করেছেন। ব্রহ্মে সম্পুর্ণ আত্মসমর্পণের নাম প্রপত্তি। ভগবানে পরিপূর্ণ নির্ভরশীল সাধক নিজের সবকিছু ঈশ্বরে নিবেদন করে অহংমমবোধ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে একমাত্র ব্রহ্মেই আশ্রয় নেন। প্রপত্তির ছয়টি অঙ্গ যথা- (১) সার্বজনীন প্রীতি ও মৈত্রী, (২) হিংসা-দ্বেষ বর্জন, (৩) ত্রাণকর্তারূপে ভগবানে বিশ্বাস, (৪) ঈশ্বরের কৃপা ও আশ্রয় প্রার্থনা, (৫) অহংমমভাব বর্জন, (৬) ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

ভক্তি বা উপাসনা ব্রহ্ম জ্ঞানমূলক বলে উচ্চ বর্ণত্রয়ের এবং জ্ঞানী ও গুণী সাধকের পক্ষেই তা সম্ভব। কিন্তু সকল মানুষ প্রপত্তির অধিকারী। শংকরাচার্য দুই প্রকার মুক্তির কথা বলছেন- জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি। জীবিত অবস্থায় যে মুক্তি তা জীবন্মুক্তি। তাঁর মতে, অধ্যাস বন্ধের কারণ। প্রকৃত জ্ঞানী দেহ-মনের ধর্ম আত্মায় আরোপ করেন না বলে তিনি দেহ-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হয়েও মুক্ত। কিন্তু রামানুজাচার্য জীবন্মুক্তির কথা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে জীব যতদিন দেহের সাথে যুক্ত থাকবে ততদিন দেহ-মন দ্বারা সে অভিভূত হবেই। জীবিত থাকতে গেলে দেহ-মনের কর্ম ভোগ করতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন। দেহ মনের সাথে যুক্ত জীব পূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লাভ করতে পারেনা, ব্রহ্মের মত অনন্তকল্যাণ গুণের আধার হতে পারেন না। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর মৃত্যু হলে এই দেহবন্ধন

---

[৪৯] জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, পৃ: ২০৭-২০৮

থেকে মুক্তজীব প্রকৃত মোক্ষ লাভ করে। তখন তাঁর সূক্ষ্ম শরীরও বিনষ্ট হয় এবং সে পুনর্জন্মের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। প্রারব্ধ কর্মের ফল স্বরূপ এই দেহকে চরম দেহ বলে। প্রকৃত জ্ঞানী চরম দেহী জীব ও বদ্ধ জীব, সুতরাং বিদেহী মুক্তিই একমাত্র মুক্তি।

রামানুজের মতে মোক্ষ জীবের জীবত্ব বিনাশ নয় বরং জীবের পরিপূর্ণ বিকাশ। বিকাশ বলতে জীবের স্বরূপ ও গুণের চরম উৎকর্ষ। এই সকল সাধনের দ্বারা জীব ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ অর্থাৎ ব্রহ্মের সাদৃশ্য অবস্থা লাভ করে। জীবের স্বরূপ ও গুণের পূর্ণ বিকাশ বলে জীব ব্রহ্মের মতই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয়। মুক্তজীব ব্রহ্ম-সাযুজ্যের শাশ্বত পরমানন্দে নিমজ্জিত থাকে। তবে দুটি ব্যাপারে জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন থাকে। প্রথমতঃ ব্রহ্ম বিভু, জীব অনুপরিমাণ। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম সৃষ্টিকারী, জীবের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। মুক্তজীবও ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মনিয়ন্ত্রিত। জীব সবরকমের জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের আকর হলেও সে সবসময়ই ব্রহ্মের সেবক ও ভক্ত।[৫০]

আচার্য গুরুনাথের মতে,আত্মা পরমেশ্বরের অংশ। পরমেশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়। তাঁর অনন্ত গুণের কণা কণা দিয়ে তিনি নিজেকে অংশীভূত করলেন। এই অংশীভূত আত্মা দেহ ছাড়া অংশ হিসাবে থাকতে পারে না। এই দেহবদ্ধ আত্মাই (স্রষ্টার চৈতন্যাংশ) জীব।দেহবদ্ধ হবার সময় সে তিনগুণে (সত্ত্ব:রজ: ও তম:) এবং বিবিধ পাশে দেহে বদ্ধ হয়। সৃষ্টিতে এসে তার চরম কাজ হচ্ছে পাশমুক্ত ও গুণাতীত হয়ে আত্মস্বরূপ লাভ করা। কেবল চিন্তার দ্বারা আত্মস্বরূপ লাভ হবে না। এর জন্য পরমেশ্বরের উপাসনা এবং বিভিন্ন পাশ মুক্তির সাধনা ও গুণের উন্নতির সাধনা করা প্রয়োজন। আচার্য গুরুনাথের এ বিষয়গুলি আমরা উপাসনা ও সাধনা অধ্যায়ে বর্ণনার চেষ্টা করেছি।

শংকরাচার্য যেমন বলেছেন উপাসনা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না। তেমনি তিনি উপাসনার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, সর্ব উপাধি বর্জিত পরমাত্মা বা ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য। মায়া উপাধিযুক্ত পরমাত্মা ঈশ্বর। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, জীবের উপাস্য দেবতা।[৫১] যখন পরমেশ্বরের নির্বিশেষ রূপ উপদিষ্ট হয় তখন শাস্ত্রে তাঁকে শব্দস্পর্শাতীত, অরূপ, অব্যয় রূপে বর্ণনা করা হয়। আর যখন তিনি উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হন তখন সর্বকারণ হেতু তাঁকে সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরূপ, সর্বরস ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিশেষিত করা হয়। ঈশ্বরোপাসনার মূলে আছে উপাস্য উপাসকের ভেদ।। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান উদিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পূজা করা হয়। কাজেই ঈশ্বরোপাসনা ব্যবহারিক দৃষ্টিসম্ভূত। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধির উপায় স্বরূপ।[৫২]

রামানুজাচার্য উপাসনার কথা বলেছেন, তবে তাঁর মতে উপাসনার দ্বারা জীব ব্রহ্ম হয় না। উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে। আচার্য গুরুনাথের মতে, উপাসনা জীবনের অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়। উপাসনা ব্যতীত জীবাত্মার কোন উন্নতি হয়না। তিনিও মত দিয়েছেন যে, ব্রহ্মের সাথে জীবের সোহহং জ্ঞান কখনই হয়না। রামানুজাচার্যের মতে, ভক্তি মানে ধ্যান বা উপাসনা। আচার্য গুরুনাথের মতে, ভক্তি

---

[৫০] জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ২৩৮-২৪০)

[৫১] ব্রহ্মসূত্র শংকরভাষ্য, ১/১/২০

[৫২]দ্রষ্টব্য, প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৪

মানে ধ্যান ও উপাসনা নয়। ভক্তি একটি মিশ্র গুণ। এ গুণের সাধনার বিষয় তিনি ভক্তি প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন।[৫৩] ভক্তি ঈশ্বরোপাসনার সহায়ক। ধ্যানও উপাসনার একটি উপায়। ধ্যান বিষয়েও আচার্য গুরুনাথ বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।[৫৪] শংকরাচার্যের মতে, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। আচার্য গুরুনাথের মতে, একথা ঠিক কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম এক নয়। কেননা ব্রহ্ম অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়, আর জীব ব্রহ্মের অনন্ত গুণের কণা কণা দিয়ে তৈরি। ব্রহ্মের অনন্ত গুণের কণা কণা সব জীবেই আছে। তাই স্বরূপতঃ এক হলেও পার্থক্য হ'ল ব্রহ্মে সমস্ত গুণের পরাকাষ্ঠা বা অনন্ত একত্ব আর জীবে প্রত্যেক গুণ অঙ্কুর বা সীমাবদ্ধভাবে আছে। সাধক উপাসনা ও সাধনা দ্বারা এ গুণগুলির উন্নতি করে যে গুণে অনন্তত্ব বা একত্ব লাভ করে সে গুণে পরমেশ্বরের সাথে এক হয়। কিন্তু অনন্ত গুণে অনন্তত্ব বা একত্ব লাভ জীবের পক্ষে অসম্ভব তাই সে কখনও পরমাত্মার সাথে এক হয় না।

শংকরাচার্য ও রামানুজাচার্য দু'জনেই বিদেহ মুক্তির কথা বলেছেন। কিন্তু গুরুনাথের মতে, কোন না কোন দেহ ছাড়া অংশের অবস্থান অসম্ভব। জীব ত্রিগুণাতীত (সত্ত্ব রজ: ও তম গুণের অতীত) হলেও বদ্ধের ন্যায় প্রতিভাত হয়।[৫৫] অর্থাৎ কারণ দেহের যে চরম অবস্থা সেটি থাকে। এ দেহের লয় কেবলমাত্র সমস্ত সৃষ্টি পরমাত্মাতে লয় হলে তবেই হতে পারে ,অন্যথায় নয়।[৫৬]

রামানুজাচার্যের মতে, দেহ থাকলে ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন। আচার্য গুরুনাথ এমত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে, স্থূল দেহসমূহের কাজ শেষ হলে সূক্ষ্মদেহসমূহ লাভ হয়। সূক্ষ্মদেহসমূহের কাজ শেষ হলে কারণ দেহ লাভ হয়। এ সময়ে সাধকের দেহজনিত যে কাতরতা তা থাকে না। অর্থাৎ দেহের উন্নত অবস্থায় দেহজনিত কষ্ট থাকেনা। সাধনার দ্বারা সাধক এসব স্তর লাভ করেন। আচার্য গুরুনাথ নিজেই এ অবস্থায় উপনীত হয়ে লিখেছিলেন, "ক্ষুধাহীন তৃষ্ণাহীন নিদ্রারহিতা।"[৫৭] জীব সাধনা করতে পারে তবে ফললাভ বা উন্নতি পরমেশ্বরের করুণা সাপেক্ষ ; এ বিষয়ে আচার্য গুরুনাথ রামানুজাচার্যের সাথে একমত।

ন্যায় বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের মতে প্রত্যেকটি জীবাত্মা স্বতন্ত্র, এদের পৃথক পৃথক ধর্ম আছে।এঁদের মতে জীবাত্মার সংখ্যা অসংখ্য।এক একটি দেহে এক একটি আত্মা আছে। কিন্তু এর কোন ব্যাখ্যা সেসব দর্শনে নাই। আমরা আচার্য গুরুনাথের জীবাত্মার ধারণা থেকে এর ব্যাখ্যা পাই। তাঁর মতে, অনন্ত গুণময় পরমেশ্বর যখন তাঁর অংশসমূহকে অংশীভূত করলেন তখন প্রত্যেক অংশে অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মায় এক একটি প্রধান গুণ প্রদান করেছেন। প্রত্যেককে কোনও একটি গুণ অধিক পরিমাণে দিয়ে গড়ে সকলকে তুল্যগুণবিশিষ্ট করেছেন।[৫৮] এই গুণের কারণেই প্রত্যেকটি জীবাত্মার পৃথক পৃথক ধর্ম বা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

---

[৫৩] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম গুণ প্রকরণ, পৃ. ৭৩-৯৮
[৫৪] দ্রষ্টব্য, ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯-৩৪
[৫৫] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যামৃত, পৃ. ৬৭ (শ্লোক নং- ১১)
[৫৬] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ২৯৪-২৯৫
[৫৭] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, 'গুরুগীতা' নিত্যকর্ম, গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ, ১৩৮৯, পৃ. ৮৮
[৫৮] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা,পৃ. ৪২-৪৩

শংকরাচার্যের মতে, জীবের সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চসূক্ষ্মভূত থেকে আর স্থূল শরীর পঞ্চমহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়। সাংখ্য দর্শনেও একই রূপ মত আছে। তবে শংকরাচার্য কারণ দেহের কথা বলেছেন এবং বলেছেন কারণ শরীর হ'ল স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কারণ। এ কারণ শরীরের উৎপত্তি কিভাবে, সে ব্যাখ্যা তাদের দর্শনে দেখা যায় না। আচার্য গুরুনাথের মতে, সব দেহই পঞ্চভূতোদ্ভূত। আর কোন দর্শনে দেহের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন কথা বা দেহের উপাদান বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট কথা নাই যা আমরা আচার্য গুরুনাথের ধর্মতত্ত্বে দেখছি।

আত্মার বন্ধন ও মুক্তি প্রসঙ্গে কর্মবন্ধন, ভববন্ধন, দেহের বন্ধন এসব কথা ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায়। আর মুক্তি বলতে এই বন্ধনসমূহ থেকে মুক্তি। ফল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং শান্তিময় বা আনন্দঘন অবস্থা।

আত্মার বন্ধন ও মুক্তি প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ

আচার্য গুরুনাথের মতে বন্ধন সত্ত্ব: রজ: তম: গুণে দেহের বন্ধন, বিবিধ পাশের বন্ধন। পাশ বলতে কেবল শাস্ত্রোল্লিখিত অষ্টপাশ নয়, গুরুনাথ কাম-ক্রোধাদি প্রভৃতিকেও পাশের মধ্যে গণ্য করেছেন। এ ছাড়া অজ্ঞানতা, অগুণ (গুণের অভাব) ষড়বিধ বিষয় (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ও মনন) বা একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রভৃতিকেও বন্ধনের কারণ বলেছেন। তিনি তাঁর ষট্চক্রভেদ সাধনা বইয়ে বন্ধন ও মুক্তির আপেক্ষিকতা সূত্রে নিম্নরূপ মুক্তির কথা বলেছেন। যথা-

(১) তমোগুণের বন্ধন থেকে মুক্তি, (২) রজোগুণের বন্ধন থেকে মুক্তি, (৩) অষ্টপাশ থেকে মুক্তি, (৪) বর্তমান জন্মের পাপ থেকে মুক্তি, (৫) পূর্বসঞ্চিত পাপ থেকে মুক্তি, (৬) অজ্ঞানতা হতে মুক্তি, (৭) অগুণ হতে মুক্তি, (৮) ষড়বিধ বিষয় বা একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হতে মুক্তি।[৫৯] ঐ গ্রন্থেই আবার মুক্তি সম্বন্ধে বলছেন- (১) ভববন্ধন হতে (২) ত্রিবিধ (কায়িক, মানসিক, বাচনিক) কলুষ থেকে (৩) ষড়বিধ বিষয় থেকে (৪) অষ্টপাশ হতে (৫) দেবতেজ দর্শনে (৬) দেবতা দর্শনে (৭) ব্রহ্মতেজ দর্শনে (৮) ব্রহ্ম দর্শনে- এই বাইশ প্রকার মুক্তিই শ্রেষ্ঠ মুক্তি। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণ নিধান। তাঁর মুক্তি প্রদায়ক গুণও অনন্ত। জীবাত্মা একক গুণে একত্ব লাভ করে ঐ গুণে ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। যেহেতু পরমেশ্বরের গুণ অনন্ত সে কারণে জীব অনন্তবার ব্রহ্মদর্শন করলেও অনন্তের অন্ত পাবেনা। তিনি অনন্তরূপে মুক্তিদাতা। সুতরাং একত্বের সংখ্যাও অনন্ত।[৬০]

এছাড়া আচার্য গুরুনাথ তাঁর গুণসূত্রম্ প্রবন্ধে মোক্ষের কথা বলেছেন। মোক্ষ বলতে সাধারণত: ভারতীয় দর্শনে বন্ধন-মোচন ও মুক্তি বোঝানো হয়েছে; কিন্তু মোক্ষের সংজ্ঞা, প্রকার, প্রকৃতি ও লক্ষণ বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা দেখা যায়না।আচার্য গুরুনাথ এ বিষয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন, আমরা নিম্নে সেসব তুলে ধরার চেষ্টা করছি। মুক্তি বলতে বন্ধনের অপগম কিন্তু মোক্ষ কোন বন্ধনের অপগম নয়। গুণ সাধনা দ্বারা সাধক আত্মার উন্নতির একটি বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হন, সে পর্যায়গুলিই মোক্ষ। মোক্ষ

---

[৫৯]দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, ষট্চক্রভেদ সাধনা, পৃ. ১৮০-১৮১, অনুবাদ, গৌরপ্রিয় সরকার, অনুবাদমালা, ১ম খন্ড, গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ, ১৩৮৮, পৃ. ৩১।

[৬০] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, ষট্চক্রভেদ সাধনা, পৃ. ১৮২-১৮৪, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩২

নঞর্থক কৃতিফল নয় বরং ভাবাত্মক অবস্থার অধিগম। মোক্ষ চার প্রকার। চার প্রকার মোক্ষই পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ ও সেই সান্নিধ্যের বিশেষ প্রকার-

(১) সাযুজ্য- জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ অনুভবের নাম সাযুজ্য মোক্ষ।

(২) সারূপ্য- পরমাত্মার অনভিমত কাজ না করার অবস্থার নাম সারূপ্য।

(৩) সালোক্য- যেখানে সাধক সেখানেই পরমাত্মার অনুভূতি এরূপ সলোকতাকে সালোক্য বলে।

(৪) একত্ব- কোন একটি গুণে পরমাত্মতা লাভ করাকে একত্ব বলে।[৬১]

শংকরাচার্যের মত, মুক্তিতে আত্মা নতুন কিছু লাভ করেনা, আত্মা স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। জৈন দর্শনের মতে, আত্মা স্বরূপত: অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত দর্শন, অনন্ত আনন্দময়। আচার্য গুরুনাথের মতে, আত্মা অনন্তময়ের অংশ সুতরাং তাতে অনন্ত গুণ বিদ্যমান। সৃষ্টিতে এসে সে বদ্ধ হয়। তার চরম কার্য হ'ল আত্মস্বরূপ লাভ করা। এই আত্মস্বরূপ লাভের উপায় হিসাবে তিনি ঈশ্বরোপাসনা ও গুণ-অনুশীলন দ্বারা গুণের উন্নতির (গুণ-সাধনা) বিধান দিয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায় সমূহে আমরা এ বিষয়ের আলোকপাত করার চেষ্টা করব। 'জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ' এ সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে কিছু আলোচনা থাকলেও এ বিষয়ে আচার্য গুরুনাথ যে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন এবং 'মানুষ মাত্রেই জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অংশ নয়' এ নিবন্ধে তিনি যে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন , তা ধর্মচিন্তায় নতুন মাত্রা এনে দেয়।

আচার্য গুরুনাথের মতে, দেহ ও মনের প্রধান কাজ- ইন্দ্রিয় সংযম, অধ্যয়ন, অহিংসা ও দয়া। জীবাত্মার প্রধান কাজ- ঈশ্বরোপাসনা, জগতের সকলকে আত্মজ্ঞান, দেহ ও মনে অনাত্মবুদ্ধি, জগদীশ্বরে ও লব্ধেশ্বরজনে পূর্ণ নির্ভরতা। যার দেহ ও মনের কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই তার জীবাত্মার কাজও সম্পন্ন হতে পারে না। জীবের প্রথম কর্তব্য- হৃদয়ের প্রশস্ততা সাধন। জীবের প্রধান কর্তব্য- জগদীশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস এবং পরিণামে যাতে তাঁকে পাওয়া যায়, সে রকম পথে এখন থেকে চলা।[৬২]

---

[৬১] গুরুনাথ সেনগুপ্ত, গুণসূত্রম্, ৪/১৬-১৮, অনুবাদ, গৌরপ্রিয় সরকার, অনুবাদমালা, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৪-৭৫

[৬২] উপদেশমালা (মহাত্মা গুরুনাথের উপদেশসমূহ), সত্যধর্ম মহামন্ডল, বাংলাদেশ, ১০, ১১, ১৪ ও ৩ নং উপদেশ, পৃ. ৮, ১০,

পঞ্চম অধ্যায়

আচার্য গুরুনাথের সৃষ্টি-তত্ত্ব

আত্মা চৈতন্যাত্মক, শরীরাদি জড়াত্মক এ উভয়ের যোগ কিরূপে হতে পারে- ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য আচার্য গুরুনাথ সৃষ্টি প্রকরণ[১] ব্যক্ত করেছন। তাঁর সৃষ্টি তত্ত্ব সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

প্রথমে একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন। তিনি অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়, সুতরাং অনন্ত প্রেমময়। প্রেমের ধর্ম বহুকে এক করা এবং এককে বহু করা। তিনি এক ছিলেন তাই প্রেম গুণের ধর্মবশতঃ তাঁর নিজেকে বহু করার ইচ্ছা হল। এই নিজেকে বহু করার ইচ্ছার অন্য নাম অনন্ত গুণের পরীক্ষা করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই তাঁর প্রকৃতি। এ প্রকৃতি তিন শক্তি বিশিষ্ট-সিসৃক্ষা (সৃষ্টি করার ইচ্ছা), রিরক্ষিষা (পালন করার ইচ্ছা) ও জিহীর্ষা (লয় করার ইচ্ছা)। এ তিন শক্তির কাজ যথাক্রমে রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। পরমাত্মার অনন্তগুণের মধ্যে কোন গুণ প্রধান,কোনটির কিরূপ শক্তি- এ পরীক্ষা করার জন্য তিনি নিজেকে বহুভাবে ভাসমান করলেন। প্রত্যেক জীবাত্মায় অনন্ত গুণ অত্যল্প পরিমানে এবং কেবল কোন একটি গুণ অধিক পরিমাণে দিয়ে নিজেকে অংশীভূত করলেন।[২]

পরমপিতার অংশসমূহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ দ্বারা জীবভাবে বদ্ধ হতে লাগল। যখন জীবভাবে বদ্ধ হতে লাগল তখনই এই অংশের সহযোগে প্রকৃতি থেকে অন্তকরণের উৎপত্তি হল। এই অন্তকরণ মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এ চারভাবে বিভক্ত। এ সময়েই পরমপুরষের অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্বরূপ একটি গুণ যার নাম অব্যক্ত, তা পরমপুরুষ সহযোগে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হল। এই অব্যক্ত থকে পরমপুরুষ সহযোগে ব্যোমের উৎপত্তি হল। এই ব্যোমই জড়জগতের প্রকৃতি। এইযে জগৎ দেখা যায়, এর জড় অংশ অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন এবং চৈতন্যাংশ তাঁর সাক্ষাৎ অংশ। ব্যোম থেকে পরমপুরুষ যোগে বায়ু, ঐভাবে বায়ু থেকে তেজঃ, তেজঃ থেকে অপ (তরল) ও তরল পদার্থ থেকে ভূমি বা কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হল। পরে এই পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হল। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে জড় জগতের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়েছে। এবার

---

[১] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ১৮১-২৬২

[২] ১।ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা,পৃ,৪২ ২।তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা,পৃ,২৬১-২৬২

আমরা এই সংক্ষিপ্ত অংশের একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং সে সাথে সৃষ্টিতত্বের অন্যান্য বিবরণ দেবার চেষ্টা করব।

গুরুনাথের মতে, প্রথমে একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন তিনিই এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এর প্রমাণ শ্রুতি থেকেও উল্লেখ করেছেন-

পূর্বমেক এবাসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ

স দেব সৌম্যেদং, সর্ব মসৃজৎ।

অর্থাৎ- পূর্বে একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন, অন্য কিছু ছিলনা। হে সৌম্য! সেই দেব এ সকল সৃষ্টি করেছেন।

আরও উল্লেখ করেছেন-

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

স ঈক্ষত লোকান নু সৃজা।[৩]

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এ দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিলনা। সে আত্মা এরূপ চিন্তা করলেন- আমি লোক সকল সৃষ্টি করব।

আর্য ধর্মশাস্ত্রের মত ইসলাম, খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্মেও ঈশ্বরের একত্বের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।ইতিপূর্বে আচার্য গুরুনাথ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, পরে ‘ঈশ্বর যে এক’ সে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর যে এক তাও ঈশ্বরের একত্ব অংশে প্রতিপন্ন করেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ প্রসঙ্গে যে লয়বাদের উল্লেখ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, সব পদার্থ মহাপ্রলয়কালে পরমাত্মায় প্রবেশ করবে বা লীন হবে।[৪] কাজেই ন্যায় বৈশেষিক বা সাংখ্য দর্শনে চতুর্বিধ পরমাণু ও আকাশাদি পঞ্চদ্রব্যকে যে নিত্য বলা হয়েছে,[৫]তাদের নিত্যতা স্বীকার করলেও প্রথমে অভিব্যক্তির অভাব ও পরে অভিব্যক্তি স্বীকার করতে হয়। সুতরাং প্রথমে একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন- একথা স্বীকার্য।

---

[৩] ঐতরেয় উপনিষদ-১ ; তৈত্তীরিয় উপনিষদ, ৪৪

[৪] শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৫৫, তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে নানাবিধ শক্তিযোগে বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি করেছেন। আবার লয়কালে তাতেই এসব বিলীন হবে। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎবিশন্তি, তদবিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম ।(তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৫৪)অর্থাৎ- যা থেকে প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যার দ্বারা জীবিত থাকে এবং যাতে প্রবেশ করে, তাকে জানতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

[৫] ন্যায় বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনে চতুর্বিধ পরমাণু ও আকাশাদি পঞ্চদ্রব্যকে নিত্য বলা হয়েছে। অথচ এ নয় পদার্থকেই কার্য বলা হয়েছে। সাংখ্যেরা সৎকার্যবাদী বলে তাদের মতে কার্যমাত্রই নিত্য। গুরুনাথ মনে করেন, মানুষের চিন্তনীয়কালে যাদের অনিত্যতার অর্থাৎ বিনাশের কারণ দেখা যায়না , তারাই নিত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে নতুবা চিন্তাতীতকালে যে তাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ সৃষ্টির জন্য তারা যে অনিত্য একথা বলা যেতে পারে। (তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ১৮২)।

আচার্য গুরুনাথ বলছেন ঈশ্বর অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়।[৬] সুতরাং অনন্ত প্রেমময়। জগদীশ্বর যে অনন্ত গুণময় তা তাঁর স্বরূপ যে দুইভাবে বর্ণনা করেছেন,তার প্রথম অংশে দেখিয়েছেন।

প্রেমের ধর্ম যেমন বহুকে এক করা, তেমনি এক-কে বহু করাও প্রেমের ধর্ম। প্রত্যেক পদার্থেই পরস্পর বিপরীত দুটি ধর্ম দেখা যায়। পরমাণুতে আকর্ষণের ন্যায় বিকর্ষণ, প্রত্যেক ঘটনায় সুখের ন্যায় দুঃখ, প্রত্যেক ব্যাপারে পাপের ন্যায় পুণ্য এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য দেয়। যে দুধ পরম উপকারী, তা-ই অবস্থা ভেদে পরম অপকারী। যে বিষ পরম অপকারী, তা-ই অবস্থা ভেদে পরম উপকারী। যে পুত্র সর্বাপেক্ষা সুখকর, সে-ই আবার সর্বাপেক্ষা দুঃখদায়ক। যে পত্নীর প্রেমে বাধ্য হয়ে লোকে না করছে এমন কাজ নাই, সে পত্নীই আবার অবস্থা ভেদে ধনমান শান্তি ধ্যান সবকিছুর বিনাশিনী হতে পারে। যে বন্ধুর প্রণয়ে সবকিছু করা যায় , সেই বন্ধুই ঘোরতর বিপত্তির কারণ হয়। প্রকৃত গুরুগণ শিষ্যদের জন্য অশেষ ক্লেশ-স্বীকার ও সর্বসুখ পরিহার করেন; সেই শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ গুরুদের জীবন নাশের কারণ হয়। অতএব স্বীকার করতে হয় যে, প্রত্যেক পদার্থেই পরস্পর বিপরীত দুটি ধর্ম আছে। এ কারণে প্রেম দ্বারা যেমন বহু এক হয় তেমন এক বহু হয়।

এ বিষয়ে আপত্তি হতে পারে যে, যিনি পূর্ণ তাতে আপনাকে বহু করতে ইচ্ছা হবে কেন? একে প্রেমের ধর্ম বলে স্বীকার করলেও তার সাথে এও স্বীকার করতে হয় যে, পরমেশ্বর পূর্ণ নন; পূর্ণ হলে তার ইচ্ছা হবে কেন? আচার্য গুরুনাথ নিজেই এ প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তরে বলছেন যে, পূর্ণ হলে যে ইচ্ছা থাকবে না এ কথা ঠিক নয়। কেননা ইচ্ছা পরমেশ্বরের একটি শক্তি। বিশেষত: যাঁতে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান তাতে যদি ইচ্ছাশক্তি না থাকে তবে তা সঙ্গত হয়না। তাতে অবশ্যই ইচ্ছাশক্তি আছে নতুবা তিনি অপূর্ণ হন। ইচ্ছাশক্তি থাকাতে পূর্ণত্বের ব্যাঘাত হয়না। সংস্কৃত ভাষায় দুটি শব্দ আছে তাদের একটির অর্থ অন্যটিতে আরোপ করার ফলে এ সংশয় দেখা দেয়। সংস্কৃতে ইচ্ছা ও ঈপ্সা এ দুটি শব্দ আছে। শেষেরটির অর্থ আপ্তুমিচ্ছা অর্থাৎ পাইতে ইচ্ছা। এ ঈপ্সা যার আছে সে অবশ্যই অপূর্ণ। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে তাকে অপূর্ণ বলা যায়না। যাঁকে অনন্ত শক্তি সম্পন্ন স্বীকার করা যায় ,তাঁতে যদি ইচ্ছাশক্তির অভাব স্বীকার করা হয় , তবে প্রকারান্তরে তাঁকে অপূর্ণ বলা হয়। সীমিত শক্তিসম্পন্ন মানুষও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অনেক কিছু করতে পারে। জগতে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। [৭]

তাঁর নিজেকে বহু করার ইচ্ছাই প্রকৃতি। যেমন বর্তমানে স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনপরমপুরুষের সাথে ইচ্ছারূপা প্রকৃতির সহযোগেই সমস্ত ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি হয়েছে। এই ইচ্ছা পূর্ণশক্তি পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষ। এ ইচ্ছাশক্তির নাশ নাই- চিরস্থায়িনী। এ জন্যই সাংখ্যগণ এ প্রকৃতিকেই নিত্যা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি নিত্যা। নিত্য বললে যেমন অনাদি অনন্ত বুঝায়

---

[৬] তৃতীয় অধ্যায়ে (ঈশ্বরের স্বরূপ অংশে) ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[৭] দ্রষ্টব্য, ইচ্ছাশক্তি, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ২৩২

তেমনই কেবল অনন্তও বুঝায়। যার আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই- তাও নিত্য। সুতরাং কারণ হয়ে যেমন নিত্য হতে পারে তেমনি কার্য হয়েও নিত্য হবার বাঁধা নাই।

এ নিত্যা প্রকৃতি ত্রিবিধ শক্তিবিশিষ্টা। সেই তিন শক্তির নাম সিসৃক্ষা, রিরক্ষিসা ও জিহীর্ষা (সৃজন, পালন ও লয় বা হরণ)। প্রতি শক্তির কাজই গুণ বিশেষযোগে সম্পাদিত হয়। যেমন- দাহকত্ব- গুণযোগে দাহিকাশক্তির কাজ (দগ্ধ করা) সম্পাদিত হয়, উপচিকীর্ষা শক্তির কাজ দয়া গুণ দ্বারা হয় ইত্যাদি। এ কারণে বলা যেতে পারে, এই তিন প্রকার শক্তির কাজ তিন প্রকার গুণ দ্বারা হয়। এ গুণ তিনটির নাম- সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। রজোগুণ দ্বারা সিসৃক্ষার, সত্ত্বগুণ দ্বারা রিরক্ষিষার এবং তমোগুণ দ্বারা জিহীর্ষা শক্তির কাজ সম্পাদিত হয়। পরমেশ্বরের এ ইচ্ছাশক্তি নিত্যা প্রকৃতি বা মহাশক্তি বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এ মহাশক্তি হতে পরমপুরুষ সহযোগে অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মান্ডের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হচ্ছে এবং পরমপুরুষে তন্ময়ভাবে নিত্য মিলিতা ও নিয়ত তাঁর সহযোগে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও লয় সাধনে সমর্থা উক্ত মহাশক্তি প্রভাবেই ব্রহ্মান্ডের বৈচিত্র সাধিত হচ্ছে। নিরন্তর উৎপত্তি হতে থাকলে যেমন বালক যুবা ও বৃদ্ধ সংখ্যা হ্রাস পায়না সেরকম জীব মুক্ত হলেও জীবাত্মাদের সংখ্যা ক্ষয় হয় না।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কথা শুনলে তার শত্রুর সুখ, মিত্রের দুঃখ এবং পিতামাতার মোহ জন্মে। এভাবে দেখা যায় কার্য জগৎ সুখ-দুঃখ- মোহাত্মক সুতরাং তার কারণও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। আর যে প্রকৃতি বিশ্বসৃষ্টির কারণ তা-ও সুখ-দুঃখ- মোহাত্মিকা। সংক্ষেপে বলা যায় সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, স্বচ্ছ লঘু ও প্রকাশক, রজোগুণ দুঃখাত্মক, চঞ্চল ও চালক (প্রবর্তক) এবং তমোগুণ মোহাত্মক, গুরু, আবরক ও নিয়ামক। সত্ত্বগুণ দুঃখ ও মোহরহিত বলে প্রকাশক অর্থাৎ আলোর ন্যায় সব বিষয়ে দীপ্তিশীল। উহা রজোস্তম গুণে অভিভূত না হয়ে দেহীকে সুখের সাথে ও জ্ঞানের সাথে দেহে বন্ধন করে। অবিদ্যা দ্বারা যখন দেহীর স্বীয় স্বরূপ জ্ঞানানন্দ তিরোহিত হয় এবং যখন আমি সুখী, আমি জ্ঞানী- এরূপ অভিমানে দেহী লিপ্ত হয়, তখন সত্ত্বগুণ আত্মাতে অন্তকরণ বৃত্তি-ধর্ম সুখ ও জ্ঞানের আরোপ দ্বারা দেহীকে দেহে বদ্ধ করে।

রজোগুণ কার্য-প্রবৃত্তির কারণ। রজোগুণ দুঃখাত্মক, চাঞ্চল্যই তার প্রধান ধর্ম; ইহা তৃষ্ণা ও সঙ্গের কারণ। অর্থ প্রাপ্যমান হলেও তাতে অতৃপ্তির নাম তৃষ্ণা, আর প্রাপ্ত বিষয়ে মনের অপ্রীতি লক্ষণ সংযোগকে সঙ্গ বলে। একারণ রজোগুণ দেহীকে দৃষ্টাদৃষ্টার্থ কর্মে তৎপরতা দ্বারা দেহে বন্ধন করে।

অজ্ঞান অর্থাৎ মায়ার আবরণশক্তি হতেই তমোগুণের উৎপত্তি সুতরাং ইহা আবরক ও দেহীর মোহন অর্থাৎ মোহজনক (ভ্রান্তির কারণ)। তমোগুণ দেহীকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা দেহে বদ্ধ করে। অর্থাৎ সত্ত্ব কার্যপ্রকাশের বিরোধী প্রমাদ (অযত্নপরায়ণতা, অমনোযোগিতা, ভ্রম), রজো কার্যপ্রবৃত্তির বিরোধী আলস্য অর্থাৎ জড়তা এবং সত্ত্ব ও রজঃ এ উভয়ের কার্যবিরোধী নিদ্রা- এ তিনটি তমোগুণের ধর্ম।

যেমন স্তম্ভে দড়ি দিয়ে বৎস্যকে (বাছুর) বাঁধা হয় বলে দড়িকে গুণ বলে, সেরকম সত্ত্ব রজঃ ও তমো দ্বারা দেহে দেহাভিমানী আত্মা বদ্ধ হয় বলে এরা গুণ নামে অভিহিত হয়সত্ত্বগুণ

সুখে রজোগুণ কার্যে এবং তমোগুণ জ্ঞানাবরণপূর্বক প্রমাদে (অমনোযোগিতা, অযত্ন পরায়ণতা) সংশ্লেষ বা সংযোগ জন্মায়। কখনও কখনও সত্ত্বগুণ রজোস্তমোগুণকে, কখনও বা রজোগুণ সত্ত্ব-তমোগুণ দুটিকে আবার কখনও তমোগুণ সত্ত্বরজোকে অভিভূত করে বর্দ্ধিত হয়।[৮]

পরম পুরুষের অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্ব গুণ দুটির একত্ব থেকে আকাশ (ব্যোম) উৎপন্ন হয়েছে।[৯] আকাশের এরূপ উৎপত্তির কারণে তা থেকে নিরাকার বায়ু ও তেজের এবং সাকার ভূমি ও জলের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়েছে। আকাশের গুণ শব্দ- তা বায়ু প্রভৃতিতেও আছে সুতরাং শব্দ-গুণাধার আকাশ নামক ভূত কেন স্বীকার করতে হবে- এ আপত্তি প্রসঙ্গে গুরুনাথ বলেন,

যে, দ্রব্য মাত্রেরই একটি বিশেষ গুণ আছে, যতক্ষণ দ্রব্য থাকে ততক্ষণ ঐ বিশেষ গুণ থাকে এবং এক সময় ঐ দ্রব্যে লীন হয়। শব্দকে বায়ুর বিশেষ গুণ মানলে এ নিয়ম রক্ষা পায়না। স্পর্শ বায়ুর বিশেষ গুণ, যতক্ষণ বায়ু আছে ততক্ষণ তার বিশেষ গুণ স্পর্শও থাকে। শব্দ সেরকম নয়। বায়ু থাকাতেও শব্দ নষ্ট হয়। অতএব শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ নয়। এভাবে প্রমাণ করা যায় শব্দ তেজঃ, অপ বা ভূমির বিশেষ গুণ নয়। অতএব শব্দ যার বিশেষ গুণ তা-ই আকাশ।[১০]

আবার, কারণে যেরূপ গুণ থাকে উৎপন্ন বস্তুতেও সেরূপ গুণ হয়ে থাকে। শব্দ বেণুবীণাদির ধর্ম হলে বেণু প্রভৃতির অবয়বের যেরূপ শব্দ তাদের শব্দও সেরূপ হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়না। কাজেই বেণুবীণাদি শব্দের অধিকরণ নয়। বেণু বীণা বা মৃদঙ্গে আঘাত করলে সেখানকার আকাশে শব্দের উৎপত্তি হয়। এজন্য আকাশ অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। শব্দ যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুতের গুণ নয় সেরকম আত্মারও গুণ নয়, মনেরও গুণ নয়। কেননা শব্দ সমবায় সম্বন্ধে আত্মায় থাকে না আবার মন অণু বলে তার গুণ প্রত্যক্ষ হতে পারে না। অতএব শব্দ আকাশের গুণ।

আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ আর উৎপাদক আকাশ থেকে প্রাপ্ত গুণ শব্দ। তেজের বিশেষ গুণ রূপ এবং উৎপাদক বায়ু থেকে প্রাপ্ত গুণ শব্দ ও স্পর্শ। অপের বিশেষ গুণ রস এবং উৎপাদক তেজ থেকে প্রাপ্ত গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ। ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ এছাড়া উৎপাদক অপ থেকে প্রাপ্ত শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস।[১১] কেউ কেউ বলেন আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ,

---

[৮] গুণত্রয়ের এ ধারনাটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় গুণত্রয়বিভাগযোগে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রী ভাগবতেও আছে (ভাঃ ৩/২৯/৭-১৪) সাংখ্যদর্শনে আছে (বাচস্পতি মিশ্র, তত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যপ্রবচন সূত্র)আবার অনেকে মনে করেন, শংকরের মায়া ও সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি একই (দ্রষ্টব্য, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৩২৩।
শ্রী জগদীশ ঘোষ বলছেন, "সাংখ্যের ভাষায় যাহা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বেদান্তের ভাষায় তাহাই অজ্ঞান বা মায়া", দ্রষ্টব্য, শ্রী জগদীশ ঘোষ, শ্রীগীতা, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৪৩। উপনিষদেও এ গুণত্রয়ের বিষয় আছে (দ্রষ্টব্য, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৮৩, অধ্যায় পাঁচ, শ্লোক-৭)।

[৯] দ্রষ্টব্য, পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক, শ্রীমদ্ভাগবৎ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরকৃত

[১০] এ যুক্তি বৈশেষিক দর্শনেও প্রয়োগ করা হয়েছে।
দ্রষ্টব্য, S.C. Chatterjee & D.M.Dutt. *Indian Philosophy,* পৃ: ১২৭-১২৮।

[১১] মনুসংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে আছে-
আদ্যাদ্যস্য গুণন্তেষা মবাপ্নোতি পর: পর:। যো যো যাবতিথ শ্চৈষাং স স তাবদ্ গুণ: স্মৃতি:।।

বায়ুর একমাত্র গুণ স্পর্শ, তেজের একমাত্র গুণ রূপ, অপের একমাত্র গুণ রস ও ক্ষিতির একমাত্র গুণ গন্ধ। অন্যেরা তা স্বীকার করেন না। তবে পঞ্চীকরণের পরে ঐ সকল গুণ যুক্ত হয় একথা সবাই স্বীকার করেন। [১২]

জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি- তাদের বিষয়ও শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। আর এরা আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও ভূমির বিশেষ গুণ। কাল ও দিক আকাশ থেকে আলাদা পদার্থ নয়- কাজ ভেদে নাম ভেদ মাত্র। যেমন একই মানুষ কারও পিতা কারও পুত্র কারও স্বামী কারও ভাই... সেরকম একই আকাশ কাজ ভেদে আকাশ দিক ও কাল সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। আবার একই কাল ক্রিয়া দ্বারা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। একই দিক উপাদি ভেদে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। কাল ও দিক যে একই এ বিষয়ে বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনে বলা আছে।

আগে বৈজ্ঞানিকেরা আকাশ মানতেন না, বর্তমানে ইথার নামে এক পদার্থ স্বীকার করছেন। তা বায়ু থেকে সূক্ষ্ম। আকাশই বায়ু থেকে সূক্ষ্ম। বৈজ্ঞানিকদের মতে ইথারের স্পন্দন আছে, আকাশেরও ক্রিয়া আছে। তবে এখনও বৈজ্ঞানিকেরা শব্দকে আকাশ ধর্ম বলে সিদ্ধান্ত করতে পারেন নাই। আকাশ সৃষ্টির পরে বায়ুর সৃষ্টি। বায়ুতে গুরুত্ব নাই। তবে বর্তমানে বায়ুতে যে গুরুত্ব আছে বলে বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন সে বায়ু বিশুদ্ধ বায়ু নয় পঞ্চীকৃত বায়ু। বায়ুর পরে তেজের উৎপত্তি, রূপ যার বিশেষ গুণ। তেজের পরে অপ বা তরল পদার্থের সৃষ্টি এর স্নেহ নামক গুণ আছে। যে গুণে চূর্ণ দ্রব্য পিন্ডাকার হয় তা-ই স্নেহ। অপের পরে ক্ষিতির উৎপত্তি এর বিশেষ গুণ গন্ধ। বর্তমান বায়ুতে বা জলে যে গন্ধ তাও ক্ষিতির গন্ধ। পঞ্চীকৃত হওয়ার পরে ঐ গন্ধ যুক্ত হয়েছে।

ভূমি জল আগুন ও বায়ু এ চারটি ভূতের দু'রকম ভাব অনুভূত হয়- এক পরমাণু অংশ দুই স্থূল অংশ। কোন পদার্থের যে সূক্ষ্মতম অংশ আর ভাগ করা যায় না তাকে পরমাণু বলে। পরমাণু অনেকে স্বীকার করেন আবার অনেকে করেননা। আমাদের মতে পরমাণু আছে তবে তা প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমেয়। কোন পদার্থকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ইত্যাদি রূপে ভাগ করতে করতে শেষে যে সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ থাকে তা-ই পরমাণু।কেউ বলতে পারেন যে, বিভাগের শেষ হয়না।সেখানে প্রধান দোষ এই যে, সকলই যদি অনন্তরূপে সূক্ষ্ম হতে পারে তবে প্রত্যক্ষদৃষ্ট স্থূল সূক্ষ্ম বিভাগ আর থাকে না, তাহলে পাহাড়ের ও সরিষার তুল্য পরিমাণের আপত্তি হতে পারে না। কেউ বলতে পারেন যে ভাগ করতে করতে শেষে কিছুই থাকেনা। এটা গণিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা। প্রথমে থাকলে শেষেও থাকবে। শেষে যদি কিছু না থাকে তাহলে প্রথমেও কিছু ছিলনা, কিন্তু প্রথমে কিছু ছিল যাকে ভাগ করা হয়েছে। গণিতের নিয়ম অনুসারে ভাজ্য=ভাজক × ভাগফল। ভাগফল=০ হলে, ভাজ্যও=০ হবে। অতএব পরমাণু স্বীকার করতে হয়।

---

[১২] আকাশে চাবিশেষাৎ। ব্রহ্মসূত্র ২/২/১৪
আগমপ্রামাণ্যাৎ তাবৎ 'আত্মন আকাশ সম্ভূমঃ' ইত্যাদি শ্রুতিভ্য আকাশস্য চ বস্তুত্বপ্রসিদ্ধিঃ। শংকরাচার্য, শারীরিক ভাষ্য ২/২২৪

চারটি ভূতের পরমাণু ছাড়া অন্য অংশ(স্থূল) তিন প্রকার- শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। শরীর ভোগের আলয়, ইন্দ্রিয় ভোগের করণ (ভোগ সাধনের উপায়), আর যার উপলব্ধিতে ভোগ হয় তা-ই বিষয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় ছাড়া ভোগ-সাধন ভূত চারটিই বিষয়। বিষয়ের উপলব্ধি হল ভোগ। ভোগ সাধনতার কারণে শরীর ও ইন্দ্রিয় এরাও বিষয় বটে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ধর্মের কারণে তাদেরকে পৃথকভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।পাঁচটি ভূতের পাঁচটি সত্ত্বাংশ দ্বারা পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি রজোগুণাংশ দ্বারা পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ আকাশের সত্ত্বাংশ দ্বারা কর্ণেন্দ্রিয় এবং রজোঅংশ দ্বারা বাক্, বায়ুর সত্ত্বাংশ দ্বারা ত্বক এবং রজোগুণাংশ দ্বারা হাত, তেজের সত্ত্বাংশ দ্বারা চক্ষু এবং রজোগুণাংশ দ্বারা পা, অপ অর্থাৎ তরল দ্রব্যের সত্ত্বাংশ দ্বারা রসনা এবং রজোঅংশ দ্বারা পায়ু আর ক্ষিতির সত্ত্বাংশ দ্বারা নাসিকা এবং রজোঅংশ দ্বারা উপস্থের উৎপত্তি হয়েছে।

পাঁচটি ভূতের পাঁচটি সত্ত্বাংশ ও পাঁচটি রজোঅংশ দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে দশটি বহিরিন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়েছে এবং সমষ্টিভাবে অন্তকরণ ও প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। অন্তকরণ চারভাবে বিভক্ত- মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। মন সংশয়াত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, অহংকার দর্প বিষয়ক এবং চিত্ত স্মরণ বিষয়ক। প্রাণ বৃত্তি (স্থিতি/অবস্থান) ভেদে পাঁচরকম- প্রাণ হৃদয়ে, অপান মলদ্বারে, সমান নাভিদেশে, উদান কণ্ঠদেশে এবং ব্যাণ সর্বশরীরে অবস্থান করে।[১৩]

শরীর[১৪] তিন প্রকার- কারণ শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর।এ তিন প্রকার শরীর পাঁচটি ভূত থেকে উৎপন্ন। পঞ্চভূতের উপরে জ্ঞান শক্তির সঞ্চালনে কারণ শরীরের, ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি হয়েছে। জীবের সমস্ত ব্যাপার তিন ভাগে বিভক্ত- জ্ঞান কর্ম ও ভোগ। জ্ঞানযোগে কারণ শরীর, কর্মযোগে সূক্ষ্ম শরীর এবং ভোগের জন্য স্থূল শরীর। কারণ ও সূক্ষ্ম শরীরেও ভোগ হয় তবে স্থূলে ভোগের পরাকাষ্ঠা হয়।[১৫]

এই তিন প্রকার শরীরেই অন্তকরণ আছে, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। এরপর পরমপুরুষ জীবগণের ভোগের জন্য ভোগ্য অন্ন পানাদির ও ভোগায়তন জরায়ুজাদি শরীরের উৎপত্তির জন্য পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চীকৃত করলেন। পঞ্চীকরণের প্রণালী এ রকম- মূল ভূতের $\frac{১}{২}$ অংশের সাথে অন্যান্য চার ভূতের প্রত্যেকটির $\frac{১}{৮}$ অংশ যুক্ত করলে পঞ্চীকৃত ভূত তৈরী হল।[১৬]

---

[১৩] পঞ্চভূত ও এদের পঞ্চীকরণ এবং তা থেকে উৎপত্তিক্রম :
এ বিষয়গুলি শ্রীমদ্ভাগবত বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরকৃত সংস্কৃত উপনিষৎ পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক ও ভূতবিবেক অংশ থেকে গুরুনাথ গ্রহণ করেছেন। তবে পঞ্চদশীতে অন্তকরণ বৃত্তিভেদে দুরকম- মন ও বুদ্ধি, আর বেদান্ত কারিকায় আছে যে, মন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত এ চারটি নিয়ে অপ্তকরণ। গুরুনাথ এ মত গ্রহণ করেছেন। তুলনীয়- ১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২৩৬ (৩/৯/২৬), ২। প্রশ্ন উপনিষদ ৩৪, ৩৫।

[১৪] শরীর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আচার্য গুরুনাথ তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা বইয়ে এবং দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অসীমত্ব নামক প্রবন্ধে করেছেন। আমরা জীব শরীর/দেহ অংশে সে আলোচনা দেখেছি। এখানে শুধু পূর্ববর্তী শাস্ত্রের আলোচনা করা হয়েছে।

[১৫] কাল্যুদ্ধাম্নায়তন্ত্রম্।

[১৬] পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক অংশ। গুরুনাথ পঞ্চীকরণের প্রমাণ দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য, শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ: ২৩৫।

অন্তকরণের যে চারটি বৃত্তি- তার মধ্যে বুদ্ধি প্রধান। চিত্ত-বিহীন, অহংকার শূন্য, লীনমনাঃ মানুষ হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিহীন বুদ্ধি সম্পর্কবিহীন মানুষ কখনও থাকতে পারেনা। এ বুদ্ধিবৃত্তি প্রায় চিরসঙ্গিনী। বুদ্ধিবৃত্তি আবার তিন প্রকার- সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। অন্তকরণ জড়; সেজন্য জড়ের সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ এতেও আছে। তামসী ও রাজসী বুদ্ধি থেকে মুক্ত হলেও জীবত্বধ্বংস বা পরমাত্মত্ব না পাওয়া পর্যন্ত সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নিরন্তর থাকে। তখন ঐ সাত্ত্বিকী জড়াত্মিকা বুদ্ধিতে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় কারণ সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ। বুদ্ধির বিশেষ গুণ বা বিষয় নিশ্চয়। বুদ্ধির পরেই অহংকার। শরীর মন প্রাণ এগুলি আত্মা নয়; কিন্তু ঐ সকলকে আত্মা বলে যে জ্ঞান এবং ঐরূপ বিকৃত জ্ঞানের জন্য শরীরাদির প্রয়োজন মিটানোর জন্য যে অতিশয় আগ্রহ, এমনকি ওদের বিকৃতিতে আপনি বিকৃত... ইত্যাদি অবস্থা যে অন্তকরণ বৃত্তি দ্বারা ঘটে, তাকে অহংকার বলে।

অন্তকরণের তৃতীয় অংশ মন। সংশয় এর বিষয় এবং এর অসাধারণ ধর্ম সংকল্প। যখন জীবভাবের সূচনা হয় তখনই বুদ্ধি ও অহংকারের উৎপত্তি হয়- এ সময়ে মনও উৎপন্ন হয়। রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের সাথে চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে ঐসব বিষয়ের উপলব্ধি হয়। কিন্তু পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাথে পাঁচটি বিষয়ের সংযোগ বা সম্বন্ধ হলেই ঐ পাঁচরকম জ্ঞান হয়না। মনসংযোগ না হলে জ্ঞান হয়না। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাথে পাঁচটি বিষয়ের সম্বন্ধ হলেও যেখানে মনের সম্বন্ধ থাকে সেখানেই জ্ঞান হয়। মনের সম্বন্ধ না থাকলে সেখানে কেবল বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হলেই জ্ঞান জন্মেনা।

অন্তকরণের চতুর্থ অংশ চিত্ত। স্মরণ এর বিষয়।[১৭] আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান পাই তা এ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সত্ত্বাসাপেক্ষ। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ অনুভব করি। এ পাঁচটির আধার আছে। এ আধার পাঁচটি- ব্যোম বায়ু তেজ জল (তরল পদার্থ) ও ভূমি।

ভূত সৃষ্টির পরে মন্ডলসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে আকর্ষণ প্রধান সুর মন্ডল পরে বিকর্ষণ প্রধান অসুর মন্ডলের সৃষ্টি। এখন যেসব সূর্যমন্ডল দেখা যায় সেগুলি সুরমন্ডল থেকে এবং যেসব ধূমকেতু দেখা যায় সেগুলি অসুরমন্ডল থেকে সৃষ্ট। আমরা যে সৌরজগতে বাস করছি তা দৃশ্যমান সূর্যমন্ডল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সূর্যের নয়টি প্রধান গ্রহ ও ১৪৮টি অপ্রধান গ্রহ আবিস্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর একটি, মন্ডলের দুটি, বৃহস্পতির চারটি, শনির আটটি, হর্শেলের ছয়টি ও নেপচুনের দুটি উপগ্রহ আবিস্কৃত হয়েছে। সূর্যমন্ডলের চারদিকে তেজোময় বাস্পরাশি আছে, তা থেকে সূর্যমন্ডলে ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে তেজ ও জ্যোতি পড়ে।

প্রথম অবস্থায় জ্যোতিষ্ক বা মন্ডলসমূহের উপরিভাগ এত উত্তপ্ত ছিল যে, সেখানে প্রাণী বা উদ্ভিদ উৎপন্ন হতে পারতো না। আস্তে আস্তে শীতল হয়ে জীব ও উদ্ভিদের বাসের উপযুক্ত হয়েছে তবে অভ্যন্তরভাগ এখনও বেশ উত্তপ্ত আছে। বর্তমানে যেমন এই পৃথিবীতে নানা জাতীয় উদ্ভিদ ও

---

[১৭] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ ২০৮-২০৯

বিভিন্ন জীব বাস করছে তেমনি অন্যান্য বহু সংখ্যক গ্রহ ও উপগ্রহে, এমনকি সূর্যমন্ডলেও নানা জাতীয় উদ্ভিদ ও জীব বাস করছে। পৃথিবীতে যেমন স্থানভেদে ৬ মাস থেকে ১০ $\frac{১}{২}$ ঘণ্টা পর্যন্ত দিন দেখা যায়; সেরকম ঐসব জ্যোতিষ্কে বৎসরের পরিমাণ আমাদের ৮১ দিন থেকে ১৬৫ বৎসর পর্যন্ত সময় দেখা যায়। পৃথিবীর মানুষ যেমন ২৪ ঘন্টা দিন ধরে তাদের দৈনিক কাজ সমাধা করে সেরকম ঐসব অতিঅল্প বা অতিদীর্ঘ দিনমান বিশিষ্ট জ্যোতিস্কের অধিবাসীগণ নিজ নিজ কাজের সে রকম ব্যবস্থা করে কাল যাপন করছে।

পঞ্চভূত বা সৃষ্টিতত্ত্বের এ বিষয়গুলো বর্ণনার সাথে আচার্য গুরুনাথ একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষীয় মনীষিগণ অধ্যাত্মশক্তি প্রভাবে বা সূক্ষ্মদেহ ধারণ দ্বারা এ সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের আবিস্কারে সমর্থ ছিলেন ও আছেন। একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির চালনা দ্বারা তার অন্যথা করা পৃথিবীর কোন মানুষের সাধ্য নয়।[১৮] এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি বিষয় প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরতে পারি। আচার্য গুরুনাথ সৃষ্টি প্রকরণে উল্লেখ করেছেন হর্শেল বা ইউরেনাস গ্রহের ছয়টি উপগ্রহ। কিন্তু আমরা জানি, গুরুনাথের এ বই প্রকাশের সময় বৈজ্ঞানিকদের আবিস্কার ছিল চারটা- Titania, Overan, Arial ও Ambriall.Miranda ও Puch আবিস্কৃত হয় যথাক্রমে ১৯৪৮ ও ১৯৮৫ সালে। আর আচার্য গুরুনাথ উল্লেখ করেছেন ইউরেনাস গ্রহের ছয়টি উপগ্রহ, তাঁর সে বই প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৭ সালে।

সূর্যের প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ যা বলেছেন, তাও তখন বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করতে পারেন নাই। বহু সংখ্যক গ্রহ উপগ্রহে এমনকি সূর্যমন্ডলে উদ্ভিদ ও প্রাণের অস্তিত্বের যে কথা তিনি বলেছেন তাও এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। অধ্যাত্ম শক্তি প্রভাবে আবিস্কারের আরও এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যেমন সূর্যের অপ্রধান গ্রহের বিবরণ গুরুনাথ যা লিখেছেন, বর্তমান বিজ্ঞানীদের আবিস্কারের সাথে তার মিল নেই। আবার শব্দের গতির বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন- বায়ুতে শব্দের গতি ১১০০'/সে., জলে ৪৪০০'/সে., কাষ্ঠে ও লৌহে শব্দের গতি আরও বেশী। কিন্তু অধ্যাত্মশক্তি বলে যা জানা গেছে তা এর বিপরীত। সেমতে উৎপাদক আকাশে শব্দগুণ বেশী, এভাবে ক্রমশঃ নিম্নের দিকে যাবে।

তবে বৈজ্ঞানিকদের ঐরূপ ফলের কারণ প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথ বলেন যে, যে যেরূপ অবস্থাপন্ন তারপক্ষে সেরূপ অবস্থার উপলব্ধি বেশী হয়। দুঃখী দুঃখীর অবস্থা, সন্তানহীনা সন্তানহীনার অবস্থা বেশী অনুভব করে। আমরা স্থূলতম দেহধারী এজন্য স্থূল ভূমির ক্রিয়া আমাদের সবচেয়ে বেশী অনুভব হয়, এর চেয়ে সূক্ষ্ম যেগুলি তাদের ক্রিয়া সেরকম অনুভব করতে পারিনা। এজন্য ভূমিতে শব্দের গতি যত বোধ হয় অন্য ভূতে সেরকম হয়না। নতুবা জল বায়ু প্রভৃতির শব্দগুণ ভূমির চেয়ে অল্প নয় বরং বেশী। এ বিষয়টি পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণ করা যায়। জলে নিমগ্ন ব্যক্তি জলের ভিতরের শব্দ যত দ্রুত শুনতে পারে, জলের উপরে থেকে কোন ব্যক্তি

---

[১৮] দ্রষ্টব্য, শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ২১৬

সেরকম শুনতে পারেনা। এরকম ভূমি মধ্যে প্রোথিত কোন ব্যক্তি ভূমির মধ্যে উৎপন্ন শব্দ যত দ্রুত শুনতে পায় ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে কোন ব্যক্তি সে শব্দ তত দ্রুত শুনতে পায়না।[১৯]

উদ্ভিদ সৃষ্টি সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথের মত :

তেজের বিকারে যখন তরল পদার্থ ও তরল পদার্থের বিকারে যখন ভূমি বা কঠিন পদার্থের উৎপত্তি হয় তখনই সেই সেই পদার্থে পরম পুরুষের ইচ্ছা অনুসারে বিবিধ উদ্ভিদ ও নানা জাতীয় জীবের বীজ নিহিত হয়। এই উদ্ভিদ বীজ থেকে উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে এবং হচ্ছে। এ ছাড়া উদ্ভিদ উৎপন্ন হবার পরে তাতে বীজাদি উৎপন্ন হলে তা থেকেও অন্যান্য উপায়ে উদ্ভিদ জাত হচ্ছে।

জীব সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর মত :

উদ্ভিদ ও জীব প্রায় এক নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে। জল ও ভূমির উৎপত্তি সময়ে তাতে উদ্ভিদ বীজের মত জীবসৃষ্টির জন্যও বীজ সন্নিবেশিত হয়েছিল। সেই বীজ থেকে প্রথম জীবের সৃষ্টি হয়। পরে উদ্ভিদ থেকে জাত বীজ থেকে যেমন অন্য উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে, সেরকম পূর্বের উৎপন্ন জীবগণের স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে জীব সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে।

প্রথম উৎপত্তি প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দ্বারা আচার্য গুরুনাথ তাঁর নিজমত সমর্থনের কথা বলছেন। যেমন, কোন স্থানে গর্ত করে সেখানে জল রেখে দিলে দেখা যাবে কয়েকদিন বা কয়েকমাস যেতে না যেতে সেখানে ছোট ছোট মাছ উৎপন্ন হয়েছে। এ মাছ কোথা থেকে আসল? অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ঐ মাছের বীজ মাটিতে বা জলে ছিল। আবার কোন পাত্রে জল রেখে ঢেকে রাখলে কিছুকাল পরে ঐ জলে পোকা জন্মে বা মশা জন্মে। এ থেকেও স্বীকার করা যায় যে ঐ জলে বা জলান্তর্গত ভূমিতে ঐ পোকা বা মশার বীজ নিহিত ছিল।এ নিয়মে যে কেবল ছোট ছোট জীবের সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। বড় বড় জীব যেমন গন্ডার হাতী প্রভৃতিও ঐ নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে। এমনকি জীবশ্রেষ্ঠ মানুষও ঐ নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে। পরে উদ্ভিদাদির মত স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে।

এ বিষয়ে আপত্তি হতে পারে যে, এ নিয়মে যদি আদিম জীবসৃষ্টি হয়ে থাকে তবে এখন তা দেখা যায়না কেন? এর উত্তরে তিনি বলছেন যে, যেসব মন্ডলে এখনও জীবের উৎপত্তি হয় নাই সেখানে ঐ নিয়মের সবিশেষ প্রয়োজন ও সেভাবেই সেখানে জীবের উৎপত্তি হচ্ছে। কিন্তু যেসব মন্ডলে জীবের উৎপত্তি হয়েছে , সেখানে ঐ নিয়মের প্রয়োজন নাই । কেননা সেখানে জীব-দম্পতি হতেই জীবের উৎপত্তি হচ্ছে। যেখানে বহুজীব থাকে সেখানে খাদ্যাদির সহযোগে ঐ সকল মূল বীজ জীবগণের দেহস্থ হয়ে যায় অথবা জীবগণের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ও উত্তাপাদির জন্য ঐ সব বীজ কার্যকর হতে পারেনা অর্থাৎ আদিম উৎপত্তির মত কাজ করতে পারেনা;এই কারণেই প্রথম নিয়ম পরে দেখা যায় না।

---

[১৯] ঐ, ঐ, পৃ. ২১৩-২১৫

এভাবে কয়েক যোড়া জীব বা অন্তত: এক যোড়া জীব উৎপন্ন হবার পরে বর্তমান দৃশ্যমান প্রণালীতে এক এক জাতীয় বহুজীবের উৎপত্তি হয়েছে ও হচ্ছে। জীবের মধ্যে প্রথমে জলচর জীবের সৃষ্টি হয়। জলচরদিগের মধ্যেও প্রথমে মাছ উৎপন্ন হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। বহু জলচর জীবের সৃষ্টির পরে উভচর জীবের উৎপত্তি হয়। উভচর জীবদের মধ্যে প্রথমে কূর্ম্মের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা যায়। এরপর স্থলচর জীবের সৃষ্টি হয়। স্থলচর জীবের মধ্যে প্রথমে বরাহের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমিত হয়। এভাবে বহু স্থলচর জীবের উৎপত্তির পরে মানুষ জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

অনন্ত শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষের ইচ্ছায় পূর্বে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ বলা হয়েছে, সে নিয়মে নর-নারী উৎপন্ন হলে তাদের মৈথুনধর্মে বহু সংখ্যক নর-নারী উৎপন্ন হল। বাইবেল অনুসারে আদি নরের নাম আদম(আদিম) এবং আদি নারীর নাম ইভ বা হবা। এ উভয় নামই গুণ অনুসারে হয়েছে। তখন বহু সংখ্যক নর-নারী না থাকায় নামের প্রচলন বা প্রয়োজন ছিল না। আদিতে উৎপন্ন বলে আদিম এবং প্রথম উৎপত্তি সাধন হোমক্রিয়া (রমন ক্রিয়া) যাতে করা হয়েছিল সে নারী 'হবা' নামে খ্যাত হয়েছে।[২০]

মনুসংহিতায় আছে যে, ব্রহ্মা নিজদেহ দুইভাগ করে এক অংশ দ্বারা পুরুষ অন্য অংশ দ্বারা নারী হলেন। সেই নর-নারীর মৈথুন ক্রিয়ায় 'বিরাট' পুরুষ নির্মিত হলেন।[২১] সেই বিরাট পুরুষ থেকে মনুর উৎপত্তি।

দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রচলিত যাবতীয় ধর্মগ্রন্থে প্রথমে একটি নর ও একটি নারীর উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পারলৌকিক মহাত্মারা বলেন যে, পৃথিবীতে প্রথমে ষাট জোড়া নর-নারীর উৎপত্তি হয়। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বহুস্থানেই একটি নর ও একটি নারী জন্মেছিলেন। আসিয়া (এশিয়া) খন্ডেই বহু দম্পতির উদ্ভব হয় এজন্য এর নাম আসিয়া বা আস্যখন্ড। যার অর্থ সর্বপ্রধান অংশ।

প্রথম সৃষ্টিতে সব জীবই (মানুষ বা অন্যজীব) দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ ও বিশাল দেহসম্পন্ন ছিল বলে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। জলচর জন্তুর বর্ণনা শাস্ত্রে যা পাওয়া যায় সেসব কেবল মহাসাগরেই চলতে পারতো। যে সকল মহাকূর্ম, মহাপশু ও অতিকায় হাতীর প্রস্তরময় কঙ্কাল বা প্রকৃত কঙ্কাল পাওয়া যায় তা এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়। মানুষও প্রথমে অতি বৃহৎ আকার বিশিষ্ট ছিল। বাস্তবে ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন না হলে হিংস্রজন্তুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়া অসাধ্য হত। তারা সেকালে গৃহ নির্মাণে ও অস্ত্র নির্মাণে অশক্ত ছিল, জ্ঞানধর্মে অনুন্নত ছিল, শারীরিক বলই ছিল তাদের বেঁচে থাকার সম্বল। ক্রমে খাদ্য লাভের উপায় নির্ধারণ, অধ্যাত্ম তত্ত্বে মনোযোগী ও গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে যখন মানুষ অগ্রসর হল তখন শারীরিক পরিশ্রম তাদের একমাত্র অবলম্বনীয় ছিলনা এজন্য শরীর ক্রমশ খর্ব হতে লাগল।

---

[২০] হূয়তে রমণধর্মেন হোমক্রিয়া সম্পাদ্যতে অস্যামিতি হবা।

[২১] দ্রষ্টব্য, মনু সংহিতা, ১মঃ ৩২ শ্লোক

পরমেশ্বর জগতের কিরূপ কারণ :

জগৎ সৃষ্টি; এর কারণ পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক গুণ (যা অব্যক্ত নামে পরিচিত) থেকে আকাশের উৎপত্তি হয়েছে। এ আকাশ সমস্ত জড়জগতের মূল। সুতরাং জড়জগৎ পরমেশ্বরের গুণ বিশেষ থেকে উৎপন্ন এবং চৈতন্যাংশ তাঁর সাক্ষাৎ অংশ। অতএব পরমেশ্বর এ জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ।

সৃষ্টির আদি আছে কি-না (অনাদি না সাদি) এ বিষয়ে আচার্য গুরুনাথের মত এই যে, এ জগৎকে সৃষ্টি বলে মানলে সৃষ্টিকে সাদি অর্থাৎ আদি বিশিষ্ট বলতে হয়। সৃষ্টি শব্দটি ক্রিয়া। ক্রিয়া মাত্রই সকর্তৃক অর্থাৎ কর্তার পরে ক্রিয়া ঘটে। সুতরাং কর্তাই আদি; কাজেই সৃষ্টি অনাদি হতে পারেনা। অনাদি জগদীশ্বরই সৃষ্টির আদি।

তবে আচার্য গুরুনাথ মনে করেন এ বিষয়ে আপত্তি হতে পারে। যেমন- সংসার অনাদি স্বীকার করতে হয়, কারণ তা না হলে কোন একসময়ে এর প্রথম উৎপত্তি বা আদিসর্গ স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া অন্য একটি কারণেও আদি সর্গ বা প্রথম উৎপত্তি স্বীকার করা অসমীচীন বলে মনে হয়। ভোগের জন্য শরীরের উৎপত্তি কেননা শরীর ভোগের অধিষ্ঠান। সুখ দুঃখ ভোগ হয় পুণ্য পাপের জন্য। পুণ্য ও পাপ শরীর দ্বারা নিস্পন্ন হয়। আদি সৃষ্টি মানলে তার আগে শরীর ছিলনা। কাজেই আদি সৃষ্টিতে যে ভোগ তা কর্মজনিত হতে পারেনা, তা আকস্মিক। আদি সর্গের সুখ দুঃখ ভোগের বৈষম্য যদি নিমিত্তহীন হয় অর্থাৎ কর্মছাড়া হয় তা হলে অকৃতাভ্যাগম (যা করা হয় নাই, তার জন্য ফলভোগ) দোষ হয় কেননা ইতিপূর্বে কর্ম করা হয় নাই অথচ কর্মফল সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। এই ফলভোগের প্রাথমিক বৈষম্য সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাধীন বলতে হয়। কাজেই যা করা হয় নাই তার ফলভোগের জন্য সৃষ্টিকর্তার বৈষম্যদোষ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ কারণে সংসারকে অনাদি বলাই যুক্তিসিদ্ধ।

এ আপত্তির উত্তরে আচার্য গুরুনাথ বলেন যে, আদিসর্গের ভোগ কর্মজনিত নয়, গুণজনিত। আদি সৃষ্টিতে যেসব জীব সৃষ্টি হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের এক একটি গুণ অধিকতরভাবে উন্নত থাকে এবং তারা সকলেই গড়ে তুল্য গুণবিশিষ্ট থাকে। সুতরাং এতে সৃষ্টিকর্তার কোনরূপ বৈষম্য দোষ হতে পারেনা। প্রতিজীব সেই অনন্ত স্বাধীনের অংশ। সকলেরই কর্মসম্পাদন বিষয়ে স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতায় পরিচালিত হয়ে যে যেরূপ কাজ করে ঐ জন্মে ও জন্মান্তরে সে সেরূপ ফলভোগ করে।

আচার্য গুরুনাথের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে সৃষ্ট আত্মায় পূর্ণ পরমাত্মার অনন্তগুণের কণা কণা অংশ রয়েছে। সুতরাং সৃষ্ট আত্মা অপূর্ণ এবং তাতে যে গুণগুলো রয়েছে সেগুলো সীমাবদ্ধ, অসীম নয়। উৎকৃষ্ট সীমাবদ্ধ গুণসমূহের যোগে অপকৃষ্ট ও মিশ্রগুণের উৎপত্তি হতে পারে। অপকৃষ্ট গুণের অন্য নাম দোষ এই দোষ দ্বারা পরিচালিত কাজের দ্বারা অমঙ্গল উৎপন্ন হতে পারে। কাজেই উৎকৃষ্ট সীমাবদ্ধ গুণের দ্বারা ভাল কাজও হতে পারে ,মন্দ কাজও হতে পারে। ফলে, যে যেরূপ কাজ করে সে সেরূপ ফল ভোগ করে।

কাজেই বলা যায় সৃষ্টি অনাদি নয় সাদি। শ্রুতিতেও সৃষ্টির সাদিত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।[২২] আবার কোরান বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রেও এরূপ উল্লেখ আছে। তবে এই সৃষ্টিকাল এত দূরবর্তী যে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য। যেমন ·৯ প্রকৃতপক্ষে একের তুল্য নয় কিন্তু একে ১ ধরে কাজ করায় স্থূল জগৎ সম্বন্ধে কোন ভুল হয়না; এ ক্ষেত্রেও সেরূপ গণিতজ্ঞদের ন্যায় দার্শনিকরা সৃষ্টিকে অনাদি বলেই ধরে নিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টি অনাদি নয়।

আচার্য গুরুনাথের সৃষ্টি-তত্ত্ব অনুসারে জগদীশ্বর জগদাদিরূপে পরিণত হন নাই, তাঁর গুণবিশেষের বিকারে এ ব্রহ্মান্ড উৎপন্ন হয়েছে। জগদীশ্বর অনন্ত অসীম, তাই সসীম পদার্থের দ্বারা তার উপমা দেয়া হলে তা সম্পূর্ণ হয় না। তবুও উপমা দিলে বুঝতে কিছুটা সুবিধা হয়। এজন্য একটা উপমা দেয়া যায়; যেমন- পুরুষের ঘর্মাদি থেকে কীটাদির উৎপত্তি হলেও তার শক্তির কোন ব্যাঘাত হয়না। সেরকম জগদীশ্বরের অনন্ত গুণের একটিমাত্র গুণের বিকারেই এ ব্রহ্মান্ডের উৎপত্তি হয়েছে।[২৩] সুতরাং তিনি কোন পদার্থরূপে পরিণত হন নাই। কোন কোন দার্শনিকের মতে ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন এবং কাহারও মতে এ জগৎ মিথ্যা একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, মায়াবশতঃ লোকে জগৎ দর্শন করে, মায়ার বিগমে সমস্তই ব্রহ্ম বলে প্রতীয়মান হয়। এর কোন মত তিনি অনুমোদন করেননি। তবে এটা নিশ্চিত যে, ব্রহ্ম জ্ঞান হলে সমস্ত ব্রহ্মান্ডই তন্ময় বলে প্রতীয়মান হয়।[২৪]

আচার্য গুরুনাথ তাঁর সৃষ্টি প্রকরণে যে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন, তার বিবরণ তৈত্তিরীয় উপনিষদ, কাল্যুর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রম্ জ্ঞানসংকলিনী, পঞ্চদশী, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আছে। এ সকল গ্রন্থ থেকে তিনি তাঁর উপযোগী বিষয়গুলো গ্রহণ করেছেন। সত্ত্ব, রজ: ও তমো গুণের বিষয় উপনিষদে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশেষত গুণত্রয়বিভাগযোগে এবং সাংখ্যদর্শনে উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে যে, জগতে সকল পদার্থই এই তিনগুণের ন্যূনাধিক্যে সৃষ্ট। ত্রিগুণ ভিন্ন পদার্থ নাই।[২৫] সাংখ্যদর্শন মতে, জগতের মূল উপাদান প্রকৃতি, একে প্রধান, অব্যক্ত, ত্রৈগুণ্য ইত্যাদি বলা হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে সত্ত্ব, রজ: তম: এই তিনগুণ প্রকৃতি থেকে জাত।[২৬]

সাংখ্যদর্শনে আছে-

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ,

প্রকৃতের্মহান্,মহতোহহঙ্কার,

অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং,

---

[২২] ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪৫৪, শ্বেতাশ্বেতর ৫৫, ঐতেরীয় ১, তৈত্তিরীয় ৪৪

[২৩] তুলনীয় মুন্ডক উপনিষদ-৭

[২৪] শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা, পৃ. ২৭৯-২৮০

[২৫] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮/৪০

[২৬] ঐ, ১৪/১৫

তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি,

পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।[২৭]

অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকারে মহৎতত্ত্ব, মহতের বিকারে অহংকার, অহংকারের বিকারে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রের বিকারে পঞ্চমহাভূত, এই ২৪ তত্ত্ব এবং পুরুষ- এই ২৫ তত্ত্ব।

সৃষ্টি বা অভিব্যক্তিকালে প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভগ্ন হয়। আবার, প্রলয়কালে এ তিনগুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। নিরীশ্বর সাংখ্যে ও সেশ্বর বেদান্তাদিমতের মধ্যে একটি প্রভেদ আছে। সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতত্ত্ব। এমতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম, উহা স্বয়ংই সৃষ্টি করে। কিন্তু সেশ্বর মতে, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের কারণ।[২৮]

গীতায় সাংখ্যের পুরুষকে পরাপ্রকৃতি ও সাংখ্যের প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলা হয়েছে।[২৯] সাংখ্যের অভিব্যক্তি তত্ত্ব গীতায় নিম্নরূপ[৩০]

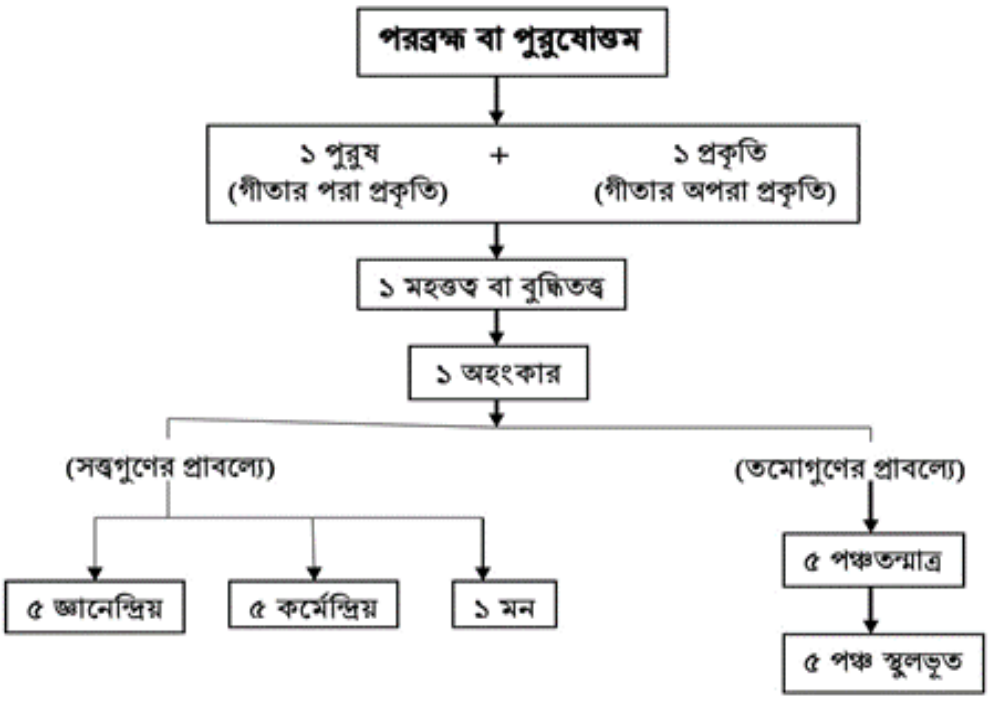

ভারতীয় দর্শনের এ দুই মতবাদ থেকে আচার্য গুরুনাথের তত্ত্বে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে এবং সৃষ্টি ক্রমটিও একরূপ নয়। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা, আর আচার্য গুরুনাথের তত্ত্বে প্রকৃতি হল অনন্ত গুণময়ের প্রেম গুণের একটি ধর্ম- যা এক হতে বহু হওয়ার ইচ্ছা। আবার, সাংখ্য প্রকৃতিকেই অব্যক্ত বলা হয়েছে। আচার্য গুরুনাথের

---

[২৭] সাংখ্য সূত্র ১/৬১

[২৮] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯/১০

[২৯] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭/৪-৫

[৩০] শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রী গীতা, কলিকাতা ১৯৯৬, পৃ. ২৫১

দর্শনে অব্যক্ত একটি গুণ যা প্রকৃতি থেকে পরমপুরুষ যোগে উৎপন্ন হয়। সাংখ্যদর্শন অনুসারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এ তিনটি গুণ নিত্য ও মৌলিক। এদের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। কিন্তু আচার্য গুরুনাথের মতে, এদের উৎপত্তি আছে। কেননা পরমপুরুষের ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি, যা তাঁর প্রেমগুণের ধর্ম। এই প্রকৃতিই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ বিশিষ্ট। আমরা এখানে আচার্য গুরুনাথে সৃষ্টিক্রম উল্লেখ করছি যাতে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়।

পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা পরমপুরুষ অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়; সুতরাং তিনি প্রেমময় (যেহেতু প্রেম একটি গুণ), প্রেমের ধর্ম বহুকে এক করা এবং এককে বহু করা। এককে বহু করার ইচ্ছার নাম বিবংহয়িষা। এই ইচ্ছাই সৃষ্টির প্রকৃতি। প্রকৃতি তিন প্রকার শক্তি বিশিষ্ট- সিসৃক্ষা, রিরক্ষিসা ও জিহীর্ষা যা যথাক্রমে সৃষ্টি করার ইচ্ছা, পালন বা রক্ষা করার ইচ্ছা ও ধ্বংস বা হরণ করার ইচ্ছা। এই তিন শক্তির কাজ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা হয়। কাজেই প্রকৃতি ঐ তিনগুণ সম্পন্না।

বিবংহয়িষা দ্বারা পরমাত্মা নিজেকে বহু করলেন। পরমাত্মার ঐ অংশসমূহ জীবভাবে (সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণে ও বিবিধ পাশে) বদ্ধ হতে লাগল। এই অংশের সহযোগে পরমপুরুষ থেকে অন্তকরণের উৎপত্তি হল। অন্তকরণ চারভাগে বিভক্ত- মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত।

এ সময়েই ঐ প্রকৃতি (ইচ্ছাশক্তি) থেকে পরমপুরুষ সহযোগে অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক একটি গুণ উৎপন্ন হল যা অব্যক্ত নামে অভিহিত। এই অব্যক্ত থেকে পরমপুরুষ সহযোগে ব্যোম উৎপন্ন হল, এই ব্যোমই জড়জগতের প্রকৃতি।

ব্যোম থেকে পরমপুরুষ যোগে বায়ু উৎপন্ন হল, বায়ু থেকে পরমপুরুষ যোগে আগুণ উৎপন্ন হল, আগুণ থেকে পরমপুরুষ যোগে জল উৎপন্ন হল, জল থেকে পরমপুরুষ যোগে মাটি উৎপন্ন হল।

পঞ্চভূতের পঞ্চসত্ত্বাংশ দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সমষ্টিভাবে অন্তকরণ উৎপন্ন হয়েছে। অন্তকরণ চারভাগে বিভক্ত- মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। পঞ্চভূতের পঞ্চ রজোঅংশ দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং সমষ্টিভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাণ অবস্থানভেদে পাঁচ রকম- প্রাণ হৃদয়ে, অপান মলদ্বারে, সমান নাভিদেশে, উদান কণ্ঠদেশে এবং ব্যান সর্বশরীরে। শরীর তিন প্রকার- কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। স্থূল শরীরের সংখ্যা ৩৯৯, সূক্ষ্ম শরীরের সংখ্যা পরার্ধ থেকে ৩৯৯ কম এবং কারণ শরীরের সংখ্যা অনন্ত। তিন প্রকার শরীরই পূর্বে উল্লেখিত পাঁচটি ভূত পদার্থ থেকে উৎপন্ন। পঞ্চভূতের উপরে জ্ঞানশক্তির সঞ্চালনে কারণ শরীর, ক্রিয়া বা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সূক্ষ্ম শরীর এবং ভোগের জন্য স্থূল শরীরের উৎপত্তি হয়েছে। এ তিন প্রকার শরীরেই অন্তকরণ ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে।

অনন্তর পরমপুরুষ জীবগণের ভোগের জন্য অন্ন পানাদির ও ভোগায়তন জরায়ুজাদি শরীরের উৎপত্তির জন্য পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চীকৃত করলেন। পঞ্চীকরণের প্রণালী হল- মূলভূতের অর্ধেকের সাথে অন্যান্য চার ভূতের প্রত্যেকটির $\frac{১}{২}$ অংশ যুক্ত করা।

বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বর মায়াশক্তির সাহায্যে যে ক্রম অনুসারে এ জন্য সৃষ্টি করলেন তা নিম্নরূপ :

প্রথমে ঈশ্বর থেকে আকাশের আবির্ভাব হল এবং তারপর ক্রমশ: একে একে বায়ু, অগ্নি, জল, অপ এবং ক্ষিতি- এই পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব ঘটল।[৩১] এ পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চীকৃত হলে পঞ্চমহাভূত হয়। যেমন- আকাশ মহাভূত= $\frac{১}{২}$ আকাশ তন্মাত্র + $\frac{১}{৮}$ বায়ুতন্মাত্র + $\frac{১}{৮}$ অগ্নি তন্মাত্র + $\frac{১}{৮}$ অপ তন্মাত্র + $\frac{১}{৮}$ ক্ষিতি তন্মাত্র। এভাবে অন্য মহাভূতসমূহ সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে ব্রহ্মান্ড, ব্রহ্মান্ডের অন্তর্ভুক্ত জরায়ুজ, অন্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ- এ চার প্রকার স্থূল দেহ ও এদের উপযোগী অন্ন পানি উৎপন্ন হয়। মানুষের স্থূলশরীর পঞ্চমহাভূতের দ্বারা এবং সূক্ষ্মশরীর পঞ্চতন্মাত্রের দ্বারা গঠিত।[৩২] শংকরাচার্য সৃষ্টির উপরিউক্ত বর্ণনা স্বীকার করেছেন তবে শংকরের মতে জগতের কোন পরামার্থিক সত্ত্বা নেই, ব্যবহারিক সত্ত্বা আছে।

কেউ কেউ আবার বলেন শংকরাচার্য উপনিষদোক্ত ত্রিবিৎকরণ[৩৩] প্রক্রিয়াকেই স্বীকার করেছেন। ত্রিবৃৎকরণ হল ক্ষিতি অপ ও তেজ তন্মাত্রের সংমিশ্রণ। এ প্রক্রিয়ায় স্থূল অগ্নি=$\frac{১}{২}$ অগ্নি তন্মাত্র+$\frac{১}{৪}$ অপ তন্মাত্র + $\frac{১}{৪}$ ক্ষিতি তন্মাত্র। এভাবে অন্য সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র থেকে মহাভূতের আবির্ভাব ঘটে। বায়ু ও আকাশ অন্যান্য ভূতের সাথে সংযুক্ত হতে পারেনা।[৩৪]

আচার্য গুরুনাথ ত্রিবৃৎকরণ গ্রহণ করেন নাই। তিনি পঞ্চদশীর পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন। তাঁর সৃষ্টি প্রকরণের ক্রম ও এর কোন মতের মত নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মৌলিক পদার্থের (elements) সংযোগে এই জড় জগৎ - এ রকম মত পোষণ করেন। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা এখনো নির্দিষ্ট করে বলা যায়না, কোন কালে বলা যাবে কি-না, তারও ঠিক নাই। সম্প্রতি তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এ সকল মূল ভূত পদার্থও এক চরম মহাভূতের বিকার মাত্র। এ চরম মহাভূতের নাম দিয়েছেন তারা প্রোটাইল (protyle)। শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ এ protyle-কে সাংখ্যের প্রকৃতির সাথে তুলনা করেছেন।[৩৫] আচার্য গুরুনাথের মতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের ভূত সংক্রান্ত মত ভ্রান্ত নয় তবে অসম্পূর্ণ। কেননা তাঁরা যে প্রণালীতে মূল পদার্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাতে মূল পদার্থের সংখ্যা নির্ণয় অসাধ্য। কারণ এখন যে কয়টি মূল পদার্থ স্থির করা হয়েছে, ১০ বছর পরে তা আরও বাড়তে পারে বা কমতে পারে, ২০ বছর পর আরো কিছু বাড়তে পারে বা কমতে পারে। কাজেই ভূত সংখ্যা নির্ণয় বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অপেক্ষা ভারতীয় প্রণালী উৎকৃষ্ট ও অচঞ্চল।[৩৬] তবে বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের তিন অবস্থা বহুদিন ধরে

---

[৩১] দ্রষ্টব্য, তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/১/৩

[৩২] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬২

[৩৩] ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/৩/৩

[৩৪] দ্রষ্টব্য, জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ১৯০

[৩৫] শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীগীতা, পৃ. ২৪৮

[৩৬] আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ. ২২০-২২১

স্বীকার করেন- solid, liquid ও gas। এছাড়া বর্তমানে Ether নামে এক শ্রেণী স্বীকার করেন। আর Energy সত্ত্বাও সকলেই স্বীকার করেন। কাজেই তাঁরাও প্রকারান্তরে এই পাঞ্চভৌতিক মতই স্বীকার করছেন।

পাঞ্চভৌতিক মতের সমর্থনে ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরানের বিভিন্ন আয়াত লক্ষণীয় :

"প্রথম সৃষ্টিতে তিনি শুকনা মাটি দ্বারা মানুষকে ও আগুন থেকে জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।"[৩৭]

"মানুষ সৃষ্টির সূচনা মাটি দ্বারা, পরে তাদের বংশকে পানির সারভাগ থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। মানুষের দেহকে ঠিক অনুপাতে গঠন করে নিজের তরফ থেকে রুহ ফুকিয়া দেন।"[৩৮]

"মানুষকে মাটির সারভাগ থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ...[৩৯] এই সৃষ্টিতে সবকিছু তিনি সুন্দর করেছেন এবং প্রয়োজন মত সকলের জন্য তিনি খাদ্য সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন বাতাস পানি প্রভৃতি।"[৪০]

---

[৩৭] আল কোরান ৫৫/১৪-১৫
[৩৮] ঐ, ৩২/৭-৯
[৩৯] ঐ, ২৩/১২
[৪০] ঐ, ১৫/১৬-১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপাসনা সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথের মত

আচার্য গুরুনাথের মতে, জীবাত্মার কর্তব্য হল, এই পাপ-পুণ্য মিশ্রিত জগতে থেকে জগতের পাপ অংশ যাতে তাকে স্পর্শ না করে, কেবল পুণ্য অংশ যাতে সে লাভ করতে পারে , সব সময় এ রকম পথে চলা। এ পথ লাভের উপায় ঈশ্বরের উপাসনা ও গুণসাধনা। মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন, জীবত্বধ্বংস বা পরমাত্মত্ব লাভ এবং ভগ্নাংশের অখণ্ড আকারে পরিবর্তন সাধন - এ তিনটি কাজ যে উপায়ে সম্পন্ন হতে পারে তা হচ্ছে প্রথমত: ঈশ্বরের উপাসনা ও দ্বিতীয়ত: সাধনা। গুরুনাথ এ বিষয় দুটিকে যথাক্রমে তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা এই দুটি বইয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে উপাসনা এবং পরবর্তী অধ্যায়ে সাধনা সম্পর্কে তাঁর মত তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। উপাসনা বিষয়ে তিনি তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা বইয়ের প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। সেখান থেকে বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

আচার্য গুরুনাথ উপাসনা বলতে এখানে ঈশ্বরের উপাসনা বুঝিয়েছেন। সত্যধর্ম বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সাকারের উপাসনা হয়না, অর্চনা হয়।[১] কাজেই সাকার দেবদেবীর উপাসনা হয়না, উপাসনা ঈশ্বরের বা পরমেশ্বরের হয়।[২] উপাসনার সংজ্ঞায় তিনি বলেন, যা দ্বারা সাধক (সাধনাকারী মানুষ) উপাস্যকে ভূষণস্বরূপ করতে পারেন তাকে উপাসনা বলে। উপাসনার

---

[১] দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ: ✓ ও পৃ: ২।

[২] প্রসঙ্গক্রমে এখানে গুরুনাথ নিরাকার ও সাকারের উপাসনা ও পূজা সম্বন্ধে যা বলেছেন তার উল্লেখ করা যায়। সাকারবাদের পক্ষে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, নিরাকার ধারণায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সাকার উপাসনা কর্তব্য। এর উত্তরে গুরুনাথ বলছেন যে, ধারণা শব্দের প্রকৃত অর্থ চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে যে, সামনের এই গাছটিকেও যখন সম্যক প্রকারে ধারণা করা যায় না, তখন অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণসম্পন্ন জগদীশ্বরের কথা দূরে থাকুক, তাঁর অংশ ও উপাসক দেবদেবীগণকেও ধারণা করা কারও সাধ্য নয়। তবে উপাসনার ক্ষেত্রে বলা যায়, সাকারের উপাসনা নাই, অর্চনা আছে। এরূপ জগদীশ্বরের পূজা নাই, উপাসনা আছে। জগদীশ্বরের উপাসকগণ প্রয়োজনে বা ভক্তিবশতঃ দেবদেবীগণের পূজা করতে পারেন। তবে সাবধান থাকতে হবে, কখনও যেন সান্তশক্তিসম্পন্ন দেবদেবীগণকে অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট জগদীশ্বর বলে বোধ করে অজ্ঞানতায় ও তার জন্য মহাপাপে পতিত হতে না হয়। অনেকে সকালে মা-বাবার ছবি দেখে প্রণাম করেন। কখনও কখনও কোন কাজের সাফল্য লাভের জন্য তাদের কাছে প্রার্থনাও করেন। মা-বাবার এরূপ পূজাও যা, দেবদেবীগণের পূজাও তা-ই। তবে তফাৎ এই যে, দেবদেবীগণকে না দেখার কারণে তাদের কল্পিত মূর্তির সামনে ওরূপ করা হয়, আর মা-বাবার প্রকৃত মূর্তির সামনে ওরূপ করা হয়। মা-বাবার পূজার মত গুরুদেবের পূজাও করা হয়। (দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৩৫-৩৬)

প্রধানত: দুটি ভাগ- (১) উপাস্যের গুণকীর্তন (২) উপাস্যের নিকটে নিজের পাপের[৩] কথা বলা। সুতরাং উপাস্যের গুণকীর্তন করা এবং উপাস্যের নিকটে বা উদ্দেশ্যে নিজের পাপের উল্লেখ করাই উপাসনা। এছাড়া প্রার্থনা নামে উপাসনার আর একটি অংশ আছে। এছাড়া আর যেসব সাধনা করা কর্তব্য, সেসব প্রকারান্তরে উপাসনারই অন্তর্গত। আচার্য গুরুনাথ বলেন যে, যে উপাসনার জন্য দেবর্ষি মহর্ষি রাজর্ষিগণ পরম ব্যাকুল, তার গুণ প্রকাশ করা জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের পক্ষেও সুসাধ্য নয় । তিনি মত দেন যে, উপাসনার গুণেই গুরুর গুরুত্ব, শিবের শিবত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, দেবের দেবত্ব, বুদ্ধের বুদ্ধত্ব, ঈশার সিদ্ধত্ব, মুসার মহত্ব ও মহম্মদের মহত্তরত্ব লাভ হয়েছে।[৪]

আচার্য গুরুনাথ বলেন, সকলেই জানেন যে, পরিপূর্ণ খাবারের জন্য লবণ, তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল এবং মধুর রস পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করতে হয়। দেহ রক্ষার জন্য, দেহের প্রকৃত উন্নতির জন্য এ ছয়টি রস যথানিয়মে যেমন গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেরকম আত্মার প্রকৃত উন্নতির জন্যও উপাসনা করা প্রয়োজন এবং এই উপাসনারও প্রথম অবস্থা লবণ-তিক্ত দ্বিতীয় অবস্থা কটু ও কষায় তৃতীয় অবস্থা অম্ল ও চতুর্থ অবস্থা মধুর রসের সাথে তুলনীয়। এ রসগুলি দেহের পক্ষে উপকারী এবং প্রত্যেক রসেই মাধুর্য্য আছে আর এ রসগুলির আগেরটা গ্রহণ না করলে পরবর্তী রসে সুখ হয়না। যেমন অম্ল রস গ্রহণ না করলে মধুর রস তেমন সুখকর হয়না। ঠিক তেমনি উপাসনারও পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা সাপেক্ষ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অবস্থার উপযোগী কাজ না করলে পরবর্তী অবস্থা লাভ করা যায়না। উপাসনার মূল লক্ষণে বলা হয়েছে যে, উপাসক যখন উপাস্যকে আত্মার অলংকারস্বরূপ করতে পারবেন, তখনই তার পূর্ণ উপাসনা হবে। কাজেই এ লক্ষণ অনুসারে উপাসনার সর্বত্রই মাধুর্য্যরস আছে; কোথাও সাক্ষাৎভাবে কোথাও পরম্পরাভাবে। অনন্ত গুণধাম পরমাত্মা উপাস্য, তাঁকে কিভাবে আত্মার অলংকার করা যাবে, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরমপিতার গুণকীর্তনাদি দ্বারা হৃদয় পাপমুক্ত ও বিবিধ গুণযুক্ত হয়ে পরমসুন্দর হয়ে ওঠে এবং অনন্ত সৌন্দর্যনিধান পরমাত্মার অধিষ্ঠানে অসীম অতুল অনির্বচনীয় শোভায় শোভমান হলেই উপাস্যকে আত্মার আভরণ করা হয়। অতএব ঈশ্বর দর্শন বা হৃদয়ে ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব না হলে সম্পূর্ণ উপাসনা হতে পারেনা। উপাসনার পূর্ণতার জন্য সাধনারও প্রয়োজন আছে।

আচার্য গুরুনাথ উপাসনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অংশে উপাসনার সর্বোচ্চ অবস্থা থেকে ক্রমশঃ নিম্ন অবস্থার উল্লেখ করেছেন এবং বলছেন যে, সাধনার সময় নিম্ন অবস্থা থেকে ক্রমশঃ উন্নত অবস্থায় যেতে হয়। অবস্থা সমূহ-

০১. - উপাসনার সর্বোচ্চ অবস্থাঃ পরম প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেম অঙ্কে আরোহন

---

[৩] পাপ বলতে গুরুনাথ দুস্কৃতি (দোষ দ্বারা পরিচালিত কাজ), পাশ (ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি আটটি পাশ), জাতগুণের অলয় (কাম-ক্রোধাদি লয় না হওয়া) এবং কিছু মিশ্র গুণের অলয় বুঝিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, যা থেকে আত্মাকে রক্ষা করা কর্তব্য, যাতে লিপ্ত আত্মার পতন অনিবার্য্য তাকে পাপ বলে। (দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ১০)

[৪] দ্রষ্টব্য,গুরুনাথ সেনগুপ্ত,তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা,পৃ.১১

০২. - ব্রহ্মদর্শন

০৩. - ব্রহ্মতেজো দর্শন

০৪. - ব্রহ্মের সত্ত্বাজ্ঞান অর্থাৎ জগদীশ্বর আমার অন্তরে বাহিরে সর্বত্র আছেন- এরূপ অটল প্রতীতি ধ্যাননিমগ্ন অবস্থায় লাভ করা

০৫. - ধ্যান

০৬. - দেবগণের সাথে কথোপকথন (দেবগণ বলতে ইহলোকস্থ ও পরলোকস্থ মহাত্মা বুঝায়)

০৭. - দেবগণের জ্যোতিদর্শন

০৮. - জপ

০৯. - স্তুতি

১০. - গুণদ্বারা গুণময়ের উপাসনা

১১. - বৈজিক ভাষানুসারে গুণকীর্তন

১২. - সাধারণ ভাষানুসারে গুণকীর্তন

আচার্য গুরুনাথ উপাসনা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করেছেন।প্রথমতঃ দেখান যে, শব্দশাস্ত্রবিদ্দের মতে- উপ পূর্বক আস্ ধাতুর ভাববাচ্যে যুচ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ হওয়াতে 'উপাসনা' শব্দ হয়েছে। পাণিনির ৩/৩/১০৭ সূত্রে আছে নিজন্ত ধাতু, আস্ ধাতু এবং শ্নন্ত ধাতুর উত্তর ভাবাদি বাচ্যে যুচ্ প্রত্যয় হয় এবং প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।[উপ-আস-যু (যুচের চ ইৎ), যুবারনাকৌ] (৭/১/১ পাণিনি)। অর্থাৎ প্রত্যয়ের যু স্থানে অন্ ও ব স্থানে অক হয়। এই সূত্র অনুসারে উপ-আস-অন-আ হইলে অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ । (৬/১/১০১)। এই সূত্র অনুসারে দীর্ঘ হলে 'উপাসনা' শব্দ হল। আস্ শব্দ উপবেশন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাতন্ত্রের মতে উপ-পূর্বক আস্ ধাতুর উত্তর যু প্রত্যয়। আর মুগ্ধবোধের মতে উপ পূর্বক আস্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অন্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ, প্রত্যয়ে উপাসনা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'উপ' এ উপসর্গের অর্থ পুরুষোত্তমদেব বলেন যে, অনুগতি, পশ্চাদ্ভাব, অনুকম্পা, আধিক্য, হীন, সামীপ্য ও প্রাথম্য। আর গণকারগণ বলেন যে, আস্ ধাতুর অর্থ উপবেশন বা স্থিতি।শব্দশাস্ত্রবিদ্দের এ সমস্ত মত একত্র করে গুরুনাথ উপাসনা শব্দের পাঁচটি অর্থের কথা বলেনঃ- (১) উপাস্যের অনুগতভাবে স্থিতি, (২) উপাস্যের করুণালাভের জন্য স্থিতি, (৩) উপাস্যের নিকট হীনভাবে স্থিতি অর্থাৎ উপাস্য অপেক্ষা নিজেকে অতি হীন মনে করে অবস্থান, (৪) পাপাবস্থায় উপাস্যের পশ্চাদ্ভাবে স্থিতি অর্থাৎ উপাস্যের দৃষ্টির সম্মুখে নয়,এমনভাবে অবস্থান এবং (৫) নিস্পাপ অবস্থায় উপাস্যের সমীপে অবস্থান। এ পাঁচটির মধ্যে প্রথমটি ভক্তদের, দ্বিতীয়টি ভক্তিপ্রেমাদি লাভার্থে চেষ্টাশীলদের অবস্থার, তৃতীয়টি পাশবদ্ধাবস্থার, চতুর্থটি পাপাবস্থার এবং পঞ্চমটি ব্রহ্মদর্শীর অবস্থার প্রকাশক।

কোষকার অর্থাৎ অভিধান লেখকদের মতে পরিচর্যাই উপাসনা।[৫] অমর,মেদিনী, রুদ্র প্রভৃতি কোষকারগণ পরিচর্যা বলতে অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করা বুঝিয়েছেন। সুতরাং তাদের মতে অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করাই উপাসনা। আর যাকে আমরা ভালবাসি তারই পরিচর্যা করি এবং ভালবাসার পাত্রের গুণকীর্তন আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং কোষকারদের মতে গুণকীর্তনই উপাসনা।

শাব্দিকগণের মত পর্যালোচনার করার পর গুরুনাথ ভারতের ধর্মপ্রণালীসমূহের মত পর্যালোচনা করেন। তখন ভারতে ৬টি ধর্ম সম্প্রদায় ছিল- (১) তান্ত্রিক বা শাক্ত, (২) বৈষ্ণব, (৩) শৈব, (৪) সৌর, (৫) গাণপত্য, (৬) বৌদ্ধ। এ ছাড়া দার্শনিকগণ ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা হলেন- গৌতম (ন্যায় দর্শনকর্তা), কণাদ(বৈশেষিক দর্শনকর্তা), কপিল(সাংখ্য দর্শনকার), ব্যাসদেব(বেদান্তদর্শন ও উত্তর মীমাংসার প্রণেতা), জৈমিনি (পূর্বমীমাংসার প্রণেতা) এবং পতঞ্জলি(যোগদর্শনের রচয়িতা)। এঁদের মতে উপাসনা কি, তা ক্রমে ক্রমে গুরুনাথ বিশ্লেষণ করেন।

শাক্তমত :

শাক্তদের 'অপরাধ ভঞ্জন'[৬] নামক স্তোত্র পাঠে জানা যায় যে, সদাচার, জ্ঞান, যজ্ঞ ও নামসংকীর্তন এগুলি অসম্পাদিত থাকাতে স্তবকারী দুঃখ প্রকাশ করছেন এবং এ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। সুতরাং শাক্তদের মতে আচার, জ্ঞান, যজ্ঞ ও নাম সংকীর্তন এ চারটি কর্তব্য কাজ। সুতরাং গুণকীর্তন তাদের মতে একটি প্রধান কাজ। নাম-সংকীর্তন শব্দে গুণকীর্তন বুঝায়। জগদীশ্বরের কোন নাম নাই। তাঁর অনন্ত গুণরাশির মধ্যে যে যতদূর বুঝতে পারে সে ততদূর প্রকাশক একটি শব্দ ব্যবহার করে, তা-ই ঈশ্বরের নাম বলে ধরে নেয়া হয়।

বৈষ্ণবমত

বৈষ্ণব মতে উপাস্যের গুণকীর্তনই পরম ধর্ম। যথা-

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্

কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা।।[৭]

---

[৫] বরিবস্যা তু শুশ্রূষা পরিচর্য্যাহপ্যুপাসনম্।
ইত্যমরঃ ব্রহ্মবর্গে। শরভ্যাস উপাসনম্। ইতি মেদিনী
পীনেহপ্যুপাসনায়াঞ্চ শরাভ্যাসেহপ্যুপাসনম্। ইতি রুদ্র

[৬] নাচারো নৈব বিদ্যা ন চ যজনবিধি নাম সংকীর্তনং বা
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে।।...
দ্রষ্টব্য, স্তব-কবচমালা, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৪।

[৭] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২০।

অর্থাৎ- কেবল হরিনামই (পরমেশ্বরের গুণকীর্তন) একমাত্র প্রধান কাজ। কলিতে অন্য উপায় নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম অনুমোদিত অন্য যে সব স্তব[৮] আছে যেমন- নারায়ণ স্তব, দশাবতার স্তোত্রম্, রামাষ্টকম্- এসব স্তবে দেখা যায় যে, নারায়ণ অভীষ্টদাতা, প্রণতের পালক, সংসার সাগরের তরণী এবং ভৃত্যবর্গের ক্লেশ নিবারক। আর মহাদেব ও ব্রহ্মা তাঁর স্তব করেন। সুতরাং বৈষ্ণব মতে জগদীশ্বরের গুণকীর্তনই পরম ধর্ম।

সৌরমত

সৌরগণ সূর্যকে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা বলে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর উপাসনা করেন। তাঁদের উপাসনা মন্ত্র হল সাবিত্রী গায়ত্রী। সাবিত্রী অর্থ সূর্য সম্বন্ধিনী এবং গায়ত্রী অর্থ গায়ৎ (গানকারী)দের ত্রাণকারিণী স্তব। সাবিত্রী গায়ত্রীতে বলা হয়েছে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এ সমুদায়ের প্রসবিতা দেবের বরেণ্য (বরণীয়) ভর্গ (তেজঃ), আমরা তাঁর ধ্যান করি, যিনি আমাদের সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করেন।[৯] এখানেও দেখা যায় গুণকীর্তনই উপাসনা। এছাড়া সূর্যের ধ্যান মন্ত্রে[১০] সূর্যের নানা গুণের কথা বলা হয়েছে। তিনি হরি ও হর (বিষ্ণু ও শিব) কর্তৃক পূজিত এরূপ নির্দেশ করে তাকে রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে। সুতরাং এমতেও উপাসনা বলতে গুণকীর্তন বোঝায়।

শৈবমত

শিবোপাসকগণ শিবকে জগতের মূল কারণ মনে করে তাঁর গুণকীর্তন করেন। শিব পঞ্চাক্ষরস্তোত্র, বৃহস্পতিকথিত শিবস্তোত্রম্, শিবাষ্টকম্, ব্যাসকৃত শিবাষ্টকম্, শিবস্তোত্রম্ প্রভৃতি স্তোত্রে[১১] শিবের নানা গুণের কীর্তন করা হয়েছে। সুতরাং গুণকীর্তন যে উপাসনার প্রধান অঙ্গ এ মতে তা স্বীকৃত।

গাণপত্য মত

গাণপত্যেরা গণপতিকে (গণেশকে) জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূল কারণ জেনে তাঁর গুণকীর্তন করেন এবং তাঁর নিকট পাপমুক্তি ও অন্যান্য প্রার্থনা করেন। গণেশাষ্টকম্[১২]-এ বলা হয়েছে যে, যে অনন্তশক্তি থেকে অনন্তজীব হয়েছে, যে নির্গুণ থেকে সকল অপ্রমেয় গুণ হয়েছে এবং যা থেকে ত্রিধাভেদভিন্ন সব জগৎ দীপ্তি পাচ্ছে, আমরা সবসময় সে গণেশকে ভজনা করি। যা থেকে এই জগৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু বায়ু দেবগণ, মানবগণ আবির্ভূত হয়েছে, যা থেকে অগ্নি, ভানু, ভব, ভূমি, জল, সাগর, চন্দ্র ব্যোম বায়ু স্থাবর জঙ্গম ও বৃক্ষসমূহ উৎপন্ন হয়েছে। যিনি অজ্ঞান নাশ

---

[৮] দ্রষ্টব্য, ঐ,ঐ, পৃ: ২১-২৪।

[৯] ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্য ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

[১০] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২৪।

[১১] দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ২৬-৩৫।

[১২] দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ৩৫-৩৭।

করেন ভক্তজনের সন্তোষ বিধান করেন ইত্যাদি, সেই গণেশকে আমরা বন্দনা করি। সুতরাং এমতেও উপাস্যের গুণকীর্তনই উপাসনা।

এ ছাড়া হানুমত, আধুনিক শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ীরা যে যে প্রণালীতে উপাসনা করেন, তাতে গুণকীর্তনই তাঁদের উপাসনার প্রধান অংশ বলে জানা যায়।

বৌদ্ধমত

বুদ্ধদেব যে ধর্মসংক্রান্ত কোন কোন তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন, তা বর্তমানে নির্ণয় করা সুকঠিন। তিনি সাকার দেবদেবী মানতেন কি-না বা নিরাকার মানতেন কি-না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে তাঁর মতাবলম্বীদের অনেকে তাঁকে জগদীশ্বর জ্ঞানে পূজা করে সাকারবাদী হয়ে পড়েছেন। এ মতে অহিংসা পরম ধর্ম। ইন্দ্রিয় জয় করা, পরের উপকার করা, সমস্ত দোষের নির্বাণ সহকারে জীবের নির্বাণ লাভই প্রধান কাজ। বৌদ্ধ দর্শন নিরীশ্বরবাদপর্ণ। আর বৌদ্ধধর্ম প্রকারান্তরে সাকারবাদপূর্ণ। এ মতেও গুণকীর্তন প্রধান কাজ। বৌদ্ধ কোষকার অমর সিংহ তার গ্রন্থের প্রথমে লিখেছেন যে-

যস্য জ্ঞান-দয়া-সিন্ধো রগাধস্যা নঘা গুণাঃ।

সেব্যতা মক্ষয়া ধীরাঃ স শ্রিয়ৈ চামৃতায় চ।।

অর্থাৎ- যিনি অগাধ জ্ঞান সিন্ধু ও দয়াসিন্ধু, যার অনঘ গুণসমূহ আছে, হে ধীরগণ আপনারা সেই অক্ষয়(বুদ্ধ)কে শ্রী ও অমৃতের নিমিত্ত সেবা করুন।

বৌদ্ধ দূর্গসিংহ কাতন্ত্রবৃত্তির প্রথমে লিখেছেন যে-

দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্বজ্ঞং সর্বদর্শিনম্।

অর্থাৎ- প্রথমে দেবদেব সর্বজ্ঞ সর্বদর্শীকে প্রণাম করে...

অতএব দেখা যায় বৌদ্ধেরা দেবগণের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন এবং জ্ঞানসিন্ধু, দয়াসিন্ধু অক্ষয়, শ্রীদাতা, অমৃত দাতা, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী প্রভৃতি জগদীশ্বরের গুণাবলী বুদ্ধে আরোপ করতেন। কাজেই বৌদ্ধমতেও গুণকীর্তন উপাসনার প্রধান অঙ্গ।

দর্শন শাস্ত্র

দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে গুরুনাথ মন্তব্য করেন যে, যে দর্শন শাস্ত্র, শাস্ত্র জগতে সম্রাট, গুরুর ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্খী, বন্ধুর মত হিতোপদেশ দেয় এবং দেহাত্মভেদ প্রভৃতি পরম জ্ঞান প্রচার করে দেহে আত্মবোধী মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অসত্য বলে প্রমাণ করেছে, তার মহিমা বর্ণনা এ ক্ষুদ্রাংশে অসাধ্য। তবে এও বলেন যে, একমাত্র দর্শন শাস্ত্র অবলম্বনে যাঁরা জীবন যাপন করেন তাঁরা প্রদীপের অধ:স্তন ব্যক্তির ন্যায় অন্ধকারে শোচনীয়ভাবে থাকেন।

দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক মতে তত্ত্বজ্ঞান হলে মুক্তি হয়। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদ পূর্ণ, মীমাংসা শ্রুতির অর্থ বিচারে পরিপূরিত। ষড়দর্শনের মধ্যে অবশিষ্ট পাতঞ্জল ও বেদান্ত।

পাতঞ্জল মতে যম নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এ আটটি যোগের অঙ্গ। পাতঞ্জল ভাষ্যে বলা হয়েছে যে প্রথমে নির্গুণে চিত্ত প্রবেশ করতে পারেনা এজন্য প্রথমে সগুণে মনোনিবেশ করবে। এরপরে নিবিষ্টমনা হলে যখন চিত্তের একাগ্রতা হবে তখন উপাসিত ঈশ্বরের করুণায় সমাধিযোগ সিদ্ধি হবে। সুতরাং পাতঞ্জল মতে প্রথমে সগুণ ব্রহ্মের গুণরাশি ধ্যান অর্থাৎ গুণকীর্তন কর্তব্য।

বেদান্ত দর্শন মতে, পরমাত্মা ঈশ্বর বিভিন্ন গুণ বিশেষে বিশিষ্ট হয়ে উপাস্য হন। ঈশ্বর এক হলেও যে তাঁর যেমন গুণের উপাসনা করে, সে তেমন ফল পায়। সুতরাং এমতে উপাসনার অঙ্গ গুণকীর্তন।

পৃথিবীতে মহাত্মাগণ উপাসনার যে প্রণালী প্রচলিত করেছেন, সেখানেও প্রধান অংশ গুণকীর্তন। এ ক্ষেত্রে আচার্য গুরুনাথ বাইবেল থেকে মুসার উক্তি, দায়ুদের উক্তি ও খৃষ্টের উক্তি উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ধর্ম অনুসারেও গুণকীর্তন উপাসনার প্রধান অংশ। কোরআন শরীফ থেকে এর প্রমাণ তুলে ধরেছেন। ব্রাহ্মমত পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন গুণকীর্তন ব্রাহ্মদের অনুমোদিত। সুতরাং যাবতীয় ধর্মাবলম্বীদের মতে উপাস্যের গুণকীর্তন তাঁর উপাসনার অঙ্গ।

উপাসনার দ্বিতীয় ভাগ স্বীয় পাপকথন- অর্থাৎ উপাস্যের নিকট নিজের পাপ উল্লেখ করা। উপাসনার সময় কেন স্বকৃত/স্বীয় পাপের উল্লেখ করতে হয় সে বিষয়ে গুরুনাথ যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ তুলে ধরেছেন।

দেহের সাথে যুক্ত অবস্থায় মানুষের তিনটি অংশ- আত্মা, মন ও শরীর। কোন পাপ করলে যদি শরীর অসুস্থ হয় তবে যেমন ঐ পীড়ার কারণ উল্লেখ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, সেরকম মনে বা জীবাত্মায় কোন ক্লেশ উপস্থিত হলে তার কারণ উল্লেখ করা দরকার। আধি ব্যাধির জন্য যন্ত্রণা হলে সকলেই কিছু না কিছু পাপের উল্লেখ করে, অন্তত: অন্যের অজ্ঞাতসারেও নিজের পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে। অতএব নিজের পাপের উল্লেখ করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম ও পাপমুক্তির প্রধান উপায়। চিকিৎসক সবকিছু জানেনা, তাই তাকে জানানোর জন্য তার কাছে রোগের কারণ সম্পর্কে বলতে হয়। কিন্তু জগদীশ্বর তো সর্বজ্ঞ তাকে জানানোর জন্য পাপোক্তি নয়; বরং জগদীশ্বরের কাছে নিজ পাপরাশির উল্লেখ করলে, পাপের মূল তখনই শিথিল হয় এবং দোষলেশ শূন্য অনন্ত গুণনিধির সন্তান হয়ে এরূপ পাপাচরণ করেছি- চিন্তা করা মাত্র ভীষণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং সে আত্মগ্লানি প্রভাবে পাপরাশি বিদূরিত হয় ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

স্বপাপোক্তি যে পাপমুক্তির প্রধান উপায় তা মহাত্মা মনুও উল্লেখ করেছেন। হিন্দুধর্মের নানা বিভাগে এরূপ পাপ উল্লেখের বিষয় দেখা যায়।ইসলাম ধর্মে তাওবা(পাপ স্বীকার ও পাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা) করার কথা আছে। খ্রীষ্টানধর্মের শাখা বিশেষে পাপ উল্লেখের বিধান আছে। অনুতাপ যখন পাপমুক্তির প্রধান উপায় তখন যেভাবে সবচেয়ে বেশী অনুতাপ হয় তা-ই অবলম্বনীয়। জগদীশ্বরের অনন্ত গুণরাশির স্মরণসহ নিজ পাপের উল্লেখ করলে সবচেয়ে বেশী আত্মগ্লানি বা অনুতাপ হয়। এজন্য স্বীয় পাপের উল্লেখ উপাসনার দ্বিতীয় অংশ।

আচার্য গুরুনাথের মতে গুণকীর্তন উপাসনার সর্বপ্রধান অংশ। যখন উপাস্য পরমপিতার অনন্ত গুণরাশি কীর্তন করতে করতে নিজের ক্ষুদ্রতা, মলিনতা ও অভাব বোধ হতে থাকে তখনই ঘোরতর আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। ঐ আত্মগ্লানি প্রভাবে ক্ষুদ্রতা, মলিনতা ও অভাব দূর হয়ে অভাবের অভাব সহকারে প্রকৃত ভাব আসতে থাকে। যেমন খাদযুক্ত সোনাকে পোড়ালে তার খাদ দূর হয়ে খাঁটি সোনা অবশিষ্ট থাকে সেরকম আত্মগ্লানি দহনে দগ্ধীভূত হলে জীবের পশুভাব ও সেজন্য মলিনতা দূর হয়ে প্রথমে মানবভাব পরে দেবভাবের উদয় হয়।[১৩] সুতরাং গুণকীর্তন করাই মানুষের সর্বপ্রধান কাজ। উপাস্যের গুণকীর্তন করা সবদেশের সবকালের সব ধর্মাবলম্বীদেরও অভিমত। গুণকীর্তন দ্বারা পূর্বজন্মের ও ইহজন্মের পাপরাশি থেকে মুক্তিলাভ হয়। পাপকর কাজে প্রথমে অনিচ্ছা পরে ঘৃণার সঞ্চার হয়। গুণকীর্তন প্রভাবে রিপুকুল বশীভূত হয় এবং দোষসমূহ গুণরূপে পরিণত হয়ে পরমমিত্রের চেয়েও বহুগুণে সাহায্য করে।[১৪] গুণকীর্তনের প্রভাবে দোষরাশি ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কপটতা ও স্বার্থপরতা সমূলে উৎপাটিত হয়। গুণকীর্তনের শক্তিতে হিংসা-দ্বেষ দূর হয়ে অন্তকরণ বিবিধ গুণে সুশোভিত হয়। গুণকীর্তনের প্রভাবে ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভরতা, প্রেম, পবিত্রতা, একাগ্রতা, অভেদজ্ঞান, সরলতা প্রভৃতি ও অন্যান্য গুণরাশির উৎপত্তি, উন্নতি ও অনন্তাভিমুখে ধাবিত হয়[১৫] এবং একবেমাদ্বিতীয়ম্ এই পরম মহৎ জ্ঞানের সমুন্নত পরিণতি ঘটে। সুতরাং গুণকীর্তন সকলের পরম উপকারক, সবশ্রেণীর সবলোকের পরম অবলম্বন। গুণকীর্তন প্রভাবে সব গুণের উন্নতি হয়, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের সম্বন্ধ ও অন্যান্য জ্ঞান লাভ হয়, এবং আত্মার সতেজ অবস্থা লাভ হয়। গুণকীর্তনের শক্তি বলে জীব প্রেমানন্দ লাভ করে। গুণকীর্তনের প্রভাবে মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, জীবভাবের লয়ে পরমাত্মভাব উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ ভগ্নাংশের অখন্ড আকারে পরিবর্তন সাধিত হয়। সুতরাং ধর্মার্থী মাত্রেরই গুণকীর্তন পরম কর্তব্য ও নিয়ত অবলম্ব্য ও সর্বাবস্থায় সাধনীয়।

আচার্য গুরুনাথ গুণকীর্তনের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদের সিদ্ধি বিবরণ উল্লেখ করেন। দেবর্ষি ভগবানের প্রথম দর্শনে পরমানন্দ লাভ করেন কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ আনন্দ আর আগের মত না থাকায় তিনি পুনরায় দর্শনের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার উত্তর নারদ দৈববাণীযোগে এরূপ লাভ করেন যে, নারদ তুমি এখন আর আমার দর্শন প্রার্থনা করোনা কারণ যাদের কাম-ক্রোধাদি প্রেম-ন্যায়পরতাদি রূপে পরিণত হয় নাই, অর্থাৎ যারা জিতেন্দ্রিয় হতে

---

১২ একাগ্রতা দেবাত্মনঃ, সারল্যঞ্চ নরাত্মনঃ।। (শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গীত, বাংলাদেশ, ১৩৮৮, পৃ: ৮৫)।(একাগ্রতাগুণ স্বাভাবিক হলে দেবভাব ও সরলতাগুণ স্বাভাবিক হলে মানবভাব আর কাম ক্রোধাদির প্রবলভাবের দ্বারা পরিচালিত হলে পশুভাব- সহজভাবে এরূপ বলা যায়)

১৩ যেমন- সুদুর্জয় কামরিপু প্রেম নামক অপূর্ব পরমোৎকৃষ্ট গুণরূপে পরিণত হয়। ক্রোধ নামক মহারিপু ন্যায়পরতায় বিলীন হয়। লোভ নামক রিপু অনিত্য বিষয় হতে অন্তর্হিত হয়ে আত্মোন্নতি লালসায় পরিণত হয় ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ৩৫-৩৭)

১৪ যেমন ভক্তি গুণ উৎপন্ন হয়ে পার্থিব ভক্তির পরাকাষ্ঠা ও লয়াভিমুখে ধাবিত হয়ে ঈশ্বরভক্তিরসে অন্তকরণ প্লাবিত হয়। নির্ভরতা ও বিশ্বাস সঞ্জাত বর্দ্ধিতও অনন্তাভিমুখে ধাবিত হয়। প্রেম উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়ে অভেদ জ্ঞান ও সোহহং জ্ঞানে পরিণত হয়। একাগ্রতা, পবিত্রতা ও অভেদজ্ঞান সহযোগে মূর্তিমতী সরলতা উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য, ঐ,ঐ)

পারে নাই সে সব কুযোগীর পক্ষে আমার দর্শন লাভ বড়ই কঠিন। তবে ভক্তিভাবের ও আগ্রহের আতিশয্যে কেউ কেউ কখনও কখনও একবার মাত্র আমার দর্শন লাভ করে থাকে কিন্তু নিত্যদর্শন তাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব, জিতেন্দ্রিয় হও, কামাদিকে বিশুদ্ধ প্রেমাদিতে পরিণত কর; তবে আমার নিত্যদর্শন পাবে।তখন নারদ ঐসব কুৎসিৎ মনোবৃত্তির হাত থেকে নিস্তারের (পরিত্রাণের) উপায় জানতে চাইলে দৈববাণীযোগে তাকে বলা হয় যে, ঐ সকল কুভাব থেকে মুক্তির জন্য তুমি সবসময় আমাকে মনোমন্দিরে রেখে আমার গুণকীর্তন কর তাহলে সব দোষ থেকে মুক্ত হতে এবং আমার নিত্যদর্শন লাভ করতে পারবে। সেখান থেকে নারদ নিরন্তর হরিগুণগানে নিযুক্ত থেকে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

এ বিবরণ শেষে তিনি বলছেন যে, সব দোষ মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় যখন গুণকীর্তন তখন ধর্মার্থীদের নিরন্তর জগদীশ্বরের গুণকীর্তন করা কর্তব্য। তিনি আরো উল্লেখ করেন, কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনায় অপারগ হলে, কঠোর ক্রিয়া সম্পাদনে অসমর্থ হলে, মানবান্তর সাহায্য সাপেক্ষ সাধনায় ভীত হলে, অনন্য সাহায্য সাপেক্ষ নিজ যত্নে সাধনীয়, অতি সহজে যা করা যায় সেই কাজ “পরমপিতার গুণকীর্তন” করা কর্তব্য। এ গুণকীর্তন দ্বারাই কৃচ্ছ্রসাধনায় যা লাভ করার চেষ্টা করা হয়, সে সকল অজ্ঞাতভাবেই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। যে সকল দোষ দূর করার জন্য মানুষে বহু চেষ্টা করেও সফল হতে পারে না, সে সকল দোষ আপনিই দূর হয়ে যায়। যে সকল গুণ লাভ করার জন্য লোকে কত কষ্ট করে, হৃদয়ে সে সকল গুণের আবির্ভাব হয়। সেজন্য তিনি বলছেন,

“হে ধর্মার্থীগণ! তুমি আর কিছু করতে পার, বা না পা্ তাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু নিরন্তর অনন্ত উন্নত অনন্ত গুণের অনন্তভাবের অনন্ত নিধান পরমপিতার গুণকীর্তন কর, সর্ব্বদা তাঁহাকে মনোরাজ্যের অধীশ্বর-রূপে অর্চ্চনা কর,তাহা হইলেই বহুবিধ কৃচ্ছ সাধ্য বিষয় অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে লাভ করিতে পারিবে।”

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্থূল দেহধারীর পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি পরমেশ্বরের গুণকীর্তন মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। পরমাত্মার গুণকীর্তন ছাড়া মুমুক্ষুর মোক্ষ জীবন নির্বিঘ্নভাবে থাকতে পারেনা। মুমুক্ষুর পক্ষে ভগবৎ গুণকীর্তনই পরমপথ্য। এই গুণকীর্তনের বাঁধা হল পার্থিব ভোগের ইচ্ছা। যারা পার্থিব ভোগ্য ভোজ্যে অত্যাসক্ত সে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের গুণকীর্তন থেকে বিরত থাকে। কাজেই পার্থিব ভোগেচ্ছা সংযত করা অবশ্য কর্তব্য। গুণকীর্তন প্রতিক্ষণ করার বিষয়। যাঁর দ্বারা মানুষের অভাব পূরণ হয়, তাঁর গুণকীর্তন করা কর্তব্য। কেউ কেউ দুই-চারদিন জগদীশ্বরের গুণকীর্তন করে কোন ফল পাওয়া যাবে না বলে মনে করে। তারা গুণকীর্তনের ফলকে সামান্য বৃক্ষফলের মত মনে করে। বৃক্ষ যেমন শিকড় দ্বারা নীচ থেকে এবং পাতার সাহায্যে উপর থেকে খাবার সংগ্রহ করে তেমনি প্রকৃত মানুষ যাঁরা তাঁরা পার্থিব কাজ দ্বারা পৃথিবী থেকে এবং জগদীশ্বরের গুণকীর্তন দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাঙ্খিত বিষয় লাভ করেন এবং সুখে জীবন যাপন করেন। তিনি আরও বলছেন, ঈশ্বরোপাসনার কি অনির্বাচনীয় ফল। উহা কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করেই ক্ষান্ত হয়না, উহা দ্বারা পার্থিব

উন্নতিরও পরাকাষ্ঠা হয়।[১৬] তিনি সকলকে সংসারের উন্নতি, পার্থিব জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও বাসস্থান, খাদ্য, পরিধেয়াদি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছেন। তবে পার্থিব কোন কাজে একান্ত ব্যসক্ত হতে নিষেধ করেছেন এবং সমস্ত কাজের মাঝে সর্বসুহৃদ পরমপরুষকে হৃদয়াসনে রেখে তাঁর ভজনা করতে বলেছেন।[১৭]

আচার্য গুরুনাথ জগদীশ্বরের গুণকীর্তনকারীকে পার্থিব কাজ ত্যাগ করতে বলেননি। তাঁরমতে জ্ঞান, ধর্ম, জীবিকা নির্বাহ প্রভৃতির জন্য যে সকল কাজ সাধু ও সিদ্ধগণের অনুমোদিত সে সব কাজ যথাসাধ্য সম্পন্ন করতে হবে এবং ঐ কাজের প্রথমে ও শেষে গুণকীর্তন, এছাড়া অবকাশ সময়ের অধিকাংশ গুণকীর্তনে ব্যয় করাই মানুষের কর্তব্য। এভাবে গুণকীর্তনকারী অশান্তিময় পৃথিবীতে বাস করেও অশান্তিশূন্য স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারেন। জগদীশ্বরের গুণকীর্তনকারীকে কোন পার্থিব বিষয়ের অভাব দুঃখ দিতে পারে না, বিচলিত করতে পারেনা। কারণ পার্থিব ভোগ্য ভোজ্যে যে সুখ হয় পরমেশ্বরের গুণকীর্তন দ্বারাই তার চেয়ে বহুগুণে সুখ লাভ হয়। পার্থিব কাজের মধ্যে যা সবচয়ে প্রধান তাও জগদীশ্বরের গুণকীর্তনের লক্ষাংশেরও তুল্য নয়। জগদীশ্বরের গুণকীর্তন মানুষের মধ্যেকার পশুভাব দুর করে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করে; গুণকীর্তনের বলে তার কাছে ইহলোক ও পরলোকের পার্থক্য থাকে না। সে সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মপ্রসাদ সুধা লাভ করে।

আচার্য গুরুনাথ বলছেন জগদীশ্বরের গুণকীর্তন বলতে তাঁর যে অনন্ত গুণ আছে তার কীর্তন করা বুঝালেও সসীমগুণসম্পন্ন ও সসীম শক্তিবিশিষ্ট মানুষের পক্ষে অসীম গুণকীর্তন অসম্ভব। এ কারণ যথাশক্তি গুণকীর্তনই অভিপ্রেত। বিশেষতঃ সকলের পক্ষে সকল গুণকীর্তন প্রয়োজনীয় নয়। যে পাপে নিমগ্ন, তার পক্ষে সত্য ও আনন্দ গুণের কীর্তনে তেমন লাভ হয়না বরং জগদীশ্বর যে গুণদ্বারা পাপীদিগকে পাপ থেকে মুক্ত করেন সেরকম গুণকীর্তনই তার পক্ষে বিধেয়। এজন্য জগদীশ্বরের গুণকীর্তনের আগে তাঁর গুণবাচক শব্দের মধ্যে কোনটির কি অর্থ তা জানা দরকার। এজন্য আচার্য গুরুনাথ কতগুলি গুণপ্রকাশক শব্দ ও তার অর্থ লিছেছেন। যেমন-

	শব্দ		অর্থ
০১.	করুণা	-	জগদীশ্বর যে গুণ দ্বারা পাপীদিগকে পাপ থেকে মুক্ত করেন।
০২.	কৃপা	-	যে গুণে শান্তি দান করেন।
০৩.	দয়া	-	যাবতীয় দুঃখ হরণাত্মক গুণ। করুণা ও কৃপা এর অন্তর্গত।
০৪.	অনুগ্রহ	-	দয়ার নামান্তর।

[১৬] উপদেশমালা (মহাত্মা গুরুনাথের উপদেশসমূহ), ৩৬ নং উপদেশ, পৃ. ২১
[১৭] আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ. ২৫৪

০৫.	অনুকম্পা	-	করুণার নামান্তর
০৬.	অবাঙ্মনসগোচর	-	বাক্য ও মনের অতীত। যাঁর স্বরূপ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করতে বা মন দ্বারা চিন্তা করে নির্ণয় করা যায় না।
০৭.	সত্য	-	নিত্য
০৮.	সনাতন	-	সর্বকাল বিদ্যমান
০৯.	মঙ্গলময়	-	পাপীদিগের শুভকর
১০.	শিব	-	নিস্পাপদিগের শুভ বিধাতা
১১.	বিভু	-	সর্বব্যাপী
১২.	প্রভু	-	অনুগ্রহ ও নিগ্রহে সমর্থতা
১৩.	নিরাকার	-	দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ রূপ আকৃতি ধর্মাতীত
১৪.	নির্বিকার	-	ষড়বিধ বিকার রহিত

এছাড়া পরমেশ্বরের অন্যান্য যেসব গুণ প্রকাশক শব্দ আছে, সেগুলির অর্থও নানা জায়গায় তিনি করেছেন। আমরা অন্যান্য অধ্যায়ে সেগুলির উল্লেখ করেছি।

ষড়বিধ বিকার হল- জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, নাশ, পরিণতি ও অস্তিত্ব। জগদীশ্বরের জন্মরূপ ও মৃত্যুরূপ বিকার নাই, তাঁর বৃদ্ধি ও ক্ষয়ও নাই। তাঁর পরিণমন রূপ বিকৃতিও নাই অর্থাৎ তিনি জগদাদিরূপে পরিণত হন নাই। তাঁর গুণবিশেষের বিকারে এ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। জগদীশ্বর অনন্ত অসীম, কোন সসীম উদাহরণ (উপমা) দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে বুঝানো যায় না তবুও কিঞ্চিৎ বুঝানোর জন্য উপমা দেয়া যেতে পারে। যেমন পুরুষের ঘর্মাদি থেকে কীটাদির উৎপত্তি হলেও তার কোন শক্তির ব্যাঘাত হয়না, সেরকম জগদীশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে একটি মাত্র গুণের বিকারে এ জগৎ সৃষ্ট। সুতরাং তিনি কোন পদার্থরূপে পরিণত হন নাই। আচার্য রামানুজের মতে, ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। আচার্য শংকরের মতে জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। আচার্য গুরুনাথ এর কোন মতই অনুমোদন করেননি। তবে বলছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান হলে সমস্ত কিছুই তন্ময় বলে প্রতীয়মান হয়। ষষ্ঠ বিকার অস্তিত্ব- এটিও গুরুনাথ গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে অস্তিত্ব বিকার নয়। এটি দার্শনিক বিচারপ্রিয় ঈশ্বরবাদীদের মত। 'ঈশ্বর আছেন' বললে কোথায় কিভাবে আছেন- এ রকম প্রশ্ন আসে; কাজেই এ বিচারে অস্তিত্বকে বিকার বলা যায়। জগদীশ্বর যখন সকলের মূল, তখন দার্শনিক কূটতর্ক ছেড়ে দিলে অস্তিত্বকে বিকার বলা যায় না।

এবার কোন গুণ কার পক্ষে কীর্তনীয় তার আলোচনা করেছেন। যাঁরা পাপ থেকে মুক্ত হতে চান তাঁরা অন্য গুণের কীর্তনের সাথে করুণাময়ত্ব গুণের কীর্তন পুন: পুন: করবেন। যাঁরা শান্তি লাভ করতে চান, তাঁরা কৃপা গুণের কীর্তন করবেন। দুঃখ থেকে পরিত্রাণের বাসনায়

দয়াময়ের দয়া গুণের কীর্তন পুন: পুন: করা আবশ্যক। এরকম পাপাবস্থায় 'মঙ্গলময়' এবং নিস্পাপ অবস্থায় 'শিব' গুণের কীর্তন করা কর্তব্য। যখন যে গুণের বিষয় উপস্থিত হবে তখন যথাশক্তি সমস্ত গুণকীর্তনের সাথে ঐ গুণের পুন: পুন: কীর্তন করা কর্তব্য।

গুরুনাথ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি পরিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। কোন পাপী নিজের পাপ থেকে মুক্তির বাসনা করে ঈশ্বরকে বলছে- হে করুণাময়! তোমার করুণা আকাশে, বাতাসে, অনলে, সলিলে ও ভূমিতে বিদ্যমান; তোমার করুণা মানুষ থেকে ক্ষুদ্রতম কীট পর্যন্ত সকলেই বর্তমান, তোমার করুণা যেমন মিলনে, তেমনি বিচ্ছেদে; ব্রহ্মান্ড তোমার করুণায় পূর্ণ। হে নাথ! হে করুণাময়! তুমি ধন্য। প্রভো! এই দীনহীন পাপীর প্রতি সেই করুণা বর্ষণ কর। হে পতিত পাবন! এ পাপীকে পাপ হতে উদ্ধার কর। হে বিশ্বত্রাতা! এ পাপীকে ত্রাণ কর। ইত্যাদি।

গুণকীর্তন সাধারণ ভাষায় যেমন করা যেতে পারে সে রকম বৈজিক ভাষায়ও করা যেতে পারে। গুণকীর্তন সব স্থানে সব অবস্থায় সব সময় করা কর্তব্য। তবে ব্রাহ্মমুহূর্ত, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল ও নিশীথকাল এই পাঁচ সময়ে এবং সমতল পবিত্র, মনোরম ও উদ্বেগশূন্য স্থানে গুণকীর্তন করা বিধেয়।[১৮] জগদীশ্বরের উপাসনায় কোন পাত্র ভেদ নাই, সকলেই করতে পারে।

গুণকীর্তনসহ স্বীয় পাপ উল্লেখ করতে করতে যখন আত্মগ্লানি হবে তখন পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। প্রথমে জ্ঞানকৃত পরে অজ্ঞানকৃত এবং শেষে পূর্বজন্মার্জিত পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা বিধেয়। পাপের মূলীভূত কাম-ক্রোধাদি নিবৃত্তির জন্যও এ সময়ে প্রার্থনা করা উচিৎ।

পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করার পরে যখন পরমপিতার করুণায় পাপ থেকে মুক্তিলাভ এবং তার ফলস্বরূপ শান্তিলাভ হয় তখন করুণাময়কে ধন্যবাদ দিয়ে পুনরায় গুণকীর্তন করতে হয়। এবারে যখন হৃদয় আর্দ্র হয় তখন প্রেমাদি গুণের মধ্যে যে গুণের অভাববোধ হয় তার জন্য প্রথমে এবং পরে সাধারণভাবে সব গুণের জন্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। তবে একাসনে অন্য গুণের সাথে প্রেমের জন্য প্রার্থনা বিধেয় নয়। নিস্পাপ মহাত্মারা কোন কারণে পাপস্পৃষ্ট হলে একমাত্র গুণকীর্তন দ্বারা পাপমুক্ত হতে পারেন। কিন্তু পাপাচরণশীলদের পক্ষে পূর্বোক্ত নিয়মে গুণকীর্তন ও প্রার্থনা করা প্রয়োজন। গুরুনাথ সব সময় উপাসনা করার কথা বলেছেন।তবে বিশেষভাবে বলছেন যে ,সব সময় না পারলেও যে পাঁচবার উপাসনার বিধান শাস্ত্রে আছে , ঐ পাঁচবারে যেন অন্ততঃ তিন ঘন্টা উপাসনা হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার।

উপাসনা যেমন সাধারণ ভাষায় স্তোত্র বা সঙ্গীত দ্বারা করা যায় তেমন ধ্যান দ্বারাও সম্পন্ন করা যায়। নিস্পাপ ও স্থিরচিত্তদের জন্য ধ্যান প্রশস্ত। পাপী ও চঞ্চলচিত্তদের জন্য গানই সর্বপ্রধান উপাসনার উপায়। প্রাতঃকালের উপাসনায় 'সারাদিন যেন তোমার প্রীতিকররূপে যাপন

---

[১৮] তুলনীয়, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ২৬, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬/১১-১২

করতে পারি' এবং সন্ধ্যাসময়ে 'রাতটি যেন তোমার প্রীতিকররূপে যাপন করতে পারি' এরূপ প্রার্থনা করা কর্তব্য।

এরপর আচার্য গুরুনাথ উপাসনা পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন-

১ম - ধর্মের শ্রেষ্ঠতাসূচক সঙ্গীত।

২য় - নির্বেদজনক সঙ্গীত।

৩য় - মনের প্রতি সঙ্গীত।

৪র্থ - গুণকীর্তন (সাধারণ কথায়, স্তবে বা গানে)।

৫ম - স্বীয় পাপের উল্লেখ ও সেজন্য আত্মগ্লানি ভোগ।

৬ষ্ঠ - পাপ হতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা।

৭ম - গুণের জন্য প্রার্থনা।

৮ম - ধ্যান।

৯ম - দীক্ষাবীজ জপ (গুণ কীর্তনের আগেও অন্তত ৩ বার উচ্চারণ অত্যাবশ্যক। ধ্যানের পরে অন্তত: ২০ বার)।

১০ম - জগদীশ্বরের কৃপাময়ত্ব সম্বন্ধে স্তব বা গান।

১১শ - জগদীশ্বরের আনন্দময়ত্ব সম্বন্ধে স্তব বা গান।

১২শ - স্তব বা গান দ্বারা জগদীশ্বরের প্রেমানন্দময়ত্ব উল্লেখপূর্বক ধন্যবাদ দান।

এর প্রতিটি বিষয়ের জন্য তিনি সংগীত ও স্তব রচনা করেছেন যা তত্ত্বজ্ঞান সংগীত নামে প্রকাশিত হয়েছে।উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনার শেষে আর একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, উচ্চ শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে গানময়ী, ভাবীজ্ঞানময়ী দূরদর্শনময়ী ও প্রেমময়ী এ চারটি অবস্থা দেখা যায়। এইগুলি উপাসনার অতি উচ্চ অবস্থা ও একই সাথে উপাসনার ফল। যে সাধক নিরন্তর গুণ গুণ করে জগদীশ্বরের গুণকীর্তন করেন ও অন্য সব কথা গান দ্বারা করেন- সে অবস্থা গানময়ী। ভাবীজ্ঞানময়ী অবস্থায় ভবিষ্যতে কি হবে তা জানা যায়। দূরদর্শনময়ী অবস্থায় সাধক দূরবর্তী স্থানের বৃত্তান্ত জানতে পারেন। প্রেমময়ী অবস্থায় সাধক নিরন্তর প্রেমভাবে পূর্ণ থাকেন। এ অবস্থাই সর্বপ্রধান। এরূপ সাধকের সান্নিধ্যে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। শতশত কূটতর্কের মীমাংসা হয়। এরূপ সাধক নিজে মুক্ত হতে পারেন। অন্যকেও মুক্ত করতে পারেন। এরূপ অবস্থাপন্ন সাধকের সমীপে আত্মসমর্পন দ্বারা পরমেশ্বরে আত্মসমর্পন করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়

সাধনা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত

(১)

সাধনা

জীবাত্মা সম্বন্ধে আলোচনায় গুরুনাথ দেখিয়েছেন যে, জীব নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপের অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের অংশ এবং জীবের পক্ষে ঐ অংশের পূর্ণতা সাধনই শেষ উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জীবভাবের লয় অবশ্য কর্তব্য। আবার মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদিত না হলে জীবভাবের লয় হয়না। সে কারণে মানুষের প্রথম কর্তব্য মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন, দ্বিতীয় কর্তব্য জীবত্ব ধ্বংস বা পরমাত্মত্ব লাভ এবং তৃতীয় কর্তব্য- ভগ্নাংশের অখন্ড আকারে পরিবর্তন সাধন অর্থাৎ অংশভূত পরমাত্মার পূর্ণ পরমাত্মার সাথে 'সোঽহং জ্ঞান'। এখানে গুরুনাথ আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন যে, দেহবদ্ধ চৈতন্যাংশ পূর্ণ পরম চৈতন্য স্বরূপকে অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান করতে পারে বটে কিন্তু সমর্ণ অভেদ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ 'সোঽহং জ্ঞান' স্বীয় চেষ্টায় কখনও করতে পারেনা এবং এ বিষয়টি তাঁর লিখিত তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা বইয়ের 'অভেদ জ্ঞান' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন প্রভৃতি কাজ তিনটি উপাসনা ও সাধনার দ্বারা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। উপাসনা বিষয়ে তাঁর মত পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে সাধনা সম্পর্কে তাঁর মত আলোচনা করা হলো। সাধনা বিষয়ের বিবরণ তিনি তাঁর তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা বইয়ে লিখেছেন। ঐ বই থেকেই বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো ।

সাধনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে, " জাত গুণের লয়, লয়শীল মিশ্রগুণের লয় ও গুণ লাভ করা -এ তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনার প্রয়োজন।"[১] যদিও উপাসনা দ্বারাই গুণের বৃদ্ধি হয় তবুও ঠিকমত অভ্যাস না করলে কখনও প্রকৃত রূপে গুণের উন্নতি হয় না। অতএব সাধনা অর্থাৎ গুণের অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন।[২] বিনা সাধনায় কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না বা কোন উন্নতিও হয়না। তিনি দেখিয়েছেন যে, বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বস্তরে যেসব উন্নতি দেখা যায়, সে সবই সাধনার ফল। মানুষ আজ যে সুন্দর বাসভবন, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অত্যাধুনিক যানবাহন, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত

---

[১] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ৫৪-৫৫।।আচার্য গুরুনাথের মতে ,আত্মার গুণগুলি তিন প্রকার-সরল,মিশ্র ও জাত।এদের সংজ্ঞা ও বিবরণ এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে দেয়া হয়েছে।

[২] দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম, পৃ: ১৭

যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরী করেছে, এসবই পার্থিব সাধনার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। আর আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা পঞ্চভূত বশীভূত হয়, দোষসমূহ বিদূরিত হয় ও হৃদয় বিবিধ গুণ লাভ করে। সাধনায় ইহলোক ও পরলোকের যাবতীয় বৃত্তান্ত সাধক জানতে পারেন। সাধনার বলে সকল বিরুদ্ধমতের মীমাংসা হয়। সাধনায় জাতিভেদ তথা সমস্ত ভেদজ্ঞান দূর হয়, হৃদয় থেকে সকল ক্ষুদ্রতা দূরে যায়। সর্বত্র পরমেশ্বরের পরমসত্ত্বা অনুভব করে সাধক প্রেমানন্দে নিমগ্ন হন।

সাধনার মহিমা বাক্যের অতীত, চিন্তারও অতীত। সাধনা কাকে বলে এ প্রসঙ্গে গুরুনাথ বলেন, "অভ্যাসকে সাধনা বলে; অর্থাৎ গুরুদেব যে বিষয়ের শিক্ষার জন্য, যেরূপে, যে বিষয় অভ্যাস করতে বলেন, সেই বিষয়ে সে রকম অভ্যাসই সাধনা। অর্থাৎ যেরূপভাবে কাজ করলে কাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেরকম ক্রিয়ার অভ্যাসকেই সাধনা বলে।"[৩] সাধনা বা অভ্যাস দু রকম- পার্থিব ও আধ্যাত্মিক। পার্থিব সাধনায় যাবতীয় পার্থিব উন্নতি হয়। আর আধ্যাত্মিক সাধনার বলে ধর্মশাস্ত্র রচনা, বিবিধ শক্তিলাভ এবং এ সকল যার অঙ্গ সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। যে সাধনায় দোষ রাশি গুণরাশিতে পরিণত হয়, আত্মার সতেজ অবস্থা লাভ হয় এবং অংশভূত আত্মা পূর্ণস্বরূপের সাথে যুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দ অবস্থা লাভ করে, তা-ই আধ্যাত্মিক সাধনা।

আচার্য গুরুনাথের মতে, অনন্ত মঙ্গলময় পূর্ণপুরুষ তাঁর অংশসমূহকে ক্রমশঃ অনন্তশক্তি দান করার জন্যই এরূপ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই উন্নতিলাভ আত্মপ্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম। কেউ চেষ্টা করুক বা না করুক তাকে অন্বয়ী উপায়ে বা ব্যতিরেকী উপায়ে সাধনার পথে যেতেই হবে। অনন্তশক্তিমান, অনন্তস্নেহময়, অনন্তপ্রেমময়, অনন্তন্যায়পর, অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণবিশিষ্ট প্রত্যেকের সঙ্গে থেকে তাঁর অনন্ত গুণে প্রত্যেকের উন্নতি করছেন। কেউ চেষ্টা করলে তার পক্ষে এ অবস্থা সুধাময়ী হবে; আর কেউ চেষ্টা না করলে ঐ অবস্থা তার অনুকূল ক্রমানুসারী না হওয়াতে তার দুঃখ হবে। কাজেই উন্নতি প্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই সাধনা করা প্রয়োজন।

আচার্য গুরুনাথ কয়েকজন সাধকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যেমন- মুক্ত পুরুষ ভোলানাথ, যিনি কালসাপকে উপবীতের মত ধারণ করেছেন, বিষকে অমৃতের মত করে পান করেছেন, পার্থিব অভাবের চরম সীমায় উপনীত হয়েও পরমানন্দে কাল যাপন করেছেন। সমদর্শনের চরমসীমা লাভ করে সকলের স্বাভাবিক বিরোধ ত্যাগ করিয়ে তাদেরকে একসাথে অবস্থান করিয়েছেন, যিনি পরস্পর বিপরীত পদার্থে সাম্যজ্ঞান প্রকাশ করে পাশমুক্ততার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। জিতেন্দ্রিয়তা, নিস্কামতা ও বিশ্বপ্রেমিকতা মানুষের হৃদয়ে অনুভূত করেছেন। ঐ মহাত্মা, ঐ উন্নতি, ঐ গুণরাশি, ঐ ক্ষমতা ,সব তিনি সাধনা বলেই লাভ করেছেন।

কংস ধ্বংসের জন্য এবং সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে সাধুদের পরিত্রাণ, দুস্কৃতিকারিদের বিনাশ ও পরাজিত, রাজনীতির অপূর্ব বৈচিত্র আবিস্কৃত হয়েছে, যিনি জন্মান্তরে নারায়ণ ঋষি নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং নর নামক ঋষির সাথে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, আর এ জন্মে পার্থের সাথে মিলিত হয়ে পৃথিবী বীরশূন্য করে শান্তিলাভ করেছেন, ঐ মহাত্মার ঐসব উন্নতি সাধনা প্রভাবেই হয়েছে।

---

[৩] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৭

যিনি দেবগণের অসাধ্য কার্যসমূহ সম্পাদন করেও নিস্পৃহতার জন্য দেবাধিপত্য গ্রহণ করেননি, যিনি শত শত জীবন শত শতবার ঘোরতর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, যিনি কেবল নিজ প্রযত্নে পরমপদ লাভ করেছেন, যিনি পুত্রার্থিদের যথোপযুক্ত প্রার্থনা পূর্ণ করেন, সেই মহাত্মা কার্ত্তিকের ঐ গুণশক্তি সাধনার দ্বারাই লাভ হয়েছে।

বেথল্‌হেম নগরীতে একটি কুটিরে যার জন্ম, যাঁকে মূর্তিমতী ক্ষমা বলতে হবে; তাঁর জীবন নাশে প্রবৃত্ত শিষ্যকেও যিনি ত্যাগ করেন নাই, জগতের উপকারে যিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, সেই মহাত্মা যীশুখৃষ্টের ঐ উন্নতি সাধনারই ফল।

মক্কাধামে প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তি, যিনি নিজের দেশে জড়োপাসনা দেখে ব্যথিতান্তকরণে হীরা পর্বতের গুহায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করে স্বজাতির মঙ্গালের জন্য চিন্তা করেছেন, যিনি প্রকান্ড একটি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তামসিকদিগকে তমোমার্গে, রাজসিকদিগকে রজোমার্গে এবং সাত্ত্বিকদিগকে সত্ত্বমার্গে পরিচালিত করেছেন, সেই মহাত্মা মুহম্মদ সাধনার দ্বারাই ঐ উন্নতি লাভ করেছেন।

এমনিভাবে আরো যত মহাত্মা বা সিদ্ধপুরুষদের কথা জানা যায়, যেমন, হাফেজ, নানক, বুদ্ধদেব, রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব, কবীর, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সাধকগণ, এঁদের সকলের উন্নতিই সাধনার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, জ্ঞান, প্রেম বা অন্যবিধ গুণ এবং পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায় সাধনা।

আচার্য গুরুনাথ সাধনার বিভাগ নিম্নরূপ দেখিয়েছেন :

সাধনা প্রথমতঃ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এ দুরকম। আধ্যাত্মিক সাধনা আবার অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী ভেদে দুরকম। আধ্যাত্মিক সাধনা আবার যোগসাধনা, মন্ত্রসাধনা ও গুণসাধনা- এ তিনপ্রকার। যোগসাধনা পার্থিব সাধনার অন্তর্গত।এর অতিরিক্ত যা আছে তা গুণ সাধনার অন্তর্গত, মন্ত্র সাধনাও গুণ সাধনার অন্তর্গত। কাজেই গুণ সাধনা শ্রেষ্ঠ ও ব্যাপক, অন্য দুটি এর অন্তর্গত। আধ্যাত্মিক সাধনা আবার শ্রেয় ও প্রেয়োভেদে দুরকম। সাংসারিক কাজ ত্যাগ করে যে সাধনা তাকে শ্রেয় এবং সাংসারিক কাজের মধ্যে থেকে যে সাধনা, তা প্রেয়ো। সাধনা আবার সশক্তিক ও নি:শক্তিক ,এ দুপ্রকার। ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে পূর্ণব্রহ্মের অন্তর্গত হওয়া সশক্তিক; আর আমার কিছুই নাই, আমি সব গুণ শূন্য, এরূপ চিন্তা করে যে সাধনা, তাকে নি:শক্তিক সাধনা বলে।

আচার্য গুরুনাথের মতে, যে বিষয়গুলো সাধক মাত্রকেই অবলম্বন করতে হয় সেগুলো হলো-

সত্য	-	সত্য বলা, সত্যপথে চলা, পরম অবলম্ব্যবোধে সত্য গ্রহণ করা। অটলভাবে সত্য প্রতিষ্ঠা হলে সাধক যা বলেন তা-ই সত্য হয়। সত্য প্রতিষ্ঠা হ'লেই ক্রিয়াফলের আশ্রয় হতে পারা যায়।
অহিংসা	-	প্রাণিপীড়ন ও প্রাণিবধ না করা। অহিংসাকারীকে কেউ হিংসা করেনা এবং তাঁর সংস্পর্শে অন্য সকলেও হিংসামুক্ত হয়।
অস্তেয়	-	ধনস্বামীর অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে তার ধন না নেয়া। রাশিকৃত ধনরাশি অস্তেয় প্রতিষ্ঠাকারীর পদানত হয়।

ব্রহ্মচর্য	-	উর্দ্ধরেতা হওয়া ও মনেও কোন প্রকার রমণীবিষয়ক কুচিন্তা না করা। ব্রহ্মচর্য না করলে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।
অপরিগ্রহ	-	অন্যের নিকট থেকে কিছু না নেয়া। অপরিগ্রহে মন বিশুদ্ধ থাকে।
শৌচ	-	শুচিত্ব। জলাদি দ্বারা শরীর এবং জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা অন্তর শোধন।
সন্তোষ	-	উপস্থিত অবস্থাতে তৃপ্ত থাকা।
তপস্যা	-	কঠোর ক্লেশ স্বীকার করে ধর্মানুষ্ঠান করা।
স্বাধ্যায়	-	ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও বীজমন্ত্রের পুন: পুন: উচ্চারণ
ঈশ্বরের উপাসনা	-	নিয়মিত উপাসকের শক্তির সীমা নাই। উপাসনা বলে সত্য, অহিংসা, ধ্যান প্রভৃতি সহজে আয়ত্ব হয়।
প্রত্যাহার	-	ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করে চিত্তস্বরূপের অনুকরণ করা
ধারণা	-	মনকে কোন বিষয়ে বদ্ধ রাখা।
ধ্যান	-	কোন বিষয়ে এরূপ চিন্তা, যাতে চিত্ত অন্য বিষয়ে না যায়। ধ্যানের মূল একাগ্রচিত্ততা। ঈশ্বর ধ্যানে জাতগুণের লয়, লয়শীল মিশ্রগুণের লয়, অলয়শীল মিশ্র গুণের বৃদ্ধি ও সরল গুণের পরমোন্নতি হয়।
সমাধি	-	অবিচ্ছেদে বহুকাল ধ্যান করা। **এতদ্ভিন্ন শরীরের সুস্থতার ও একাগ্রতা লাভের সাহায্য হিসাবে আসন ও প্রাণায়াম অবলম্বনীয়।
আসন	-	যেরূপ বসলে কোন কষ্ট হয়না অথচ শরীর স্থির থাকে।
প্রাণায়াম	-	জীবনীশক্তির বিস্তার যাতে হয়, যে ক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়।

ধর্মের এ বিষয়গুলির বিপরীত কাজ ধর্মের ব্যাঘাতজনক ও মোক্ষ বা মুক্তিপথের বিরোধী। যেমন- অসত্য, হিংসা, স্তেয়, অসংযত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, পরিগ্রহ, অশুচিত্ব, নিরন্তর অসন্তোষ, তপস্যা না করা, ধর্মশাস্ত্র পাঠ না করা, উপাসনা না করা, ধ্যান-ধারণাদি না করা, ধর্মের ও মোক্ষ লাভের বিঘ্ন। এগুলি অল্প, মধ্যম বা অধিক পরিমাণে কৃত কারিত বা অনুমোদিত হয়ে অনন্ত প্রায় দুঃখ ও অজ্ঞানতা উৎপাদন করে। কারণ এগুলি ক্রোধ, লোভ ও মোহ থেকে উৎপন্ন হয়। সাধককে এই বিষয়গুলিকে সাধনার প্রতিপক্ষ ভাবতে হবে। সাধনাবস্থায় বিপক্ষ ভাব- সকল উপস্থিত হলে প্রতিপক্ষ ভাবনা করতে হবে। সাধনার ব্যাঘাতকর হিংসাদি অল্প, মধ্যম বা অধিক পরিমাণে নিজে করলে বা অন্য দ্বারা করাইলে কিংবা অন্যের ঐসব কাজ অনুমোদন করলে অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানতা উৎপাদিত হয়।

এ আলোচনায় একটি বিষয় সুস্পষ্ট সে সাধনাকারীকে খুব যত্নের সাথে যথানিয়মে কাজ করতে হয়। কেননা যে সাধনায় যা যা করণীয়, তার ব্যতিক্রম হলে ফল লাভ হয়না। সাধনাকারীকে (সাধককে) আরও কিছু বিষয় অবশ্যই জানতে হয় বলে গুরুনাথ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) অনন্তের উপমা সান্ত পদার্থে সম্পূর্ণ হতে পারেনা। পরমেশ্বর অনন্ত অসীম। আর এই সৃষ্টিতে যা কিছু সবই সান্ত বা সসীম। কাজেই সসীম পদার্থের দ্বারা অসীমকে বুঝানোর চেষ্টা করলে তা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারেনা। নানা শাস্ত্রে এরূপ নানা উপমা দেয়া আছে, কিন্তু তার কোনটিই অনাদি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভের জন্য সম্পূর্ণ নয়।

(২)উপাসনাশীল ও ধ্যানপরায়ণ মানুষ জগদীশ্বরকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত আনন্দস্বরূপ, অমৃত ও প্রেমময় জানতে পারেন। এ বিষয়ে প্রথমে শব্দ প্রমাণ অবলম্বন করতে হয় পরে নিজেই অনুভব করা যায়। এরূপ অনুভবকারী সাধক এর পরে ক্রমাগত উপাসনা ও ধ্যান করতে করতে ক্রমশঃ অনুভব করেন-

(৩)জগদীশ্বর সর্বশক্তিমান

(৪)জগদীশ্বর সর্বব্যাপী এবং

(৫)জগদীশ্বর মঙ্গলময়।

জগদীশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে এ তিনটি গুণে সাধকের প্রত্যয় জন্মে। এভাবে অনন্ত অজ্ঞেয় প্রায় ব্রহ্মতত্ত্ব কিছু পরিমাণে জানতে পেরে সাধক পরমানন্দে নানা সাধনায় রত হন। এ কারণে ধর্মার্থী ও মোক্ষার্থী উভয়ের প্রথম কর্তব্য উপাসনা ও ধ্যান।

আচার্য গুরুনাথ এরপরে ক্রমশঃ সাধকের যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন সেরকম আরও কতগুলি বিষয় আলোচনা করেছেন। যেমন, জীবাত্মা পরমেশ্বরের অংশ, জীবদেহ, পুনর্জন্ম, সৃষ্টি অনাদি নয়, একত্ব, অবতারবাদ, অদৃষ্টবাদ, পরোপকার, সুখ, মানুষ মাত্রেই জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অংশ নয়, জাগরণ ও স্বপ্ন, অধিকারীভেদ, শাস্ত্র প্রভৃতি।

এ অধ্যায়ে আমরা তিনি যে সাধনাগুলির বর্ণনা দিয়েছেন সে বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। সাধনার ক্ষেত্রে গুরুনাথ উল্লেখ করেছেন যে, জাতগুণের (দোষের) লয়ের জন্য, লয়শীল মিশ্রগুণের লয়ের জন্য এবং গুণলাভের জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনা আবশ্যক। এ তিনটি বিষয়ের জন্য বিশেষ সাধনাসমূহ তিনি উল্লেখ করেছেন। জাতগুণ অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য- এ ছয়টি দোষ লয়ের সাধনা কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ[৪] প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পাশসমূহ (ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি) লয়ের জন্য যা যা করণীয় তা পাশাষ্টকম্ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। আর গুণ লাভের জন্য যা যা করণীয় সে প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রধান গুণ-সাধনার বিবরণ তুলে ধরেছেন। যেমন- প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সরলতা, পবিত্রতা, বিশ্বাস ও অভেদ জ্ঞান। আমরা পর্যায়ক্রমে এ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

[৪] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ১৪৮-১৮৪।

আচার্য গুরুনাথ আধ্যাত্মিক গুণগুলিকে তিনভাবে ভাগ করেছেন- সরল, মিশ্র ও জাত। যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে স্বভাবতঃ আছে সেগুলো সরলগুণ, যথা- প্রেম, সরলতা ইত্যাদি। আর যে গুণের অঙ্কুর আত্মায় থাক্ বা না থাক্ অন্য গুণসমূহের যোগে নিজ নামে পরিচিত হয় সেগুলো মিশ্রগুণ। যেমন- ঈশ্বরভক্তি, এটি আধ্যাত্মিক প্রেম ও পার্থিব ভক্তিরযোগে উৎপন্ন হয়। এটি অলয়শীল। আবার পার্থিব ভক্তিও একটি মিশ্র গুণ যা কয়েকটি আত্মনিষ্ট গুণাঙ্কুরের মিলনে উৎপন্ন হয়েছে। এটি লয়শীল গুণ। যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে নাই, ভৌতিক জগতের সাথে আত্মার সম্বন্ধকালে ক্ষণে ক্ষণে আসে ও চলে যায়, সেগুলিকে জাতগুণ বলে। যথা- কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি। শাস্ত্রে এদেরকে দোষ ও পাশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণগুলি উৎকৃষ্ট এবং তৃতীয় শ্রেণীর গুণগুলি অপকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট গুণের উন্নতি ও অপকৃষ্ট গুণের লয় সাধনাকেই গুণ-সাধনা বলে। গুণ-সাধনা বললে উৎকৃষ্ট গুণের সাধনাই বুঝায়। উৎকৃষ্ট গুণের উন্নতি হলে অপকৃষ্ট আপনা থেকেই লীন হয়ে যায়।[৫] আমরা এ পরিচ্ছেদে প্রথমে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পরে পাশাষ্টকম্ সম্বন্ধে এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদে গুণগুলির সাধনার বিষয়ে আলোচনা করব।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ :

জাত গুণগুলির মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এ ছয়টিকে রিপু বা শত্রু বলা হয়। এদের দমন ও লয় সাধনাই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। দমনে ও লয়ে অনেক তফাৎ। লয়াবস্থায় সাধকের যে কামাদি আছে এরূপ অনুমানই করা যায়না। তবে সাধক ইচ্ছা করলে এগুলিকে ব্যাবহার করতে পারেন। লয়াবস্থায় এদের ধ্বংস হয়না। সাধারণ লোকে লয়াবস্থার ভাব ধারণা করতে পারেনা। একারণে মনে করে যে, এদের দমন হতে পারে কিন্তু লয় হতে পারেনা। কিন্তু বাস্তবে এদের লয় ছাড়া আত্মাতে মহান গুণসমূহের উৎপত্তি ও সম্যক বিকাশ হয়না। এজন্য এদের লয় সাধনা আবশ্যক। কিন্তু যে বিশুদ্ধ প্রেম ও অসুলভ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এদেরকে লীন করতে হয়, সে দুটি মহানগুণ লাভ করতে হলে কাম ক্রোধ প্রভৃতি জাতগুণগুলির অন্ততঃ ক্রিয়া-রহিততা ও সাময়িক লীনবৎ অবস্থা করা আবশ্যক। এ কারণে এ প্রবন্ধে গুরুনাথ রিপুদমন প্রসংগে এবং গুণ-সাধনা বর্ণনার সময়ে এদের লয়াবস্থার বর্ণনা করেছেন।

কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে ছয়টি রিপু বলা হলেও আচার্য গুরুনাথ প্রথমে এদের প্রয়োজনীয়তা পরে এদের দমনের প্রয়োজন এবং শেষে দমনের উপায় বর্ণনা করেছেন। আচার্য গুরুনাথের মতে কামাদির প্রয়োজন এই যে, এরাই সুমহান গুণসমূহ লাভ করার উপায়। যেমন, বায়ু না থাকলে বাঁচা যায় না আবার তার প্রবলভাব হলে জগৎ বিধ্বস্ত হয়। আগুণ না থাকলে প্রয়োজনীয় কাজ করা যায় না আবার বেশীভাবে জ্বললে সর্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত হতে পারে। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় কামাদির অতিপ্রভাবে অশান্তির পরাকাষ্ঠা হয় তেমনি আবার এরা না থাকলে প্রেমাদি গুণসমূহেরও বিকাশ হয়না। এরা যেমন অনিষ্টের কারণ তেমনি ইষ্ট সিদ্ধির বিধানও করে।

যে কামে উন্মত্ত হলে মানুষ গম্যাগম্যবিহীন হয়, নানা পাপে লিপ্ত হয়, সেই অশেষ দোষাকর কাম থেকে ঈশ্বরত্ব লাভের অন্যতম উপায়স্বরূপ প্রেমের লাভ হয়। কামই দোষশূন্য হয়ে প্রেমরূপে পরিণত হয়।

---

[৫] দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম, পৃ: ৩৭-৩৮।

তবে এ ক্ষেত্রে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। কামকে আশু সুখকর ক্রিয়া বিশেষে প্রবর্তিত করলে তা প্রেমে পরিণত হয়না। যে ক্রোধের প্রভাবে মানুষ মনুষ্যত্ববিহীন হয়, সে না করতে পারে এমন পাপ নাই; যে ক্রোধে আক্রান্ত হলে নানা দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি হয়, সেই ক্রোধ তেজঃ ও ন্যায়পরতা গুণের কারণ। ক্রোধই সংস্কৃত হয়ে তেজঃ ও ন্যায়পরতা গুণ হয়। যে লোভ নানাবিধ অনিষ্টদায়ক, যা থেকে কাম ও ক্রোধ উৎপন্ন হয়, যে লোভে বুদ্ধি বিচলিত ও জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, যে লোভ অনন্ত ব্যাধি, সে লোভই সংস্কৃত হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইচ্ছায় পরিণত হয়। মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতারও এরূপ অবস্থা। প্রথমে যদি মোহ না থাকত এবং সেজন্য এ দেহ আমি নই, এ দেহের কষ্টে আমার কোন কষ্ট নাই- এরকম ধারণা হ'ত, তাহলে শরীরকে সবল ও নীরোগ রাখার কোন চেষ্টা থাকতো না; ফলে পার্থিব জগতেরও কোন উন্নতি হতনা। কাজেই মোহও প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনীয়। অহংকারের চেয়ে বড় রিপু নাই বলে শাস্ত্রকারেরা বলেছেন। অহংকার আত্মোন্নতির ব্যাঘাত করে, অন্যের হৃদয়ে আঘাত করে। অহংকারী মানুষের ঈশ্বরোপাসনা শব্দ উচ্চারণ মাত্র। এই মদ বা অহংকারই নানা উন্নতির কারণ। আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা- এরূপ ধারণা না থাকলে কেউই কোন কাজ করতনা, ভোগের জন্য কোন কিছু তৈরী করতনা, ফলে জগতেরও উন্নতি হতনা। কাজেই অহংকারও প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনীয়। মাৎসর্য্য বা পরশ্রীকাতরতা অর্থাৎ অন্যের ভাল দেখে কষ্টবোধ- এটা না থাকলে কেউ উন্নতি লাভই করতে পারতোনা। অন্যে এত ধন, এত বিদ্যা লাভ করছে- এ দেখে যন্ত্রণা হলে তখন নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা জাগে। কাজেই এরও প্রয়োজন আছে।

তবে এ ষড়্‌রিপু দমনেরও প্রয়োজন আছে, কেননা এরা প্রবল থাকলে মানুষ আর মানুষ নামের যোগ্য থাকে না। কাম ক্রোধাদি রিপুকুল প্রবল হলে নিজের ও নিজের বংশাবলীর যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি অন্যেরও নানা ক্ষতি করে। কাজেই এদের দমন করা প্রয়োজন। আচার্য গুরুনাথ কামক্রোধাদি ছয়টি রিপু দমনের উপায় নির্দেশ করেছেন।

প্রথমতঃ তত্ত্বজ্ঞান। তবে কাম ক্রোধ ও লোভ এ তিনটির দমন ছাড়া যথাযথভাবে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়না। এদের দমনের পরে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে রিপুকুল লয় হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ সার্বভৌম প্রেম। এটিও লয়ের জন্য উপায়, কারণ ষড়রিপুর দমন ছাড়া এ পরমগুণ উৎপন্ন হয়না।

তৃতীয়তঃ ভক্তি। বলবতী ভক্তি দ্বারা রিপুদমন হয়। দেবভক্তি বা গুরুভক্তির সাহায্যে রিপুদমন হয় কিন্তু ঈশ্বরভক্তি ছাড়া এদের লয় হয় না।

চতুর্থতঃ সবসময় জগদীশ্বরকে স্মরণ করা। কেননা একই হৃদয়ে অনন্ত-গুণ- জ্যোতির্ময় জগদীশ্বর এবং পাপের কারণ দোষসমূহের অবস্থান সম্ভব নয়।

পঞ্চমতঃ মহাপুরুষদের চিন্তা করা। যাঁরা ঈশ্বরত্ব লাভ করে রিপুকুলের দমন করেছেন তাঁদের চিন্তা দ্বারাও রিপু দমন হয়।

ষষ্ঠতঃ প্রার্থনা। উপাসনার শেষে রিপুকুল দমন ও লয়ের জন্য একান্তমনে প্রাণের সহিত জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা দ্বারা একাজ সম্ভব হয়।

সপ্তমতঃ মহাপুরুষদের কাছে একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে প্রার্থনায়ও রিপুদমন হতে পারে। যাঁরা নিজেদের রিপু লীন করেছেন তাঁরা আন্তরিক প্রার্থনাকারীর রিপু দমন করে দিতে পারেন।

অষ্টমতঃ জগদীশ্বরের সর্বব্যাপীত্ব ও সর্বদর্শিত্ব সবসময় চিন্তা করা। জগদীশ্বর সবখানে আছেন। সকলের অন্তরে বাইরে আছেন, তিনি অন্তর্যামী, সকলের সবকিছু জানছেন, দেখছেন- এরূপ চিন্তা ও অনুভূতি জাগলে রিপুসমূহ আর কাউকে কোন পাপকাজে প্রবর্তিত করতে পারেনা। স্বাভাবিকভাবে মানুষ যখন অন্য একজনের সামনেই পাপ কাজ করেনা, তখন সর্বত্র জগদীশ্বর আছেন- এ জ্ঞান হলে তাঁর সামনে পাপ কাজ করা একান্তই অসম্ভব। জগদীশ্বর সবখানে আছেন ও সব দেখছেন এবং তিনি পাপকারীর কঠোর দন্ড প্রদান করেন- এরূপভাবে চিন্তা করলে কেউই আর কুকাজ বা কুচিন্তা করতে পারেনা।

পাশাষ্টকম্

আচার্য গুরুনাথের মতে পাশসমূহ পাপের মধ্যে গণ্য। পাশ মুক্তির জন্য যেমন পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় সেরকম এগুলি থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। তিনি পাশসমূহের বিবরণ এবং পাশমুক্তির সাধনা বিষয়ে ‘পাশাষ্টকম্’ প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধটি তাঁর লিখিত সত্যামৃত গ্রন্থে আছে। পরবর্তীকালে এর বাংলা অনুবাদও করা হয়েছে।[৬] এ প্রবন্ধের আলোকে আমরা বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।পাশ আটটি- (১) ঘৃণা (২) লজ্জা (৩) ভয় (৪) আশংকা/ক্রোধ (৫) জুগুপ্সা (৬) কুল (৭) শীল (৮) জাতি।

(১) দ্রব্যে, গুণে বা কর্মে যে অশ্রদ্ধা তাকে ঘৃণা বলে। ঘৃণার ফলে নানা রোগ জন্মে, মন চঞ্চল থাকে। ঘৃণা পাশ লয় হ’লে সাধক সব কিছুতে ঘৃণাশূন্য হন। তাঁর কাছে, সব কিছু সমান। সুগন্ধ-দুর্গন্ধ, পুরীষ চন্দন সবই সমান। এ অবস্থায় সাধক নিয়ত আনন্দে থাকেন। ‘মূলাধার’ চক্র সাধনায় এ পাশ লয় হয় (চক্রভেদ সাধনার বিষয়ে গুরুনাথ ‘ষটচক্রভেদ সাধনা’ বইয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, আমরা সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব)।

(২)অন্যায্য কার্যকারীর মনে যে সংকোচ ভাব হয় তাকে লজ্জা বলে। বস্ত্রের অভাবে উলঙ্গ ব্যক্তির মনে যে সংকোচ ভাব তাকে সাধারণভাবে অনেকে লজ্জা বলেন। কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা শিশু ও বৃদ্ধকালে উলঙ্গাত্বের কারণে কোন সংকোচ হয়না। কোন মানুষ যদি অকারণে অন্য কারো নিন্দা করে, পরে তার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে তার মনে যে ভাব হয় তা-ই লজ্জা। এ লজ্জার কারণে মৃত্যুতুল্য দশা হয়। যাঁরা এই লজ্জা পাশ মুক্ত হন তাঁরা কারো লজ্জার কারণ হননা এবং তিনিও কারো দ্বারা লজ্জিত হননা। ‘স্বাধিষ্ঠান’ চক্র সাধনায় এ পাশ দূর হয়।

(৩)দেখা বা শোনা যত অনিষ্ট ঘটনা সব নিজের ক্ষেত্রে কল্পনা করে চিত্তমাঝে যে সংকোচ সঞ্চার হয়, তাকে ভয় বলে। ভয়ের কারণে দেহে ও মনে নানা বিকলতা দেখা দেয়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এ পাশ মুক্ত হলে সাধক কোন কিছুতে ভীত হননা বা তাঁর দ্বারা কেউ ভীত হয় না। তিনি বাক্য দ্বারা সকল ভয় দূর করতে পারেন। ‘মনিপুর’ চক্র সাধনায় এ পাশ থেকে সাধক মুক্ত হন।

[৬] দ্রষ্টব্য, শ্রী গৌরপ্রিয় সরকার, অনুবাদমালা ২য় খন্ড, পৃ: ৫৩-৭৪।

(৪) বিষয় বিশেষে যে বহুরূপ জ্ঞান তাকে আশংকা বলে। এর অন্য নাম সংশয় বা সন্দেহ। কোন বিষয়ে অনিশ্চিত জ্ঞান-ই আশংকা বা সংশয়। প্রথমে এর প্রয়োজন আছে পরে এর লয়ে শুভ সংঘটন হয়।কোন ব্যক্তির আশংকা পাশ লয় হলে ,ঐ ব্যক্তির প্রতি অন্য লোকের আশংকাও দূর হয়ে যায়। অনেকে আশংকা পাশের স্থলে ক্রোধের কথা বলেন। ক্রোধ যদি পাশ হয় তাহলে কামও পাশের মধ্যে গণ্য হবে। ক্রোধ অতীব দুর্জয় রিপু। ক্রোধের ফলে নানা অনিষ্ট ঘটে। সাধক ক্রোধ পাশ লয় করতে পারলে বিকার রহিত হন। কোন অবস্থায় তিনি ক্রুদ্ধ হননা। 'অনাহত' চক্র সাধনায় এ পাশ দূর হয়।

(৫)গোপন করার ইচ্ছাকে জুগুপ্সা বলে। কেউ কেউ এর অর্থ 'নিন্দা' বলেন। এটি অসরল ভাবের প্রকাশ, এটি ভেদবুদ্ধি থেকে হয়। পূর্ণভাবে অভেদজ্ঞান হলে ভেদবুদ্ধি থাকেনা। সরলতা গুণের যোগে এ পাশ লয় হয়। নিন্দা ত্যাগ সজ্জনের পক্ষেও কঠিন। পরনিন্দা বেশী মোহকর। অতিযত্নে এর লয় করা দরকার। এ পাশ লয় হলে গোপনতা থাকেনা এবং নিন্দা ত্যাগ হয়। 'বিশুদ্ধ' চক্র সাধনায় এ পাশ লয় হয়।

(৬)মাননীয় উচ্চবংশে আমার জন্ম- কোন ব্যক্তির মনে এরকম যে ভাব তাকে কুল পাশ বলে। এ পাশে বদ্ধ থাকার ফলে উচু-নীচু ভেদ সৃষ্টি হয়। এ পাশ লয় হলে সকলকে সে স্ববংশীয়তুল্য ভাবে এবং তাঁকেও সবাই সেরূপ ভাবে। যে পর্যন্ত এ বিশ্বে সবকিছু ব্রহ্মময় দর্শন না করে সে পর্যন্ত জীবের এ ভাব থাকে। অতি যত্নে এ পাশ থেকে মুক্ত হবার সাধনা করতে হয়। 'ললনা' চক্র সাধনা দ্বারা ক্রমান্বয়ে এ পাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

(৭)শীল অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। পুণ্য ও অপুণ্য এ প্রভেদের কারণে চরিত্র দু'রকম। আর এর কারণে পাপী-পুণ্যবান ভেদ, সুশীল-দুঃশীল ভেদ হয়। এরূপ আরো যে ভেদ জ্ঞান হয় তা শীল পাশের কারণে হয়। মহাত্মারা

(৭)শীল অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। পুণ্য ও অপুণ্য এ প্রভেদের কারণে চরিত্র দু'রকম। আর এর কারণে পাপী-পুণ্যবান ভেদ, সুশীল-দুঃশীল ভেদ হয়। এরূপ আরো যে ভেদ জ্ঞান হয় তা শীল পাশের কারণে হয়। মহাত্মারা আগে পাপ ত্যাগ করেন, পরে পুণ্যও ত্যাগ করেন, পরে পাপ-পুণ্যকে সমান বলে ভাবেন। পাপ ও পুণ্য এ দুই-ই শীল-এ দুই-ই ত্যাগ করা কর্তব্য। 'আজ্ঞা' চক্র সাধনার দ্বারা জীব ক্রমান্বয়ে এ পাশ থেকে মুক্ত হয়।

(৮)জাতি অর্থ আকৃতি গ্রহণ। পশুত্ব, পক্ষীত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি আকৃতি- এদের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার নানা ভেদ আছে। জীবগণ এ পাশে বদ্ধ হয়। এ পাশ মুক্ত হলে সাধক সবাইকে সমরূপে দেখেন, তাঁর কাছে সকলে আত্মতুল্য, সেও সকলের আত্মতুল্য হয়। তাঁর কাছে হিংস্ররাও হিংসাভাব ত্যাগ করে একত্রে অবস্থান করে। 'মনশ্চর' চক্র সাধনায় এ পাশ লয় হয়।

চক্রভেদ সাধনা :

গুরুনাথ বলছেন, চক্রভেদ সাধনার দ্বারা পাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এ চক্রভেদ সাধনা বিষয়ে গোরক্ষ সংহিতায়, অমৃতবিন্দু, হংস ও ব্রহ্ম উপনিষদে এবং পূর্ণানন্দ রচিত 'ষট্চক্র' নামক বইয়ে বর্ণনা আছে। তবে এসব বইয়ের বর্ণনায় নানা মতভেদ আছে। গুরুনাথ এসব মতভেদের মীমাংসা করেছেন।

তিনি প্রথমে ধ্যানে জেনেছেন এবং পরে অনুষ্ঠান করেছেন। এ সাধনায় রোগ-মৃত্যু হতে পরিত্রাণ লাভ হয়।

মহাত্মা মহাদেব ষট্‌চক্র বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন এবং তা বর্তমানে যেভাবে পাওয়া যায়, গুরুনাথ সত্যধর্ম বইয়ের গুণ প্রকরণের একাগ্রতা প্রবন্ধে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে তা তুলে ধরছি।[৭]

মেরুদন্ডের দু'দিকে ইড়া ও পিঙ্গালা নামে দুটি নাড়ী আছে। ইড়ার ডানে ও পিঙ্গালার বামে সুষম্না নাড়ী আছে। সুষম্নার মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী ও তার মধ্যে চিত্রিণী নাড়ী অবস্থিতি করে। দেহ মধ্যে সাতটি স্থানে সাতটি পদ্ম সুষম্নায় গ্রথিত আছে। যথা- মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রদল। মূলাধার বা আধারপদ্ম পায়ুদেশের একটু উপরে, স্বাধিষ্ঠান লিঙ্গামূলে, মণিপুর নাভিমূলে, অনাহত হৃদয়ে, বিশুদ্ধ কণ্ঠদেশে, আজ্ঞা ভ্রূমধ্যে এবং সহস্রদল মস্তকে বিদ্যমান। এ সকল স্থানে যে সকল বীজ আছে গুরুনাথ তাঁর রচিত 'ষটচক্রভেদ সাধনা' বইয়ে তার উল্লেখ করেছেন। এ বীজগুলি বাংলা ভাষার অক্ষরে লেখা নয়, বৈজিক ভাষার বর্ণমালা অনুসারে লিখিত।[৮] বাস্তবে এগুলি পদ্ম নয়, পদ্ম বলে রূপক করা হয়েছে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ নাড়ী বিশেষের সংযোগে এগুলি উৎপন্ন। এ জন্য কোন কোন পদ্ম লাল দল বিশিষ্ট কেননা সেগুলি ধমনীর, কৈশিকার অথবা ফুসফুসীয় শিরার সংযোগে গঠিত; কোন কোনটি কালো দলবিশিষ্ট কেননা সেগুলো শিরা সংযোগে বা ফুসফুসীয় ধমনী দ্বারা গঠিত; কোন কোনটির কিছু লাল কিছু কালো দল বিশিষ্ট কেননা সেগুলি শিরা ও ধমনী উভয়ের যোগে গঠিত, কোন কোনটি সাদা বর্ণের কেননা সেগুলো স্নায়ুযোগে গঠিত আবার কোন কোনটি মিশ্রবর্ণ দলযুক্ত কেননা সে সকল পূর্বোক্ত ও অন্যান্য নাড়ীসমূহ সংযোগে উৎপন্ন। উল্লিখিত সাত টি পদ্মে যে সকল দলের সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে সে সকলও বৈজিক বর্ণমালার আকার অনুসারে ই হয়েছে।

এ সাতটি পদ্মে যে সকল দলের সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বৈজিক ভাষার বর্ণমালার আকার অনুসারে হয়েছে। প্রচলিত চিত্রে যেমন আকার দেখা যায়, প্রকৃত আকার সেরকম নয়। যাঁদের বৈজিক বর্ণমালার জ্ঞান হয়েছে তাঁরা প্রকৃত আকৃতি বুঝতে পারেন। নাড়ী সংযোগে উৎপন্ন উল্লিখিত আকৃতির সংখ্যা ৬৮টির বেশী হলেও তার মধ্যে ৫০টি প্রধান। এজন্য আর্যেরা বর্ণসংখ্যা ৫০ নির্দেশ

---

[৭] দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম , পৃ: ১২১-১২২

[৮] গুরুনাথ বলছেন, জগতে সাধারণভাবে যেসব ভাষা প্রচারিত আছে, তাছাড়া বৈজিক ভাষা নামে অন্য একটি ভাষা আছে। প্রচলিত পার্থিব ভাষাগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে কোনও একটি দ্বারা ভাষার যে উদ্দেশ্য তা সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয়না। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, আরবী, পার্শী, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় উচ্চার্যমান বর্ণাবলীরই অভাব আছে; কাজেই এসব ভাষা উচ্চারণ দ্বারা ভাষার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই। তবে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে যে ভাষার যে অংশ পূর্ণভাষা বৈজিক ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত তার দ্বারা অভিপ্রায় বেশী পরিমাণে সিদ্ধ হয়। কিন্তু বৈজিক ভাষা উচ্চারণে যেমন সম্পূর্ণ হয় অন্য কোন ভাষায় সেরূপ হয়না। কেননা বৈজিক ভাষাই পূর্ণ ভাষা, বৈজিক ভাষা সমস্ত ভাষার মাতা ও পিতা, বৈজিক ভাষাই সমস্ত ভাষার উৎকর্ষের মূল এবং এ ভাষা সার্বভৌম সার্বজীবিক ভাষা। সমস্ত মন্ডলের সব মানুষের সব জীবজন্তুর যে সাধারণ ভাষা তা-ই এই মূল ভাষা। সব ভাষা এ ভাষা থেকে উৎপন্ন। যেমন বীজ থেকে সবকিছু উৎপন্ন হয়, সেরকম বীজ-ভূত ভাষা থেকে সমস্ত ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। বৈজিক ভাষায় জ্ঞান লাভ হলে সব জীবের সব ভাষা জানা যায়। এ ভাষায় জ্ঞান লাভ করতে হলে আত্মাকে বহুগুণে উন্নত করতে হয়। সৃষ্টিতে দেখা যায়, যে জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে, সেসব ঐ জাতীয় পদার্থ থেকে উৎপন্ন। কেননা ভূতসকল মূলভূত আকাশ থেকে, মন্ডলসমূহ সূর্যমন্ডল থেকে উৎপন্ন ইত্যাদি। অতএব সমস্ত ভাষাও কোন একটি মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেই মূল ভাষাই বৈজিক ভাষা (দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম : গুণ প্রকরণ, পৃ: ১২৫-১২৬)

করেছেন; আর এ জন্য 'ক্ষ' সংযুক্ত বর্ণ হলেও একে মূল বর্ণমধ্যে গণনা করা হয়েছে। এ আকৃতিগুলিই বৈজিক ভাষার বর্ণের আকার।

'ষটচক্রভেদ সাধনা'[৯] বইয়ে গুরুনাথ চক্র সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন। মেরুদন্ডের বাইরের দিকে বামে ইড়া নাড়ী সত্ত্বগুণযুক্তা, তন্ত্রে একে চন্দ্র নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ডানদিকে পিঙ্গলা নাড়ী রজোযুক্ত, তান্ত্রিকেরা একে সূর্যশিরা বলেন; এ দুই নাড়ীর মাঝে সুষম্না নাড়ী সত্ত্বরজতমোগুণযুক্ত। সুষম্নার মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী, বজ্রাখ্যার ব্যাপ্তি লিঙ্গ থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত। বজ্রাখ্যার ভিতরে চিত্রিণী নাড়ী। চিত্রিণীর মধ্যভাগে ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। এটি মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত। এ ব্রহ্মনাড়ী ও সুষম্না নাড়ী সব চক্র ধারণ করে আছে। মূলাধারে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষম্না মিলিত হয়েছে।

চক্রে রক্ত পীত ইত্যাদি যে সব বর্ণ আছে সেগুলি ধমনী ও শিরার লাল ও নীল রক্তের কারণে হয়। কিন্তু এ সকল বর্ণ মৃতদেহে ও ভগ্ন চক্রে দেখা যায়না। মূলে চক্র সংখ্যা চৌদ্দ। এর মধ্যে দশটি প্রধান, আর তার মধ্যে সাতটি প্রধান, যাতে এ চক্রভেদ সাধনা করতে হয়। প্রধান সাতটি চক্র হ'ল- মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধা, আজ্ঞা ও সহস্রার। বিশুদ্ধাচক্রে এক গুপ্ত চক্র আছে যার নাম ললনা। আজ্ঞা চক্রে দুটি গুপ্তচক্র- একটি মন অন্যটি সোম। এই মোট দশটি চক্র। আবার অনাহত চক্রে এক গুপ্ত চক্র আছে যার নাম জৈবচক্র। সহস্রারে সত্য নামে এক গুপ্ত চক্র আছে। এভাবে চক্র সংখ্যা বারো। এ ছাড়া কেউ কেউ বলেন, মূলাধারে এক পরমচক্র গুপ্তভাবে আছে সেটি সহস্রদলবিশিষ্ট, এজন্য সহস্রার নাম; আর সে চক্রের কর্ণিকায় সমাধিস্থ জনেরা সত্য নামে এক উজ্জ্বল দর্শন চক্র দেখে। এই মোট চৌদ্দটি চক্র। অন্তশ্চক্র বা গুপ্ত চক্রভেদের জন্য আর ভিন্ন সাধনা নাই। মূল চক্র(সাত) ভেদ হলে গুপ্ত চক্রভেদ হয়। যদিও দশচক্র বা সপ্ত চক্র সবাই বলে তথাপি সাধনার নাম ষটচক্রভেদ, কেননা এ সাতচক্রে ছয়টি গুণের সাধনা করতে হয়। যথা মূলাধারে সত্য, স্বাধিষ্ঠানে শিব, মণিপুরে ক্ষান্তি, অনাহতে সহিষ্ণুতা, বিশুদ্ধায় প্রিয়ভাষণ, আজ্ঞায় দয়া ও সহস্রারে দয়া। চক্রে সাধনীয় ছয়গুণ- এজন্যই ষটচক্রভেদ সাধনা নাম হয়েছে। চক্রের দলসংখ্যা, দলের বীজসমূহ, কিভাবে সাধনা করতে হয়- এসব বিস্তৃতভাবে এ বইয়ে আচার্য গুরুনাথ বর্ণনা করেছেন।

(২)

গুণ-সাধনা

আচার্য গুরুনাথের ধর্মতত্ত্বে গুণ-সাধনা[১০] একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি গুণসাধনা বলতে গুণের অভ্যাস বা গুণের চর্চা বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, গুণের দ্বারাই মানুষ ও পশুর প্রভেদ এবং সাধারণ মানুষ ও উন্নত

[৯] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, ষটচক্রভেদ সাধনা (সংস্কৃত গ্রন্থ) এর বঙ্গানুবাদ : অনুবাদক শ্রী গৌরিপ্রিয় সরকার, বাংলাদেশ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

[১০] মানুষ পৃথিবীতে গুণ সাধনার জন্য জন্মগ্রহণ করে, গুরুনাথ এ তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। গুরুনাথ 'গুণরত্নম্' ও 'গুণসূত্রম্' এ দুটি সংস্কৃত রচনায় গুণ ও গুণ-সাধনার বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন। প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সারল্যম, পবিত্রতা ও বিশ্বাস, এ ছয়টি সংস্কৃত প্রবন্ধে এ পরম গুণগুলি সম্বন্ধে ও এদের সাধনার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া 'অভেদজ্ঞানম্' সংস্কৃত প্রবন্ধে 'অভেদজ্ঞান' নামক গুণ ও এর সাধনার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ সংস্কৃত প্রবন্ধগুলি শ্রী গোরপ্রিয় সরকার অনুবাদ করেছেন এবং অনুবাদমালা ১ম খন্ড ও ২য় খন্ডে ছাপা হয়েছে। গুরুনাথ সত্যধর্ম গুণ প্রকরণে প্রেম, ভক্তি ও একাগ্রতা এ তিনটি গুণের সাধনার

মানুষের প্রভেদ। মানুষের ভালমন্দের বিচার গুণের দ্বারাই হয়। যার গুণ বেশী তাকে সবাই ভাল বলি, যার গুণ কম তাকে মন্দ বলি। শিষ্ট হও, শান্ত হও, ভদ্র হও, জ্ঞানী হও- এ জাতীয় আশীর্বাদ মানুষের শিক্ষা নিরপেক্ষ ও স্বভাব সুলভ। অপরের সুখে সুখী হওয়া বা অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া- গুণসাধনের এ মূলসূত্রগুলো সকলের হৃদয়েই দেখা যায়। গুণসাধনা যেমন মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম, তেমন ই মানুষের নিজ নিজ প্রকৃতির উৎকর্ষের মূলেও গুণসাধনা। গুণের চর্চ্চা ছাড়া মনুষ্যত্বের বিকাশ ও উন্নতি হয়না। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সব ধর্মেই কিছু না কিছু গুণসাধনার কথা আছে। সবকালে সব দেশে সব ধর্ম-প্রচারক গুণ সাধনার কথা বলেছেন । গুণ বাদ দিলে পশু ও মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। পশুভাব ত্যাগ করা, নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলোর উচ্ছেদ করা ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলোর উন্নতি করা, মানুষের স্বাভাবিক কাজ।আর একাজ করতে হলে গুণসাধনা অবশ্য কর্তব্যকর্ম।

সুতরাং তাঁর এ মত অনুসারে বলা যায় যে, ধর্মসাধন করার সেরা উপায় বা একমাত্র উপায় গুণসাধনা; গুণসাধনা ছাড়া কোন ধর্মকাজ হয় না। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক লোকই যোগ সাধনার পক্ষপাতী। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় যে, যা যোগ দ্বারা হওয়া কঠিন বা অসাধ্য, তা গুণ দ্বারা সহজে হয়। গণিতের ক্ষেত্রে যেমন যোগ অপেক্ষা গুণের দ্বারা অনেক কাজ অল্পে হয় বা অসংখ্য যোগের কাজ গুণ দ্বারা সহজে হয়, তেমনই আধ্যাত্মিক রাজ্যে বা ধর্মরাজ্যে যোগসাধনায় যা হওয়া কঠিন, গুণসাধনায় তা সহজে হয়। যোগ সাধনায় যা হাজার হাজার বৎসরে হয় , গুণসাধনায় তা মুহূর্তমাত্রে হতে পারে।[১১] সুতরাং যোগ অপেক্ষা গুণই প্রধান। যে যোগ গুণের বা গুণসাধনার মূল তা আমাদের স্বাভাবিক। অপরকে ভালবাসতে হলে যে করুণরসের যোগ আত্মায় থাকা দরকার, যে গুণ-সামঞ্জস্যে বা সাদৃশ্যানুপাত দ্বারা পরস্পরের যোগ থাকা আবশ্যক এবং এরূপ অন্য যে সকল সরলগুণ আত্মায় থাকা দরকার, সেগুলি সৃষ্টির সময়ই আমরা মঙ্গলময়ের মঙ্গল নিয়মে লাভ করি। সেগুলি পাবার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয়না। মানুষের হৃদয়ে যে স্বাভাবিক গুণাঙ্কুর আছে, যেমন করুণ রস, মমতা প্রভৃতি; তা-ই ঐ গুণসাধনার মূল। হঠযোগাদি সংক্রান্ত বায়ুসাধনা দ্বারা তা লাভ করা যায় না। তাছাড়া যোগ নামে প্রচলিত বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি গুণ গৌরবের ব্যাঘাতজনক ও অন্বয়ী সাধনার প্রতিকূল।[১২]

বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যা সত্যধর্ম বইয়ের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা বইয়ে 'অভেদজ্ঞান' বাংলা প্রবন্ধ আছে। এসব বইয়ের আলোকে আমরা গুণসাধনা বিষয়ে গুরুনাথের মত উল্লেখ করছি।

[১১]দ্রষ্টব্য,সত্যধর্ম,পৃ,৩১-৩৩

"কি হঠযোগ, কি রাজযোগ, কি অন্যবিধযোগ, সকলেরই উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা সাধন। যখন পরমপিতার প্রতি প্রেম করিতে পারিলেই আত্মার একাগ্রতা জন্মে তখন ঐ বিষয়ের যে কোনও প্রয়োজন নাই, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। কেননা শতবর্ষ যোগ সাধনা করিয়া যেরূপ একাগ্রতা হয়। এক মুহূর্তের প্রেমে তদপেক্ষা সহস্রগুণে একাগ্রতা জন্মে। আরও দেখ, শেষোক্ত উপায়ে কার্য করিলে একাগ্রতা ব্যতীত পাপমুক্তি প্রভৃতি লাভও হয়।" (শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত (প্রকাশক),সত্যধর্ম, পৃ:২-৩)

[১২] " যোগসাধকেরা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া অবলম্বন না করিয়া, কেবল পার্থিব ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা একাগ্রতা লাভ করিতে প্রবৃত্ত হন। কেহ কেহ প্রথমে একটি পার্থিব বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করিয়া একাগ্রতা লাভ করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা বিবেচনা করেন না যে, কেবল স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে অথবা কেবল মাতার চরণোপরি চক্ষু রাখিলেই, স্ত্রী ও মাতার প্রতি একাগ্রতা জন্মে না। প্রত্যুত প্রেম ও ভক্তি থাকিলে দর্শন ব্যতীতও উহাদিগের প্রতি আত্মার একাগ্রতা জন্মে। ... একাগ্রতা একটি আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্ট গুণ। এজন্য উহা লাভ করা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সাপেক্ষ। সুতরাং পার্থিব ক্রিয়া-মাত্র দ্বারা কখনই ইহার লাভ বা বৃদ্ধি সমীচীন বা প্রকৃতরূপে হইতে পারে না।" (দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ১৩০-১৩১)

"... প্রেম ও ভক্তি লাভ হইলে একাগ্র হওয়া যায়, একাগ্রতা লাভ করিবার জন্য কত লোকে পানদোষাদিতে রত হয় কিন্তু সেরূপ করা অতি গর্হিত। কতগুলি লোক এই একটি গুণ লাভ করিবার জন্য অন্যান্য বহুবিধ সদ্‌গুণ বিনষ্ট করিয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাও যে কর্তব্য নয়...". (দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ১৯)

আচার্য গুরুনাথের মত অনুসারে, মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনে গুণসাধনা গুরুত্বপূর্ণ,কেননা এর উপরই তার সব উন্নতি নির্ভর করে। মানুষ যে মধুময় কাব্যরসে আত্মহারা হয়ে বিমল সুখ লাভ করে, সুধাময়ী গীতি শ্রবনে শোক-দুঃখ নিবারণপূর্বক বিমোহিত হয়, একাগ্রতা ও অনুচিকীর্ষার ফলস্বরূপ কারুকার্য্যের সৌন্দর্য দেখে আনন্দ লাভ করে-- এ সব-ই গুণসাধনার ফল। সকলে সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের নাম শুনে তাঁর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, গুণবানের আদর করে, দোষীর প্রতি ঘৃণা করে, দোষীর অট্টালিকা ত্যাগ করে গুণবানের জীর্ণকুটিরকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, এ সবই গুণ গৌরব প্রকাশ করে এবং এর দ্বারা গুণ সাধনার কর্তব্যতাও প্রকাশ পায়। সুতরাং বলা যায়, গুণই মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম, গুণই মানুষের প্রকৃতির পরিশোধক ও সংস্কারক; গুণ চিত্তের নির্মলতা বিধান করে এবং গুণই মানুষের উন্নতির মূল ও মুক্তির একমাত্র উপায়। ঈশ্বর অনন্ত গুণের নিধান ; তাঁকে পাবার উপায়ও গুণ-সাধনা। কাজেই, মুক্তিকামী ও উন্নতিকামীদের গুণ-সাধনা করা একান্ত প্রয়োজন। গুণ-সাধনায় সকলেই অধিকারী। গুণসাধনার উপায় অসংখ্য। প্রধান দুটি উপায় হ'ল,(১) উপাস্য অনন্ত গুণময়ের উপাসনা ও (২) উৎকৃষ্ট গুণগুলির অভ্যাস বা চর্চা করা। আচার্য গুরুনাথের মতে গুণের সংজ্ঞা ও বিভাগ নিম্নরূপঃ

যা ধারণা করা যায় তাকে পদার্থ বলে অথবা যা ইন্দ্রিয়গোচর বা যার অংশ ইন্দ্রিগোচর তাকে পদার্থ বলে। পদার্থ দু'প্রকার - ভাব ও অভাব। যা নিজে নিজে আছে বলে জানা যায়, তা ভাব পদার্থ। যেমন- ঘট, কৃষ্ণত্ব, পঞ্চত্ব ইত্যাদি। আর যা অন্যের অবিদ্যমানতা প্রমাণ করে, তা অভাব পদার্থ। যেমন- অন্ধকার, ছায়া। ভাব পদার্থ পাঁচ রকম- দ্রব্য, গুণ, কর্ম(ক্রিয়া), জাতি ও সম্বন্ধ। পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম), আত্মা এবং এই উভয়ের যোগে এই দুই ধর্মী পদার্থকে দ্রব্য বলে। উপরে নিক্ষেপ, নিচে নিক্ষেপ, সংকোচন, প্রসারণ ও গমনকে ক্রিয়া বলে। যা দ্রব্যে অবস্থান করে দ্রব্যের পরিচয় দেয় কিন্তু নিজে দ্রব্য বা ক্রিয়া নয় এবং অপূর্ণে বা অপূর্ণাবস্থায় যার হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় ,তাকে গুণ বলে। গুণের মধ্যে কতগুলি নিত্য ও অনন্তকাল স্থায়ী কিন্তু সব গুণেরই হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে। তাছাড়া যে গুণগুলি নশ্বর দ্রব্য অবলম্বন করে থাকে, তাদেরও লয় হতে পারে। যেগুলি নিত্য দ্রব্য অবলম্বন করে থাকে, তাদেরও কারও কারও লয় হয়।

জগতে যে কত গুণ আছে তা নির্ণয় করা মানুষের অসাধ্য বলে মনে হয়। সেজন্যই বলা হয় যে, গুণ অনন্ত। অবলম্ব্য দ্রব্যভেদে গুণ প্রধানত: দু'প্রকার- ভৌতিক গুণ ও আধ্যাত্মিক গুণ। যেসব গুণ পাঁচটি মূল ভূত অর্থাৎ ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটি অবলম্বন করে থাকে, তাদেরকে ভৌতিক গুণ বলে। এদের গুণগুলি শব্দ, শব্দ ও স্পর্শ, শব্দ স্পর্শ ও রূপ, শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। ভৌতিক পদার্থ অসংখ্য। এদের গুণ কৃষ্ণত্ব, শুভ্রত্ব, সুস্বাদ, বিস্বাদ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, ত্রিকোণত্ব, গোলাকারত্ব ইত্যাদি। কোন কোন দার্শনিকদের ও বিজ্ঞানবিদ্‌দের মতে, আমরা ভৌতিক পদার্থ জানতে পারি না কেবল তার

"মনস্থির করিবার জন্য বায়ুস্থির করিবার যে যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়ও উৎকৃষ্ট নহে। কেননা বায়ুস্থির করিতে যে কুম্ভক রেচকাদি করা হয় অথবা রসনাচালনা করিতে হয় তৎসমুদায় অবলম্বনে অনেকে অনেক প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। যদি কষ্টে সৃষ্টে সেই রোগ হইতে মুক্তি পান তথাপি ইন্দ্রিয় বিশেষের তেজোহানি হইয়া থাকে।" (দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ১৪২)

গুণগুলি জানতে পারি। এমত সত্য হোক বা না হোক, গুণগুলি বাদ দিয়ে আমরা ভৌতিক পদার্থ জানতে পারিনা, আবার ঐ পদার্থকে বাদ দিয়ে গুণগুলি বোঝা যায় না; এটা স্বীকার করতে হয়। অতএব ভৌতিক পদার্থের গুণগুলি তাকে বিশেষ করে এজন্য এগুলিকে বিশেষণ গুণ বলা যায়। আত্মার গুণকে আধ্যাত্মিক গুণ বলে। এদের পরিচয়ের জন্য আধারের অপেক্ষা করে না, সেজন্য এদেরকে বিশেষ্য গুণ বলে। ধর্ম জগতে আধ্যাত্মিক গুণের সাধনাই আবশ্যক, আত্মার পরম উপকারক, পরিপোষক, অনন্তকালের সহচর এবং অনন্ত গুণময়, প্রেমময়, পরমপিতার সান্নিধ্য লাভের সহায়তাকারক। আধ্যাত্মিক গুণের সাধনাই ধর্মসাধন।

আধ্যাত্মিক গুণগুলি কঠোর ও কোমল ভেদে দু'প্রকার। এই দুই প্রকারের প্রত্যেক প্রকার আবার সরল, মিশ্র ও জাত--এ তিনভাগে বিভক্ত। আবার এদের প্রত্যেক প্রকার লয়শীল ও অলয়শীল এ দু'প্রকার। এভাবে গুণ দশ প্রকার, (১) সরল কোমল অলয়শীল, যথা- প্রেম, (২) সরল কোমল লয়শীল, যথা- মমতা, (৩) সরল কঠোর অলয়শীল, যথা- জ্ঞান, (৪) সরল কঠোর লয়শীল, যথা- বহুত্ববোধ, (৫) মিশ্র কোমল অলয়শীল, যথা- ঈশ্বরভক্তি, (৬) মিশ্র কোমল লয়শীল, যথা- পার্থিব ভক্তি, (৭) মিশ্র কঠোর অলয়শীল, যথা- বিশ্বাস, (৮)মিশ্র কঠোর লয়শীল, যথা- সৃষ্টগণের প্রতি আত্মোন্নতিবোধ, (৯) জাত কোমল লয়শীল, যথা- কাম, (১০) জাত কঠোর লয়শীল, যথা- ক্রোধ। জাত গুণের অলয়শীলত্ব নাই।

যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে স্বভাবত: আছে সেগুলো সরল গুণ। যেমন- প্রেম, সরলতা ইত্যাদি। যে গুণের অঙ্কুর আত্মায় থাক বা না থাক অন্য কোন গুণ বা গুণসমূহের যোগে স্বীয় নামে পরিচিত হয় ,তাকে মিশ্র গুণ বলে। যেমন- ঈশ্বরভক্তি, এটি আধ্যাত্মিক প্রেম ও পার্থিব ভক্তির যোগে উৎপন্ন। আবার পার্থিব ভক্তি, এটি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, এরও লয় আছে। এটি কয়েকটি আত্মনিষ্ট গুণাঙ্কুরের যোগে উৎপন্ন।[১৩] কাজেই এটাও মিশ্র গুণ। যে গুণের অঙ্কুর আত্মাতে নাই, ভৌতিক জগতের সাথে আত্মার সম্বন্ধকালে ক্ষণে ক্ষণে উদিত ও তিরোহিত হয়,তাকে জাত গুণ বলে। যেমন- কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গুণগুলি উৎকৃষ্ট এবং তৃতীয় শ্রেণির গুণগুলি অপকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট গুণগুলির উন্নতি ও অপকৃষ্ট গুণগুলির লয় সাধনাকেই গুণ-সাধনা বলে। অপকৃষ্ট গুণের অন্য নাম দোষ। গুণ বললে উৎকৃষ্ট গুণগুলিই বুঝায়। এজন্য গুণ সাধনা বললে উৎকৃষ্ট গুণের সাধনা বুঝায়। উৎকৃষ্ট গুণের উন্নতি হলে অপকৃষ্ট গুণ বা দোষ আপনা থেকেই লীন হয়ে যায়।

আচার্য গুরুনাথের মতে ,গুণ মাত্রই শক্তিসম্পন্ন। জগতে যা কিছু আছে সবই গুণ ও গুণময়। গুণ ভিন্ন দ্রব্য নাই। গুণ ব্যতীত ক্রিয়া হতে পারেনা কেননা যে দ্রব্যের ক্রিয়া হবে তাও গুণ সমষ্টি। দ্রব্যত্বাদি জাতিও গুণসাপেক্ষ। সম্বন্ধও গুণ ছাড়া অসম্ভব এবং অভাবও গুণ বা গুণসমষ্টি ছাড়া অন্যের হবার সম্ভাবনা নাই। সৃষ্টির সর্বত্রই গুণ ও গুণ সংক্রান্ত কাজই দেখা যায়। জড় পদার্থ, আত্মা, এ সবকিছুই গুণসমষ্টি। সৃষ্ট-স্রষ্টা সবই গুণসমষ্টি, গুণময়। অতএব যে গুণ থেকে সৃষ্টি, যে গুণের সৃষ্টি, যে গুণ দ্বারা সৃষ্টি, যে গুণেতে সৃষ্টি, যে গুণ সম্বন্ধে সৃষ্টি, যে গুণ স্রষ্টা, যে গুণ সৃষ্ট, নিখিল জগতের সেই একমাত্র পরম পদার্থ গুণ। অতএব

---

[১৩] (১) করুণ রস (২) উৎপন্নের আদিত্ববোধে উৎপাদকের প্রতি মমতা ও কৃতজ্ঞতা (৩) নির্ভরতা (৪) উপচিকীর্ষা (৫) ন্যায়পরতা (৬) গুণাদরেচ্ছা (৭) আধ্যাত্মিক প্রেমাঙ্কুর। এই সাতটি গুণের যোগে পার্থিব ভক্তি হয় (দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ: ৮০)

মানুষের সাধনার বিষয় একমাত্র গুণ। গুণসাধনা-ই ধর্মার্থী বা উন্নতিকামী মানুষের কর্তব্য। মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ উন্নতি গুণ সাধনার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

প্রেম, ভক্তি, সরলতা, বিশ্বাস, একাগ্রতা, পবিত্রতা- এ ছয়টি পরম গুণ। সত্য, অহিংসা, শৌচ, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ- এসব ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রার্থীদের অবলম্বনীয়।

মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যে পথ তা ধর্ম; প্রয়োজনের নাম অর্থ; কাম্য বিষয়ের লাভকে কাম বলে। মোক্ষ চার প্রকার-

(১) সাযুজ্য – আত্মায় পরমাত্মার সংযোগ অনুভব।

(২) সারূপ্য - পরমাত্মার অনভিমত কাজ না করার অবস্থা।

(৩) সালোক্য – যেখানে সাধক সেখানেই পরমাত্মার অনুভূতি, এরূপ সলোকতা।

(৪) একত্ব - কোন একটি গুণে পরমাত্মত্ব লাভ করা।

গুণ সাধনার ফল : (১) আত্মপ্রসাদ (২) অন্যের অশ্রুয়মান শব্দ শ্রবণ (৩) জ্যোতি দর্শন (৪) পরহৃদয়াভিজ্ঞতা (৫) সূক্ষ্ম দেহধারীদের সাথে কথাবার্তা (৬) বাক্ সিদ্ধি (৭) কীর্ত্তিসিদ্ধি- যা দ্বারা দেহ থেকে বাইরে যাওয়ার শক্তি জন্মে (৮) গুটিকা সিদ্ধি- যা দ্বারা দেহ নিয়ে শূন্যে ভ্রমণ করা যায় (৯) অমৃতসিদ্ধি- যা দ্বারা নিজ দেহ থেকে বের হয়ে অন্য দেহে প্রবেশ করা যায় (১০) অমূলসিদ্ধি- যা দ্বারা নিজ দেহ থেকে বের হয়ে অন্য দেহীর রূপ ধারণে শক্তি জন্মে (১১) দূরদর্শন (১২) দূরশ্রবণ (১৩) আয়ু প্রদানে সমর্থতা (১৪) বৈজিক ভাষায় জ্ঞান, যা দ্বারা সব জীবের ভাষা বোঝা যায় (১৫) জীবত্বধ্বংস বা পরমাত্মত্ব লাভ (১৬) এক ব্যক্তির বহুদেহ ধারণের সমর্থতা- একে অসীমত্ব বলা হয়। ক্রমশঃ এরকম আরও বহুফল লাভ হয়। গুণসাধনার অন্তিম ফল পরমেশ্বরের দর্শন লাভ। পরমেশ্বর একমাত্র। তিনি নিরতিশয়রূপে সর্বজ্ঞত্বাদি গুণের আধার। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তিনি কালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নন। তাঁর অনন্ত গুণের মধ্যে কেউ যদি একটি গুণে তাঁর সাদৃশ্য অবস্থা লাভ করে, সে সাধারণের অতীত হয় এবং ঈশ্বর বলে অভিহিত হয়। জগতে অনেক ঈশ্বর আছেন কিন্তু পরমেশ্বর একমাত্র। পরমেশ্বর অব্যক্ত ও অজ্ঞেয় হলেও গুণ সহকৃতা উপাসনা দ্বারা তাঁকে ক্রমশঃ জানা যায়। যেহেতু তিনি করুণাময় ও সর্বশক্তিমান। সেহেতু তাঁর গুণেই তাঁর স্বরূপ দেখা বা জানা যায়।

গুণসমূহের মধ্যে প্রেমগুণ সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর ভক্তি, একাগ্রতা, বিশ্বাস প্রভৃতি; 'ভক্তিই গরীয়সী', 'জ্ঞান আর ভক্তি একটি অপরটির আশ্রিত','বিশ্বাস ধর্মের মূল', 'একাগ্রতার সমান আর নাই', এরকম বহু মত আছে। এজন্য প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, বিশ্বাস, সরলতা ও পবিত্রতা এ ছয়টি গুণ শ্রেষ্ঠ। এ গুলিকে পরমগুণ বলা হয়। 'জ্ঞান হতে মোক্ষ হয়' প্রধান সাধু ব্যক্তিরা এরকম বলেন। ঐ ছয়টি পরমগুণের উৎকৃষ্ট ফল যা তা-ই এই জ্ঞান। এই ছয় গুণের সাধনা না করে জ্ঞানার্থীরা শুষ্কভাবে[১৪] জ্ঞান-কণা লাভ করে। এই শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি তথা সৃষ্টিকর্তার বিষয় জানা যায় না।

---

[১৪] শুষ্ক জ্ঞান বলে কভু জানা নাহি যায়।
কোথা হতে এই সৃষ্টি, কে করে ইহায়।
কি হেতু, কাহার দ্বারা, কাহার সৃজন।

আচার্য গুরুনাথ প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সরলতা, বিশ্বাস, ও পবিত্রতা--এ ছয়টিকে পরম গুণ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এগুণগুলি সাধনার জন্য যেসব বিষয়ের প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হয়েছে, তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে সেগুলি লিখেছেন।[১৫] এছাড়া অভেদজ্ঞান নামক আর একটি গুণ যাকেও পরমগুণের অন্তর্গত করা যায়, সে বিষয়েও লিখেছেন।[১৬] প্রেম প্রবন্ধে প্রেম কাকে বলে, প্রেম-উৎপত্তির ব্যাঘাত, প্রেমের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, প্রেম কিরূপে অনুভূত হয়, কি উপায়ে বৃদ্ধি হয়, প্রেমের আধার, প্রেমের পাত্র, প্রেমের বিভাগ ও তাদের বিশেষ বিবরণ, প্রেমের সাধনা কিভাবে হয়, প্রেম সাধনার ফল, ফলের উপলব্ধি, প্রেমের শক্তি কার্য ও লয়, এসব বিষয়ের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ভক্তি প্রবন্ধে ভক্তি কাকে বলে, প্রেম ও ভক্তির প্রভেদ, ভক্তির উৎপত্তি কিভাবে হয়, কি কি গুণের যোগে ভক্তি হয়, ভক্তির বিভাগ, লক্ষণ, ঈশ্বর ভক্তির উৎপত্তি, ভক্তি কিরূপ গুণ, ভক্তি কিভাবে অনুভূত হয়, ভক্তির আধার, ভক্তির ভাজন, ভক্তি উৎপত্তির ব্যাঘাত, কি কি উপায়ে ভক্তি বৃদ্ধি হয়, কি কারণে ভক্তি হ্রাস হয়, কিভাবে ভক্তি সাধনা করতে হয়, ভক্তি সংকট কি, বিপরীত ভক্তি সাধনা কি, ভক্তির শক্তি, কার্য, লয় প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। এমনিভাবে অন্যান্য পরমগুণগুলির বিবরণ এবং সেগুলি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সাধনার বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গক্রমে কিছু দার্শনিক বিষয় এবং ধর্মার্থীর জ্ঞাতব্য বিষয়ও এসব প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

<u>গুণ সম্বন্ধে অন্যান্য দর্শন:</u>

আমরা দেখেছি, আচার্য গুরুনাথ আধ্যাত্মিক গুণগুলিকে তিন প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন।যথা-সরল, মিশ্র ও জাতগুণ। সরল ও মিশ্রগুণ কে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছেন;যথা-লয়শীল ও অলয়শীল।এই বিভাগগুলি গুণের উৎপত্তি,স্থিতি ও লয় ভেদে হয়েছে।কিন্তু গুণের প্রকৃতি অনুসারে গুণগুলিকে কোমল ও কঠোর –এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।এভাবে সব মিলিয়ে তিনি দশ প্রকার গুণের কথা বলেছেন।

গুণের এরকম একটি বিভাগ আমরা ব্রিটিশ দার্শনিক জি.**ই.**ম্যুরের(১৮৭৩-১৯৫৮) নীতিদর্শনে দেখতে পাই। তাঁর মতে,অন্তর্নিহিত মান বা মূল্যের দিক থেকে নৈতিক গুণাবলী তিন শ্রেনীর-১)অবিমিশ্র ভাল (unmixed good) ২)মিশ্র ভাল (mixed good) ও ৩)অতীব মন্দ (great evil)। অবিমিশ্র ভাল ও মিশ্র ভাল জিনিষ হল ইতিবাচক ও অন্তর্নিহিত অর্থে মূল্যবান। অতীব মন্দ জিনিষ গুলোর নেতিবাচক অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। অবিমিশ্র ইতিবাচক ভাল দুটি জিনিষ ,সেগুলো হল- মানুষে মানুষে

কোন স্থানে হয় এই সৃষ্টি-সংঘটন।।২০
প্রেমে লভে সেই জ্ঞান কেহ বা আয়াসে।
অচিরাৎ লভে কেহ জ্ঞান-প্রেম বশে।
তাই জ্ঞান-প্রেম-রূপ পরম রতন।
লভিতে হইবে করি বিশেষ যতন।।২১
(দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, <u>সত্যামৃত</u>, 'মুক্তি জিজ্ঞাসা', পদ্যানুবাদ, অনুবাদক: শ্রী গৌরপ্রিয় সরকার, , পৃ: ৪

[১৫] গুরুনাথ সত্যধর্ম, গুণ প্রকরণে, প্রেম, ভক্তি ও একাগ্রতা গুণের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন (দ্রষ্টব্য, সত্যধর্ম, পৃ: ৩০-১৪৪)তিনি সত্যমৃত বইয়ে এ ছয়টি গুণ সম্বন্ধে সংস্কৃত প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যার বঙ্গানুবাদ অনুবাদমালা ১ম ও ২য় খন্ডে (গৌরপ্রিয় সরকার কৃত) প্রকাশিত হয়েছে।

[১৬] শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ২৫৪-২৯৫।

স্নেহ-মায়া(personal affection)ও নান্দনিক উপভোগের আনন্দ (pleasure of aesthetic enjoyment)। এরা যে উপাদানে গঠিত তার কোনটি মন্দ নয়।মিশ্র ভাল হচ্ছে অবিমিশ্র ভাল ও অতীব মন্দ এর মধ্যবর্তী স্তরে; যেমন, শান্তি,সাহস,করুণা ইত্যাদি।এদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যদিও এরা অন্তর্নিহিত অর্থে মূল্যবান তবুও এদের প্রতিটির মধ্যে কোন না কোন মন্দ উপাদান মিশ্রিত রয়েছে।অতীব মন্দ হচ্ছে নিষ্ঠুরতা,কামুকতা,হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও কুৎসিত।ম্যুরের মতে অবিমিশ্র জিনিষের পরিমাণ বৃদ্ধি করা,মিশ্র ভাল জিনিষগুলো প্রয়োজন মত বৃদ্ধি করা ও অতীব মন্দ জিনিষগুলো পরিহার তথা চূড়ান্তভাবে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল বা নিশ্চিহ্ন করাই আমাদের নৈতিক আদর্শ।[১৭]

ভারতীয় দর্শনে বৈশেষিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদের মতে, যে পদার্থ কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, যার অপর কোন গুণ নাই বা কর্ম নাই, যা থেকে কোন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় না, যা কর্ম পদার্থের ন্যায় কোন বস্তুকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করতে পারে না, তাকে গুণ বলে।[১৮] ন্যায় বৈশেষিক দর্শন মতে সাতটি পদার্থের একটি হ'ল গুণ। গুণ সব সময় কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। দ্রব্যাশ্রিত না হয়ে গুণ থাকতে পারে না। আবার গুণের কোন গুণ থাকতে পারেনা।[১৯]

জৈন দর্শন মতে দ্রব্য হচ্ছে গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট সৎ পদার্থ। বস্তু অনন্ত গুণবিশিষ্ট, বস্তু সম্পর্কে দ্রব্য, গুণ, পর্যায় সবই সত্য। অবস্থান্তর ভেদে বস্তু অনন্ত ধর্ম বিশিষ্ট, অনন্ত গুণ বিশিষ্ট; বস্তু সম্পর্কে কোন একটি এক চোখা অর্থ জ্ঞান করা যায়না।[২০] রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর গুণ ও পর্যায়ের প্রকৃতি বদলায়। গুণগত প্রকারগত পরিবর্তনের কোন সীমা সংখ্যা নাই। বস্তুর অসংখ্য উপাদানের মধ্যে যেগুলি নিত্য এবং মৌলিক, সেগুলিকে দ্রব্য বলা হয়। যেসব আকৃতি পরিবর্তনশীল, অবভাসিক এবং আকস্মিক সেগুলিকে পর্যায় বলা হয়। পর্যায়ের তুলনায় গুণ নিত্য ও নিয়ত। গুণ ব্যতীত দ্রব্যের ধারণা যেমন সম্ভব নয়, দ্রব্য ব্যতীত গুণেরও স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না।প্রত্যেকটি বস্তু দ্রব্যের বিচারে অনন্য, গুণের বিচারে বহু। দ্রব্যের বিচারে নিত্য, গুণের বিচারে নিত্যানিত্য ।[২১] প্রত্যেক বস্তুর এমন কতগুলি ধর্ম থাকে, যাকে গুণ বলা হয়- যা শত পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তিত থাকে। যা দ্রব্যের স্বাভাবিক বা স্বরূপগত ধর্ম এবং যার জন্য দ্রব্য স্থিতিশীল থাকে, তাকে বলা হয় গুণ।[২২]

সাংখ্য দর্শনে যাকে গুণ বলা হয়েছে তা কোন দ্রব্যের গুণ নয় তা নিজেই দ্রব্য, কেননা এদের আবার কতগুলি গুণ আছে। সাংখ্য দর্শনে গুণের অর্থ উপাদান। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বিশিষ্ট- এ তিনটি গুণ নিত্য ও মৌলিক।এই তিনটি মৌলিক উপাদানের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে গুণের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়, সাংখ্যদর্শনের গুণের সংজ্ঞা তার চেয়ে ভিন্ন। শংকরাচার্যের মতে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। ব্রহ্ম সকল প্রকার বিশেষণ ও গুণবর্জিত। ব্যবহারিক

---

[১৭]উদ্ধৃত, ড.এম.আবদুল হামিদ ,সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা,বাংলাবাজার,ঢাকা,২০০৩,পৃ.৫৬-৫৮।
মূল উৎসঃ Moore ,G.E.,Principia Ethica ,Cambridge University Press,১৯৬৮p.১৮৮-২০৫।

[১৮] দ্রষ্টব্য, মহর্ষি কণাদ, বৈশেষিক সূত্র, ১/১, ১৬

[১৯] দ্রষ্টব্য, জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৩৪৬

[২০] অনেকাত্মকং বস্তু গোচরঃ সর্ব সংবিদাম। একদেশোবিশিষ্টোঽর্থো ন যস্যবিষয়ো মতঃ।। মাধবাচার্য, সর্বদর্শন সংগ্রহ, পৃ. ১৩

[২১] দ্রষ্টব্য, রমেন্দ্র নাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৩০

[২২] দ্রষ্টব্য,১। জগদীশ্বর সান্যাল,ভারতীয় দর্শন,পৃ,৩২৩; ২। প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৪

দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ। সগুণ ব্রহ্মই মায়া উপাধি উপহিত। ব্রহ্মজ্ঞান হলে মায়িক ঈশ্বরের আর কোন সত্ত্বা থাকেনা। সুতরাং বলা যায় যে, শংকরাচার্যের মতে, গুণগুলি বিশেষণ।

রামানুজাচার্যের মতে, ব্রহ্ম সগুণ। তাঁর মতে গুণ ছাড়া দ্রব্য কিংবা দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারেনা। নির্গুণ দ্রব্যের কোন সত্ত্বা নাই। সগুণ দ্রব্যই অনুভবের বিষয়। ব্রহ্ম থেকে সব বিশেষ নির্গত হচ্ছে, ব্রহ্ম সর্বপ্রকার বিশেষণের আধার- তিনি বিশেষণযুক্ত। সুতরাং এ মতেও গুণগুলি বিশেষণ।

শংকরাচার্যের মতে, 'নিরং নাস্তি গুণং যস্য তস্য নির্গুণ'; এর অর্থ অনুবাদকারীদের মতে, যার কোন গুণ নাই তিনি নির্গুণ। রামানুজাচার্যের মতে, নির্গুণ অর্থ সমস্ত হেয় গুণ বর্জিত, ব্রহ্ম অসংখ্য সদ্‌গুণের আধার। [২৩]'নিরং নাস্তি গুণং যস্য' বলতে শংকরাচার্য কি বুঝিয়েছিলেন,তা আমরা জানতে পারছিনা; অনুবাদকারী ঐরূপ অর্থ করেছেন। ভারতীয় দর্শনের এসব সম্প্রদায়ে গুণ সম্পর্কিত যে সব কথা বা মত আছে, সেসব আপাতঃ দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও আচার্য গুরুনাথের গুণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যার আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এসব মতের মধ্যে কোন বিরুদ্ধতা নাই। তিনি সগুণত্ব-নির্গুণত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে আলোকে, শংকরাচার্য ও রামানুজাচার্যের মতের মধ্যেও কোন বিরোধ নাই। তবে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে গুণ সম্পর্কে এসব কথা থাকলেও গুণ যে একমাত্র সাধনীয় বিষয়, গুণ-সাধনায়ই যে মানুষের মুক্তি, এবং কোন গুণের সাধনা কিভাবে করতে হয়, এসব বিষয় সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি।

আচার্য গুরুনাথ মত দিয়েছেন যে, গুণ দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি, সব কিছুই গুণসমষ্টি এবং গুণ সাধনায়ই মানুষের সব উন্নতি। সর্বোপরি মুক্তি বা মোক্ষ গুণ সাধনার দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। আর এ কারণে তিনি গুণ সাধনার যাবতীয় বৃত্তান্ত নিজে লিখে রেখে গেছেন। বিশেষতঃ পরম গুণগুলির সাধনার বিষয় তিনি লিখেছেন এবং এই সূত্র ধরে অন্যান্য সমস্তগুণের সাধনার পথ নির্দেশ করেছেন।

আমরা এখানে তাঁর প্রেম প্রবন্ধ থেকে প্রেমগুণের বিষয়ে এবং "ভক্তি প্রবন্ধ" থেকে ভক্তি গুণের বিষয়ে কিছু কথা উল্লেখ করছি।

প্রেম

উৎকৃষ্ট গুণগুলির মধ্যে যার ব্যাপকতা বেশী, সেগুণই প্রধান। আচার্য গুরুনাথের মতে, প্রেম গুণ প্রধান কারণ প্রেম ব্রহ্মাণ্ড বিস্তীর্ণ। প্রেম সরল গুণ অর্থাৎ এ গুণের অঙ্কুর আত্মায় স্বভাবতঃ আছে। গুণ প্রকরণের প্রথমেই আচার্য গুরুনাথ প্রেম গুণ সম্বন্ধে লিখেছেন।[২৪] আমরা সে আলোকে প্রেম সম্বন্ধে তাঁর মত তুলে ধরার চেষ্টা করব। প্রেম সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এ গুণটি দুটি আত্মার অনুরাগ বিশেষের সমুন্নত পরিণতি।[২৫] প্রেম কাকে বলে এ বিষয়ে তিনি বলেন,

"প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে যত কিছু গুণ আছে, তন্মধ্যে প্রেম সর্বপ্রকারে সর্বাংশে সর্বাপেক্ষা প্রধান। ভালবাসা যাহার অঙ্কুর, তাহাকে প্রেম কহে, অথবা ভালবাসার উন্নত পরিণতিকে প্রেম কহে, অর্থাৎ

---

[২৩] দ্রষ্টব্য, জগদীশ্বর সান্যাল, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ২২৬

[২৪] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম গুণ-প্রকরণ, পৃ. ৩৯-৭২

[২৫] শ্রী গৌরপ্রিয় সরকার, অনুবাদমালা, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১।

অপরকে আত্মায় সংলগ্ন করাকে বা অপরের সুখ-দুঃখাদি অবস্থাতে আপনাকে উপনীত করাকে প্রেম কহে। যে গুণ থাকিলে মরিয়াও বাঁচে, আত্মাতে যাহার অভাব কখনও হয়না ও হইতেও পারে না। যাহা দুঃখকেও সুখে পরিণত করে। সুতরাং যাহা সুখ দুঃখ চায়না, লাভালাভের অপেক্ষা করে না, কেবল অভীষ্টকে পাইবার জন্য প্রবর্তিত করে, তাহাকে প্রেম কহে। যে গুণ থাকিলে ঐ গুণের ভাজনকে পাইলে প্রাণ শীতল হয়, আত্মা তৃপ্তি লাভ করে, মনে অভিনব আনন্দ রসময় ভাবের উদয় হয়, হৃদয় নবভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও পরমাত্মার প্রকৃত কার্য্য করা হয়; আর না পাইলে প্রাণ কিছুতেই শীতল হয় না, হৃদয় নীরস হয়, মন ভাব-শূন্য-প্রায় হইয়া পড়ে। জীবাত্মার ক্লেশের ইয়ত্বা থাকে না এবং পরমাত্মার উৎকর্ষ ও শান্তি হয়না। মূল কথা, যে গুণে ঐ পরম গুণের ভাজনের দোষ গুণে আসিয়া পড়ে, দোষ দেখিতে বাসনা হয়না, কেবল গুণই লক্ষ্য হয়, কথা শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, না শুনিলে জগৎ অন্ধকারময় বোধ হয়, অভাবে জীবন্মৃত থাকিতে হয়, ভাবে সকল অশান্তি দূরে যায়, ফলতঃ ঐ গুণের প্রকৃত ভাজনের চিহ্নমাত্র না পাইলে কিছুতেই জীবিত থাকা যায়না, তাহাকে প্রেম কহে। প্রেমে সকল গুণের গুণত্ব (সংস্কার) হয়, এজন্য উহা গুণের গুরু বলিয়া কথিত হইতে পারে। যেমন কান্তিহীন দেহের কমনীয়তা কাঞ্চনযোগে বাড়ে না, সেইরূপ, প্রেমসাধনাহীন আত্মার উন্নতি অন্য গুণে তত হয়না, ইহার সাধনা সর্বপ্রথমে আরম্ভ হইলেও সর্বশেষেও শেষ হয়না, সুতরাং ইহা অসীম কাল সাধনের ধন। সর্বভূমণ্ডলের সকল লোকের হৃদয়েই প্রেম আছে (বা প্রেমাঙ্কুর আছে) সকলেই উহার জন্য পাগল, সকলেই ঐ ধনের ভিখারী। ঐ সুধাময় রসের স্বাদ পাইলে মোহিত না হয়, এমন কেহই নাই, তথাপি উহার স্বরূপ নির্দেশ করা বোধ করি কাহারও সাধ্য নহে। কেননা যাহার অন্ত পাওয়া যায়না, তাহার স্বরূপ কিরূপে নির্দিষ্ট হইবে? দুঃখময় সংসারে সুখের চন্দ্র প্রেম, ভালবাসা জীবনের বন্ধন, জীবন উহাতেই উৎপন্ন, উহাতেই স্থিত এবং উহার ব্যতিক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিষময় বিষয়ধনে প্রেমসুধা-ব্যতীত কিছুতেই শান্তি নাই। এ ধন আধারে আলোক, দুঃখে অশান্তিনাশক ও বর্দ্ধনশীল, সুখে সুখ-বর্ধক, যৌবনে বৃদ্ধত্ব ও বার্ধক্যে তারুণ্য সম্পাদক এবং জীবনের চির সম্বল। এই অসীম গুণের বর্ণন, অসীমকালেও শেষ হইবার নহে।”[২৬]

উপরের অংশটুকু সরাসরি আচার্য গুরুনাথের ভাষায় উদ্ধৃত করা হলো। এরপর তাঁর “প্রেম প্রবন্ধ” থেকে কিছু কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো।

প্রেমের উৎপত্তি :

প্রেমের অংকুর স্বাভাবিক হলেও এর উৎপত্তি আছে। সব আত্মাতেই নানা গুণ আছে। পরিমাণে কম বা বেশী হলেও প্রত্যেকেরই কতগুলি গুণ অপরাপরের সাথে সাধারণ(common)। কিন্তু এরূপভাবে মিলিত যে প্রত্যেক আত্মার গুণ সমষ্টি অপরের সমান। যে যে আত্মার গুণের পরিমাণ অন্যান্যের বেশী সংখ্যক গুণের পরিমাণের কাছাকাছি অর্থাৎ যাদের বহুসংখ্যক গুণের অধিক সামঞ্জস্য আছে, তাদের প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য, কার্যপ্রণালী, বাসনা, রীতিনীতি ইত্যাদিও সমান এবং তাহারা সমপথাবলম্বী ও সমব্যবসায়ী, সুতরাং তাদের আত্মাই প্রথমে সহজে একে অন্যের প্রেমে পড়ে। হঠাৎ দেখলেই আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরস্পর পরস্পরকে প্রেমের পাত্র, ভালবাসার জিনিষ বলে বিশ্বাস করে ও ভালবাসে। আত্মার

[২৬] শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম গুণ-প্রকরণ, পৃ. ৩৯-৪০

এরূপ গুণ-সামঞ্জস্যকে সাদৃশ্য অনুপাত বলে। গুণ সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হলে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনুপাত বা সমানুপাত এবং আংশিক হলে আংশিক সাদৃশ্যানুপাত বলে।

সম্পূর্ণ বা আংশিক সাদৃশ্য-অনুপাতীয়ের মিলনে অপরের সুখ-দুঃখাদি অবস্থায় আপনাকে যে উপনীত করা হয়, তাকে প্রেমের উৎপত্তি বলে। তবে এরূপ অবস্থার উন্নতি অনেক অংশে আত্ম প্রযত্ন সাপেক্ষ। সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনুপাতীয় না পাওয়া গেলেও আংশিক সাদৃশ্য অনুপাতীয় লাভ অসম্ভব নয়। আর এরূপ লোক লাভ হলে তার সাথে যে অংশে সাদৃশ্য আছে, তার পরিচালনা দ্বারা আংশিক প্রেমসুখ লাভ হয়। এভাবেই আত্মচেষ্টা দ্বারা ভালবাসার যে বৃদ্ধি হয়, তাকে প্রেমের উৎপত্তি বলা যায়। কিন্তু ওরূপ চেষ্টা না করলে প্রেমাঙ্কুর প্রেমরূপে পরিণত হয়না। আবার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনুপাতীয়ের লাভ হলেও ঘোরতর স্বার্থপরতা ও অলীক বিষয়াসক্তি প্রবল থাকলে প্রেমোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মায়। এজন্য স্বার্থপরতা প্রেমোৎপত্তির ব্যাঘাত জননী।

সম্পূর্ণ বা আংশিক সাদৃশ্য অনুপাতীয়ের লাভ হলে স্বাভাবিকভাবে অথবা মমতা ও স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনার দ্বারা প্রেমের উৎপত্তি হয়। প্রেমের প্রকৃত অবস্থা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ তা আত্মা থেকে উৎপন্ন হয়। ভালবাসার সমুন্নতি পরিণতিকে যে প্রেম বলে, তা পৃথিবীতে প্রকাশিত নাই অর্থাৎ তা পার্থিব লোকের হৃদয়ে প্রকৃতরূপে অনুভূত হয়না। সমানুপাতীয় দুই ব্যক্তির ধর্ম এই যে, তাদের প্রকৃতি একরূপ, আর এজন্য তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে। এ ভালবাসা কোন কঠোর আঘাতে ছিন্ন না হলে তাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম সঞ্চার হবে। আর আংশিক সাদৃশ্য অনুপাতীয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে মমতা দ্বারা প্রেমের আংশিক উৎপত্তি হয়, পরে স্বাধীন ও বিশুদ্ধ ইচ্ছার পরিচালনা দ্বারা স্বার্থপরতার বিনাশ হলে সম্পূর্ণভাবে প্রেমের উৎপত্তি হয়।

প্রেমবৃদ্ধির উপায় :

প্রেম বৃদ্ধির জন্য যে উপায়গুলি সকলের অবলম্বনীয় বলে গুরুনাথ নির্দেশ করেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) করুণরস (প্রেমাস্পদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ইত্যাদিবোধ): করুণরস বৃদ্ধির জন্য, অন্যের অপকার করা ও গুণী ব্যক্তির গুণে দোষারোপ করা ত্যাগ করতে হয় এবং যথাসাধ্য পরের উপকার করতে হয়। এছাড়া কতগুলি অনুকুল বিষয়ের অভ্যাস করা দরকার। যেমন,করুণ রসাত্মক বই পড়া,কোথাও করুণরসাত্মক ব্যাপার ঘটলে সেখানে যাওয়া, ইত্যাদি। (২) মমতা (এ আমার এরূপ জ্ঞান), (৩) তুল্যাবস্থা (জাতীয় সাদৃশ্য), (৪) অন্যের প্রেম (অন্যে আমাকে ভালবাসে, এটা জানতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে তার প্রতি প্রেম সঞ্চার ও বৃদ্ধি হয়), (৫) সদুপদেশ দেওয়া, (৬) সৎপথে পরিচালিত করা, (৭) দোষ না দেখে কেবল গুণ দেখা, (৮) কোন মহাত্মা যদি প্রেমার্থী দুজনকে অভেদ করেন তবে তাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম হতে পারে, (৯) প্রেমার্থী দুজন যদি অন্য কোন জনকে প্রেম করে তবে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রেম বৃদ্ধি পায়। এই অন্য ব্যক্তি তিন প্রকার হতে পারে-

(ক) মন্ত্রদাতা গুরু, মাতাপিতা, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি উভয়ের ভক্তিভাজনের প্রতি ভক্তি করা (খ) উভয়ের বন্ধুকে প্রেম করা, (গ) উভয়ের স্নেহাস্পদ যারা, তাদের স্নেহ করা।

(১০) সরলতা (অকপট ভাব), (১১) একাগ্রতা (চঞ্চলতাহীনতা), (১২) পবিত্রতা (নিস্পাপ অবস্থা), (১৩) সম্পত্তি বিষয়ে নিস্পৃহতা, (১৪) জ্ঞান (একজন অদ্বিতীয় প্রেমময় প্রভু আছেন, যিনি সকলের প্রতি প্রেম করছেন, আমি তাঁর অংশ, আমার মধ্যেও প্রেম আছে, এ প্রেমের বৃদ্ধি করা আমার কর্তব্য- এরূপ জ্ঞান), (১৫) কাম ক্রোধের দমন, (১৬) পাশ মুক্তি (পাশ বলতে কেবল ঘৃণালজ্জাদি অষ্টপাশ নয়, কাম ক্রোধাদি রিপুসমূহ, হিংসা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস প্রভৃতিও পাশের মধ্যে গণ্য) (১৭) মানবচক্ষে ঘৃণিত কিন্তু ঈশ্বর দৃষ্টিতে উন্নত হওয়া, (১৮) প্রেমানুশীলন (প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে প্রেম সাধনা করা), (১৯) ঈশ্বরের উপাসনা, ইত্যাদি। এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় গুরুদেবের নিকট থেকে জেনে নিতে হয়।

প্রেমের হ্রাস কিভাবে হয় :

প্রেমাস্পদকে অসদুপদেশ দেওয়া ও অসৎপথে পরিচালনা করা, প্রেমভাজনের দোষ আলোচনা করা, সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ, প্রেমের বর্দ্ধিতাবস্থার পূর্বে অবিচ্ছেদে একত্রে বাস করা, কপট ব্যবহার, একাগ্রতার অভাব, কামনা, পাপজ্ঞানে পাপ করা, বলবতী ধনস্পৃহা, প্রেমাস্পদের প্রতি অবিশ্বাস ,পাশসমূহের বৃদ্ধি, প্রভৃতি কারণে প্রেমের হ্রাস হয়।

প্রেমের আধার :

প্রেম আত্মার একটি গুণ, গুণ মাত্রই দ্রব্যনিষ্ঠ, সুতরাং আত্মাই প্রেমের আধার। তবে জীবত্ব ধ্বংস না হলে প্রেমের যথোচিত বিকাশ হয়না, এজন্য পরমাত্মাই প্রকৃত প্রেমের আধার।

প্রেমের পাত্র :

নিখিল নরনারীই প্রেমের পাত্র। ঐ প্রেম অভেদ জ্ঞানে পরিণত হলে সমস্ত চেতন পদার্থই প্রেমের ভাজন হয়ে ওঠে। আর সমস্ত চেতন পদার্থ যাঁর প্রেম অঙ্কে বিরাজ করে, সেই অনন্ত প্রেমময় অনাদি পুরুষ প্রেমের পাত্র।

প্রেমের প্রকারভেদ :

স্বজাতীয় ও ভিন্ন জাতীয় ভেদে প্রেম দুই প্রকার- প্রেম ও প্রণয়। পুরুষে পুরুষে বা রমণী রমণীতে যে প্রেম তা ‘প্রণয়’ আর পুরুষে রমণীতে যে প্রেম তা ‘প্রেম’ নামে পরিচিত। প্রেম বা প্রণয় আবার প্রকৃত ও পাক্ষিক এ দুরকম। উভয়ে উভয়কে প্রেম করলে তা প্রকৃত প্রেম আর একজন যদি অপরজনকে করে তা পাক্ষিক প্রেম। প্রকৃত প্রেম আবার দু রকম। উভয়ের সাধনার দ্বারা যা হয় তা প্রাথমিক প্রকৃত প্রেম; আর কোন উন্নত মহাত্মার বাক্‌সিদ্ধি দ্বারা বা অভেদ জ্ঞান দ্বারা যে প্রেম হয়, তা আনুষঙ্গিক প্রকৃত প্রেম।

প্রেম বা প্রণয়ের উন্নত অবস্থায় অভেদ জ্ঞান জন্মে। উভয়ের আত্মাতে কোন বিভিন্নতা নাই- এরূপ অবস্থাকে অভেদ জ্ঞান বলে। অভেদ জ্ঞানের উন্নত অবস্থায় **সোঽহং** জ্ঞান জন্মে। মূর্তিমতী সরলতা, পবিত্রতা, একাগ্রতা, প্রেম, সরলান্তকরণ, কাম ও ক্রোধবিহীনতা, পাপগ্রহণের ক্ষমতা, শ্রদ্ধার অঙ্কুর ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে অভেদজ্ঞান করতে পারেন।

রমণী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের পাত্র বা পাত্রীকে চিরসঙ্গীরূপে গ্রহণ করাকে বিবাহ বলে। যে সকল গুণ দ্বারা প্রেমের বৃদ্ধি হয় ,তার মধ্যে করুণ রস ও মমতা যাদের আছে, তারাই বিবাহের প্রকৃত

ভাজন। অন্যকে হৃদয়ে ধরবার বা অন্যের হৃদয়ে ধৃত হবার জন্য একমাত্র প্রেম ছাড়া অন্য গুণ নাই। এ প্রেম প্রথমে চার প্রকারে থাকে-

(১) ভক্তি--ভক্তির ভাজন মা, বাবা ও বিবিধ গুণসম্পন্ন উন্নত আত্মা

(২) প্রেম—এর ভাজন স্বামী/স্ত্রী, বন্ধু, পরে সমস্ত নর-নারী

(৩) স্নেহ—এর ভাজন সন্তান, ছোট ভাই বোন

(৪) শ্রদ্ধা--এর ভাজন জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, পর্বত প্রভৃতি যাবতীয় চেতন পদার্থ। প্রেমের সমুন্নত পরিণতির ফলই শ্রদ্ধা।

প্রেমের সাধনা :

প্রেম সব আত্মাতে সব সময় আছে। এর উন্নতির জন্য চেষ্টা,চর্চা বা অভ্যাস করাকে প্রেম সাধনা বলে। সমানুপাতীয়ের লাভ হলে প্রেম অনুশীলন দ্বারা সহজে প্রেম সাধনা হয়। অসমান অনুপাতীয়ের ক্ষেত্রে এ সাধনা কঠিন হয়। প্রেমের ব্যাঘাতকর বিষয়গুলো বর্জন করে প্রেমবৃদ্ধির উপায়গুলো অবলম্বন করলে প্রেম বৃদ্ধি হয়। এভাবেই প্রেমের সাধনা করতে হয়। যাঁরা নৈসর্গিকভাবে পরস্পর মমতায় বদ্ধ, তাঁদের মধ্যে সহজেই সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়। এজন্য নিজ নিজ গৃহই প্রেমবৃত্তের প্রকৃত কেন্দ্র। প্রেম এখান থেকে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়ে ক্রমশঃ সার্বভৌমভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হতে থাকে। সংসারে ছেলেমেয়ে বা ছোট যারা, তারা মা বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের ভক্তি করবে। মা বাবা সন্তানদের স্নেহ করবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর প্রেম করবে। শ্রদ্ধার পাত্র যাঁরা , সকলে তাঁদের শ্রদ্ধা করবে। এভাবে আপন সংসার থেকেই প্রেম উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়।

প্রেম সাধনার ফল :

প্রেমের ব্যাপকতা লাভই প্রেম সাধনার ফল। প্রথমে একজনের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে অভেদজ্ঞান করতে হয়। এতেও তৃপ্ত না হয়ে আরও প্রেমবৃদ্ধি করতে হয়, পরে তার প্রতি প্রেমের চরমসীমা উপস্থিত হয়। ঐ অভেদজ্ঞান ও অতৃপ্তি নিবন্ধন ঐ আত্মা ক্রমশঃ উন্নত হয়ে বহুসংখ্যক আত্মার সমানুপাতীয় হয়। এরপরে তাদেরকেও ঐরূপ করতে হয়। এভাবে সমস্ত চেতন পদার্থ সমানুপাতীয় হলে তাদেরকে অভেদভাবে গ্রহণ করলে তারা যাঁর অংশ তাঁর সাথেও প্রেম করা যায়। অর্থাৎ এভাবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেম অসীমগুণে সাধিত হতে থাকে। আর এজন্যই এর সাধনাও অনন্ত। এই প্রেম সুধা লাভই প্রেমসাধনার অন্তিম ফল।

প্রেমের শক্তি ও কাজ :

প্রেমের শক্তি অনন্ত। প্রেমে আত্মা সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত হয় এবং সবগুণ অনায়াসে লাভ করে। সর্বোপরি আত্মাকে পরমপুরুষের প্রেমে মোহিত করে আদ্যন্তে উপস্থিত করে। প্রেম একটি গুণ, অংশকে ক্রমশঃ পূর্ণতা দান করাই প্রেমের কাজ।

সাধারণ লোকে প্রেম বলতে একটা খারাপ মনোভাব পোষণ করে এবং ঘৃণা প্রকাশ করে। কারণ তারা প্রেমকে কামের সাথে এক করে ভাবে। বস্তুতঃ প্রেম ও কাম এক নয়। কাম সংস্কৃত হয়ে প্রেমে

পরিণত হয়। প্রেম নীচ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা শূন্য। আচার্য গুরুনাথ বলেন- "পরাঙ্গনা বা বারাঙ্গনার প্রতি পাশবিক ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে প্রেম নয়, তা উদ্দাম পশুবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতাজনিত পাপপূর্ণ ক্রিয়া মাত্র।[২৭] প্রেম আত্মার গুণ। সুতরাং বিশুদ্ধ ও নির্মল। এই সরলগুণ মানবাত্মার অশেষ উপকারক ও উন্নতি সাধক। ধর্মে উপাস্যকে প্রেমময় বলা হয়েছে সুতরাং প্রেম নিকৃষ্ট নয়, বরং উৎকৃষ্ট গুণ। বাইবেলে আছে-

"প্রেম ঈশ্বরের, যে কেহ প্রেম করে সে ঈশ্বরের থেকে জাত এবং ঈশ্বরকে জানে। যে প্রেম করেনা, সে ঈশ্বরকে জানেনা, কারণ ঈশ্বর প্রেম।"[২৮]

"ঈশ্বর যখন আমাদিগকে এমন প্রেম করেছেন, তখন আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বাধ্য। যদি আমরা পরস্পর প্রেম করি তবে ঈশ্বর আমাদিগেতে থাকেন।"[২৯]

"যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে তাহা হইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে।"[৩০]

ঈশ্বর সমস্ত সদ্‌গুণের আধার। ঈশ্বর যখন প্রেম তখন প্রেম অবশ্যই সদ্‌গুণ, বিশুদ্ধ ও নির্মল। কাজেই জাগতিক কলুষিত ভাবকে প্রেমের সাথে এক করা ঠিক নয়। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এম্পিডক্লিস প্রেমের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। তিনি প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন; বিচ্ছেদ প্রেমেরই সহচর।[৩১]

ভক্তি

এবার আমরা আচার্য গুরুনাথের ভক্তি প্রবন্ধ[৩২] থেকে ভক্তি গুণ সম্পর্কে তাঁর মত তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ভক্তি কি ?:

সৃষ্টিতে যত মিশ্রগুণ আছে তার মধ্যে ভক্তি অতি শ্রেষ্ঠ গুণ। প্রেমের হীনতা বা প্রেমের সীমাবদ্ধ ভাবই ভক্তি। যে গুণ দ্বারা উপকারীর প্রতি বা নিজের চেয়ে উন্নত মহাত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা সহ মন আকৃষ্ট হয়, যে গুণ দ্বারা সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ইত্যাদি ভাব 'ইনি আমার চেয়ে উন্নত'- এ জ্ঞানসহ সীমাবদ্ধভাবে উপস্থিত হয়; যে গুণ দ্বারা ঐ গুণের ভাজনের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ-নিবারণ করা জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে হয়; ফলে যে গুণ দ্বারা প্রেমের লক্ষণগুলি অল্পতরভাবে উপস্থিত হয়, তাকে ভক্তি বলে, অথবা নিজের স্বার্থের জন্য নির্ভরতা বা নির্ভরতার অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হয়ে অন্যের প্রতি যে অনুরাগ বা আসক্তি উৎপাদন করে, তাকে ভক্তি বলে। ভক্তি করার অর্থ ভক্তি ভাজনের অভিমত কাজ করা।

---

[২৭] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ২৮৮-২৮৯

[২৮] *বাইবেল* ১, যোহন ৪ : ৭-৮

[২৯] ঐ ঐ ৪ : ১১-১২

[৩০] ঐ ঐ ৫ : ৯

[৩১] দ্রষ্টব্য, ১। W.T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, London, ১৯৬৪, p. ৮৩; ২। মোহাম্মদ আবদুল হালিম, গ্রিকদর্শন প্রজ্ঞা ও প্রসার , বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৩৭

[৩২] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম গুণ প্রকরণ, পৃ: ৭৩-৯৮

প্রেম ও ভক্তির প্রভেদ :

ভক্তির পূর্ণতা হলে তা প্রেমে পরিণত হয়। পাত্র ভিন্ন হলে একসাথে এই দুই-গুণের সাধনা হতে পারে। কিন্তু এক পাত্রে পার্থিব ভক্তি ও প্রেম সাধনা হয়না তবে ঈশ্বরে একই সাথে ঈশ্বর ভক্তি ও প্রেম সাধনা হতে পারে। প্রেম অসীম গুণ। ভক্তি ঐ গুণের সীমাবদ্ধভাব। প্রেমের ভাজন অসীম কিন্তু ভক্তির ভাজন অসীম নয়। আত্মা যত উন্নত হতে থাকবে ভক্তির ভাজন তত কমবে, শেষে একমাত্র পরমেশ্বরই ভক্তিভাজন থাকেন। কেননা প্রথমে যাঁরা ভক্তিভাজন থাকেন, ভক্তির পূর্ণতা হলে তাঁরা প্রেমভাজনে পরিণত হন। প্রেমের প্রথম অবস্থায় প্রেমভাজনকে নিজের চেয়ে উন্নত ভাবা যায় কিন্তু পরিণামে উভয়ে তুল্য এই জ্ঞান হয়। কিন্তু ভক্তিতে এরকম হয়না, ভক্তিভাজনকে চিরকাল নিজের চেয়ে উন্নত ভাবতে হয়।

ভক্তির উৎপত্তি :

ভক্তি গুণ আত্মার স্বাভাবিক নয়। প্রথমে আত্মাতে ভক্তি নামে কোন গুণ বা গুণাঙ্কুর থাকে না। আত্মা পূর্ণ পরমাত্মার অংশ। পূর্ণ পরমাত্মায় ভক্তিগুণ নাই এজন্য প্রথমাবস্থায় তাঁর অংশে এগুণ থাকেনা। পূর্ণ পরমাত্বায় যে যে গুণ নাই, সৃষ্ট আত্মায় বা অপূর্ণ আত্মায় তার অতিরিক্ত যে যে সীমাবদ্ধ গুণ দেখা যায়, সেসব অংশের পূর্ণনিষ্ঠ গুণ ধারণার অক্ষমতা ও জড়জগতের সাথে সম্বন্ধের অধীন থাকার কারণে উৎপন্ন হয়। উৎকৃষ্ট সীমাবদ্ধ গুণসমূহের যোগে অপকৃষ্ট গুণ (যার অন্য নাম দোষ) ও মিশ্রগুণের উৎপত্তি হয়। এভাবেই আত্মায় ভক্তিগুণ জন্মে।

(১) করুণরস, (২) উৎপন্নের আদিত্ববোধে উৎপাদকের প্রতি মমতা ও কৃতজ্ঞতা, (৩) নির্ভরতা, (৪) উপকার করার ইচ্ছা, (৫) সব সময় ন্যায় পথে চলা, (৬) গুণাদরেচ্ছা, (৭) আধ্যাত্মিক প্রেমের অঙ্কুর-এ গুণগুলির যোগে পার্থিব ভক্তি জন্মে। আর এই পার্থিব ভক্তির সাথে আধ্যাত্মিক প্রেম যুক্ত হলে ঈশ্বরভক্তি জন্মে। মাতাপিতা গুরু ও অন্যান্য মহাত্মাদের প্রতি যে ভক্তি তা পার্থিবভক্তি আর পূর্ণ পরমাত্মার প্রতি যে ভক্তি তা ঈশ্বর ভক্তি। পার্থিব ভক্তি সীমাবদ্ধ, ঈশ্বরভক্তি অসীম। অপূর্ণ আত্মাই ভক্তির আধার।

ভক্তি বৃদ্ধির উপায় :

(১) করুণরস, (২) মমতা, (৩) ভক্তিভাজনে প্রত্যয়, (৪) ভক্তিভাজনের গুণ অনুশীলন, (৫) ভক্তিভাজনের নিকটে উপদেশ গ্রহণ, (৬) ভক্তিভাজন দ্বারা সৎপথে পরিচালিত হওয়া, (৭) সরলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ, (৮) স্বার্থপরতা ত্যাগ করে ভক্তিভাজনের স্বার্থকে নিজস্বার্থ মনে করা, (৯) ভক্তিভাজনের সুখশান্তি বাসনা করা ও সেজন্য চেষ্টা করা, (১০) কৃতজ্ঞতা, (১১) ভক্তিভাজনের স্নেহ অনুভব, (১২) যাদের সাথে আমরা বাস করি তাদেরকে ভক্তি করতে দেখা, প্রভৃতি উপায়ে পার্থিব ভক্তি বৃদ্ধি পায়। পার্থিব ভক্তি ছাড়া কখনই ঈশ্বর ভক্তি জন্মে না।

ভক্তির হ্রাস কিভাবে হয় :

(১) জ্ঞানপূর্বক ভক্তিভাজনের অভিমত কাজ না করা, (২) ভক্তিভাজনে অবিশ্বাস, (৩) দোষ অনুশীলন, (৪) স্বার্থপরতা, (৫) ভক্তিভাজনের স্নেহে বঞ্চিত হওয়া, (৬) কৃতজ্ঞতা লঘুতর হওয়া, (৭) করুণরস, মমতা প্রভৃতিরহীন অবস্থা, এ সব কারণে ভক্তির হ্রাস হয়।

ভক্তির ব্যাঘাত :

স্বার্থপরতা, নিরন্তর ভক্তিভাজনের দোষ অনুশীলন, যে যে গুণে ভক্তির উৎপত্তি হয় সেইসব গুণের হ্রাস, এবং যে যে কারণে ভক্তির হ্রাস হয়, এগুলিই ভক্তির উৎপত্তি ও সাধনার ব্যাঘাত।

ভক্তির সাধনা :

প্রথমে মাতা-পিতাকে অবলম্বন করেই ভক্তি সাধনা করতে হয়। মাতা ও পিতার প্রতি ভক্তি করলে , ঐ উভয় ভক্তি মিলিত ও আধ্যাত্মিক প্রেমের সাথে মিশ্রিত এবং তার দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বরের দিকে যায় অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তি উৎপন্ন করে।পার্থিব ভক্তির পূর্ণতা ও লয় হলে কেবল ঈশ্বর ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

ভক্তিসংকটঃ

মাতা ও পিতার প্রতি আগে ভক্তি পূর্ণ না করে বা পার্থিবভক্তি পূর্ণ না করে যদি কেউ দীক্ষাদাতা গুরু বা অন্যান্য মহাত্মাদের প্রতি প্রেম করতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে ভক্তিসংকটে পড়বে।আবার, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি না করে, প্রথমে যদি কেউ অন্য কারো প্রতি ভক্তি করে,তবে সেও ভক্তিসংকটে পড়বে।

ভক্তির শক্তি ও কাজঃ

ভক্তি মানবাত্মাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ও সদ্‌গুণের আদর করতে শিক্ষা দেয়। ভক্তি প্রভাবে হৃদয়ের বহু দোষ দূর হয়, রিপুগুলো শান্ত হয় ও স্বার্থপরতা দূরে যায়। ভক্তিসাধনা ছাড়া আত্মার অভাব দূর হয় না,হৃদয় উপযুক্তভাবে কাজ করার ক্ষমতা পায় না ও উন্নতও হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে পূর্ববর্তী ভক্ত্যাচার্যগণ ভক্তি সম্পর্কে যা বলেছেন তার আলোচনা করছি। পূর্ববর্তী ভক্ত্যাচার্যগণের মধ্যে নারদ, অশ্বিনীকুমার, সনক, ব্যাস, শুক, শান্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌন্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান ও বিভীষণ প্রধান।[৩৩]

নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রের ১-৬ শ্লোকে যা বলছেন, তার ভাবার্থ নিম্নরূপ :

যা লাভ করে পুরুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতীভূত হয়, তৃপ্ত হয় এবং যা পেয়ে কিছুই বাঞ্ছা করে না, শোক করেনা, দ্বেষ করেনা, রত হয়না ও উৎসাহী হয়না, সেই কাহার (কোন কোন মতে ঈশ্বরের) উদ্দেশ্যে পরম প্রেম স্বরূপা, অমৃত স্বরূপাকে ভক্তি বলে।

এরপর ঐ গ্রন্থের ৩য় অনুবাকে ভক্তির লক্ষণ সম্পর্কে অন্যান্য আচার্যগণ যা বলেছেন, তিনি তাঁর উল্লেখ করেছেন। ব্যাস বলেছেন, পূজাদিতে অনুরাগকে ভক্তি বলে। গার্গের মতে, ভক্তি হ'ল কথাদিতে অনুরাগ। শান্ডিল্য বলেন, পূর্ণ পরমাত্মার যে রতি, তার অবিরোধে অনুরাগকে বা অবিরোধী বিষয়ের অনুরাগকে ভক্তি বলে।[৩৪] ঋষি শান্ডিল্য তাঁর নিজের লেখা ভক্তিসূত্রে বলছেন, ঈশ্বরে অত্যন্ত অনুরাগকে ভক্তি বলে। এছাড়া নারদ আরও বলেন যে, সমস্ত স্বকৃত কর্মাদি ঈশ্বরে সমর্পন করাকে এবং ঈশ্বরের

[৩৩] দ্রষ্টব্য, নারদীয় ভক্তিসূত্র, দশম অনুবাক, ৮৩তম সূত্র

[৩৪] ঐ, ৩/১৫-১৮

বিস্মৃতিতে অত্যন্ত ব্যাকুলতাকে ভক্তি বলে।[৩৫] নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রের দশম অনুবাকে বলছেন, ভক্তি এক প্রকার হয়েও একাদশ প্রকার যথা- গুণ মাহাত্মাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাসাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, ভক্ত্যাচার্যদেরও অভিমত তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

ভক্তি কি উপায়ে লাভ হতে পারে সে সম্পর্কে নারদ বলেন, যে সব বিষয়ে ভক্তির ব্যাঘাত হয় সে সব ত্যাগ করলে, সঙ্গ পরিহার করলে, নিরন্তর ভজনা করলে , লোকের নিকটেও ভগবানের গুণ শ্রবণ ও কীর্তন করলে, প্রধানতঃ মহতের কৃপা লাভ হলে বা ভগবানের কৃপালেশ পেলে ভক্তি লাভ হয়।[৩৭]

নারদীয় ভক্তিসূত্র ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তির আলোচনা আছে। সেখানে ভক্তিকে প্রধান বলা হয়েছে। প্রাচীন পন্ডিতদের মতে অনুরাগকে ভক্তি বলে। এ অনুরাগ কারো মতে কথাদিতে, কারো মতে পূজাদিতে; আবার কারো মতে আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ে হলেই তাকে ভক্তি বলা যায়। প্রাচীন পন্ডিতেরা ভক্তির সে সকল লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, সে সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথ বলেন যে, তাতে ভক্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট হয় নাই, কারণ এর কোনটি ভক্তির অঙ্গমাত্র, পূর্ণভাব নয়, আবার কোনটি প্রেমের অঙ্কুরের বর্ণনা মাত্র, প্রকৃত ভক্তির বর্ণনা নয়।[৩৮] তাঁরা ভক্তি ও প্রেমের পার্থক্য করেন নাই। কিন্তু পার্থক্য আছে, ভক্তি প্রবন্ধে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

আচার্য গুরুনাথ এভাবে একাগ্রতা, সরলতা বিশ্বাস, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণের সংজ্ঞা ও সেসব গুণের সাধনা কিভাবে করতে হয় , সেসব সাধনার ব্যাঘাত কি, ঐ গুণগুলির বৃদ্ধির উপায় , শক্তি, কাজ, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জীবনে এই পরম গুণগুলি অর্জনের সূত্র ধরে যেভাবে অন্যান্য গুণাবলীও অর্জন করা যায়, তিনি সে পথ দেখিয়েছেন। এভাবে গুণ অর্জনের মাধ্যমে মানুষের এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ সার্থক হয় বলে তিনি মনে করেন।

এ অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ্য যে, এ গুণ- সাধনাতত্ত্ব আচার্য গুরুনাথ যে কেবল বুদ্ধি বা অনুমান নির্ভর হয়ে লিখেছেন তা মনে হয়না, তিনি নিজের জীবনে সাধনা দ্বারা এ সব আয়ত্ব করেছিলেন। কেননা তিনি লিখেছেন, “যে মহাত্মা যে গুণ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, যিনি যে গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং যিনি কেবল আশীর্বচনে নহে কিন্তু স্বকৃত সাধনে, যে গুণের গুণাবলী পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই সেই গুণের বিষয়ে বর্ণনা করিতে সমর্থ...”[৩৯] তাছাড়া গুণ সাধনার যেসব উন্নত অবস্থার কথা তিনি লিখেছেন, বুদ্ধি বা অনুমান দ্বারা যে তা লাভ করা যায়, এ রকম মনে করা যায় না।

---

[৩৫] ঐ, ৩/১৯

[৩৬] ঐ, ১০/৮১-৮৩

[৩৭] ঐ, ৫/৩৪-৩৮

[৩৮] আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম গুণ প্রকরণ, পৃ. ৭৫

[৩৯] দ্রষ্টব্য, আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম গুণ-প্রকরণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

অষ্টম অধ্যায়

অবতার, দেবতা ও সোঽহং জ্ঞান প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথের মত

(১)

অবতার সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত

'ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন'- কিছু ধর্মে এরকম একটি মতবাদ প্রচলিত আছে, যাকে অবতারবাদ বলে। এ প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথের মত নিম্নরূপ :

"জগতে অনেক ঈশ্বর আছেন কিন্তু পরমেশ্বর একমাত্র। একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণ ঈশ্বর শব্দে অভিহিত হন। অন্তত: একটি গুণেও যিনি একত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ ঐ গুণের চরম উৎকর্ষ বা পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছেন, তিনি ঈশ্বর। পরমেশ্বর এরূপ অনন্ত একত্বের একত্ব। জগদীশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে কোন একটিতে যিনি অনন্ত ভাব প্রাপ্ত, তাকেই একত্ব প্রাপ্ত বলে। সুতরাং জগতে অবতার বলে যাঁরা অভিহিত , তাঁরা কোন কোন গুণের অবতার, অনন্ত গুণের নয়। যেমন, শিব জ্ঞানিত্বের, শ্রীকৃষ্ণ বীরত্বের, যীশুখৃষ্ট ক্ষমাশীলত্বের অবতার। অবতারগণ জগদীশ্বর নন, তবে তাঁরা গুণ-বিশেষে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়ে সাধারণ লোকের চেয়ে অত্যুন্নত অবস্থা লাভ করেছেন।"[১]

হিন্দু ধর্মের সাকারবাদী সম্প্রদায় বিশেষের অবতারবাদ নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক দেখা যায়। মহাযানী বৌদ্ধরাও বুদ্ধের নানা অবতারে বিশ্বাসী। ঈশ্বর যে জন্মগ্রহণ করেন, এর পক্ষে অবতারবাদীদের যুক্তি হল যে, "ঈশ্বর যখন সর্বশক্তিমান তখন তিনি জন্মগ্রহণ করতে পারবেন।"

হিন্দুধর্মে শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে শ্রুতি-স্মৃতির স্থান সর্বোপরি। কঠশ্রুতিতে আছে-

"জগদীশ্বর জ্ঞানময়, তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, সুতরাং মৃত্যুগ্রাসেও পতিত হননা। তিনি কারো থেকে হননা ও কোন জীবও হননা।"[২] সুতরাং হিন্দু অবতারবাদীদের বক্তব্য তাঁদের ধর্মগ্রন্থ শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে। শ্রুতিবিশ্বাসীগণ জগদীশ্বরের জন্মগ্রহণ স্বীকার করেননা।

কোরআনেও আছে যে-

---

[১] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৭১

[২] কঠোপনিষদ, ১/২/১৮; আরও দ্রষ্টব্য শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৬/৯

"স্ত্রী-পুরুষবৎ তাঁর দ্বারা কেউ জন্মপ্রাপ্ত নয়। তিনি মানুষের ন্যায় হন নাই অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষোৎপন্ন নন, তাঁর জোড়া কেউ নাই, তিনি একমাত্র, নিরাকার জ্যোতিস্বরূপ।"[৩] এ সকল শাস্ত্রবাক্য অবতারবাদ সমর্থন করেনা।

অবতারবাদের পক্ষের ও বিপক্ষের বক্তব্য দিয়ে আচার্য গুরুনাথ নিম্নরূপ আলোচনা করেছেন :

অবতারবাদীদের যুক্তি- 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সুতরাং তিনি জন্মগ্রহণ করতে পারেন'- এর বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, শক্তি থাকলেই তো অপ্রয়োজনে প্রয়োগ হয় না। কোন পার্থিব উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি তেমন পরিস্ফুট করা যায় না। সবিশেষ শক্তি সম্পন্ন মানুষ ছাড়া 'প্রয়োজন' কথাটির অর্থ অন্যে বুঝতে পারবেনা। যেমন, শুধু দয়াবান মানুষ দয়ার বশবর্তী হয়ে কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারেন। যাঁর মধ্যে দয়া ও ন্যায়পরতা উভয়ই আছে তিনি বুঝতে পারেন কোন কাজটি কর্তব্য বা প্রয়োজন এবং সেটি তিনি করবেন। তিনি অপ্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করেন না। যাঁর মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, এরূপ বহুবিধ গুণের উন্নত অবস্থা আছে, তিনি প্রয়োজনে যথাযথ কাজ বুঝতে পারেন ও করেন। তিনি অপ্রয়োজনে কাজ করবেন না বা তাঁর দ্বারা কারও অনিষ্টও হবেনা। রাজা ইচ্ছা করলেই গ্রাম বিশেষ বা নগর বিশেষ জনশূন্য করতে পারেন কিন্তু কোন আদর্শ, সৎ, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাবৎসল রাজা এরূপ করেন নাই। ঈশ্বর পূর্ণ; তাঁর মধ্যে সমস্ত গুণের চরমোৎকর্ষ বিদ্যমান। সর্বশক্তিমান হলেও তিনি তাঁর কোন গুণের বিরোধী কোন কাজ করবেন না। তাঁর সর্বব্যাপীত্ব ক্ষুণ্ন করে তিনি কোন বিশেষ স্থানে বিশেষ দেহে

জন্মগ্রহণ করতে পারেননা।অতএব শক্তি থাকলেই সাকারবাদীদের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করবেন, এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে আছে-

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।[৪]

অর্থাৎ- সাধুদের পরিত্রাণ ও পাপীদের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের প্রয়োজনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এ উক্তি দ্বারা জগদীশ্বরের জন্মগ্রহণ স্বীকৃত হয়না, কেননা উক্তিটি শ্রীকৃষ্ণের, জগদীশ্বরের নয়। আর এ জাতীয় উক্তি জগদীশ্বরের হওয়াও সম্ভব নয়। সমস্ত সৃষ্টির তিনি স্রষ্টা, পালক ও উদ্ধার কর্তা। তিনি পাপীদের বিনাশ করলে তাঁর সত্ত্বার মহিমা ক্ষুণ্ন হয়। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কাজ একজন সবিশেষ শক্তিসম্পন্ন মানুষ দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং জগদীশ্বরের জন্মগ্রহণ-রূপ শ্রুতিবিরোধী বাক্যের উল্লেখ করা ঠিক নয়। যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তিনি একজন দুষ্টাত্মার দমন করতে গিয়ে বারে বারে বিপদগ্রস্থ হবেন বা কখনও কখনও পরাজিত হবেন, এরূপ বক্তব্যে তাঁর শক্তির সীমাবদ্ধতা দেখানো হয়। একজন সবিশেষ শক্তিসম্পন্ন মানুষ দ্বারাই উক্ত সমস্ত কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে, জগদীশ্বরের জন্মগ্রহণের প্রয়োজন হয়না।

অবতারবাদের বিপক্ষে শাস্ত্রে যেসব প্রমাণ আছে, গুরুনাথ তার উল্লেখ করেন।। ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের ধারণা, জগদীশ্বর সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্তকারণ, তাঁর অংশই সমস্ত জীবাত্মা। সমস্ত সৃষ্টি

---

[৩] কোরআন ১১২, অনুবাদ- গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ১৩৭

[৪] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/৮

তাঁর আশ্রয়ে আছে। তিনি যদি সৃষ্টির একস্থানে স্থিত হন তাহলে অন্যান্য স্থানের অবস্থা কি হয় বা কিরূপে থাকে? সুতরাং যৌক্তিক দিক থেকে ও বাস্তব দিক থেকে ক্ষমতা থাকলেও ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করতে পারেন না এবং তাঁর জন্মগ্রহণ করাটা অপ্রয়োজনীয়। তবে অবতার বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁরা সাধনা ও উপাসনা দ্বারা এরূপ শক্তি লাভ করেছেন যে, তা সাধারণ লোকের ধারণার অতীত। হিন্দুধর্মে যাঁরা অবতার হিসেবে পরিচিত, তাঁরা বহুজন্ম সাধনায় ঐ শক্তি লাভ করেছেন বলে হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। হিন্দু ধর্মে অবতারদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রধান। বৈষ্ণবেরা তাঁকে পূর্ণাবতার বলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুজন্ম তপস্যা করে ঐ শক্তি লাভ করেছিলেন কিন্তু তিনি পরমেশ্বর নন। হিন্দু শাস্ত্রে এর প্রমাণ আছে।

মহাভারতে আছে-

তৌ জগ্মতু রসম্ভ্রান্তৌ নরনারায়ণাবৃষী।[৫]

অর্থাৎ- 'পূর্বজন্মে যে দু'জন নর ও নারায়ণ ঋষি বলে পরিচিত ছিলেন , সে দু'জন অর্থাৎ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অসম্ভ্রান্তভাবে গমন করলেন।' ঐ একই গ্রন্থের অন্যত্র আছে-

মাহাত্ম্যং তে শ্রুতংরাজন্, কেশবস্য মহাত্মনঃ।

নরস্য চ যথা তত্ত্বং যন্মাং ত্বং পৃচ্ছ মে নৃপ।।

যদর্থং নৃষু সম্ভূতৌ নরনারায়ণাবৃষী।।[৬]

অর্থাৎ- "হে রাজন! তুমি মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম শুনেছ। হে নৃপ! নরের যে তত্ত্ব তুমি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছ, তা শোন। নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় যে জন্য এ মর্ত্তলোকে উৎপন্ন হয়েছেন, তাও বলছি।" তাহলে, এ দুই উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে যে অর্জুন ও কৃষ্ণ পূর্বজন্মে নর ও নারায়ণ নামক ঋষি ছিলেন। এঁরা যে কর্মদ্বারা ঐরূপ উন্নতি লাভ করেছিলেন, তার বিবরণও মহাভারতে আছে-

এষ দেবান্ মহেন্দ্রেণ জিত্বা পরপুরঞ্জয়ঃ।

অতর্পয়ান্মহাবাহু রর্জ্জুনো জাতবেদসম্।।

নারায়ণ স্তথৈবাত্র ভূয়সোঽন্যান্ জঘান হ।

এবমেতৌ মহাবীর্যৌ তৌ পশ্যত সমাগতৌ।।

বাসুদেবার্জ্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ।

নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবা বিতি শ্রুতেঃ।।

অজেয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।

এষ নারায়ণ কৃষ্ণঃ ফাল্গুণশ্চ নরঃ স্মৃতঃ।।

---

[৫] মহাভারত, দ্রোণপর্বে অভিমন্যু বধানন্তর প্রতিজ্ঞাপর্ব ; উদ্ধৃত, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৬৪

[৬] মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, উদ্ধৃত, ঐ, পৃ: ঐ

নারায়ণো নরশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধাকৃতম্।

এতৌ হি কর্ম্মনা লোকানশ্নুবাতেঽক্ষয়ান্ ধ্রুবান।।

তত্রাতত্রৈব জায়েতে যুদ্ধকালে পুনঃ পুনঃ।

তস্মাৎ কর্ম্মৈব কর্ত্তব্য মিতি হোবাচ নারদঃ।।[৭]

অর্থাৎ- "এই পরপুরঞ্জয় অর্জুন মহেন্দ্রের সহিত দেবগণকে জয় করে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করেছেন। সেরূপ নারায়ণও এ জগতে অন্য বহু শত্রুকে বধ করেছেন। এঁরা এ প্রকার মহাবীর্য, এঁরা সমাগত হয়েছেন, তোমরা দর্শন কর। আমরা শুনেছি যে, দ্যোতনাত্মক নর নারায়ণ পূর্বদেব। এ মর্ত্তলোকে এদেরকে সুরাসুরগণ সহকৃত দেবেন্দ্রও পরাজিত করতে পারেননা। এই কৃষ্ণই সেই নারায়ণ এবং এই অর্জুনই সেই নর বলে জানবে। নারায়ণ ও নর একই সত্ত্ব, কেবল দ্বিধাকৃত। এঁরা উভয়ের কর্মদ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক সমুদায় প্রাপ্ত হয়েছেন। ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হবার সময়ে ওঁরা সেই সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।"

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায়, তিনি পরমেশ্বর নন। তিনি সেই পরমাত্মার উপাসনা করেন, যিনি সকলের উৎপত্তির কারণ। মহাভারতের পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিশতম অধ্যায়ে নর-নারায়ণতত্ত্ব-নারায়ণ-নারদ সংবাদ নামক আখ্যানে উক্ত হয়েছে যে, একদা দেবর্ষি নারদ নর ও নারায়ণের আহ্নিক সময়ে বদরিকাশ্রমে আগমন করলেন এবং নর ও নারায়ণকে আহ্নিক ক্রিয়ায় রত দেখে চিন্তা করলেন, "ইহারা সর্বভূতের পিতা ও দেবতাস্বরূপ হয়েও কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন- কিছুই বুঝিতে পারিনা। পরে নর ও নারায়ণ সমীপে প্রশ্ন করেন, 'ভগবন! বেদ-বেদাঙ্গ ও পুরাণসমুদয়ে তোমার গুণ বর্ণিত আছে। তুমি অজ, ধাতা, নিত্য ও অমৃতস্বরূপ। তোমাতেই সমুদয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চারি আশ্রমবাসী লোকেরা সকলেই তোমাকে নানারূপে নিরন্তর উপাসনা করে এবং পন্ডিতেরা তোমাকেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি আজ কোন দেবতা ও কোন পিতৃলোকের আরাধনা করিতেছ?"

এই আখ্যানের শেষাংশ "নারদস্তবে তুষ্ট নারায়ণের আত্মপ্রকাশ"-এ বর্ণিত আছে যে,

"তখন ভগবান নারায়ণ নারদকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা নিতান্ত নিগূঢ়, উহা প্রকাশ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; কিন্তু আমি তোমার ভক্তি দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। সুতরাং উহা তোমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করিতে হইল। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয় বিষয় ও সর্বভূত হইতে অতীত, পন্ডিতেরা যাঁহাকে সর্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দেশ করেন, যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভুত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তরূপে অবস্থানপূর্বক প্রকৃত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা সেই পরমাত্মাকে পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা বা ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই। তিনিই আমাদিগের আত্মাস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই

[৭] মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, উদ্ধৃত, ঐ, পৃ: ৬৫

লোকোৎপত্তির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই আজ্ঞানুসারে মানবগণ দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা কর্তব্যকর্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে।

ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠি, সূর্য, চন্দ্র, কর্দ্দম, ক্রোধ, বিক্রীত ও প্রচেতা এই একবিংশতি প্রজাপতি সেই পরমাত্মার দৈব ও পৈত্রকার্যসমুদয় অবগত হইয়া তাঁহার সনাতন নিয়ম প্রতিপালনপূর্বক স্বীয় স্বীয় অভিষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন। স্বর্গবাসী প্রাণিগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীর, পঞ্চদশ কলাত্মক স্থূলশরীর, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও কর্মসমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হয়। মুক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ হইয়াও কেবল মায়া প্রভাবেই সগুণ বলিয়া অভিহিত হয়েন। আমরা সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহাকে দর্শনপূর্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি। বেদাধ্যয়নরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসীগণ ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা পরিণামে সেই পরমপদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। আমি তোমার ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তোমার নিকট এই সমুদয় গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।[৮]

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পূর্বজন্মে কোথায় কিরূপ তপস্যা করেছিলেন, তার বিবরণও মহাভারত থেকে পাওয়া যায়-

নরস্ত্বং পূর্ব্বদেহে বৈ নারায়ণ-সহায়বান।

বদর্য্যাং তপ্তবানুগ্রং তপোবর্ষাযুতান্ বহূন্।।

ত্বয়ি বা পরমং তেজো বিষ্ণৌ বা পুরুষোত্তমে।

যুবাভ্যাং পুরুষাগ্র্যাভ্যাং তেজসা ধার্য্যতে জগৎ।।[৯]

অর্থাৎ- (মহাদেব অর্জুনকে বলছেন), তুমি পূর্বদেহে নর ছিলে। তখন নারায়ণ তোমার সহায় ছিলেন। তুমি নারায়ণের সাথে বদরিকাশ্রমে বহু অযুত বর্ষ উগ্র তপস্যা করেছিলে, তোমাতে বা পুরুষোত্তম বিষ্ণুতে পরমতেজ বিদ্যমান। পুরুষ শ্রেষ্ঠ তোমরা উভয়ে তেজ দ্বারা জগৎ ধারণ করছ।

মহাভারতে আরও উল্লেখ আছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ একসময় শিবকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে উপাসনা করে তাঁর নিকট থেকে বর লাভ করেন।' তখন সেই দেবদেবের তেজঃ প্রভাবে তাঁহাকে অবলোকন করার ক্ষমতাও শ্রীকৃষ্ণের ছিলনা। [১০]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন-

---

[৮] মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৫ অধ্যায়, নর-নারায়ণ তত্ত্ব ; অনুবাদ- কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, ২য় খন্ড, তুলি-কলম, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ: ৮২৯-৮৩০

[৯] মহাভারত, বনপর্বের অন্তর্গত কৈরাতপর্বে শিবের উক্তি, ৪০তম অধ্যায় , অনুবাদ- কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, ২য় খন্ড,

[১০] মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, ১৪শ অধ্যায়, অনুবাদ- কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, ২য় খন্ড, পৃ: ৮৯০

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।

তান্যহংবেদ সর্ব্বানি নত্বং বেত্থ পরন্তপ।।[১১]

অর্থাৎ- হে অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়ে গেছে। আমার জ্ঞানশক্তি বিলুপ্ত না হওয়ায় আমি জানি, তুমি অজ্ঞানাবৃত এজন্য জানোনা।

মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে আছে, শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মে প্রাপক যে সকল বিষয় অর্জুনকে জানিয়েছিলেন, সে সকল অর্জুন আবার জানতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাতে অসমর্থ হন। তিনি অর্জুনকে জানান যে, তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় ঐ বিষয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন। এখন আর তা পারবেন না, কেন না এখন তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় নাই।[১২]

হিন্দুশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেসব বিভূতির কথা আছে বা যেসব ক্ষমতার কথা আছে, অনুরূপ বা তার চেয়ে বেশী ক্ষমতার কথা অন্যান্য সাধক-সাধিকা সম্বন্ধেও আছে। যেমন, ব্রহ্মবাদিনী কুমারী বাক্, সুপ্রসিদ্ধ দেবী-সূক্তের ঋষি, হিন্দুদের শক্তিপূজা এই দেবী-সূক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। উদ্দীপ্ত জ্ঞানের মহিমায় তিনি অনুভব করেছিলেন-

“অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি

ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।

অহং জনায় সমদং কৃনোম্যহং

দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ।।[১৩]

অর্থাৎ- লোক হিংসক, ব্রহ্মবিদ্বেষীকে বধ করার জন্য আমি রুদ্রের ধনু বিস্তার করে থাকি। আমিই জনগণের নিমিত্ত সংগ্রাম করি; আমি দ্যুলোক ও পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজমান।

অতএব, বিভূতি দেখেই কোন মানুষকে পরমেশ্বর মনে করা যায় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যাঁরা অবতার বলে পরিচিত, তাঁরাও প্রথমে সামান্য মানুষ ছিলেন এবং বহু শতবর্ষ কঠোর তপস্যা ও কর্ম প্রভাবে বিবিধ গুণ ও শক্তিসমূহ লাভ করেছেন। সুতরাং অবতার বলতে এরূপ গুণ সম্পন্ন মানুষ বুঝায়, পরমেশ্বর যে অবতীর্ণ হন, তা বুঝায় না। নিম্নতর কর্মচারী থেকে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা পর্যন্ত সকলেই সরকারী কর্মচারী হলেও তাদের মধ্যে যেমন প্রভেদ, তেমনই পরমেশ্বরের অংশ হয়েও সাধারণ লোক ও অবতারদের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। বিবেকানন্দ বলেছেন, “আমরা মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি আনতে পারি না। ঈশ্বর তো নিরাকার, নিত্য, সর্বব্যাপী, তাঁকে সাকার বলে চিন্তা করা মহাপাপ, ঐ রকম চিন্তা করলে ঈশ্বর-নিন্দা হয়।”[১৪]

---

[১১] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/৫

[১২] মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব, ষোড়শ অধ্যায়, অনুগীতা পর্বাধ্যায়, অনুবাদ- কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৭২

[১৩] ঋগ্বেদ, ১০ মন্ডল, ১২৫-৩,৬

[১৪] বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : প্রসূন বসু, শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রকাশক : প্রসূন বসু, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৯১ বাং, পৃ: ৬৬৭

ঈশ্বরের সান্নিধ্যে মানুষ ঈশ্বর হয়ে যায়- এ জাতীয় মতও অনেকে পোষণ করেন। সীতারামের মতে- আগুনে যেমন লোহা পড়ে থাকলে, সেই লোহাকে লোকে আগুন বলে। তেমনি যাঁরা ভগবানকে অনন্যভাবে আশ্রয় করে থাকেন তাঁদের লোকে চিরদিন ভগবান, অবতার ইত্যাদি বলে এসেছে।[১৫]

সাধারণ লোকে ভগবান অবতার বললেও মানুষ ভগবান হতে পারে কি-না বা এতে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কীত জটিলতার সৃষ্টি হয় কি-না তা সহজেই অনুমান করা যায়। আগুনে লোহা পড়লে লোহা আগুন হয়, কিন্তু যে আগুনে লোহা পড়ল আর পরে লোহা যে আগুন হল- এ দুই আগুন কি এক হতে পারে বা কখনও হওয়া সম্ভব? এ সূক্ষ্ম বিবেচনার অভাবে এ জাতীয় বক্তব্য ধর্মে দেখা যায়। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বা অনন্ত গুণময়ের সান্নিধ্যে এসে মানুষের অপূর্ণ কোন কোন গুণের (এক বা একাধিক) উৎকর্ষ ঘটে; কিন্তু সেজন্য অনন্ত গুণময়ের সাথে সীমিত গুণের অভিন্নতা চিন্তা করা যায়না।

অনন্ত শক্তির সাথে সীমাবদ্ধ শক্তিকে এক ভাবা অযৌক্তিক। তন্ত্রসাধক বামা ক্ষ্যাপা (বামাচরণ)'র মতে-

"তন্ত্র সাধকের দেহমধ্যস্থ কুন্ডলিনী শক্তি যখন জেগে ওঠে, ব্রহ্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত ও একাত্ম হয়, তখন এই বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্মময় দেখেন সেই সাধক। তখন তাঁর তারা মা ব্রহ্মময়ী রূপে যুগপৎ বিরাজ করতে থাকেন, সর্বচরাচরের স্থাবর ও জঙ্গম সকল বস্তুতে।[১৬]

এসব সাধকদের এ সকল উক্তিকে, সাধারণ লোকে যেমন বোঝে, সেভাবেই, ঐ সাধকের উক্তি বলে প্রচার করে। এ অবস্থাসমূহ একান্তই ঐ সাধকের; সাধক নিজ সাধনা উপাসনা বলে সর্বত্র ব্রহ্মময় অবস্থা দেখেন, ব্রহ্মশক্তির সাথে যুক্ত ও একাত্ম হন, কিন্তু তিনি ব্রহ্ম হন না। তিনি ব্রহ্মে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মিলিয়ে দেন। কিন্তু ব্রহ্মের সাথে মিলে তিনি নিজে ব্রহ্ম হন না।

ঈশ্বরের কোন স্থূল-আকার থাকতে পারে কি-না, এ প্রসঙ্গে যোগসাধক নবীন চন্দ্রের (তিব্বতী বাবা) মত নিম্নরূপঃ

"অখন্ড মন্ডলাকার যে পরম সত্য সর্বচরাচরকে ব্যাপ্ত করে আছে, তাঁর কোন লিঙ্গভেদ থাকতে পারেনা এবং কখনও তিনি কোন সংকীর্ণ মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তিনি পরম ঈশ্বর, সকলের কারণের কারণ, অগতির গতি, তিনি একাত্মভাবে নির্গুণ ও নিরাবয়ব। ... মন্ত্র ও দেবদেবীর ধ্যানমূর্তিগুলোকে মানুষেরই কল্পনা প্রসূত মনে হয়। এইসব দেবতা মানুষেরই সৃষ্টি।"[১৭]

হিন্দু ধর্মের পঞ্চসম্প্রদায়ের প্রত্যেকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উপাস্যকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপাস্যদের চেয়ে বড় বলে দাবী করেন এমনকি তাঁদের উপাস্যকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপাস্যদের দ্বারা পূজিত বলেও নির্দেশ করেছেন। এঁদের বিভিন্ন স্তব-স্তুতিতে এরকম উল্লেখ আছে; যেমন- হরি ও হর সূর্য্যের পূজা করেন। ব্রহ্মা নারায়ণের স্তব করেন। আবার হরি, হর ও ব্রহ্মাদি জ্ঞানীগণ শক্তির স্তব করেন। [১৮] এসব স্তবে কোথাও

---

[১৫] দ্রষ্টব্য, সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ, ভারতের সাধক সাধিকা, তুলি-কলম, কলিকাতা ১৯৮৬, পৃ: ৩৫৭।
[১৬] দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ: ১১৫
[১৭] দ্রষ্টব্য, সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩
[১৮] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৬৮-৭০

শক্তিকে, কোথাও বিষ্ণুকে কোথাও বা সূর্য্যকে প্রধান বলা হয়েছে। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে, এঁরা কেউই পূর্ণ নন, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রধান ।

আচার্য গুরুনাথের মতে, একসময় ভারতীয় জনগণ গুরুকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন;[১৯] যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এসময়ে 'গুরুরেব পরং ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'গুরুই পরম ব্রহ্ম' এসব শ্লোক রচিত হয়েছিল।[২০] কিন্তু শাস্ত্রে এরকমও আছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু বরুণ ইন্দ্র শিব ও মরুদ্‌গণ যাঁকে দিব্য স্তব দ্বারা বর্ণনা করেন, সামগগণ সাঙ্গপদক্রম ও উপনিষদ বিশিষ্ট বেদ দ্বারা যাঁর গান করেন, যোগীগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্গতচিত্তে যাঁকে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁর অন্ত জানেনা সেই দেবতাকে নমস্কার।[২১]

এসব স্তবে দেখা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতিরও উপাস্য আছে। সুতরাং এঁরা কেউই পূর্ণব্রহ্ম নন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বা অবতারগণ দেহধারী কিন্তু 'পরমেশ্বর দেহধারী'- এরূপ কথা কোথাও উল্লেখ নাই। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে-

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো

ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।

স্তুতির্জপোঽধমো ভাবঃ

বহিঃ পূজাঽধমা ধমা।।[২২]

অর্থাৎ- ব্রহ্মভাবে ভাবাপন্ন হওয়াই উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম ,স্তব ও জপভাব অধম, বাহ্যপূজা অধম হইতেও অধম।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অবতারগণ জগদীশ্বর নন। তাঁদেরকে জগদীশ্বর জ্ঞানে পূজা করার কারণে সাকারবাদ সৃষ্টি হয়েছে। অবতার সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথ আরও কিছু কথা বলেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ :

একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণ 'ঈশ্বর' শব্দে কথিত হয়ে থাকেন। এরূপ কথনবশতঃই ভারতের দেবদেবীগণ ও বুদ্ধাদিকে তাঁর পূজকগণ পরমেশ্বরের আসনে উপবিষ্ট বোধ করেছেন এবং খৃষ্টশিষ্যগণ খৃষ্টকে পরমেশ্বরের তুল্য বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যিনি যত একত্বই লাভ করুন না কেন, অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ পরমেশ্বরের তুল্য হতে পারেন না। ঈশ্বর ও পরমেশ্বর যে এক নন, তা মহাদেব মহানির্বাণতন্ত্রে নির্দেশ করে বলছেন যে, "ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" ইত্যাদি।[২৩]

একত্বপ্রাপ্ত বা তত্তুল্য গুণসম্পন্ন মানবগণই 'অবতার' বলে কথিত হয়ে থাকেন। 'অবতার' বলতে পরমেশ্বর যে অবতীর্ণ হয়েছেন, এরূপ বুঝতে হবে না; পরন্তু পরমেশ্বরের কোন গুণের অনন্তাভিমুখী

---

[১৯] ঐ, ঐ, পৃ: ৭০

[২০] সত্যধর্ম, পৃ: ১৫৬

[২১] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সম্পাদক : শ্রী সুবোধ মজুমদার, দেবসাহিত্য কুটির, কলিকাতা ১৯৯১, মঙ্গালাচরণম্, শ্লোক-৯, পৃ: ৮/.

[২২] মহানির্বাণতন্ত্র ১৪:১২২।

[২৩] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম, ধর্মার্থীর কর্তব্য, ১০ নং পাদটীকাসহ, পৃ: ১৭২

অবতীর্ণতা হয়েছে, এ-ই বুঝতে হবে। অর্থাৎ ঐ সাধক কোনও কোনও গুণে একত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বা একত্ব প্রাপ্তের সাদৃশ্য লাভ করেছেন, এরূপ জানতে হবে। [২৪] 'স্বভাজাত চরিত্র ও পৌরুষজাত চরিত্র' প্রবন্ধে আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্ত অবতার ও ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষ সম্পর্কে বলেন যে-

"(১) যে সকল মনুষ্য স্বভাবতঃই গুণসম্পন্ন অর্থাৎ প্রযত্ন ব্যতীত বিবিধ গুণে ভূষিত, তাঁহাদিগের চরিত্রকে স্বভাবজাত চরিত্র কহে, আর যাঁহারা স্বভাবতঃ বিবিধ গুণসম্পন্ন না হইয়াও স্বকীয় পুরুষকার প্রভাবে বিবিধ গুণকুসুমে ভুষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিত্রকে পৌরুষজাত চরিত্র কহে।

(৫) স্বভাবজাত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি যদি আজীবন উন্নতি সহকারে কাল যাপন করিতে পারেন, প্রত্যুত কুসংসর্গাদি দোষে কদাচ অধপাতিত না হন, তাহা হইলেই লোকে তাঁহাকে "অবতার'' বলিয়া বিবেচনা করে।

(৮) কাহারও প্রতি এই ভূমণ্ডলে অনন্ত কালের জন্য কার্য-সাধন-ভার জগদীশ্বর প্রদান করেন নাই, সুতরাং যে সময়ের জন্য যতটুকু কার্যের জন্য যাহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি তত সময়ের জন্য ততটুকু কার্য অবশ্যই সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(৯) উল্লিখিত ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য সমাধা করিবার পরে উক্ত আদিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ কার্য করিয়াছেন, তদনুরুপ ফল পাইবেন।

(১০) যাঁহার প্রতি যে গুণের প্রচারের ভার থাকুক না কেন, তিনি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র, যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহাই হইবে, ইহা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা যে যে অন্যান্য কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন, অচিরেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

(১১) মানব হৃদয় যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে অপরিমিত শক্তি হস্তে পাইয়া যে অধিকাংশ লোকেই তাহার অপব্যবহার করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কারণবশতঃ অধিকাংশ প্রচারকগণই শেষসময়ে শক্তিহীন ও দন্ডিত হইয়া থাকেন।

(১২) আদিষ্ট সাধকদিগের মধ্যে অনেকের গুরুতর দন্ডভোগের একটি কারণ এইযে, জগদীশ্বর ঐ দন্ডচ্ছলে সমস্ত জগদ্বাসীকে এই উপদেশ দান করেন যে, যাঁহাকে তোমরা অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন বোধ করিয়াছ, দেখ দোষদুষ্ট হওয়াতে তাঁহাকেও দন্ডভোগ করিতে হইল, অতএব সাবধান! সাবধান! তোমরা কদাচ দোষকর কার্যে প্রবৃত্ত হইওনা।"[২৫]

প্রাচীন আর্যেরা এরূপ গুরুভক্ত ছিলেন যে, তাঁরা গুরুকে ব্রহ্মের তুল্য বলে নির্দেশ করেছেন (গুরুরেব পরং ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ইতি গুরুগীতা)। খৃষ্টানগণও গুরুকে পরমেশ্বর থেকে অভিন্ন বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মতে পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা এ তিন-ই তুল্য। কিন্তু মুসলমানগণ এ বিষয়ে অন্যরূপ। তাঁরা হযরত মহম্মদকে কখনও পরমেশ্বর বলে নির্দেশ করেন না...। এরূপ গুরুভক্তি প্রযুক্ত ভারতে ভিন্ন

---

[২৪] ঐ ঐ, ১১ নং, পৃ: ১৭৩

[২৫] দ্রষ্টব্য ১।দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ,পূর্বোক্ত,পৃ,২১১-২১৩।২।মহাত্মা গুরুনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত ধর্ম ও ধর্ম সমন্বয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ,কলকাতা২০০১,পৃ,৭৩-৮৫।

ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। শিবের শিষ্য অর্থাৎ শিবকে গুরু রূপে বরণ করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা শৈব নামে বিখ্যাত। এরূপে যাঁরা বিষ্ণুর শিষ্য তাঁরা বৈষ্ণব, যাঁরা গণপতির শিষ্য তাঁরা গাণপত্য, যাঁরা সূর্য্যের শিষ্য তাঁরা সৌর (এই সূর্য্য আকাশস্থ সূর্য নন, ইনি সূর্য নামে খ্যাত কোন উন্নত ব্যক্তি) এবং যাঁরা শক্তিদেবীকে গুরু বলে স্বীকার করেন, তাঁরা শাক্ত বলে প্রসিদ্ধ। প্রথমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ সকল মহাত্মারা গুরুরূপে বৃত হতেন,পরে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যাদি কর্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তিরা ঐ সকল মহাত্মাদিগকে মনে মনে বা পরম্পরা সম্বন্ধে গুরুরূপে বরণ করে ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত হতেন। এরূপে ভারতে ধর্ম সম্প্রদায়সমূহের উৎপত্তি হয়েছে। এখন, ঐ সকল গুরু, দেব-পদবীতে অধিরূঢ় এবং পরমেশ্বরের স্থানীয় বলে পূজিত হচ্ছেন। কিন্তু এরূপে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁদের অর্চনা করা যে একান্ত অসংগত, তা... চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে পারেন।[২৬]

(২)

দেবতা বা মহাত্মা সম্বন্ধে গুরুনাথের মত

দেবতা ধারণাটি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দেবতা হল একটি প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত শক্তি যা স্বর্গীয় বা পবিত্র বলে বিবেচিত। দেবতা শব্দের ধাতুগত অর্থ হল জ্যোতির্ময় জীব। স্বর্গলোকেই দেবতাদের আবাস।দেবতারা অমর, নির্জর,দীপ্তিশালী,জ্ঞানী, সুবুদ্ধিসম্পন্ন।

আচার্য গুরুনাথের মতে, "'দেবগণ' শব্দে ইহলোকস্থ মুক্ত পুরুষ ও পরলোকগত উন্নত মহাত্মাগণ বুঝায়।"[২৭] "------- দেব-দেবীগণ অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, দূর্গা, কালী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি এবং খৃষ্টানাদি শাস্ত্রানুসারে পবিত্র আত্মা---। এঁরা সকলেই এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও আত্মোন্নতি সাধনপূর্বক পরলোকে গমন করেছেন এবং পরমানন্দময় ধামে এখনও অবস্থিতি করছেন।"[২৮] "দেব-দেবীগণ শব্দে পরলোকগত মহাত্মা বা ইহলোকস্থিত মহাত্মা বুঝায়।"[২৯]

পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব এগুলো আচার্য গুরুনাথের মতে জীবের অবস্থা বিশেষ।মানুষই কখনও পশুর মত আচরণ করে আবার পশুত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং উন্নতির আরও উচ্চ ধাপে দেবত্ব অর্জন করে। মানুষেরই গুণের উন্নতি অবনতি দ্বারা এসকল অবস্থা লাভ হয়। তিনি বলছেন-"গুণ দ্বারাই মনুষ্য ও পশুত্বে এবং দেবে (পারলৌকিক মহাত্মাতে) ও নরে প্রভেদ।"[৩০] " উপাস্য পরমেশ্বরের

---

[২৬] ঐ ঐ, গুরুতত্ত্ব, পৃ: ১৫৬-১৫৭
[২৭] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ১৯৮
[২৮] ঐ, সত্যধর্ম, ধর্মার্থীর কর্তব্য, ৬ নং, পৃ: ১৭১-১৭২
[২৯] ঐ ঐ, গুরুতত্ত্ব, পৃ: ১৬৯
[৩০] সত্যধর্ম, গুণ প্রকরণ, পৃ: ৩১

অনন্ত গুণরাশি কীর্তন করতে করতে ... আত্মগ্লানি দহনে দগ্ধ হলে জীবের পশুভাব ও সেজন্য মলিনতা দূর হয়ে প্রথমে মানবভাব ও পরে দেবভাবের উদয় হয়...।"[৩১]

মহাত্মা বা দেব-দেবীদের পূজা ও ভক্তি করা প্রসঙ্গে তিনি মত দিয়েছেন যে, "প্রয়োজনানুসারে দেবদেবীগণের পূজা করাও অকর্তব্য নয়, কিন্তু তাঁদেরকে কখনই জগদীশ্বরের তুল্য জ্ঞান করা যাবে না...।"[৩২]

"জগদীশ্বরের উপাসকগণ প্রয়োজনানুরোধে দেবদেবীগণের পূজা করতে পারেন। কিন্তু সাবধান! কখনও যেন সান্তশক্তিসম্পন্ন দেবদেবীদিগকে অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট জগদীশ্বর বলে বোধ করে অজ্ঞানতায় ও সেজন্য মহাপাপে পতিত হতে না হয়।"[৩৩]

"যে সকল মহাত্মারা জগতে সিদ্ধ বা পরমোন্নত হয়েছিলেন, যথা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, হযরত মহম্মদ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি, তাঁদের প্রতি যথোচিত ভক্তি করবে।"[৩৪]

"... জগতে যাঁরা অত্যুচ্চ কার্য সম্পাদন করেছেন বা করছেন, তাঁদের প্রতি ভক্তি করা উত্তমই বটে এবং দেবদেবীগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাঁদের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রকাশ অবশ্য কর্তব্য বটে কিন্তু তা বলে ঐ সকল ভক্ত ও ঐ সমস্ত দেবদেবী যাঁর অংশ, তাঁকে ঐ সকল রূপে ভাবনা করা... বিজ্ঞতার কার্য নয়।"[৩৫]

গুরুনাথের মতে, " দেবদেবীগণ অনন্ত অনন্ত গুণসম্পন্ন জগদীশ্বরের অংশ ও উপাসক। এদেরকে ধারণা করাও সাধারণতঃ কারও সাধ্য নয়।"[৩৬]

এদেশে একটি মত আছে যে, প্রথমে দেবদেবীগণের উপাসনা করে ভক্তি সঞ্চয় হলে পরে ঈশ্বরোপাসনা বিধেয়। গুরুনাথের মতে, এমত যুক্তি সিদ্ধ নয়। তাঁর মতে, "যদি ভক্তি ও তদ্‌গুণজাত অন্যান্য গুণের বৃদ্ধির জন্য কল্পিত দেবদেবীগণের উপাসনার প্রয়োজন বোধ কর, তবে ঐ কল্পিত দেবদেবীগণ পরিত্যাগ করে সাক্ষাৎ দৃশ্যমান দেবদেবীর অর্থাৎ মাতা পিতা ও গুরুদেবের প্রতি ভক্তি করাই কর্তব্য। কিন্তু সাবধান কখনও তাদেরকে অনন্ত স্বরূপের স্থানীয় বোধ করো না...।"[৩৭]দেবদেবীগণ সাকার। গুরুনাথের মতে, "সাকারের উপাসনা নাই, অর্চনা আছে। জগদীশ্বরের পূজা নাই, উপাসনা আছে।"[৩৮] পরমেশ্বরের বাহ্যপূজা হতে পারেনা বটে কিন্তু দেবদেবীগণের ও গুরুদেবের গুণোপাসনার ন্যায় বাহ্যপূজাও হতে পারে।"[৩৯]

---

[৩১] শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, গুণকীর্তন প্রবন্ধ, পৃ: ২৬৭
[৩২] ঐ, সত্যধর্ম, ধর্মার্থীর কর্তব্য, ৭নং, পৃ: ১৭২
[৩৩] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৩৫
[৩৪] ঐ, সত্যধর্ম, ধর্মার্থীর কর্তব্য ৮নং, পৃ: ১৭২
[৩৫] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ১৪১
[৩৬] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৩৫
[৩৭] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২৮৫
[৩৮] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ: ৩৫
[৩৯] ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ: ২৬৬

আচার্য গুরুনাথ ষট্‌চক্রভেদ-সাধনা প্রসংগে দেববাদ সম্পর্কে নিম্নরুপ মত দেন:

বহুধর্মচারিগণ দেবতাদের মানেননা, আর সেকারণে তাঁদের ষট্‌চক্রভেদ-সাধনা জ্ঞান বিফল হয়। আবার যাঁরা পরম ব্রহ্মকে ভুলে দেবগণকে ব্রহ্মতুল্য মনে করে তাঁদের পুজা করেন,তাঁরাও এ সাধনায় বিফলকাম হন।

ব্রহ্ম পরাৎপর, তিনি দেবতাদেরও আরাধ্য,তিনি আদি অন্তহীন, তাঁর সমান কেহ নাই। ইহলোকে ও পরলোকে বহুগুণ সম্পন্ন মানুষ ও দেবতা আছে, তাঁরা অনাদি অনন্ত অসীম অনন্তগুণসম্পন্ন পরব্রহ্মের আরাধনা করেন।দেবতাদের জন্য ভক্তি-অর্চনা করা কর্ত্তব্য,কিন্ত তাঁদের উপাসনা বিধেয় নয়[৪০] শাস্ত্রপ্রমাণ থেকে দেখা যায় যে,দেবতা ও অবতারগণ সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র কর্তা পরমেশ্বরকেই সকলের একমাত্র উপাস্য বলে নির্দেশ করেছেন, কিন্তু অনেকস্থলে মানুষেরা তাঁদেরকেই পরমেশ্বরের আসনে বসিয়ে তাঁদেরকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি উল্লেখ করছি। "যীশু বলিয়াছিলেন, আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক, এবং তোমরা তাহার পুনরাবৃত্তি কর। তথাপি ইহা মানবসমাজকে সাহায্য করে নাই। উনিশ শত বছর ধরিয়া মানুষ এই বাণী বোঝে নাই। তাহারা যীশুকে মানবের পরিত্রাতা করিয়াছে। তিনি ঈশ্বর আর আমরা কীট। ঠিক এইরূপ ভারতবর্ষে- প্রত্যেক দেশে এই ধরণের বিশ্বাসই সম্প্রদায় বিশেষের মেরুদন্ড।

হাজার হাজার বছর ধরিয়া সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো হইয়াছে- জগৎ প্রভু, অবতার, পরিত্রাতা ও প্রেরিত পুরুষগণকে পূজা করিতে হইবে; শেখানো হইয়াছে- তাহারা নিজেরা অসহায় হতভাগ্য জীব, মুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে। তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় এই প্রকার বিশ্বাস ধর্মের কিন্ডার গার্টেন, এইগুলি মানুষকে অতি অল্পই সাহায্য করিয়াছে বা কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও অধঃপাতের গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকজন শক্তিশালী মানুষ এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন।

সময় আসিতেছে- যখন মহান মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশু শিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মার দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।"[৪১]

দেবতা সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মতের অনুকূলে পরবর্তী গবেষকদের মতও পাওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্র সান্যাল দেখিয়েছেন যে, যাঁরা ঈশ্বর নামে খ্যাত বা অমর দেবতা নামে পরিচিত তাঁরা কেউই পূর্ণ নন বা অমর নন। শাস্ত্রে বলছে-

ন খং বায়ুর্নচাগ্নিশ্চ জলং পৃথিবী ন চ

---

[৪০] ঐ, ষট্‌চক্রভেদ-সাধনা,পৃ,২৫-২৬

[৪১] স্বামী বিবেকানন্দ, বেদান্তের আলোকে, কলিকাতা ১৯৮৩, পৃ: ৯৬

নৈতৎ কার্যং নেশ্বরাদি পূর্ণৈকাত্মা ভবেৎ কিল।।[৪২]

অর্থাৎ- একমাত্র পরমাত্মাই পূর্ণ। এছাড়া, আকাশ বাতাস আগুন পৃথিবী এমনকি ঈশ্বরগণ (ব্রহ্মাদি দেবগণ) কেউই পূর্ণ নন।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্বা বা ভূতজাতয়ঃ।

নাশবেমানুধাবন্তি সলিলমীব বাড়বম্।।[৪৩]

অর্থাৎ- জলরাশি যেমন বাড়বানলে প্রবেশ করে। তেমনি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও নিখিল প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, " জীবাত্মা ঈশ্বরাধীন।ঈশ্বর বহু হতে পারেন না। ঈশ্বর নামে খ্যাত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি এঁরা শক্তিসম্পন্ন মুক্ত আত্মা। এই মুক্ত আত্মারা বিপুল শক্তির আধার, প্রায় সর্বশক্তিমান। কিন্তু কেউই ঈশ্বরের মত সর্বশক্তিমান হতে পারেন না।"[৪৪]

বিভিন্ন শাস্ত্রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যেসব স্তব স্তুতি দেখা যায়, এ সম্পর্কে বেদের গবেষক পূরবী পাল বলেন, "এই স্তুতিগুলো রাজা বা রাজকর্মচারীদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, কালক্রমে সেগুলি দেবতাদের স্তুতি বলে গণ্য হয়েছে।"[৪৫]

গবেষক শ্রী যজ্ঞেশ্বর মিত্র বলেছেন, " দেবতারা বর্তমান পৃথিবীর অধিবাসী মানুষের মতই একটি জাতি। বেদে যে বিভিন্ন দেবতার নাম পাওয়া যায় (মরুৎ, গন্ধর্ব, কিন্নর...) এঁরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি। বেদে এদের আচার- আচরণ, পেশা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। দেবতারা সর্বদা উন্নতিশীল ছিলেন বলে তাঁরা নিজেদেরকে আর্য বলতেন। যিনি উন্নতি করে চলেছেন ও বুদ্ধিমান, তিনিই আর্য।

সুতরাং আর্য শব্দে নরগোষ্ঠী না বুঝিয়ে গুণগত বৈশিষ্ট্য বোঝায়। দেবতারা একটি নরগোষ্ঠী- এঁরা জরামরণশীল। ঋগ্বেদে দেখা যায়, এঁরা বহুবছর বেঁচে থাকার জন্য প্রার্থনা করেছেন। এঁরা সকলেই মৃত্যুর অধীন। ঋক্ সংহিতার দশম মন্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বলা হয়েছে, দেবতাদের মধ্যে কাকে মৃত্যু আবৃত করেনি? প্রজাগণই বা কেন অমৃতের আবরণে সুরক্ষিত হননি। দেবগণের নিবাস স্বর্গভূমি- কল্পনার জগৎ নয়, একটি যথার্থ ভৌগোলিক ভূখন্ড। এ ভূখন্ডটি হিমালয় পর্বতের উচ্চতর বিস্তীর্ণ ভূভাগকে অধিকার করেছিল এবং এ অঞ্চলটিই হচ্ছে তথাকথিত স্বর্গভূমি। ইন্দ্র এখানে অধিকার স্থাপন করেছিলেন।"[৪৬]

প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এরিক ফন দানিকেনের মতে, "দেবতারা স্বর্গের অধিবাসী, মহাকাশের কোন অজানা গ্রহবাসী সুসভ্য মানুষ। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে পৃথিবীবাসী মানুষের

---

[৪২] শিবসংহিতা, প্রথম পটল ৬২ শ্লোক (১/৬২), অনুবাদ হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, জ্ঞানদর্পন, কলিকাতা ১৩৭১, পৃ. ২৭

[৪৩] যোগবাশিষ্ট ১৬৩ অনুবাদ, ঐ, পৃ. ২৮

[৪৪] বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৫৩৬

[৪৫] পূরবী পাল, বেদ পরিক্রমা, হুগলী, ভারত, ১৯৮৭, পৃ. ১

[৪৬] শ্রী যজ্ঞেশ্বর মিত্র, স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা, কলিকাতা ১৯৭৭, ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য, আরও দ্রষ্টব্য, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, মহাভারতের গল্প, নিউএজ পাবলিকেসন্স, ঢাকা, পৃ. ৭০।

চেয়ে বহুগুণে উন্নত। তাঁরা মহাকাশ যানে করে পৃথিবীতে এসেছিলেন, কেউ কেউ এখানে কিছুকাল বসবাসও করেছিলেন। সে যুগের মানুষ তাঁদের অবয়ব, শৌর্য্য-বীর্য, জ্ঞান-গরিমা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। সেদিনের মানুষের কাছে তাঁরা পেয়েছিলেন ভক্তি, অর্ঘ্য, নৈবেদ্য এবং দেব, প্রভু, ঈশ্বর ইত্যাদি আখ্যা।"[৪৭]

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক জেনোফিনিস মানবাকারে সৃষ্ট দেবতায় বিশ্বাসী গ্রীকধর্মের সমালোচনা করেন। তিনি ঈশ্বরের মানবাকার রূপধারণকে মানুষের কল্পনা বলে মনে করেন। এই দেববাদের পরিবর্তে তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, " ঈশ্বর এক, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা;সৃষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে তাঁকে স্থান ত্যাগ করতে হয়না। ভগবান অপরিবর্তনীয় ও অনড়। আমাদের একমাত্র সেই পরমপুরুষের উপাসনা করা কর্তব্য। হিরাক্লিটাসও মূর্তিপূজাকে নিন্দা করেছেন, তিনি ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী।

গ্রীক দেবতা সম্পর্কে পরমাণুবাদীরা মন্তব্য করেন যে, দেবগণ মানুষের চেয়ে বেশী প্রভাবশালী, কিন্তু তাই বলে তাঁরা অমর নন। তাঁরাও নশ্বর জীবের ন্যায় পরমাণু গঠিত। অধিক সময় জীবিত থাকলেও যথাসময়ে তাঁদেরও মৃত্যু ঘটে। এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে অপ্রতিহত প্রাধান্য কারোর চিরভোগ্য নয়। দেবতা যিনি যত বড়ই হোননা কেন, সবার উপর এমন একটি বস্তু আছে, যা অসীম শক্তিশালী ও অনতিক্রম, তা সেই মহান নিরপেক্ষ নিয়তি, যা দিয়ে সমস্ত বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত। স্থাবর, জঙ্গম ,সৃষ্টি মাত্রের উপর সমভাবে প্রতিষ্ঠিত সেই নিয়তির নিকট আমরা যেন প্রফুল্লচিত্তে মস্তক অবনত করি। তা-ই প্রকৃত শান্তি লাভের উপায়।"[৪৮]

(৩)

সোঽহং জ্ঞান প্রসঙ্গে আচার্য গুরুনাথের মত

জগতে "সোঽহং" নামে একটি মত আছে। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম, আধুনিক থিওজোফিষ্ট ধর্ম ও যোগ সাধকেরা সোঽহং মতাবলম্বী। কোন কোন উপনিষদে এ মত পাওয়া যায়। উপনিষদের তত্ত্বমসি[৪৯] অহং ব্রহ্মাস্মি[৫০] সোঽহমস্মি[৫১] অয়মাত্মা ব্রহ্ম[৫২] বাক্যগুলি এ মত সমর্থন করে। খৃষ্ট ধর্মে পিতা, পুত্র ও

---

[৪৭] দ্রষ্টব্য, ১। ইন্টারনেট, ২। আরজ আলী মাতুব্বর, রচনাসমগ্র-১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ: ১৫৯

[৪৮] দ্রষ্টব্য, ১. W.T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, London, Newyork 1964, p. 42, 79, 92

[৪৯] ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/৮/৭

[৫০] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৪/১০

[৫১] ঈশোপনিষদ-১৬

[৫২] মান্ডুক্য উপনিষদ-২

পবিত্র আত্মার অভেদ ভাবের কথা আছে। যীশুখৃষ্ট বলেছেন, "আমি ও পিতা এক।[৫৩] কিন্তু আমিই পিতা" এরকম কথা পাওয়া যায় না। জানা যায়, ইসলাম ধর্মানুসারী হাল্লাজ মনসুর আল্লাহর সাথে একত্ব অনুভব করে বলেছিলেন, "আনাল হক্"। সোঽহং শব্দের অর্থ সে-ই আমি। এখানে 'সে' বলতে এঁরা ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে বুঝান।

অর্থাৎ সৃষ্ট আত্মা ঈশ্বর বা পরমেশ্বর তুল্য হয়ে যায়- এরকম মতে এঁরা বিশ্বাসী। সোঽহং জ্ঞান সম্বন্ধে আচার্য গুরুনাথের মত এই যে, গুণ সাধনার উন্নত অবস্থায় সোঽহং জ্ঞান জন্মে। তবে এখানে 'সে' অর্থ ঈশ্বর বা পরমেশ্বর নন; 'সে' অর্থে সমগুণ সম্পন্ন কোন সৃষ্ট আত্মা। অর্থাৎ সৃষ্ট আত্মারা পরস্পর গুণসাধনা করে এমন উন্নত অবস্থায় উপনীত হয় যে, তাঁরা একে অন্যকে 'আমি' বলে ভাবতে পারে। তিনি গুণসাধনা বর্ণনার সময়ে এ বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন। বিশেষতঃ ভক্তি প্রেম ও অভেদজ্ঞান এ তিনটি গুণের সাধনা বর্ণনার মধ্যে এ বিষয়গুলি পাওয়া যায়। তাঁর মতে, ভক্তি হলে ভক্তি ভাজনের প্রতি 'আমি ইহার' এরূপ জ্ঞান হয়। প্রেম হলে প্রেমভাজনের প্রতি 'আমি ইহার, এ আমার' এ জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয়। প্রেমের আরও উন্নত অবস্থায় 'আমিই তুমি, তুমিই আমি'- এ জ্ঞান হয়। প্রেমের সমুন্নত পরিণতিতে অভেদজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ তাঁরা অধিকাংশ গুণে সাদৃশ্য বা সমভাবাপন্ন হন। এ অবস্থায় 'ইনি আমি, আমি ইনি' এ জ্ঞান হয়।[৫৪]

যেহেতু প্রেমের উন্নত অবস্থায় অভেদজ্ঞান জন্মে। সেকারণে তিন প্রকার প্রেমের উন্নত অবস্থায় তিন প্রকার অভেদজ্ঞান হয়। পাক্ষিক প্রেমের উন্নত অবস্থায় যে অভেদ জ্ঞান জন্মে তার নাম স্বর্গীয় অভেদ জ্ঞান। আনুষঙ্গিক প্রকৃত প্রেম থেকে যে অভেদজ্ঞান জন্মে তার নাম পারলৌকিক অভেদজ্ঞান। আর প্রাথমিক প্রকৃত প্রেম থেকে যে অভেদজ্ঞান জন্মে তার নাম পার্থিব অভেদজ্ঞান। এই পার্থিব অভেদজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ হলে 'সোঽহং জ্ঞান' জন্মে। পার্থিব অভেদ জ্ঞান ছাড়া সোঽহং জ্ঞান জন্মে না।[৫৫]

জগতে যে কত সাধক আছেন, তার সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য বা অসম্ভব হলেও তাঁদের শ্রেনীবিভাগ অসাধ্য বা অসম্ভব নয় ;এ মন্তব্য করে আচার্য গুরুনাথ সাধকগণকে তিন শ্রেণীভূক্ত করেছেন- (১) অত্যুন্নত, (২) উন্নত ও (৩) উন্নতি পথে ধাবিত। অত্যুন্নত সাধকগণ সাধনা দ্বারা উন্নত, উন্নতি পথে ধাবিত ও সাধারণ মানুষকে নিজের অন্তরস্থ করেন। এ অভেদজ্ঞানকে উত্তমর্ণ অভেদজ্ঞান বলে। উন্নত সাধকগণ সাধনা দ্বারা অত্যুন্নত সাধকদের অন্তরস্থ হন এবং উন্নতি পথে ধাবিত সাধকগণ সাধনা দ্বারা অত্যুন্নত ও উন্নত সাধকদের অন্তরস্থ হন। এ অভেদজ্ঞানকে অধমর্ণ অভেদজ্ঞান বলে। আর সমভাবাপন্ন সাধকগণ পরস্পর পরস্পরের গুণাবলীর অধিকাংশ লাভ করে পরস্পর সাদৃশ্য ভাবাপন্ন হন। এ অভেদজ্ঞানকে সমর্ণ অভেদজ্ঞান বলে। সমর্ণ অভেদজ্ঞানসমূহ পার্থিব অভেদ জ্ঞানের অন্তর্গত। এ সমর্ণ অভেদজ্ঞান বা পার্থিব অভেদজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই সোঽহং জ্ঞানের নামান্তর।[৫৬]

---

[৫৩] বাইবেল নতুন নিয়ম যোহন ১০:৩০

[৫৪] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, সত্যধর্ম গুণ প্রকরণ, পৃ. ৭৭, গৌরপ্রিয় সরকার, অনুবাদমালা ২য় খন্ড, পৃ. ৪০, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ২৮২।

[৫৫] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ২৭১

[৫৬] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ২৫৯, ২৬০, ২৭০, ২৯৪

সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বর জগতের প্রতি উত্তমর্ণ অভেদজ্ঞান করেন কেননা সমস্ত সৃষ্টি তাঁর অন্তরস্থ। স্রষ্টা সৃষ্টদিগকে অভেদজ্ঞান করলেও সৃষ্টেরা স্রষ্টাকে অভেদজ্ঞান করতে পারেনা। কারণ তাঁর প্রেমের সদৃশ প্রেম সৃষ্ট জগতে নাই। কিন্তু সাধকগণ এ বিষয়ে চেষ্টা করেন, অন্ততঃ অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু স্রষ্টার অনন্তত্ব হেতু সম্পূর্ণ নিজচেষ্টায় বা নিজসাধনায় এ অভেদজ্ঞান করতে সমর্থ হয়না। তবে যদি পরমেশ্বরের করুণা হয় তাহলে হতে পারে। কিন্তু সৃষ্ট জীব স্রষ্টার প্রতি সমর্ণ অভেদজ্ঞান করতে পারেনা কেননা স্রষ্টার গুণাবলীর সদৃশ বা সম গুণাবলী সৃষ্টজীব লাভ করতে পারেনা। স্রষ্টা অনন্ত অসীম। এজন্য স্রষ্টার প্রতি সৃষ্ট আত্মার সোঽহং জ্ঞান কখনও জন্মেনা কারণ সমর্ণ বা পার্থিব অভেদজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই সোঽহং জ্ঞান।[৫৭] সমর্ণ বা পার্থিব অভেদজ্ঞান সৃষ্ট আত্মার সাথে সৃষ্ট আত্মার হয়। কাজেই সোঽহং জ্ঞান সমভাবাপন্ন সৃষ্ট আত্মাদের পরস্পরের সাথে পরস্পরের হয়, স্রষ্টার সাথে হয়না। সৃষ্ট সৃষ্টার তুল্য হয়না।

একত্ব বর্ণনায় আচার্য গুরুনাথ বলছেন, একত্ব একপ্রকার মুক্তি। জগদীশ্বরের যে অনন্তগুণ আছে তার মধ্যে কোন গুণে অনন্তত্ব (পরাকাষ্ঠা) লাভ করাকে একত্ব বলে। কেননা ঐ গুণে সাধক জগদীশ্বরের সাথে এক হন। এ রকম পুরুষ 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত হন। কিন্তু একত্বপ্রাপ্ত সাধক জগদীশ্বরের তুল্য নন। অনন্ত গুণময়ের অনন্তগুণের মধ্যে যদি কেউ কোটি কোটি গুণেও একত্বপ্রাপ্ত হয়, তবুও ঐ কোটি কোটি গুণে একত্বও অনন্ত একত্বের কণামাত্র ছাড়া আর কিছু না। পরমেশ্বর অনন্ত একত্বের একত্ব স্বরূপ। মানুষ অনন্ত একত্ব লাভ করলেও তাঁর তুল্য হতে পারেনা, কেননা অনন্ত একত্বের যে একীভবন তা-ই জগদীশ্বরের স্বরূপ। জীব নিজের চেষ্টায় অনন্ত একত্বই লাভ করতে পারেনা; আর অনন্ত একত্বের একত্ব লাভ করার চিন্তাও সে করতে পারেনা। তবে এই একত্ব প্রাপ্ত সাধকগণও সাধারণের নিকট পরম পূজ্য কিন্তু তাঁরা জগদীশ্বরের তুল্য নন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এ জাতীয় অজ্ঞানতা দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন, মানুষ এ রকম হতে পারে এবং তিনি নিজেও সেরকম হয়েছেন।[৫৮]

আচার্য গুরুনাথ বলছেন যে, প্রেমের উন্নত অবস্থায় অভেদজ্ঞান জন্মে। সুতরাং জগতের প্রতি প্রেমের প্রসার হলে সকল মানুষকে 'আমার' বলে বোধ হয়। এভাবে অভেদজ্ঞানকারী সাধক আরও উন্নত অবস্থায় সকল মানুষকে সোঽহং জ্ঞান করেন অর্থাৎ সকলেই যে 'আমি' এরূপ বোধ করেন। অভেদজ্ঞানের আরও বৃদ্ধি হলে ক্রমে ক্রমে পশু,পাখী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, সাগর সব কিছুই তাঁর সোঽহং জ্ঞানের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। সে সময়ে তিনি বোধ করেন যে, একমাত্র অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর ও আমি এই উভয়ই কেবল বিদ্যমান। কেননা সমস্ত জগৎ তখন তাঁর অন্তর্গতভাবে থাকে। ঐ পরমোন্নত সময়ে সাধক আত্মোন্নতির জন্য যেমন চেষ্টা করেন, সমস্ত সৃষ্টির উন্নতির জন্যও তেমন চেষ্টা করেন।। এ অবস্থাপন্ন সাধকই ধর্মপ্রচার, জ্ঞানপ্রচার এবং জগতের সুখবর্ধন ও দুঃখ নিবারণে প্রকৃত সমর্থ।[৫৯] নিখিল জগতের প্রতি সোঽহং জ্ঞানকারী সাধক দেবগণাবধি দৈত্য, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি পর্যন্ত সমস্ত চেতন পদার্থকে ঔরসপুত্রবৎ পরম স্নেহ করে থাকেন। তিনি কারও শত্রু নন, কেউ তার শত্রু নয়।

---

[৫৭] দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ. ২৯৩-২৯৪

[৫৮] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ৫৯-৬০

[৫৯] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ২৯১

তখন সবজীবের মঙ্গল বিধান ও উন্নতি সম্পাদনই তাঁর চেষ্টা এবং তখন পাপী-পুণ্যবান, সাধু-অসাধু, ভদ্র-অভদ্র, সভ্য-অসভ্য, উন্নত-অবনত বলে কোন ভেদ তাঁর হৃদয়ে থাকেনা। সমভাবে সকলের উন্নতি সম্পাদনই তাঁর কাজ।[৬০] সুতরাং বলা যায়,এই সাধকগণই জগতের সমস্ত কাজে সমর্থ। স্রষ্টানির্দিষ্ট বিভিন্ন কাজের জন্য এঁরাই স্রষ্টার নির্দেশে বিভিন্ন মণ্ডলে জন্ম নেন ও কাজ সম্পাদন করেন।

স্রষ্টার প্রতি সোঽহং জ্ঞান সম্পর্কে আচার্য গুরুনাথ বলছেন,

"তোমারে অভেদ কর্ব্ব কবে?
(নাথ),অধমর্ণ অভেদ জ্ঞান,করে রব তোমায় ডুবে।...
অভেদ জ্ঞানের সীমা, সোঽহং জ্ঞানের গরিমা
না করিতে চাহি তোমা, পুত্র কেন পিতা হবে?"[৬১]

জগতের প্রতি সোঽহং জ্ঞানের অবস্থায় জগদীশ্বরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন,

"আমি তোমারি নাথ, আমারি ধন হে তুমি।
তোমার মঙ্গল চরণে[৬২] পড়ে আছি সদা আমি।
অনন্ত প্রায় এ ব্রহ্মান্ড, সকলি তোমার কাণ্ড,
আমারি অভেদ ভাণ্ড, এ বিশ্ব সকলি আমি।
আকাশ বায়ু অনল, কি সলিল কিবা স্থল
আমি আছি সর্বস্থল, এ বর দিয়াছ তুমি।
কিন্তু তবু তব অন্ত, না পাইনু প্রাণকান্ত
কেমনে হইব শান্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত এবে আমি।
কিবা দেব কি দানব, যক্ষ রক্ষ কি মানব
তোমারি প্রেমের গুণে সকলি তো বিভো আমি।
কিবা পশু পাখী যত, কীট পতঙ্গ অযুত
তোমারি প্রেমের গুণে, সকলি তো বিভো আমি
তরুলতা আদি যত, নদ হ্রদাদি পর্বত

---

[৬০] দ্রষ্টব্য, শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ২৯৩

[৬১] দ্রষ্টব্য, ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত, সত্যধর্ম মহামন্ডল, বাংলাদেশ, ১৩৮৮, পৃ. ৬৯, সঙ্গীত নং-৯৮

[৬২] অভিধান অনুসারে চরণ অর্থ পদ, পা, শীল ইত্যাদি, পদ অর্থ অনুগ্রহ আশ্রয় স্বরূপ ইত্যাদি, শীল অর্থ চরিত্র, স্বভাব। যেহেতু পরমেশ্বর স্থূলদেহধারী নন সেহেতু চরণ অর্থে কোন স্থূল অঙ্গ না বুঝিয়ে অনুগ্রহ, আশ্রয় স্বরূপ প্রভৃতি বুঝায়। (দ্রষ্টব্য, সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান,)

তোমারি প্রেমের গুণে, সকলি তো বিভো আমি।

কিন্তু তবু তব অন্ত, না পাইনু প্রাণকান্ত

কেমনে হইব শান্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত এবে আমি।”[৬৩]

সোঽহং মতাবলম্বীদের সম্পর্কে তিনি বলেন,

“জ্ঞানোৎপন্ন অভেদজ্ঞানেও জগতের প্রতি সোঽহং জ্ঞান জন্মিতে পারে কিন্তু তা আর অগ্রসর হবার পথ পায় না বলে ঐ শ্রেণির সাধকগণ সাধনা নিরপেক্ষ হয়ে ঈশ্বরের প্রতি সোঽহং জ্ঞান হয়েছে বলে মনে করেন এবং সে কারণে ঐ মতাবলম্বীরা সোঽহং জ্ঞানকে একটি সামান্য কাজ বলে মনে করেন।”[৬৪]

জ্ঞানমার্গাবলম্বী সাধকগণের মধ্যে অনেকেই ২২৪দিন মাত্র গুরুসেবা করে সোঽহং জ্ঞান হয়েছে বলে অভিমান করেন। কিন্তু আচার্য গুরুনাথ মনে করেন যে, এরকম অভিমান করা ঠিক নয়।[৬৫]

---

[৬৩] দ্রষ্টব্য, শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত, পৃ. ৯২, সঙ্গীত নং-১৩৫

[৬৪] দ্রষ্টব্য, ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ২৯০

[৬৫] দ্রষ্টব্য, ঐ, ঐ, পৃ. ২৯৫

উপসংহার

আচার্য গুরুনাথের ধর্মতত্ত্বের কয়েকটি দিক আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।যতটা বোঝা গেছে তাতে মনে হয়, তাঁর ধর্মতত্ত্বের মূল বিষয় গুণ-তত্ত্ব। তাঁর মতে, জগতে যা কিছু আছে, সবই গুণ ও গুণময়। এ জগতের স্রষ্টা যিনি, তিনিও গুণময়। তাঁর অনন্ত গুণ। তাঁর অনন্ত গুণের প্রতিটি গুণের অনন্ত ভাব, এই অনন্ত ভাবের অনন্তত্ব একটি গুণের অনন্তত্ব। এভাবে অনন্ত গুণের অনন্তত্ব তিনি। তাই গুরুনাথ বলেছেন, স্রষ্টা অনন্ত অনন্ত অনন্ত গুণময়।

গুণ দিয়ে যখন ঈশ্বরকে প্রকাশ করা যায় তখনই তাঁকে সগুণ বলা হয়। এ গুণসমূহের অধার্য্য ভাবকেই নির্গুণ বলা হয়। ঈশ্বরের এত গুণ যে তার ধারণা করা যায়না তাই তাঁকে নির্গুণ বলা হয়। যখন বিশেষ বিশেষ গুণে তাঁকে বিশেষিত করা হয় তখন তাঁকে সগুণ তাঁর অনন্ত গুণের একটি গুণ প্রেম। এই প্রেমগুণের ধর্মবশতঃ এ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টাতে সমস্ত গুণ অসীম, অনন্ত; আর সৃষ্টিতে সব গুণ সসীম, সীমাবদ্ধ।

এই সীমাবদ্ধ গুণগুলির যোগে সৃষ্টিতে অপকৃষ্ট গুণ (যার অন্য নাম দোষ) ও মিশ্রগুণ উৎপন্ন হয়। সীমাবদ্ধ গুণের দ্বারা এবং তাদের যোগে যে সব দোষ উৎপন্ন হয়,এদের ফলে জগতে অমঙ্গল বা অনিষ্ট দেখা দেয়। গুণগুলিকে অসীম করতে পারলে তাদের দ্বারা অনিষ্ট বা অমঙ্গল উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। তাই জীবের কর্তব্য তার গুণগুলির উন্নতি করা, গুণগুলিকে অসীমত্বে উপনীত করা। আর এটা করার উপায় স্রষ্টার উপাসনা করা(স্রষ্টার অনন্ত গুণের কীর্তন করা ও তাঁর কাছে প্রার্থনা প্রভৃতি) এবং গুণগুলির উন্নতির জন্য চর্চ্চা বা অভ্যাস করা, এক কথায় গুণ সাধনা করা।

সৃষ্টির নিয়মে প্রথম সৃষ্টিতে সকল জীবাত্মা তুল্যগুণ সম্পন্ন। গুণের উন্নতি দ্বারা সকলে ক্রমশঃ উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়। গুণের দ্বারাই পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্বে প্রভেদ। গুণের অবনতি উন্নতি অনুসারে এগুলি আত্মার অবস্থা বিশেষ। গুণের সাধনা করা সব মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সকলেই গুণের আদর করে। গুণ মানুষের স্বভাবকে পরিশোধন করে ও উন্নত করে। কোন গুণের সাধনা করে সৃষ্ট আত্মা ঐ গুণে অনন্তত্ব বা পরাকাষ্ঠা লাভ করে এবং ঐ বিশেষ গুণে স্রষ্টার সাথে এক হয়। কিন্তু এভাবে কখনও স্রষ্টার সমান হয় না কেননা স্রষ্টা অনন্ত গুণের অনন্ত একত্ব স্বরূপ।

আচার্য গুরুনাথ তাঁর ধর্মতত্ত্বকে যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বার্ট্রান্ড রাসেলের মত ধর্মতত্ত্বকে নিছক dogma বলেননি বা বিজ্ঞানের জ্ঞানকেও definite

বলেননি।[১] তিনি ধর্মতত্ত্বের বিচারে যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে' অর্থাৎ যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হয়, এই ঋষিবাক্য স্মরণ করে তিনি শাস্ত্রের অর্থ করার কথা বলেছেন।[২] তিনি ধর্মার্থীকে বিচার পরিত্যাগ করতে বলেননি।[৩] তবে তিনি বলছেন যে, আধ্যাত্মিক জগতে এমন অনেক কাজ আছে, যার কারণ বোধ না হলেও প্রথমে কেবল গুরু বাক্যানুসারে কাজ করতে হয়, পরে কারণ জ্ঞান হয়।[৪] তাঁর মতে, দর্শন শাস্ত্র জ্ঞান লাভের মূল কারণ,এর বিচার প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। দর্শনশাস্ত্র শাস্ত্র জগতে সম্রাট, গুরুর ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুর মত হিতোপদেশ দেয়, দেহাত্বভেদ প্রভৃতি পরম জ্ঞান প্রচার করে। তবে একমাত্র দর্শনশাস্ত্র অবলম্বন করে জীবন যাপনের পক্ষপাতীও তিনি নন।[৫]যিনি অন্য ধর্মকে জানেননা, তিনি নিজের ধর্মকে ভালোভাবে জানেন, এ দাবী করতেই পারেন না।[৬] আচার্য গুরুনাথ এ মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই তিনি প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করেছেন এবং সেগুলো তাঁর ধর্মতত্ত্বে সন্নিবেশ করেছেন।

আচার্য গুরুনাথের মতে, গুণসাধনা করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সকলেই গুণের আদর করে ও গুণের চর্চ্চা করে। কাজেই ধর্মের মধ্যে অবান্তর কড়াকড়ির কোন বিষয় নাই। ধর্ম স্বাভাবিক গতিতে সকলকে উন্নতির দিকে নিবে। কবি নজরুলও ধর্মের কড়াকড়িকে কবি ও কবিতার প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেছেন।[৭] গুরুনাথ ধর্ম আচরণ অর্থাৎ জীবনে ধর্মকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপাসনা ও সাধনা একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে বলছেন। তিনি বলেছেন, উপাসনা ছাড়া সত্যধর্ম পথে থাকার উপায় নাই। দোষ ত্যাগ ও গুণ লাভের জন্য তিনি বিশেষ বিশেষ সাধনার বিধান দিয়েছেন এবং তাঁর মতে, বিনা সাধনায় কিছু লাভ হয়না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনিই হইবে।"[৮]

জগতে যাঁরা ধর্ম প্রচার করেছেন, তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল জগতের সকলের কল্যাণ করা। বিশেষ কোন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা দেশের মঙ্গলের জন্য ধর্ম আসেনি বরং সব মানুষের মঙ্গলের জন্যই ধর্ম এসেছে। কিন্তু বর্তমানে ধর্ম অনুসারীদের আচার-আচরণের ফলে প্রায় প্রতিটি ধর্মের অনুসারীগণ ভিন্ন ভিন্ন গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। যার ফলে ধর্মগুলোকেও ভিন্ন ভিন্ন মনে হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন ধর্মের উপাস্যও ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে। একধর্মে ব্যবহৃত

---

[১] দ্রষ্টব্য Bertrand Russell, *A History of Western Philosophy*, George Allen and Unwin Ltd. London, 1962, p. 13

[২] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ১৪৭।

[৩] দ্রষ্টব্য, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ২৯৫।

[৪] দ্রষ্টব্য, ঐ, সত্যধর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

[৫] দ্রষ্টব্য, ঐ, তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা, পৃ. ১২৮, ৪০।

[৬] দ্রষ্টব্য, Max Muller (ed.) Buddhism & Nihilism, *Studies in Buddhism*, Calcutta, Sushil Gupta Ltd. 1953, p. 40

[৭] আনওয়ার হোসেনকে লিখিত একপত্রে নজরুল লিখেছেন, "ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মলাভও করতে পারেনা।" (দ্রষ্টব্য, নজরুল রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৩৭১)।

[৮] দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্ম, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৯০, পৃ. ৬৮।

উপাস্যের নাম অন্য ধর্মাবলম্বীরা এড়িয়ে চলছেন। এক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান অন্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠান থেকে ভিন্নতর। যে কারণে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বেরর কথা ধর্মে থাকলেও ধর্মানুসারীগণ স্ব স্ব ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধের গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। ধর্ম জগতে এর চেয়েও ক্ষতিকর যে দিকটা- সেটি হচ্ছে, নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হয়; এমনকি ধর্মের নামে হত্যা পর্যন্ত করা হয়।

আচার্য গুরুনাথের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাঁর মতে, ধর্ম করতে হলে জগতের সমস্ত নর-নারীকে সহোদর সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করতে হয়। তাঁর মতে, ধর্মকাজ বলতে গুণ সাধনা এবং তা দুইভাবে করার কথা আছে; এক- অনন্ত গুণময়ের গুণকীর্তন ও তাঁর কাছে প্রার্থনা, দুই- উৎকৃষ্ট গুণাবলীর চর্চ্চা বা অভ্যাস করা। পৃথিবীর সব ধর্মাবলম্বীই এটা করেন বা করতে পারেন। গুরুনাথের মতে, জগতে উপাস্যের যত নাম পাওয়া যায়, সবই তাঁর বিভিন্ন গুণ প্রকাশক শব্দ। যত ভাষায় তাঁর যত নাম পাওয়া যায়, সবই তাঁর গুণ প্রকাশ করে। কোন কোন ধর্মাবলম্বীগণ উপাস্যের কিছু কিছু নামের ক্ষেত্রে এক একজন ব্যক্তিকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু আচার্য গুরুনাথের মতে, উপাস্য ঐ রকম কোন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নন। ঐ নামগুলো এক উপাস্যেরই বিভিন্ন গুণের নাম। একজন উপাসক এর সব শব্দই ব্যবহার করে উপাসনা করতে পারেন।

আচার্য গুরুনাথের মতে, ধর্মের যে ঐশ্বরিক বাণীগুলি এসেছে, সেগুলি প্রচারকের মাতৃভাষায় এসেছে, যাতে তিনি সহজে ধর্ম প্রচার করতে পারেন। যাবতীয় ধর্ম অনুষ্ঠান যার যার মাতৃভাষায় করাই শ্রেয়। আর যাঁর যে সব ভাষায় জ্ঞান আছে, তিনি সে সব ভাষায়ও ধর্মকাজ করতে পারেন। অর্থাৎ সব ভাষাতেই ধর্মকর্ম করা যায়। তাঁর মতে, জগতে প্রচারিত ধর্মগুলোকে আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও এরা একই ধর্মের দেশ কাল পাত্রোপযোগী সংস্করণ। ধর্মে ধর্মে কোন ভিন্নতা নাই। ধর্মের পার্থক্য শুধু অবান্তর বিষয়ের জন্য। আর ধর্মের নামে বিনাশ বা হত্যা তাঁর ধর্মতত্ত্ব সমর্থন করেনা। তাঁর মতে, যারা কলুষ অনলে দগ্ধ অর্থাৎ যারা পাপী, তাদের শান্তি দিতে এবং যারা মুক্তিকামী তাদের মুক্তি দিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর মতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল সৃষ্টিকর্তার গুণগান করার অনুষ্ঠান আর ধর্মীয় আচার হচ্ছে সদ্‌গুণাবলীর চর্চ্চা বা অভ্যাস করার জন্য যা কিছু করা। সমস্ত সৃষ্টির মুক্তির লক্ষেই ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিদাতা একমাত্র, যিনি অনন্ত গুণময়। প্রত্যেকে নিজ নিজ গুণের অভ্যাস বা চর্চ্চা ক'রে, গুণের বৃদ্ধি ঘটিয়ে, ক্রমশঃ অনন্ত গুণময়ের সান্নিধ্য লাভ করবে। এই-ই ধর্ম-কর্মের উদ্দেশ্য, এই গুণসাধনা-তত্ত্বই আচার্য গুরুনাথের ধর্মতত্ত্বের মূল কথা।

অনেকেই জগতের মঙ্গালের কথা বলেন এবং এ জন্য অনেক উদ্যোগও নিয়েছেন। এ বিষয়ে আচার্য গুরুনাথের মত এই যে, সমর্থ না হয়ে যে কারও উপকার করতে যায়, সে অনিষ্টই করে।[৯] জগদ্বাসীর মঙ্গাল করতে হলে প্রথমে আত্মমঙ্গাল সম্পন্ন করতে হয়। নিজের চিত্ত যাতে অটল ও বিশ্বাসপূর্ণ হয়, গুরু বাক্যানুসারে সব করতে পারি বলে দৃঢ় জ্ঞান হয়, উপাসনা দ্বারা যখন

---

[৯] মহাত্মা গুরুনাথের উপদেশাবলী (উপদেশমালা), উপদেশ নং-৬

বিমল আনন্দ লাভ হয়, তখনই আত্মমঙ্গল হয়েছে বলা যায়। আত্মমঙ্গল হলে জগদ্বাসীর যার যা অভাব তা পূরণের জন্য বাসনা আপনিই উপস্থিত হয়। কিন্তু তখনও গুরুর আদেশ না পেলে সংযত থাকতে হয়।[১০]

সুতরাং গুরুনাথের মতে যথাযথ শক্তি সম্পন্ন অর্থাৎ গুণসম্পন্ন মানুষই জগতের কল্যাণ করতে পারেন। পরের উপকার করতে হলে দয়া, ন্যায়পরতা, জ্ঞান এই প্রধান গুণগুলি এবং এর সাথে আরও বহুগুণের সমন্বয় প্রয়োজন। সেই সাথে আত্মপ্রেম ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিতে হয়।[১১] এরূপ মানুষই জগতের উপকারে সমর্থ। এরূপ গুণবিশিষ্ট না হয়ে জগতের কল্যাণ করতে প্রবৃত্ত হলে, তার দ্বারা জগতের কল্যাণ হবে, না অকল্যাণ হবে,তা নির্ণয় করা যায়না।

কাজেই গুরুনাথের মতে, মানুষকে জীবনে যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে গুণ অর্জন এবং লব্ধ গুণগুলিকে অসীমত্বে উপনীত করা। তাঁর মতে, মানুষ এ পৃথিবীতে গুণ সাধনার জন্যই জন্মগ্রহণ করে। যে এ কাজে যতটা সফল, তার জীবন ততটা ধন্য, ততটাই সার্থক।

---

[১০] ঐ, ঐ, উপদেশ নং-৮

[১১] শ্রী গুরুনাথ সেনগুপ্ত, তত্ত্বজ্ঞান-সাধনা, পৃ. ৮৪

গ্রন্থাবলী

১.মূল উৎস

১. *ঈশোপনিষৎ,* স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা,১৯১৮
২. *উপনিষদ,* অখন্ড সংস্করণ, অনুবাদ: অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশ চন্দ্র ঘোষ, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা-১৯৮০
৩. *ঋগ্বেদ সংহিতা,* প্রথম খন্ড, ২য় প্রকাশ, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা-১৯৮৭, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬
৪. *ঋগ্বেদ সংহিতা,* দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা-১৯৭৬
৫. *কোরআন শরীফ,* তাফসীরুল কোরআন, অনুবাদ: আকরাম খাঁ, ঢাকা, ১৯৫৮-৫৯
৬. *কোরআন শরীফ,* অনুবাদ: গোলাম মোস্তফা, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৭
৭. *কোরআনুল করিম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৩৮৫
৮. *গৌরপ্রিয় সরকার,* অনুবাদবালা ১ম খন্ড, ফরিদপুর, ১৩৭১
৯. গৌরপ্রিয় সরকার, অনুবাদমালা ২য় খন্ড, কলিকাতা-২০১৫
১০. স্তব-কবচমালা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৪
১১. পঞ্চদশী, শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর কৃত, রামকৃষ্ণ বিরচিত টীকা সহিত এবং পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক অনূদিত, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, নটবর চক্রবর্তী, ১৩২০
১২. পাতঞ্জল দর্শনম্। যোগদর্শনম্ বা যোগসূত্রম্। মহেশ চন্দ্র পালেন। কলিকাতা, বেদ মন্দির, ১৩১৭
১৩. বাইবেল, ধর্ম পুস্তক অর্থাৎ পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ব্যাঙ্গালোর, ভারতের বাইবেল সোসাইটী,১৯৬৬
১৪. বেদান্ত দর্শনম্, কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ সমেত ও দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫১-৫৩
১৫. মহাভারত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত, রাজশেখর বসু অনূদিত, কলিকাতা এম, পি, সরকার এন্ড সন্স, ১৯৭১
১৬. মহাভারত, ২য় সংস্করণ, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা, বিশ্ববানী, ১৯৭৬
১৭. মহাভারত, ২য় খন্ড, শ্রীকালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনূদিত, তুলি-কলম, কলিকাতা, ১৯৮৪
১৮. রামানুজ : বেদান্ত সার, অনুবাদ: যতীন্দ্র রামানুজাচার্য্য, ষড়দহ (২৪ পরগণা), শ্রী বলরাম ধর্ম সোপান, ১৯৭০
১৯. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *ষট্চক্রভেদ সাধনা,* গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ, ১৩৮৮
২০. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *মনোদূতম্,* কলিকাতা,
২১. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *বারিদূতম্,* কলিকাতা, ২০০০
২২. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *বাতদূতম্ (সানুবাদ),* অনুবাদ: শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কলিকাতা-১৯১৭
২৩. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *পত্নীশতকম্ (সানুবাদ),* অনুবাদ: শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কলিকাতা-১৯৯৬
২৪. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *শিক্ষাশতকম্ (সানুবাদ),* অনুবাদ: শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কলিকাতা-১৯৯৭
২৫. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *উপদেশমালা,* গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ
২৬. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *বীরোত্তর কাব্য,* কলিকাতা, ১৪০২
২৭. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *স্বভাবজাত চরিত্র ও পৌরুষজাত চরিত্র*

২৮. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *অদ্ভুত উপন্যাস,* গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ, ১৩৪৬ বাং
২৯. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *হিতদীপ,* ঢাকা, ২০০৫
৩০. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত,* কলিকাতা, ১৯০৩(১ম), ১৯৮২(২য়)
৩১. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত প্রকাশিত '*সত্যধর্ম*', আহীরীটোলা, কলিকাতা, ১২৯৩, ২য় সংস্করণ, ১৩১৯, ৫ম সংস্করণ বরিশাল, ১৩৮৬
৩২. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *'তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা'* বরিশাল, ১৩৩৩
৩৩. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *'তত্ত্বজ্ঞান সাধনা'* বরিশাল, ১৩৩৩
৩৪. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *'তত্ত্বজ্ঞান সংগীত'* বরিশাল, ১৩৩৩
৩৫. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *'নিত্যকর্ম'* বরিশাল, ২য় সংস্করণ, ১৩৫০
৩৬. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *'মুক্তি জিজ্ঞাসা'* অনুবাদক : গৌরপ্রিয় সরকার, গোপালগঞ্জ, ১৩৯৫
৩৭. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *'সত্যামৃত'* বরিশাল, ১৩৪৬
৩৮. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *'দম্পতির ধর্মালাপ'* কলিকাতা, ১৯৯৪
৩৯. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *'মাতৃভক্তি ও মাতৃউপাসনায় সন্তানের মুক্তি'* কলিকাতা, ২০০১
৪০. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, *'স্ত্রী শিক্ষা'* বরিশাল, ১৩৪৬
৪১. শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত, ধর্ম ও ধর্ম সমন্বয় এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, কলিকাতা, ২০০১
৪২. শ্রী দ্বিজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মহাত্মা গুরুনাথ, কলিকাতা, ২০০১
৪৩. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* সম্পাদক, স্বামী জগদানন্দ, অনুবাদ :স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ষষ্ঠ সং, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬০
৪৪. সত্যধর্ম প্রচারক দেবমান মহাত্মা গুরুনাথ, কলিকাতা, ১৩৫৬
৪৫. *সাংখ্যদর্শনম্* মহর্ষি কপিল মতম্ ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য্য প্রণীত কারিকাত্বম, শ্রীনটবর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৬
৪৬. *Badrayana : Brahmasutra,* edited by Kapileswara Sastri, Viswabharati Vidyabhavan, 1980
৪৭. *Digha-Nikaya,* Rhys Davis T.W. (ed), Pali Text society, Oxford University Press, 1890
৪৮. *Iswarakrishna : Sankhya Karika,* edited by S.S. Sastri, University of Madras, 1948
৪৯. *Mahanirvanatantra,* edited by Arthur Avalon, Motilal Baranasidas, Delhi, 1977
৫০. *Majjhima-Nikaya,* Honer I.B.(Tr.), London, 1969
৫১. *Vedanta Sutras,* with the commentary by Shankara, Translated and edited by G. Thibaut, Motilal Baranasidas, Delhi, 1962
৫২. *Yogo-System of Patanjali,* J.H. Woods (r.), Delhi 1966, Reprint : Harvard Oriental Series, Vol. 17, 1914

২.সহায়ক-উৎস

1. আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪
2. ইব্রাহীম খাঁ, *ইসলামের মর্মকথা,* ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০
3. ঈশপ, *রচনা সমগ্র,* রমা ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৬ বাং
4. ঈশপ, *গল্প সমগ্র,* তুলি-কলম, কলিকাতা, ১৯৮২
5. উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, *মানবের আদি জন্মভূমি,* সারস্বতগেহ, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ
6. কল্যাণ চন্দ্র গুপ্ত ও অমিতাভ বন্দোপাধ্যায়, *ধর্ম দর্শন,* ব্যানার্জী পাবলিকেসন্স, কলিকাতা, ১৯৭৪
7. কালীপদ মালাকার, *আন্তর্জাতিক-ঐক্য ও ধর্ম নিরপেক্ষতা,* কলিকাতা, ১৯৭৬
8. কার্ল মার্কস্ ও ফ্রেডারিখ এ্যাঙ্গেলস্, *ধর্ম প্রসঙ্গে,* মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮১

9. খন্দকার আবদুল করিম, *ইসলামের মৌলিক তত্ত্ব কথা,* চান্দিনা (বাংলাদেশ), হাসান মঞ্জিল, ১৯৭৮
10. গৌড়পাদাচার্য্য, *আগমশাস্ত্র বা বুদ্ধোত্তর বেদান্ত,* চট্টগ্রাম, বৌদ্ধ বিহার, ১৯৭৪
11. *জাতক,* অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত, অনুবাদ: ঈশান চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা, ১৯১৬-১৯৩০
12. ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম, ড. কাজী নূরুল ইসলাম, তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০২, পৃ: ১৪
13. ড. আমিনুল ইসলাম, পাশ্চাত্য দর্শন আধুনিক ও সাম্প্রতিক কাল, ঢাকা, ১৯৯৯
14. ড. এম. আবদুল হামিদ, সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৩
15. ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, *পাঁচটি ভাষণ,* সংকলক : শ্রী শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৯৯ (১০ম সংস্করণ)
16. ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মানবধর্ম, কলিকাতা,১৪১০
17. ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের নিরপেক্ষ বিচার, কলিকাতা,১৯৯৯
18. ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, বেদ-বেদান্ত, কলিকাতা, ১৯৯৯
19. ডি. মায়াল এডোয়ার্ডস, *ধর্ম দর্শন,* অনুবাদ : সুশীল কুমার চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৯
20. তেজস শংকর দাস, *বাংলাদেশে খৃষ্টধর্মের দুশো বছর এবং অতঃপর,* প্রকাশক জনেশ লোটন রায়, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
21. নৃপেন্দ্র গোস্বামী, *ভারতীয় দর্শন,* কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৭৫
22. দীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী, *দিগ্বিজয়ী দয়ানন্দ,* আর্য সমাজ, কলিকাতা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ
23. দেওয়ান মোঃ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম,* ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৭
24. দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন,* আদিপর্ব, কলিকাতা, কে.পি. বাকচী, ১৯৮০
25. দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন,* নিউ এজ পাবলিকেশন্স, কলিকাতা, ১৯৬৩
26. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮
27. নূরুল ইসলাম মানিক (সম্পাদক), *ইসলামী দর্শনের রূপরেখা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এরপক্ষে, পরিচালক, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ১৯৮২
28. পাতঞ্জল যোগসূত্রম্, ব্যাখ্যাতা : স্বামী প্রেমেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-২০০২
29. পূরবী পাল, *বেদ পরিক্রমা,* চুঁচুঁড়া (ভারত), পূরবী পাল, ১৩৮৭
30. প্রবাস জীবন চৌধূরী, *ঈশ্বর সন্ধানে,* কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬
31. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন,* ১ম,২য় ও ৩য় খন্ড, কলিকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮০
32. প্রিয়দা রঞ্জন রায়, বিজ্ঞান, *দর্শন ও ধর্ম,* কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৮
33. *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র,* প্রসূন বসু ও শচীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য (সংকলন ও সম্পাদনা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৯১
34. বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা,* কলিকাতা, ১৯৬১
35. মুনীর উদ্দীন আহ্মেদ, *কোরআনের অভিধান,* নোয়াখালী, বাংলাদেশ, ১৯৭৭
36. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ,* ঢাকা, রেনেসাঁস, ১৯৬৩
37. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কোরআন প্রসঙ্গ, ঢাকা, রেনেসাঁস, ১৯৭০
38. মোহাম্মদ আবদুল হালিম, গ্রীকদর্শন *প্রজ্ঞা ও প্রসার,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১
39. যতীন্দ্র মোহন সিংহ, *সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার,* ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ভট্টাচার্য্য এন্ড সন, ১৩৩০
40. যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়,* কলিকাতা, কে.এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫

41. যোগেন্দ্র নাথ বাক্চী, *ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ,* কলিকাতা, ১৯১৬
42. রবীন্দ্র কুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী, *পরলোকতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা,১৩৮০
43. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ধর্ম,* বিশ্ব ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১২১৫; ১৩৯০ বাং
44. রমাপ্রসাদ দাস ও শিব প্রসাদ চক্রবর্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা,* ২য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮১
45. রমেন্দ্র নাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩
46. রাজেশ্বর মিত্র, *স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা,* কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭
47. হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, *জ্ঞান দর্পন,* রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৭১
48. হরেন্দ্র কুমার দে চৌধুরী, *অমৃতের সন্ধানে,* কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৩১
49. হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন,* কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৮০
50. শিব প্রসন্ন লাহিড়ী, *মহাভারতের গল্প,* নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৪০০, ৩য় মুদ্রণ
51. সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ, *হিন্দুধর্ম,* জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৬৬
52. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, *ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,* East and West in Religion-এর অনুবাদ, অনুবাদ: নীরদ চন্দ্র চক্রবর্তী, কলিকাতা, মিত্র এন্ড ঘোষ, ১৩৭৪
53. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস,* বাংলা সংস্করণ, কলিকাতা, সরকার এন্ড সন্স, ১৩৬৮
54. সাইয়েদ আবদুল হাই, *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬
55. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *ইসলাম পরিচিতি,* সৈয়দ আবদুল মান্নান কর্তৃক অনূদিত, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭১
56. সুধাংশ রঞ্জন ঘোষ, *ভারতের সাধক-সাধিকা,* তুলি-কলম, কলিকাতা, ১৯৮৬
57. সুধীর কুমার দাশগুপ্ত, *আমাদের পরিচয়,* কলিকাতা, বীনা লাইব্রেরী, ১৯৪১
58. সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা,* কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪১
59. সুবল মিত্র (সংকলিত), *সরল বাঙ্গালা অভিধান,* নিউবেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৫, পূণর্মুদ্রণ
60. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২
61. স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী, *সত্যার্থ প্রকাশ,* আর্য সমাজ, কলিকাতা
62. স্বামী বিবেকানন্দ, *হিন্দুধর্ম,* উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা, ১৯৮৭
63. স্বামী বিবেকানন্দ, *বেদান্তের আলোকে,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-১৯৮৩
64. স্বামী প্রভবানন্দ, *নারদীয় ভক্তিসূত্র,* উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৯২ বাং
65. রশীদ আল ফারুকী, *মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া,* কলিকাতা, ১৯৮১
66. A.C. Ewing, *The Fundamental Questions of Philosophy, London,1958*
67. Abdul Jalil Mia, *Concept of Unity*, Islamic Foundation, Dhaka, 1980
68. Abdul Matin, *An Outline of Philosophy*, Mallik Brothers, Dhaka, 1968
69. Ahmad Abdullah-al-Masdoosi, *Living Religions of the World,* English rendering by Zafar Ishag Ansari, Karachi, Pakistan, 1962
70. Ahmad A. Galwash, *The Religion of Islam*, Cairo, Dar-el-Kitab-el, Arabi Press, 1961
71. Alan H. Cromer, *Physics for the Life Sciences,* Mc. Graw-Hill Book Company, New York, 1974
72. A.J. Bahm, *The Words Living Religious :* Arnold Weinene nn. 1964
73. Alston, *Philosophy of Language :* Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1964
74. Amarjit Singh Sethi and Reinhard Pummer (eds.), *Comparative Religion,* Canada Sociological Research Centre, OTTAWA, Canada, 1979

75. Ananda K. Coomarswami, *Hinduism and Budhism,* Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1975
76. Annie Besant, *The Religious Problems in India,* Agam Prakashan, Delhi, 1976
77. Anthony G.N. Flew (ed.), *Essays on Logic and Language,* Second Series, Oxford, 1953
78. Arthur Beiser, *Concept of Modern Physics*, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1963
79. Arthur Pap, *Elements of Analytic Philosophy*, New York, Macmillan, 1949
80. Azizunnahar Islam, *The Nature of Self, Suffering & Salvation: With Special Refference to Buddhism,* Islam,Vohra Publishers,Allahabad,1987
81. Ballantyne and Sastri, *Yoga Sutra of Patanjali,* Govinda Deva (ed.) ,Benares 1882
82. Bertrand Russell, *A History of Western Philosophy*, London, 1948
83. Chandradhar Sharma, *A critical Survey of Indian Philosophy*, Delhi, 1973
84. Davis S. Noss and John B. Noss, *Mans Religions*, Macmillan Publishing Co., New York, 1984
85. Deviprasad Chattopadhyaya, *What is living and What is dead in Indian Philosophy*, Peoples Publishing House, Delhi, India, 1976
86. Deviprasad Chattopadhyaya, *Science and Society in Ancient India,* K.P. Bagchi & Co. India, edition-2, 2014
87. Deviprasad Chattopadhyaya, *Indian Atheism,* New Delhi, 2006
88. Edward J. Juri (ed.), *The Great Religions of the World, Princton*, New Jersey, 1967
89. Edward Mc Nall and Philip Lee Ralph, *World Civilization* Vol. 1, Norton and company Inc., New York, 1955
90. F. H. Bradley,*Appearance and Reality*,Oxford, Clarendon Press,1930
91. Gloria Faizi, *The Bahai Faith; An Introduction*, Gloria Faizi, Lebanon, 1971
92. Haridas Bhattacharyya, *The Foundation of Living Faith*, An Introduction to Comparative Religion, University of Calcutta, 1938
93. Huston Smith, *The Religions of Man,* Perenial Library, New York, 1965
94. Irving M. Copi, *Introduction to Logic,* 5th ed., Macmillan Publishing Co., New York, 1978
95. Jacques P. Thiroux, *Philosophy, Theory and Practice*, Macmillan Publishing Co., New York, 1985
96. Jadunath Sinha, *Unity of Living Faiths : Humanism and World Peace*, Part-1, Sinha Publishing House Pvt. Ltd., Calcutta ,1974
97. J.E. Swain, *A History of World Civilization,* 2nd ed. 2nd Impression, Mc Graw-Hill Book Co. Inc., New York and London, 1947
98. John Hosperse, *An Introduction to Philosophical Analysis*, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, 1953
99. John Hick, *The Philosophy of Religion,* Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1979
100. Jullian A. Joffe, *Studies in the History of Civilization*, Philosophical Library, New York, 1970
101. Kashinath Upadhyaya, *Early Budhism and the Bhagabadgita*, Motilal Baranasidas, Delhi, 1983
102. Karan Singh (ed.), *Religious of India*, Clarion Books, New Delhi, 1983
103. Kazimierz Ajdukiewicz, *Problems and Theories of Philosophy,* Tr. By Hanryk Skolimowski and Anthony Quinton, Cambridge University, 1975

104. Kedarnath Tiwary, *Comparative Religion*, Motilal Baranasidas, Delhi, 1983
105. M.M. Sharif, *Muslim, Its Origin and Achievements*, Lahore, 1959
106. Mohes Tiwary (ed.), *Bodhi-Ras' mi*, Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, 1984
107. Moore , G. E., Principia Ethica , Cambridge University Press,1968
108. Max Arthur Macauliffe, *The Sikh Religion*, Oxford, 1909
109. Max Webber, *The Religion of India*, Tr. and ed. By Hans H. Gerth and Don Martindale, The Free Press, New York, 1967
110. R.C. Zahner, *Hinduism*, London, 1962
111. R. Pierce Beaver and others (eds.), *A Lion Handbook of the Worlds Religion*, Lion Publishing, England ,1984, 1st Print in 1982
112. Ramendra Nath Ghosh, *The Dialectics of Nagarzuna, Vohra Publishers*, Allahabad, 1987
113. Reynold Nickolson, *The Mystics of Islam*, G. Bell and Sons, London, 1914
114. Robert Maynard Huchins (ed. in Chief), *Great Books of the Western World Vol. 31*, William Benton, Publisher, Encyclopaedea Britanica Inc., 1952
115. Sayed Abdul Hai, *Muslim Philosophy*, Islamic Foundation, Dhaka, 1982
116. Saral Jhingran, *The Roots of World Religions*, Books and Books, 1982
117. Sarvepalli Radhakrishnan, *Indian Philosophy Vol. 1*, Blackie and son Pvt. Ltd., Bombay, 1977
118. Sarvepalli Radhakrishnan, Eastern Religions and Western Thought, India, 1939
119. Sarvepalli Radhakrishnan, *A Source Book in Indian Philosophy*, London, 1923 Princeton, New Jersey, Princeton University Press, Moore, Charles A (ed.), 1957
120. Sarvepalli Radhakrishnan, *The Hindu View of Life*, Blackie and son Publishing Pvt. Ltd., Bombay, 1964, Third Indian Print
121. Satish Chandra Chatterjee, *The Fundamentals of Hinduism*, University of Calcutta, 1970
122. SatishChandra Chatterjee and Dhirendra Mohan Datta, *An Introduction to Indian Philosophy*, University of Calcutta, 1960.
123. Theodore Stcherbatsky, *The Conception of Budhist Nirvana*, Motilal Baranasidas, Delhi, 1977
124. Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, Cosmo Publications, New Delhi, 1982
125. Thomas Patrick Hughes, *Notes on Muhammadanism*, Idarab-i-Adabiyat-i, Delhi, 1894, reprint 1975
126. Vaman Shivram Apte, *The Students Sanskrit English Dictionary*, Motilal Baranasidas, Delhi, 1976
127. Voltaire, *Philosophical Dictionary*, ed. and Tr. By Wade Baskin, Philosophical Library, New York, 1961
128. W.T. Stace, Greek Philosophy, London, 1964
129. Will Durant, *The Pleasures of Philosophy*, Simon and Schuster, New York, 1952
130. William P. Alston, Richard B. Brandt (eds.),*The Problems of Philosophy*, Allyn and Bacon, Boston, 1974

৩.সাময়িকী / প্রবন্ধ

১. Kalyana-Kalpataru, *A Monthly for the Propagation of Spiritual ideas and love of God*, Edited by C.L. Goswami, (God-Number) Vol. 1. No. 1, Gorakpur, India, January 1934

২. God, *The Contemporary Discussion*, edited by Frederick Sontag & M. Dorrol Bryant, The Unification Theological Seminary 1982, New York

৩. Arvind Sharma, W.T. Stace on Mysticism : An Advaitic Approach, *THE VISWA-BHARATI JOURNAL OF PHILOSOPHY*, edited by RAJENDRA PRASAD PANDY, volume xiv, Numbers 1 & 2, August 1977 and February 1978 (Published in 1982) VISWA-BHARATI, SANTINIKETON, West Bengal

৪. Dr. R.V. De Smet, The Problematics of the Knowledge of God, *INDIAN PHILOSOPHICAL ANNUAL, VOLUME SEVEN 1971*, CENTRE FOR ADVANCED STUDY IN PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF MADRAS, 1973

৫. Fr. William Ruddy, Can the Judgement, *'God is the Perfect Actualization of Pure Thought*', be fulfilled , Op. cit.

৬. Dr. Ch. Sreenivasa Rao, *Can We know God*? Op. Cit.

৭. Prof. S.S. Raghavachar, *Logical Positivism and the Concept of God*, Op. Cit.

৮. Dr. V.A. Devasenapathi, *The Concept of God*, Op. Cit.

৯. Dr. M. Muthuraman, *The Problem of Existence of God*, Op. Cit.

১০. Dr. T.S. Devadoss, *Gandhis Conception of God*, Op. Cit.

১১. G. C. Nayak, Approach of Hinduism to its Scriptures, *JOURNAL OF DHARMA*, Vol. xxi, Oct-Dec. 1996, No. 4, DHARMARAM COLLEGE, BANGALORE-560029

১২. GODFREY TANGWA, God and the Problem of Evil, AFRICA, *Thought and Practice, The journal of the Philosophical Association of Kenya*, Vol. 4 No. 2, 1982, Nairobi, Kenya.

১৩. J.N. Upadhyaya, 'Irrelevance of God : A Budhist view' *BODHI-RAS'MI,* Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, 1984

১৪. Kazi Nurul Islam, Some Observations of Contemporary Atheism, Copula, *A JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF PHILOSOPHY* Vol. 2, No. 1, June 1985, JAHANGIRNAGAR UNIVERSITY, SAVAR, DHAKA

১৫. Kazi Nurul Islam, World Peace Through Interreligious Dialogue, *PHILOSOPHY and PROGRESS*, Vol V, June 1986, Dev Centre for Philosophical Studies, Dhaka University, Dhaka, Bangladesh

১৬. Paul Mojzes, UNIVERSALITY AND UNIQUENESS IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS PLURALISM : AN INTRODUCTION, *JOURNAL OF ECUMENICAL STUDIES*, edited by Paul Mojzes, Volume 26, Number 1, TEMPLE UNIVERSITY, WINTER 1989

১৭. Santi Nath Chattopadhyaya, Universal Humanism : A study on Tagore, *PHILOSOPHY AND PROGRESS*, Volume 11 : Number 2, Dec. 1983, Dev Centre for Philosophical Studies, Dhaka University, Dhaka , Bangladesh

১৮. W.D. HUDSON, WHAT MAKES RELIGIOUS BELIEFS RELIGIOUS? *Religious Studies*, Volume : 13, Number 2, June 1977, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

১৯. কাজী নূরুল ইসলাম, *'ঈশ্বরে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে' দর্শন,* বাংলাদেশ দর্শন সমিতির গবেষণাপত্র, ১১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ১৯৮৮

২০. ভবতোষ সুতার, *'হিন্দু শব্দের অর্থ* সমাজ দর্পন, ৩য় বর্ষ ৭, ঢাকা ১৩৯৩

২১. ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,১৯৬৯, উদ্ধৃত, আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়, ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব স্মারক পুস্তিকা, কলিকাতা, ১৯৮৫

২২. মোঃ তোফায়েল হোসেন, *'সাভারের ইতিহাস'* স্বাবলম্বী, দ্বাদশবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পল্লী সম্পদ ব্যাবহার শিক্ষা কেন্দ্র, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা, ১৯৯০

পরিশিষ্ট

আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়

১২৫ বছর পূর্তি উৎসব স্মারক পুস্তিকা

১৮৫৯—১৯৮৪

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরে নাধিগচ্ছতি॥

৮০ বি. কে. পাল এভিনিউ
কলকাতা ৭০০০০৫
ফোন—৫৫-৮৫২০

স্বামী অভেদানন্দ

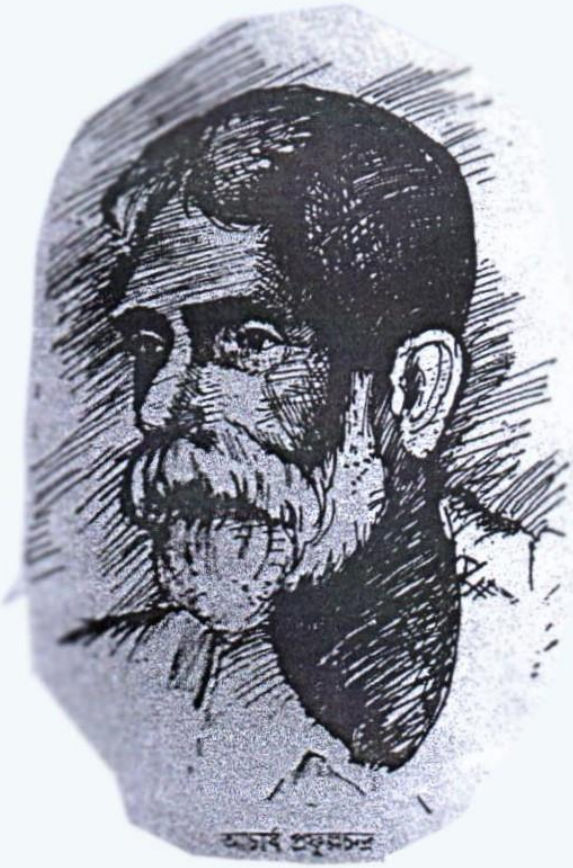

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক
গুরুনাথ সেনগুপ্ত

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
ভোলানাথ চন্দ্র

বঙ্গ বিদ্যালয়ের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসে ১২৫ বর্ষে আবিষ্কৃত এক বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব

গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন (১৮৪৭-১৯১৪)

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে ২০ বছর বয়সে গণিত-শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ক্রমে ক্রমে তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হন। সে যুগে কলকাতার সারস্বত সমাজে আদর্শ শিক্ষক রূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পরিচালনায় বঙ্গবিদ্যালয় বিশেষ উন্নতি করে, কলকাতার এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। প্রধান শিক্ষকতার অবকাশে তিনি সংস্কৃত ও বাংলায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এই সমস্ত রচনার খুব অল্পমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। মহাকবি কালিদাসকে অনুসরণ করে তিনি লিখেছিলেন 'বাতদূতম্' 'মনোদূতম্' এবং 'বারিদূতম্' কাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্যের উত্তর হিসেবে তাঁর রচনা 'বীরোত্তর কাব্য', যা বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। শোনা যায় বিদ্যাসাগরের তিনি অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। পরিতাপের বিষয় অনেক খোঁজখবর করেও আমাদের বিদ্যালয় থেকে তাঁর সম্বন্ধে প্রায় কোন তথ্যই জানা যায়নি। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে এটি পুনর্মুদ্রণ করে তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। প্রবন্ধটির জন্য আমরা ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে এই উপলক্ষে তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য পত্রিকার কাছে আমাদের ঋণ রইল।]

॥ এক ॥

বিচারের অন্যতম নিয়ামক শক্তি কাল; সাধারণতঃ কোন এক ইংরেজ সমালোচক একবার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলেছিলেন যে, প্রতি একশ বছর অন্তর সাহিত্যের পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন। কারণ সাহিত্য-স্ব-কালের সঙ্গে সহব্যাপী বলে আমরা অস্মিতার বাইরে যেতে কিছু ক্লেশ বোধ করি। কালক্রমে অনেক লেখক বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যান; গুণপণা সত্ত্বেও বহু শিল্পী-

সাহিত্যিককে অল্পকালের মধ্যে লোকস্মৃতির বাইরে চলে যেতে হয়। আবার অনেক পরে স্মৃতির যাদুঘর থেকে যখন কোন লেখককে বাইরে আনা হয়, তখন আবার তাঁর মধ্যে নতুন প্রতিভার জ্যোতি ফুটে ওঠে। রবার্ট ব্রিজেস চেষ্টা না করলে হপকিন্‌স্‌কে আরও কতকাল অজ্ঞাতবাস করতে হত কে জানে?

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালীর জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও গূঢ় চেতনার যে উৎসব শুরু হয়েছিল—সমাজ, রাষ্ট্রচেতনা, নীতিবোধ, ধর্মৈষণা, শিক্ষাদর্শ—জীবনের স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার অধিমানসের যে অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার একটা বড় স্বরূপ সাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল। যথার্থ বিশুদ্ধ শিল্প বলতে বোধ হয় সাহিত্যকে নির্দেশ করা যায়। কারণ সাহিত্যের উপাদান-কারণ মনঃপ্রকর্ষের আলোছায়াকে অবলম্বন করে বাঙ্‌ময় সত্তার মধ্যে চেতনাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু আবেগের বাঁধভাঙা বন্যায় এমন সমস্ত সাহিত্যবস্তু ভেসে আসে যে, পরবর্তী কালে তার আর কোন চিহ্ন থাকে না; ক্বচিৎ পুরাতত্ত্বের ভূগর্ভ থেকে কিছু কিছু জীবাশ্ম উঠে আসে; তখন তার কঙ্কালতত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই বেধে যায়।

গুরুনাথ সেনগুপ্ত এমনি একটি বিস্মৃত প্রত্ননিদর্শন। অবশ্য তিনি এমন কোন দূরাস্তৃত ধূসর ইতিহাসের নিষ্প্রভ ব্যক্তি নন যে, তাঁকে প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত করতে হবে। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে (২২ অগ্রহায়ণ, ১২৫৪ বঙ্গাব্দ) তাঁর জন্ম এবং ১৯১৪ সালে (২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁকে খুব একটা পুরাতন কালের ব্যক্তি বলা যায় না। সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মসাধনা এবং শিক্ষাবিতরণে অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিলেও উনিশ শতকের এই বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, অথচ কয়েক বছর পূর্বে তাঁর একখানি সুবৃহৎ জীবনী প্রকাশিত হয়েছে।[১] নানা অনুসন্ধান থেকে দেখা যাচ্ছে, গুরুনাথ একটি বিশেষ ধর্মচর্যা ও সাধনমার্গের আচার্য ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর বহু শিষ্য ও অনুরাগী ব্যক্তি তাঁকে দেবতাবৎ ভক্তি করতেন। এখনও তাঁর মতাবলম্বী ভক্তসম্প্রদায় তাঁর স্মৃতি পবিত্র চিত্তে রক্ষা করছেন।[২] অধ্যাত্মমার্গে তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, তার নানা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তাঁর জীবনীতে সবিস্তারে পাওয়া যাবে। তাঁর ভক্ত ও শিষ্যগণ অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলিকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করেন। সে ধরনের বোধাতীত ব্যাপারের সঙ্গে যাঁদের সংযোগ নেই এবং বিশ্বাসও নেই, তাঁরাও গুরুনাথের এই অলোকসামান্য ক্রিয়াকলাপ থেকে এইটুকু বুঝতে পারবেন যে, এই গৃহী, কবি, পণ্ডিত ও সজ্জন ব্যক্তিটিকে তাঁর অনুরাগীর দল কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন। বর্তমান প্রসঙ্গে সেকথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কেই দু'চার কথা বলব।

॥ দুই ॥

গুরুনাথ সেনগুপ্ত (১৮৪৭-১৯১৪) যশোহরের বেন্দা গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামনাথ সেনগুপ্ত সচ্চরিত্র ও পবিত্র জীবনাদর্শের জন্য 'সাধু রামনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহনের একেশ্বরবাদের দ্বারা কিছু প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্বে যেতে হলে আগে প্রতীক কল্পনা করতে হবে—রামমোহনের বেদান্তাশ্রয়ী একেশ্বরবাদকে তিনি এইভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পত্নী গৌরী দেবীও সতীসাধ্বী রমণীর আদর্শ বলে গ্রাম্য নারীসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেছিলেন। শোনা যায় তাঁর প্রথম তিন পুত্রের শৈশবে মৃত্যু হলে চতুর্থ পুত্রটির জন্মের পর কোন এক অপরিচিতা মহিলা নবজাতকের সূতিকাগৃহে প্রবেশ করে বলেন, 'ওগো, এই শিশুটির নাম তোমরা কিন্তু গুরুনাথ রাখিও।' একথা বলেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হন। সেই জন্যই বোধ হয় এই শিশুর নামকরণ করা হল গুরুনাথ। সাধকবংশেই গুরুনাথের জন্ম। তাঁর পিতামহ রাজচন্দ্রও সাধক ছিলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ কেউ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে এমন একটি তথ্যবহুল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন যে, স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেটি পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি কৌতূহলী হয়ে গুরুনাথের সঙ্গে পরিচিত হন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর গুরুনাথের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ পড়ে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতবর্ষে মৌলিকপ্রবন্ধ লিখনক্ষম কোনও পণ্ডিত আছেন বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ-লেখক আমার সে-ধারণা পাল্টাইয়া দিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মতের কি সুন্দর সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে!"

শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধেও গুরুনাথ বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অতিশয় যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশ করে ১৮৯৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদককে একখানি চিঠি লিখে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। স্কুল কলেজে বিশেষভাবে বাংলা শিক্ষা দেবার জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন।

॥ তিন ॥

সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র এবং বাংলা কাব্যে ও দার্শনিক চিন্তায় গুরুনাথের অসাধারণ অধিকার ছিল। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষা তাঁর মাতৃভাষাবৎ আয়ত্ত হয়েছিল। ইদানীং যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাদি রচনা করে সারা ভারতেই যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের তুলনায় গুরুনাথের সংস্কৃত সাহিত্যসৃষ্টির মৌলিক প্রতিভা কোন দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়, বরং কোন কোন দিক দিয়ে উৎকৃষ্টতর। দক্ষিণভারতের পণ্ডিতসমাজ এখনও মৌলিক সংস্কৃত রচনায় নিরত আছেন। ঐ অঞ্চলে সংস্কৃত গদ্যে রচিত আধুনিক বিষয়ের (যেমন টেলিগ্রাফ) ওপরেও অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে থাকে। ইদানীন্তন কালে বাংলাদেশের কবিপ্রতিভাশালী কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী রসসাহিত্য সৃষ্টিতে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিলেও সংস্কৃত গদ্যে রচিত মননধর্মী নিবন্ধ-সাহিত্যের ঐতিহ্য-ধারাটি মরা খাতে কায়ক্লেশে বহমান। এদিক থেকে গুরুনাথের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, যা সেযুগের বিদ্বৎ সমাজ ততটা লক্ষ্য করেন নি, এযুগেও সে সম্বন্ধে সংস্কৃতসমাজে বিস্ময়কর তুষ্ণীভাব দেখা যায়। এর প্রধান কারণ, পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীর কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তিকা ভিন্ন গুরুনাথের অধিকাংশ মৌলিক সংস্কৃত রচনা মুদ্রিত হয় নি। অনুরাগী ও ভক্তসমাজে ঐ সমস্ত সংস্কৃত রস-সাহিত্য জীর্ণ পাণ্ডুলিপির আকারে একযুগে প্রচলিত ছিল। তাঁর কোন-এক বিচক্ষণ ভক্তশিষ্য গুরুর একখানি উপাদেয় জীবনী লিখেছেন। তাতেই গুরুনাথের মৌলিক সংস্কৃত-রচনাশক্তির অনেক নিদর্শন পাওয়া যাবে। সে নিদর্শন রীতিমতো বিস্ময়কর। সেগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হলে বিদ্বৎ-সমাজ বুঝতে পারতেন যে, এখনও সংস্কৃত সাহিত্যে মৌলিক গ্রন্থ রচনা সম্ভব। সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ ও সংহিতায় গুরুনাথের ছিল অসামান্য ব্যুৎপত্তি। ষড়দর্শনে তিনি স্নাতকত্ব লাভ করেছিলেন অবলীলাক্রমে। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যে-ধরনের জীবন-ব্রহ্মতত্ত্বে একনিষ্ঠ ছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'সত্য-ধর্ম'। জাতিপাতি নির্বিশেষে সকল পিপাসু ব্যক্তিকেই তিনি এই *perennial philosophy* থেকে আত্মার খাদ্যপানীয় সংগ্রহ করতে আহ্বান করেছিলেন। সাধনমার্গে তিনি এমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন যে, আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানী তা শুনলে উচ্চহাস্য করবেন। তবে "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy," এই মহাকাব্য স্মরণ করে বস্তুবিজ্ঞানী উপহাস ও উচ্চহাস্য কিছু প্রশমিত করতে পারেন।

গুরুনাথের জীবনীতে তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। সে তালিকা রীতিমতো বিস্ময়কর। যিনি বাংলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, অর্থাভাবে বহু গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যবস্থা করতে পারেন নি, বাইরে থেকে উৎসাহের অভাব সত্ত্বেও শুধু

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরস্থিত সারস্বত আবেগের বশেই তিনি প্রায় একশ[৩] সংস্কৃত কাব্য, মহাকাব্য, কোষকাব্য, গদ্যনিবন্ধ, ধর্মজিজ্ঞাসা, দার্শনিক আলোচনা, ব্যাকরণ, টীকাভাষ্য—এমন কি আধুনিক ইতিহাস লিখেছিলেন। এই সমস্ত রচনার কণিকামাত্র প্রকাশিত হয়েছে, কিছু-বা তাঁর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধ' পত্রিকাতেই রয়ে গেছে। এখানে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁর রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের শুধু নামোল্লেখ করা যাচ্ছে।

১. 'সত্যামৃত'—এর মধ্যে মোট দশখানি সংস্কৃত নিবন্ধ ও স্তোত্র জাতীয় রচনা স্থান পেয়েছে। যথা—সত্যধর্মঃ, গুণরত্নম্, পাশাষ্টকম্, মুক্তিজিজ্ঞাসা, ধ্যানম্, অবতারবাদঃ, অদৃষ্টবাদঃ, গুণত্রয়ম্, অভেদজ্ঞানম্। এর মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থে সরল সংস্কৃতে ধর্মকথা ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

২. কয়েকটি দার্শনিক নিবন্ধ—ধর্মঃ, ধর্মজিজ্ঞাসা, প্রণবপ্রশংসা।

৩. দশখানি ব্যাকরণ-আলোচনা-সংক্রান্ত পুস্তিকা—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণম্, কৌমার ব্যাকরণম্, ছন্দোরত্নম্, গণরত্নম্, পাণিনিসারঃ, চতুষ্টয়বৃত্তিঃ আখ্যাতবৃত্তিঃ, কৌমারসঞ্জীবনী, বৈদিক ব্যাকরণম্।

৪. টীকা ও ভাষ্য—সর্বানন্দতরঙ্গিণীটীকা, ঋগ্বেদটীকা, কাদম্বরীটীকা, মুগ্ধবোধটীকা, আর্যবেদভাষ্যম্, কালী-উর্ধ্বম্নায় তন্ত্রভাষ্যম্।

৫. 'নিত্যকর্ম'—এর মধ্যে গুরুগীতা (সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ), মহেশপঞ্চকম্, চন্দ্রকান্তপঞ্চকম্, জাতি-ভেদঃ, আত্মবংশপরিচয়ঃ, শ্বশুরবংশপরিচয়ঃ, একাগ্রতা, প্রচার্যবিষয়াঃ, কালীস্তোত্রম্, অষ্টোত্তরশতস্তোত্রম্, ঈশাষ্টকম্, ব্রহ্মস্তোত্রম্, ব্রহ্মাষ্টকং প্রভৃতি মুদ্রিত হয়েছিল।

৬. 'ভারতেতিহাসঃ'—এতে সংস্কৃতে ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থটি অতি বিচিত্র। এর মুদ্রণ ও প্রচার হওয়া উচিত। এতে ইংরেজ রাজত্বের বর্ণনাই প্রধান। এতে "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্ভব এবং পশ্চাৎ ইংরাজ জাতির ভারতে আগমন কাল হইতে পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার সরল ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে।"[৪] এই ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় থেকে 'ক্লীবচরিত্রম্' (অর্থাৎ ক্লাইভ চরিত্র)-এর কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হচ্ছে :

অত্র দৃশ্যতে যদ্রাজ্যং বিশালং ভারতাহ্বয়ম্।
অস্য মূলং ক্লীবো নূনং ত্রিবর্গস্যাদিবর্গবৎ॥
শান্তারো বহবঃ সন্তঃ শক্তিমন্তঃ সমাগতাঃ।
ভারতে শাসনার্থায় তে পূজ্যা দেববদ্ ধ্রুবম্॥
মূলং ভারতরাজস্য মহামহীরুহাত্মনঃ।
ইঙ্গলণ্ডেঽধীনস্য ক্লীবো লয়বিশারদঃ॥
হেষ্টিংসাখ্যো মহাজেতা, স্কন্ধঃ স্থূলোঽস্য বিস্তৃতঃ।
কর্ণবালিশ বেলেশ্‌লি সংজ্ঞৌ তদ্‌বিটপৌ মতৌ॥

বিশাল ভারতরাজ্যের মূল 'ক্লীবের' জয়গান এবং হেষ্টিংস কর্ণওয়ালিশ প্রভৃতি শাসকদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় আধুনিক পাঠক কিছু অপ্রসন্ন হতে পারেন। কিন্তু আধুনিক ইংরেজ আমলের ভারত-ইতিহাসকে যে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করা যায়, শুধু এর জন্য লেখক নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন।

৭. মহাকাব্য—শ্রীরামচরিতম্ ও শ্রীগৌরবৃত্তম্।

৮. কাব্য ও খণ্ডকাব্য—বারিদূতম্, বাতদূতম্, মনোদূতম্, পত্নীশতকম্, শিক্ষাশতকম্, ভ্রমভ্রমণম্।

এর কোনখানিই মুদ্রিত হয় নি—আমাদের দুর্ভাগ্য। 'শ্রীরামচরিতম্' ছাব্বিশ সর্গে বিরচিত একখানি বৃহৎকলেবর মহাকাব্য। রামচন্দ্রের জন্ম থেকে লীলাবসান পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাহিনী সুমধুর সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। গুরুনাথ এতে বহু বিচিত্র ছন্দের সাহায্য গ্রহণ করেছেন এর বহু স্থলে নিজেই নিজের রচনার টীকা করেছেন। নানা ছন্দ ও বিচিত্র অলঙ্কারের দৃষ্টান্তে আধুনিক কালের বঙ্গভাষী কবি যে কতটা পারদর্শিতা দেখাতে পারেন এই মহাকাব্যই তার প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ প্রথম সর্গ থেকে ক'টি শ্লোক উদ্ধৃত হচ্ছে :

চন্দ্রিকাচন্দ্রমোহাভিন্নৌ গঙ্গাস্থূযমুনাযুতৌ।
শ্রীগৌরীরামনাথৌ মে পিতরৌ প্রণমাম্যহম্॥১

Dhaka University Institutional Repository

সাধনায় ডুবে থাকতেন। শিষ্যদের লক্ষ্য করে প্রদত্ত উপদেশ, চিঠিপত্র, নিবন্ধ প্রভৃতি থেকে তাঁকে শুধু ক্রান্তদর্শী ঋষিকল্প ব্যক্তি বলেই মনে হয় না, আধুনিক ধর্মান্দোলনে তাঁরও যে একদা একটা গুরুতর ভূমিকা ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। প্রচারের অভাবে, তাঁর যথার্থ পরিচয় আজ নিষ্প্রভপ্রায়। গুরুনাথের উদার অসাম্প্রদায়িক[২১] মানবজীবনকেন্দ্রিক ব্রহ্মবাদ উনিশ শতকের বাঙালীর বিচিত্র জীবনজিজ্ঞাসাকে অভিনব দিক থেকে ফুটিয়ে তুলেছে। বেদান্তের ওপর ভিত্তি করলেও আচার-অনুষ্ঠানকে তিনি সাধ্যসাধন থেকে বাদ দেন নি এবং প্রতীকোপাসনাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন নি।[২২] আমরা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ঈশ্বরতত্ত্ব ও তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করি বটে, কিন্তু এই একই পথের পথিক গুরুনাথের কথা ভুলে থাকি। এটি একটি গুরুতর অপরাধ। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বহু শিষ্যের কাছে 'দেব-মানব' বলে গৃহীত গুরুনাথের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে আকস্মিকভাবে। ১৩২১ সনের ২ জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুরের গোয়ালগ্রামে জনৈক শিষ্যের বাড়ীতে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। রাত্রি দুটোর সময় ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ে শিষ্যের বাড়ীর কিয়দংশ উড়ে যায় এবং চারপাশের ঘরদালানের প্রভূত ক্ষতি হয়। গুরুনাথ যে-ঘরে রাত্রিযাপন করছিলেন সে ঘরও ভেঙে পড়ে এবং তার ফলে তাঁর তৎক্ষণাৎ জীবনাবসান হয়।

পরবর্তীকালে অসংখ্য শিষ্য ও অনুরাগী ভক্তের হৃদয়ে গুরুনাথের স্মৃতি পবিত্র হোমাগ্নির মতো প্রজ্জ্বলিত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে ধর্মোপদেষ্টা, গুরু ও সাধকরূপে তাঁর গূঢ় পরিচয়ের অনেকটা অনুদ্‌ঘাটিতই রয়ে গেছে। কবি, প্রাবন্ধিক ও মনস্বী লেখক গুরুনাথের সারস্বত প্রতিভারও সবটা কি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে?

পাদটীকা নির্দেশিকা

১. এই জীবনীর নাম 'সত্যধর্মপ্রচারক দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ'। লেখক বোধ হয় তাঁর কোন শিষ্য। গ্রন্থে লেখকের নাম বা প্রকাশের তারিখ নেই।

২. সম্প্রতি প্রকাশিত সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের 'সাধুতপস্বী'তে (২য়) গুরুনাথের অধ্যাত্ম সাধনা সম্পর্কে কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩. কবি তাঁর 'পত্নীশতকম্' কাব্যে বলেছেন:

গ্রন্থান্ পরান্ বহুবিধান্ দ্বিশতার্ধ সংখ্যান্
নির্মায় নির্জন গৃহে চিরকালমাস্তে

এর থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি সংস্কৃতে দ্বিশতার্ধ অর্থাৎ একশখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

৪. 'সত্যধর্ম প্রচারক দেব-মানব মহাত্মা গুরুনাথ', পৃঃ ১৭৪

৫. এই সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, "অন্য নারীর (সে নারী কাল্পনিক বা বাস্তবই হউন) রূপগুণ-বর্ণনাবহুল অসংখ্য কাব্য পৃথিবীতে রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বকীয় পত্নীর বিষয় আশ্রয় করিয়া এইরূপ কাব্য রচনা সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ হয় অভূতপূর্ব—কবি গুরুনাথই বোধ হয় এ বিষয়ে পথিকৃৎ ও পথপ্রদর্শক!… …যাঁহাদিগের এরূপ ধারণা আছে যে, মহোন্নত মহাপুরুষেরা রতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নহেন বা হইতে পারেন

Dhaka University Institutional Repository

নাথ, কৈকেয়ীর প্রতি দশরথ, সূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণ, দ্রৌপদীর প্রতি অর্জুন, ভানুমতীর প্রতি দুর্যোধন, দুঃশলার প্রতি জয়দ্রথ, জাহ্নবীর প্রতি শান্তনু, উর্বশীর প্রতি পুরুরবা, জনার প্রতি নীলধ্বজ।

১৭. কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "মধুসূদন বঙ্গীয় কবিকুলের শিরোমণি; বিশেষতঃ, মনোহারিণী বীরাঙ্গনা তদীয় কবিত্ব-যৌবন-সম্ভূত। এজন্য আশা করিয়াছিলাম যে, কবিহৃদয়সুলভ সদ্‌গুণাবলী-ভূষিত কোন মহাত্মা বীরাঙ্গনার উত্তর স্বরূপ কোন একখানি কাব্য রচনা করিয়া উত্তর-পাঠার্থী জনগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না দেখিয়া এবং কতিপয় বন্ধুর অনুল্লঙ্ঘনীয় অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া, আমি সাদৃশ জনের সুদুঃসাধ্য এই দুরূহ ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।"

১৮. সেযুগের কোন কোন সমালোচক এ কাব্যে বিজ্ঞানের উপমা ব্যবহারকে প্রশংসাই করেছিলেন। 'ব্রহ্মাণ্ড বাজার' শীর্ষক সাময়িক পত্রিকায় 'বীরোত্তর কাব্যে'র প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল, "বীরোত্তর কাব্য-লেখক গুরুনাথ বাবু একজন প্রধান কবি, তিনি স্বপ্রণীত কাব্যে রসায়ন শাস্ত্র-সংক্রান্ত অলঙ্কারগুলি সুচারুরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া বঙ্গীয় ভাবী কবিদিগকে এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।" ('মহাত্মা দেবনাথ'—পৃঃ ১৮৭-১৮৮)

১৯. গুরুনাথ বোধ হয় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমর্থন করতেন না, যদিও বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। বিদ্যাসাগরও তাঁকে অতিশয় স্নেহ করতেন। কিন্তু উচিত বোধ হলে তিনি বিদ্যাসাগরের মতের প্রতিবাদ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। বর্ণপরিচয়ের অনুরূপ 'প্রথম পাঠ' নামে তিনি একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তিকা লেখেন। তাতে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয় প্রথমভাগে'র দোষ দেখিয়ে লিখেছেন, "বিদ্যা-সাগর মহাশয় যে প্রণালীতে বর্ণপরিচয় রচনা করিয়াছেন, তাহাতে র্ ও ঋ এই বর্ণদ্বয়ের সংযোগে যে কি আকার হইবে তাহা বলিবার অবকাশ পান নাই। শুভঙ্কর দাসও ঐবিষয়ে ঐরূপ। অথচ নির্ঋতি নৈঋত প্রভৃতি পদ সংস্কৃতের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষায় বহু পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের আরও অনেক দোষ আছে, উহা ইউরোপীয় প্রণালীর অনুসরণে বাহ্য চাকচিক্যসম্পন্ন বটে, কিন্তু উহার অন্তঃসার অত্যল্প।" ('মহাত্মা গুরুনাথ', পৃঃ ২৩৬)

২০. তাঁর সম্বন্ধে মুখে মুখে এমন সমস্ত অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হয়েছে যে, সে-যুগে তাঁকে ভক্তেরা কী দৃষ্টিতে দেখতেন তা সহজেই বোঝা যাবে। তাঁর জীবনীতে এই ধরনের বাইশটি 'সিদ্ধায়িতা' বা অলৌকিক শক্তির উল্লেখ এবং একাশিটি অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা আছে (উক্ত জীবনীর ৩৯২ থেকে ৪৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)।

২১. তাঁর 'সত্যধর্মঃ' শীর্ষক তত্ত্বগ্রন্থে (১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) বলা হয়েছে:

নাত্র শুদ্ধতমে ধর্মে সাকারাণামুপাসনা।
ন জাতিভেদনিয়মো যোগানাং নাস্তি সাধনম্॥
লয়ো ন সম্মতশ্চাস্মিন্নাত্মনঃ পরমাত্মনি।
মোক্ষস্য কারণং জ্ঞেয়ং কেবলং গুণসাধনম্॥

অর্থাৎ এই বিশুদ্ধ ধর্মমতে সাকার উপাসনা নেই, জাতি-ভেদ নেই, যোগসাধন নেই, নির্বাণ নেই। কেবল গুণসাধনকেই (অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক স্বভাবধর্ম) মোক্ষের কারণ বলে জানবে। 'গুণরত্নম্' (১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) পুস্তিকায় তিনি বলেছেন:

আর্যা-ম্লেচ্ছা-দুরাচারাঃ সদাচারা মহাধিয়ঃ
দুর্ধিয়াশ্চাপি সর্বেঽত্র গুণানাং সাধনে ক্ষমাঃ॥

অর্থাৎ আর্য, ম্লেচ্ছ, দুরাচার, সদাচার বুদ্ধিমান ও দুর্বুদ্ধি লোক—সকলেই এই গুণসাধন করতে পারে।

২২. তাঁর 'তত্ত্বজ্ঞান' গ্রন্থে 'গুণসাধনা'র বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে।

h